পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনা

পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০২২

গবেষক

অণিমা রায়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা

গবেষণার কাজটিতে আমি আমার সংগীত বিভাগের শিক্ষক সহযোগী অধ্যাপক ড. মহসিনা আক্তার খানমের কাছে প্রেরণা ও নির্দেশনা পেয়েছি, যিনি আমার তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়াও বহু অধ্যাপক, চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক কর্মী, সংগীতশিল্পী ও শুভাকাঙ্ক্ষীর সহায়তা ও অনুপ্রেরণা পেয়েছি। তাঁদের মধ্যে অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ, অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ শংকর জোয়ার্দ্দার, জনাব কে এম খালিদ হোসেন, কথাসাহিত্যিক ফরিদুর রেজা সাগর, শিশুসাহিত্যিক আমিরুল ইসলাম, ড. আকলিমা আক্তার কুহেলি, ড. শাহনাজ নাসরীন ইলা, ড. রেজওয়ান আলী লাবলু, কণ্ঠশিল্পী শাহীন সামাদ, তিমির নন্দী, শারমিন সাথী ইসলাম ময়না প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগতি বিভাগের প্রাক্তন পাঠাগার সহায়ক ও অফিস সহকারী মনি রাণী সরকার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের কর্মকর্তা স্বরাজ কুমার অধিকারী, পাঠাগার সহায়ক পলি রাণী সরকার, কবি নজরুল ইনস্টিটিউটের গ্রন্থাগারিক তামান্না আনওয়ার, জনাব মোঃ মহসিন মিঞা, বাংলা একাডেমির উপপরিচালক ড. সাহেদ মন্তাজের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও স্মরণ করছি।

সর্বোতভাবে আমার পরিবার, পুত্র অমিয় ও তার বাবা সাংবাদিক তানভীর তারেকের অনুপ্রেরণার কথা বিশেষভাবে স্মরণ করছি।

এদের সকলের প্রতি আমার ঋণ কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করছি।

জুন ২০২২ — অণিমা রায়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়নপত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ২০২০-২০২১ (পুনঃ) শিক্ষাবর্ষ, গবেষক রেজি. : ১৮, **‘পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনা’** গবেষণাটি সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য প্রণীত অভিসন্দর্ভ। আমার জানামতে গবেষণাকর্মটির কোনো অংশ পূর্বে প্রকাশ হয়নি বা প্রকাশের জন্য কোথাও জমা দেওয়া হয়নি। গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত ও উপস্থাপিত হলো।

আরো প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, গবেষকের গবেষণায় কোনো প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ঘোষণাপত্র

আমি ঘোষণা করছি যে, 'পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনা' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি আমার নিজস্ব একটি মৌলিক রচনা। অভিসন্দর্ভটি সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে। গবেষণাপত্রের কোনো অংশ প্রকাশ করা হয়নি বা প্রকাশের জন্য জমা দেওয়া হয়নি।

আরো ঘোষণা করছি যে, আমার গবেষণায় কোন প্রকার Plagiarism (অন্যের লেখা নিজের বলে চালানো) নেই।

গবেষক

অণিমা রায়
পিএইচ. ডি গবেষক
রেজি. : ১৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০২০-২০২১ (পুনঃ)
সংগীত বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

অবতরণিকা

স্বদেশ শব্দটির সাথে একটি নিবিড় সংযোগ থাকে আত্মার। অদৃশ্য ও অনির্বচনীয় এই ধ্যানের সংজ্ঞা বিবৃত করা অত্যন্ত কঠিন। যেমনটা কঠিন মায়ের প্রতি ভালোবাসা মুখের কথায় বর্ণনা করা। এ যেন অব্যক্ত এবং উপলব্ধির। পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের যেকোনো ভাষাভাষির জন্যই এই আবেগের ব্যাপ্তি সমান। তাই স্বদেশমাতৃকার অস্তিত্ব রক্ষায় নিজের পরিচয়ের শেকড় বলবৎ রাখতে যুগের পর যুগ পৃথিবীব্যাপী রক্তঝরার কতশত ইতিহাস! পাশবিক শক্তি যেমনি হোক দেশপ্রেমিক আত্মিকশক্তি দিয়ে প্রচণ্ডভাবে লড়ে যেতে চায় দেশের পতাকা উড্ডীয়মান রাখতে। যা দেখতে পাই একবিংশ শতাব্দীর এ পর্যায়ে ইউক্রেনের উপর রাশিয়ার হামলায় ইউক্রেনের জনগণের প্রতিরোধের উদাহরণে।

দেশপ্রেমিক নিজের অবস্থান থেকে দেশের পরিচয়, নিজের অস্তিত্বের পরিচয় সুরক্ষিত রাখতে সংগ্রাম করে যায়। কেউ অস্ত্র ধরে, কেউ কলম ধরে, আবার কারো কণ্ঠের গান হয় অনুপ্রেরণার শক্তির স্মারক। প্রত্যেকের ভূমিকাই তাৎপর্যপূর্ণভাবে গুরুত্ববাহী। একটি শক্তিশালী মুষ্টি পঞ্চআঙুলের সমষ্টি। প্রতিটি আঙুল শক্তিশালী হলেই আঘাতটি বলিষ্ঠ হয়।

চেতনার বিষয়টি চোখে দেখা যায় না, অথচ চেতনাই সকল আবেগের কেন্দ্রের ঘর। যেখানে মানুষ পরিবর্তনের স্বপ্ন বুনে। ঘুমিয়ে থাকা চিত্তকে জাগানোর নাম চেতন, তেমনি আবেগে পূর্ণ অনুভূতিপ্রবল জাগ্রতচিত্তের অপর নাম চেতনা। চেতনাবিহীন জাতি নিষ্প্রাণ দেহসর্বস্ব। স্বদেশচেতনায় পূর্ণ জাতি সবচেয়ে বিত্তশালী, রাষ্ট্রের মুকুটস্বরূপ। স্বদেশচেতনায় পূর্ণ এক মহানায়কের নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, যিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন পরিবর্তনের এবং সেই স্বপ্নে বিভোর করেছিলেন স্বপ্নাতুর দেশবাসীকে, যার ফলশ্রুতি আজকের বাংলাদেশ।

একটি দেশের পরিচয় তার সংস্কৃতি। সংগীত-সাহিত্য ও শিল্প-ঐতিহ্যে পূর্ণ জাতি বিশ্বের মানচিত্রে নিজেদের শক্ত আসনের জানান দেয়, তেমনি দেশের যেকোনো সংকট বা আন্দোলনের আবেগ প্রকাশের বাহন হয় সংগীত-সাহিত্য। যে দেশে যত বেশি গুণি গীতিকার, সুরকার, শিল্পী-সাহিত্যিকের জন্ম, সেই দেশ তত বেশি সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী। সেদিক থেকে বাংলা সংস্কৃতি তথা গানের ভাণ্ডার অত্যন্ত সমৃদ্ধ সেই আদিকাল থেকে। স্বদেশসংগীত বলতে বুঝায় স্বদেশের প্রকৃতি, ঐতিহ্য, গৌরবগাঁথার সমন্বয়ে রচিত গান। আবার স্বদেশের দুঃসময়ে মানুষের মনে উদ্দীপনা জাগানিয়া গান অসহায় মানুষের মনে শক্তি সঞ্চার করে। স্বদেশের বিজয়ে আনন্দ প্রকাশ, স্বদেশকে মাতৃ ও ভক্তিজ্ঞানে স্বদেশপ্রেমের গান রচিত হয়। স্বদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন, আভ্যন্তরীণ দুর্যোগ বা আন্তর্জাতিক প্রীতিস্থাপন সকল গানই স্বদেশপর্যায়ের গান বা দেশাত্মবোধক গান। দেশ শঙ্কাপূর্ণ হলে এ সকল গানের ভূমিকা হয় অত্যন্ত বলিষ্ঠ ও অনুপ্রেরণাদায়ক। এতটাই শক্তিশালী হয় এর আবেগ যে দেশের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করতে মনে সাহস জোগায় এই গানের বাণী ও সুরের সম্মিলনী শক্তি।

Dhaka University Institutional Repository

স্বদেশপর্যায়ের গান রচনায় পঞ্চগীতিকবির কৃতিত্বের কাছে আজও আমরা ঋণী এবং সেই স্বর্ণ সময়কে অতিক্রম করা কখনো সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথ থেকে অতুলপ্রসাদ সেন অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়টা স্বদেশসংগীত রচনার জোয়ারকাল। আবার এর পরবর্তী সময় অর্থাৎ অসহযোগ আন্দোলনের সময়টাতে স্বদেশসংগীত রচনার অন্যরকম ঢেউ দেখতে পাওয়া যায় নজরুল ইসলামের গানে। বঙ্গভঙ্গোত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত এবং অতুলপ্রসাদের স্বদেশসংগীত রচনার অপ্রতুলতাকে কানায় কানায় পূর্ণ করে দেন কাজী নজরুল ইসলাম। ইংরেজবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে এই সকল স্বদেশচেতনাবাহী গানের গুরুত্ব অপরিসীম।

বর্তমান অভিসন্দর্ভের প্রতিপাদ্য পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনার স্বরূপ অন্বেষণ। এই অভিসন্দর্ভটি মোট আটটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে। 'স্বদেশচেতনার পটভূমিকা' শিরোনামে অধ্যায়টি মূলত স্বদেশচেতনা বিষয়ক আলোচনা এবং এই ধারার সংগীত রচনার পটভূমি বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। স্বদেশি গানে পঞ্চগীতিকবির সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে আনা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে সম্পূর্ণভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনা, তাঁর পারিবারিক বলয়ে স্বদেশি গান রচনার অনুপ্রেরণাসহ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্ব পর্যন্ত তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গানের ভাব বিশ্লেষণ ও প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও সামগ্রিক রবীন্দ্রজীবনে স্বদেশসংগীতের গুরুত্ব ও তাঁর রচিত অন্যান্য পর্বের গানেও স্বদেশ কি করে মিশে গেছে তার উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে। যেমন রবীন্দ্র রচনার বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বদেশ, স্বদেশসংগীত রচনার কালানুক্রমিক আলোচনা, বঙ্গভঙ্গের সময়ে রচিত গান, বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে রচিত স্বদেশি গান, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগীতের তালিকা, রবীন্দ্রনাথের অন্যপর্যায়ের গানে স্বদেশভাবাশ্রিত গান, প্রকৃতিপর্বের গানে স্বদেশবন্দনা প্রভৃতির আলোকপাত করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে রবীন্দ্র সমসাময়িক গীতিকবি বৈচিত্র্যতায় পূর্ণ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে স্বদেশভাবনা, তাঁর সংগীতে স্বদেশচেতনা, নাটকের গানে স্বদেশ, স্বদেশের গানে সুর অন্বেষণ, হাসির গানের উপমায় স্বদেশচেতনা প্রকাশ এমনকি তাঁর কাব্যপ্রবাহের স্বদেশের চেতনা বিষয়ে আলোচনা আছে। চতুর্থ অধ্যায়ে আধ্যাত্মিকভাবের কবি রজনীকান্ত সেনের গানের স্বদেশবিষয়ক আলোচনা আছে। রজনীকান্ত সেনকে বৈচিত্র্যতাবিহীন সরলতায় আদর্শ কবি বলা যেতে পারে। তাঁর স্বদেশপর্বের গানও ঠিক তাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে জাতীয় চেতনায় রজনীকান্ত সেনের ভূমিকা, তাঁর গানে স্বদেশচেতনা, তাঁর রচিত জাগরণী গানে স্বদেশচেতনার বিকাশ ও কতিপয় হাসির গানেও স্বদেশচেতনার বিষয়টি ধরা পড়ে। এই বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। অতুলপ্রসাদ সেন রবীন্দ্র-ভাবনার আদর্শিক কবিদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ এবং রবীন্দ্রনাথের নিকটজন। অতুলপ্রসাদ সেনের গানে স্বদেশভাবনা বিষয়ে আলোচনা আছে পঞ্চম অধ্যায়ে। আরও আছে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর অনুরাগ, শিক্ষা বিস্তারে তাঁর ভূমিকার কথা, অবহেলিত হরিজন-সভার প্রতি মমত্ববোধ এবং তাদের সেবা তথা স্বদেশের মানুষের সুবিধার স্বার্থে বিভিন্ন সংগঠনও তিনি গঠন করেন। তাঁর গানে স্বদেশচেতনা, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্বে অতুলপ্রসাদের ভূমিকাসহ তাঁর রচিত বিবিধ পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনার স্ফুরণবিষয়ক আলোচনা করা হয়েছে এই অধ্যায়ে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে সন্নিবেশিত হয়েছে স্বদেশসংগীত রচনার ক্ষেত্রে একেবারে নতুন এক ধারার বিকাশ। এক উন্মাদনার সুরে কবি নজরুলের আবির্ভাব হয় অসহযোগ আন্দোলনপর্বে। তাঁর গানের স্বদেশভাবনায়, জীবনপ্রবাহে সংগীত, সামরিক জীবনে সংগীত রচনার অনুপ্রেরণা এবং তাঁর সাম্যবাদী গানে স্বদেশচেতনাসহ দেশাত্মবোধক গানের ভাব-বিশ্লেষণ, স্বদেশচেতনার স্ফুরণ ও পর্যালোচনা করা হয়। প্রথম থেকে ষষ্ঠ অধ্যায় পর্যন্ত পঞ্চগীতিকবির স্বদেশভাবনা, স্বদেশি রচনাসম্ভার এবং স্বদেশচেতনা বিষয়ক আলোচনা করা হলেও সুর বিশ্লেষণ নিয়ে কোনো বিষয়ের অবকাশ ছিলো না। কিন্তু সুরবিহীন সংগীত কেবলই পদ্য। তাই স্বদেশি গানে সুরের প্রয়োগে পঞ্চগীতিকবি তাঁদের সক্রিয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন। সেই বিষয়ে স্বদেশি সংগীতের উদাহরণসহ আলোচনা করা হয়েছে সপ্তম অধ্যায়ে। 'পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনা' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটির অষ্টম অধ্যায়ে রয়েছে হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনকাল পর্যন্ত দীর্ঘ আন্দোলনের পটপরিবর্তনে যে সকল পর্বে গান রচিত হয়েছে তার চেতনার প্রকাশ। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধসহ বর্তমান কালের যেকোনো সংকটে, উৎসবে কি করে আজও একই আবেগে অনুরণিত করছে সে বিষয়ে আলোচনা। পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনার সার্বিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা থেকে রচিত হয়েছে এর উপসংহার। এই গবেষণায় পঞ্চগীতিকবি ও স্বদেশের উপর প্রকাশিত গ্রন্থ, গীতিগ্রন্থ ও স্বরলিপি গ্রন্থসমূহের সাথে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান এবং অভিসন্দর্ভটির শিরোনাম সংক্রান্ত আলোচনা ও প্রাসঙ্গিক গবেষণা গ্রন্থকে মাধ্যমিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

গবেষণা পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রথমত, পাঠ বা আধেয় বিশ্লেষণ পদ্ধতি (Content Analysis Method) অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতিতে ব্যবহৃত উপকরণ হিসেবে বর্ণনামূলক ধারাকে (Descriptive Method) অনুসরণ করে পরীক্ষামূলক লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। সবশেষে তুলনামূলক পদ্ধতির (Comparative Method) মাধ্যমে এ গবেষণার অতীত ও আধুনিক রূপ বিশ্লেষণ করে নতুন তথ্য উন্মোচনের চেষ্টা করা করা হয়েছে।

গবেষণাপত্রটি সুন্দরভাবে উপস্থাপনের জন্যে শিকাগো পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায় ॥ সংগীতে স্বদেশচেতনার পটভূমিকা	১২
দ্বিতীয় অধ্যায় ॥ রবীন্দ্রনাথের গানে স্বদেশচেতনা	২১
রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা	২১
পারিবারিক বলয়ে স্বদেশ	২৩
হিন্দুমেলার ভূমিকা	২৫
সঞ্জীবনী সভার ভূমিকা	২৫
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্ব	২৬
রবীন্দ্র রচনার বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বদেশ	২৭
রবীন্দ্র প্রবন্ধে স্বদেশ	২৮
রবীন্দ্র কবিতায় স্বদেশ	৩১
চিঠিপত্রে স্বদেশ	৩২
রবীন্দ্র গল্পে স্বদেশ	৩২
রবীন্দ্র নাটকে স্বদেশ	৩৩
রবীন্দ্র উপন্যাসে স্বদেশ	৩৪
রবীন্দ্র স্বদেশচেতনার গান রচনার কালানুক্রমিক ধারা	৩৬
বঙ্গভঙ্গকালে রচিত স্বদেশচেতনার গান	৪৫
স্বদেশি গান রচনার ভাটাকাল	৫৫
বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে রচিত স্বদেশি গান	৫৬
রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা	৬৬
পূজা পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা	৬৬
স্বদেশচেতনার বিষয় বৈচিত্রতা	৭২
মাতৃভাষার গুরুত্ব	৭৩
অসাম্প্রদায়িকতার বার্তা	৭৫
প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বন্দনা	৭৭
গণমানবের জয়গান	৭৯
আত্মজাগরণ বার্তা	৮০
জননী কল্পনায় স্বদেশরূপ	৮০
তৃতীয় অধ্যায় ॥ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে স্বদেশচেতনা	৮৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশভাবনা	৮৯
স্বদেশভক্ত ও রাজভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৯১
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়	৯৬
দ্বিজেন্দ্রনাটকের গানে স্বদেশচেতনা	৯৮
দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশ	১০০
সুরশৈলী অনুসন্ধান	১০৪
হাসির উপমায় স্বদেশ	১০৮

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১১০
দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহে স্বদেশচেতনা ১১২
দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতে স্বদেশচেতনা ১১৪

চতুর্থ অধ্যায় ॥ রজনীকান্ত সেনের গানে স্বদেশচেতনা ১২৭
রজনীকান্ত সেনের স্বদেশভাবনা ১২৭
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা জাতীয় চেতনায় রজনীকান্ত সেনের ভূমিকা ১২৯
রজনীকান্ত সেনের গানে স্বদেশচেতনা ১৩৩
জাগরণী গানে স্বদেশচেতনা ১৪১
হাসির গানে স্বদেশচেতনা ১৪৩

পঞ্চম অধ্যায় ॥ অতুলপ্রসাদ সেনের গানে স্বদেশচেতনা ১৪৯
অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশভাবনা ১৪৯
বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ ১৫২
শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা ১৫৫
হরিজন সভার প্রতি মমতা ও দায়িত্বপালন ১৫৫
স্বদেশ রক্ষার্থে গঠিত সংগঠন ও ভূমিকা ১৫৭
অতুলপ্রসাদের গানে স্বদেশচেতনা ১৬০
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্বে অতুলপ্রসাদ সেন ১৭১
বিবিধ পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা ১৭৩

ষষ্ঠ অধ্যায় ॥ কাজী নজরুল ইসলামের গানে স্বদেশচেতনা ১৮১
নজরুলের স্বদেশভাবনা ১৮১
সেনাবাহিনীতে যোগদান ১৮২
সামরিক সংগীত রচনায় নজরুল ১৮৩
নজরুলের সাম্যবাদী চেতনায় স্বদেশ ১৮৫
রাজনৈতিক আন্দোলনে নজরুল ১৮৮
নজরুলের গানে স্বদেশচেতনা ১৯৩
নজরুলের গানে স্বদেশচেতনার স্ফুরণ ও পর্যালোচনা ১৯৫
ক. শিকল ভাঙার গান ১৯৮
খ. বিজয়গাঁথার গান ২০১
গ. সাম্যবাদের গান ২০৩
ঘ. নবযাত্রার আন্দনধ্বনির বার্তাবাহী গান ২০৬
ঙ. শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণের গান ২১০
চ. নারী জাগরণের গান ২১৫
ছ দেশের গানে মাতৃরূপ দর্শন ২১৭
জ. স্বদেশে বিশ্বরূপ লোকায়ন ২১৮
ঝ. স্বদেশের গানে প্রকৃতি বন্দনা ২১৯
ঞ. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি ২২১

সপ্তম অধ্যায় ॥ পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনাবাহী গানের সুর বিশ্লেষণ ২২৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ ২৩০
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ ২৪১

Dhaka University Institutional Repository

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ ২৫০
অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ ২৫৩
কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ ২৬২

অষ্টম অধ্যায়: মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় জীবনে স্বদেশচেতনা বিনির্মাণে পঞ্চগীতিকবির গান ২৭৫
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান ২৮০
চলচ্চিত্রে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান ২৮১
থিয়েটারে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান ২৮২
জাতীয় সংকটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান ২৮২

উপসংহার ২৮৭

গ্রন্থপঞ্জি ২৯৫

পরিশিষ্ট ॥ পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গানের তালিকা ২৯৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশচেতনার গান ২৯৯
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশচেতনার গান ৩২৮
রজনীকান্ত সেনের স্বদেশচেতনার গান ৩৪১
অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশচেতনার গান ৩৫২
কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশচেতনার গান ৩৬১

পঞ্চগীতিকবির গানে স্বদেশচেতনা

পিএইচ. ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

জুন ২০২২

গবেষক

অণিমা রায়
রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ১৮
শিক্ষাবর্ষ : ২০২১-২০২২
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক

ড. মহসিনা আক্তার খানম (লীনা তাপসী)
সহযোগী অধ্যাপক
সংগীত বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম অধ্যায়
সংগীতে স্বদেশচেতনার পটভূমিকা

বাংলা স্বদেশি গানের মর্মমূলে রয়েছে পরাধীনতারবোধ। বাংলা সাহিত্যে ও সংগীতে ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্বদেশ প্রসঙ্গটি বিকাশলাভ করে। চর্যাপদ থেকে রামপ্রসাদের গানের যুগে অর্থাৎ প্রায় সাতশ বছরের ইতিহাসে স্বদেশ বিষয়ক কোনো গান বা কবিতা রচিত হয়নি। ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বন্ধনই ছিলো তাদের রচনার উৎস। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইংরেজদের আগমনের পরেই স্বদেশ নিয়ে সচেতনতার বিষয়টি প্রত্যক্ষ হয়। ইংরেজদের শোষণমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে পরাধীনতাবোধের সম্মিলনে জনমনে দেশপ্রেমবোধ দানা বাঁধতে থাকে। সামাজিক হীনমন্যতা ও বেদনার উপলব্ধি থেকে জাগ্রত হয় স্বজাতির সকল মহত্তর বিষয়ের প্রতি গর্ববোধ ও দেশের তুচ্ছ থেকে তুচ্ছতর বিষয়ের জন্য মায়ার অনুভূতি।

স্বদেশপ্রেম বিষয়ক সাহিত্য আত্মপ্রকাশের প্রধান দুটি কারণ হিসেবে বলা যায়, নিজস্ব পরিচয় প্রতিষ্ঠা ও সেই লক্ষ্যে সমাজকে সচেতন করা এবং সর্বোপরি স্বাধীনতার জন্য মানসিক প্রস্তুতির নির্দেশনা দেওয়া। স্বদেশপ্রেম বিষয়ক গানের রয়েছে দুটি ধারা। এক ধারার স্বদেশীয় গানে থাকে স্বদেশের মানুষের প্রতি, প্রকৃতির প্রতি গভীর অনুরাগ, অন্য ধারাতে থাকে স্বদেশের জন্য এর বিশেষ কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে জনমনকে শুদ্ধ করা, অনুপ্রাণিত বা আন্দোলিত করা। এ বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, ইংরেজ সাহিত্যের প্রতি বিশেষত মুর, বায়রন, ক্যাম্বেল প্রমুখের লেখনির প্রতি এক ধরনের মুগ্ধতা কাজ করতো এদেশের শিক্ষিত সমাজের। এদের লেখায় অনুপ্রাণিত হয়ে অনেকেই অনুকরণ করতেন। যেমন রঙ্গলাল, নবীনচন্দ্র, হেমচন্দ্রসহ আরো জগৎখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখ্য। যেমন মাইকেল মধুসূদন ও বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষেত্রেও ইংরেজ কবিদের উক্তি বাংলা ভাষায় অনুবাদের উদাহরণ মেলে। এসব উল্লেখের উদ্দেশ্য হলো ইংরেজ কবিদের লেখায় তথা ইউরোপীয় সাহিত্যে স্বদেশপ্রেমমূলক রচনার বিকাশ ছিলো বহু আগে থেকেই এবং সেই সকল রচনা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বাংলা সাহিত্যে এর অনুপ্রবেশ ঘটে। স্বদেশের কীর্তিবিষয়ক রচনা, বিজয়গাঁথা ও প্রকৃতির আরাধনার বিষয় স্থান করে নেয় বাংলা সাহিত্য ও গানে। সেদিক থেকে বাংলা সাহিত্যে স্বদেশচেতনা বিকাশে এসব রচনার সূত্রপাতের একটি পরোক্ষ কারণ হতে পারে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশক থেকে মূলত দেশপ্রেম নিয়ে গান রচনা শুরু হয়। সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্রেক্ষাপট ও এর গতি পরিবর্তনের সাথে সাথে স্বদেশপ্রেমমূলক গানের রূপ বদলাতে থাকে। দেশের মানুষের বিপন্নতা, হীনমন্যতা, সর্বোপরি পরাধীনতার বোধ স্বদেশি গান রচনার মূল অনুপ্রেরণায় পরিণত হয়। ইংরেজ শাসক কর্তৃক শাসিত বাঙালির দেশাত্মবোধের বেদনা থেকে রচিত হতে থাকে স্বদেশপ্রেমের গান। পরাধীন জাতির এই হতাশা মূলত অনুভূত হতে শুরু করে পলাশী

যুদ্ধের সময়কাল থেকেই। ভারতবাসীর উপর আধিপত্য বিস্তারে ইংরেজরা সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের সামরিক শক্তি প্রয়োগ, বাণিজ্য ঘাটি স্থাপনে নানা কুটিলতার মাধমে অর্থশক্তি বৃদ্ধি যেভাবে অগ্রসর হতে থাকে; ততই বাড়তে থাকে বাঙালির দুঃখ-কষ্ট, অপমান ও বহুবিধ পন্থায় অত্যাচারের নমুনা। যে কারণে কেবল দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইংরেজকে আরও বহুকাল সহ্য করে যাওয়াটা অসহনীয় হয়ে ওঠে। ইতোমধ্যে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থানের অবনতি বাঙালির আশাভঙ্গের ও চরম ক্ষোভের কারণ হয়ে ওঠে–যা শিক্ষিত বাঙালির মনে চরমভাবে আঘাত হানে। শাসক হিসেবে বাঙালি ইংরেজকে আর চায় না। শুরু হয় পরাধীনতার অপমান থেকে নিজেদের মুক্তির অভিপ্রায়ে সকলকে একাত্ম করা ও জাগ্রত করবার নানা পথের সন্ধান। চলতে থাকে স্বদেশি গান, কবিতা রচনা ও সর্বত্র স্বদেশপ্রেম জাগ্রতকরণের লক্ষ্যে এবং দেশের প্রতি অধিক মনোযোগী করে তোলার অভিপ্রায়ে সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার তৎপরতা।

সিপাহি বিদ্রোহ চলাকালীন সময়ে বাঙালি যেভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে প্রতিবাদে লিপ্ত হয়, প্রতিবাদে ও বাংলা প্রসারে মনোযোগী হয় তাতে সময়টাকে বাংলা রেনেসাঁ বলা যেতে পারে। ইংরেজদের বিরুদ্ধে বাঙালি চিত্তকে জাগ্রতকরণে সময়টি ছিলো অত্যন্ত সহায়ক। এ ক্ষেত্রে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য–

> "১৮৫৬ হইতে ১৮৬১ অব্দ পর্যন্ত এই কাল বঙ্গসমাজের পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ বলিলে হয়। এই কালের মধ্যে দেবেন্দ্রনাথে ঠাকুরের ব্রাহ্মধর্ম প্রচার, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বিধবা-বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আন্দোলন, নীলচাষের প্রসার ও তদ্বিষয়ে হাঙ্গামা ও হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'হিন্দু প্যাটরিয়টে' প্রতিবাদ, বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্র হইতে ইশ্বরচন্দ্র গুপ্তের তিরোভাব ও মধুসূদনের আবির্ভাব, 'সোমপ্রকাশ' নামক পত্রিকার অভ্যুদয়, দেশীয় নাট্যশালা স্থাপন ও হিন্দুসমাজের মধ্যে রক্ষণশীলদলের জাগরণ এবং ধর্ম ও সমাজ সংরক্ষণের প্রয়াস, বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও পাশ্চাত্যশিক্ষার দ্রুত ব্যাপ্তি, ইনডিয়ান কাউন্সিল একট পাশ ও কলকাতায় হাইকোর্ট স্থাপন প্রভৃতি ঘটনাগুলি ঘটিয়াছিল। ইহার প্রত্যেকটি বঙ্গ সমাজকে এমন প্রবলভাবে আলোড়িত করিয়াছিল যে, প্রত্যেকটি বিষয়ে পৃথক ইতিহাস গভীরভাবে আলোচনার বিষয় হতে পারে। ইহাকে আমরা বলিব বাংলাদেশের রেনাসাঁস।"[১]

এ উক্তির মধ্যদিয়ে পরাধীনতার মুক্তি পেতে বাঙালি শিক্ষিত সমাজ যে জেগে উঠেছিল তার উদাহরণ মেলে। দেশবাসী দেশাত্মবোধের দিকে প্রসারিত হতে থাকে, তেমনি দেশের ভাষার প্রতিও অনুরাগী হয়ে ওঠে। মাতৃভাষার জন্য রচিত হয় গান, যার দ্বারা হয় ইতিহাসের প্রথম স্বদেশি গানের সূচনা। নিধুবাবুর রচিত সেই নবজাগরণের চেতনাবাহী গান–

"নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা ॥
কত নদী সরোবর, কিবা ফল চাতকীর
ধারা জল বিনে কভু ঘুচে কি তৃষা ॥"[২]

প্রায় একই সময় বিশেষত মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্যস্বরূপ রচিত হয় ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতা 'স্বদেশ' ও 'মাতৃভাষা'। মাইকেল মধুসূদনের 'বঙ্গভাষা' রচিত হয় ১৮৬১ সালে এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' রচিত হয় ১৮৬২ সালে। স্বদেশ বিষয়ক লেখনিতে বাংলা সাহিত্যের পটভূমি গড়তে শুরু করে।

স্বদেশের প্রতি উচ্ছ্বাস ও স্বদেশবন্দনার প্রকাশ পেতে থাকে বহু কাব্য ও গদ্য রচনার মধ্যদিয়ে। সেই সময় অর্থাৎ ১৮৬৭ সালে যে সংগঠনটিকে ঘিরে স্বদেশি গান রচনার জোয়ার শুরু হয় তা হলো 'হিন্দুমেলা'। এবিষয়ে সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্ধৃতি তুলে ধরা আবশ্যক–

> "উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জনচিত্তে দেশানুরাগ জাগিয়ে তোলার প্রচেষ্টায় বাঙালি এক নতুন কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেন। সভা-সমিতির আলোচনায় আর সাহিত্যের মধ্যে এতদিনে যে প্রচেষ্টা গণ্ডিবদ্ধছিলো তা বহুমুখী আর ব্যাপকরূপে লাভ করল 'চিত্রমেলা' বা 'হিন্দুমেলা'র প্রবর্তনে।"[৩]

এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন যে, হিন্দুমেলার পূর্বেই বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি অনেকটা অগ্রসর হয়ে গিয়েছিল যেখানে স্বদেশপ্রীতিমূলক আনন্দ-বেদনার উচ্ছ্বাসসহ জাতিগত সম্প্রীতি ও স্বদেশবন্দনার দিক-নির্দেশনা প্রকাশ পায়। যেমন ১৮৫৮ সালে রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যান', ১৮৬১ সালে মাইকেল মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্য এবং ১৮৬৪ সালে প্রকাশিত হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বীরবাহু' প্রভৃতি কাব্যে স্বদেশপ্রীতি ব্যক্ত হয়। এ সকল অনুপ্রেরণাই মূলত হিন্দুমেলা প্রতিষ্ঠার তাগিদ সৃষ্টি করে যেখানে দেশের মানুষের দুঃখ-দুর্দশা প্রতিহত করতে দেশের শিক্ষিত বাঙালি একত্রিত হয় এবং স্বদেশের স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষায় স্বদেশের উন্নতিকরণে স্বাবলম্বী হওয়ার আবশ্যকতা অনুভূত হয়। বিশেষত স্বদেশের উন্নতি নিশ্চিত করবার লক্ষ্যে স্বজাতির সকলের মধ্যে সাম্যতা ও সদ্ভাব গড়ে তোলা ছিলো 'হিন্দুমেলা'র মূল উদ্দেশ্য। অর্থাৎ বাঙালিমনে জাতীয়তাবোধ স্থাপন করাই 'হিন্দুমেলা'র প্রধান লক্ষ্য ছিলো। হিন্দুমেলার উদ্যোক্তাদের এই লক্ষ্যটির প্রতিফলন হিসেবেই এর বিশ বছর পরে কংগ্রেসের আবির্ভাব। প্রাক হিন্দুমেলাপর্বে স্বদেশবোধের যে বীজ বপিত হয়েছিল তারই বিকাশ লাভ ঘটে হিন্দুমেলার পর্বে। অতীত গৌরবের স্তুতিগাঁথা, কর্ম ও চিন্তায় স্বদেশপ্রীতিবোধ জাগ্রতকরণ সর্বোপরি জাতীয়তাবোধের প্রকাশ হিন্দুমেলা যুগে রচিত স্বদেশি গানের প্রধান উপজীব্য। সময়ের সাথে সাথে এই মেলা ও এর কর্মের পরিব্যাপ্তি বাড়তে থাকে। এই মেলা প্রসঙ্গে যোগেন্দ্রচন্দ্র বাগলের উক্তি, 'আমাদের এই মিলন সাধারণ ধর্মকর্মের জন্য নহে, কোনো বিষয়সুখের জন্য নহে, কেবল আমোদ-প্রমোদের জন্য নহে, ইহা স্বদেশের জন্য, ইহা ভারত ভূমির জন্য।'[৪] হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশনের মধ্যদিয়ে দেশীয় শিল্প, সাহিত্য ও সংগীতচর্চায় যেমন উৎসাহ প্রদান করা হতো, তেমনি কৃষিকাজ থেকে শুরু করে দৈহিক শক্তিচর্চা বিষয়েও দেশবাসীকে সচেতন করতে শুরু করেছিল। শুধু তাই নয় দেশের অর্থনৈতিক দৈন্য-দুর্দশার কথা ও এর প্রতিকারের পন্থা বিষয়ে প্রথম আলোকপাত করা হয় হিন্দুমেলাতেই। দেশীয় শিল্প পুনঃপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তার কথাও এই মেলাতেই প্রথম ব্যক্ত হয়। জাতীয় ঐক্যের বিষয়টিকে মূল করে এরা অগ্রসর হতে থাকে।

হিন্দুমেলা যুগে (১৮৬৭-১৮৮০) এই সকল আদর্শ বা ভাবনা ব্যক্ত করা হতো গানের মাধ্যমে। হিন্দুমেলার বিভিন্ন অধিবেশন উপলক্ষে কত গান রচিত হয়েছে, তা নিরূপণ করা কঠিন, এমনকি অনেক গানেই রচয়িতার নাম না থাকায় গীতিকাব্যের নাম নিরূপণ করাও অসম্ভব ছিলো। এই সকল গানের মধ্যদিয়ে বিশেষত স্বদেশি সাহিত্যচর্চায় হিন্দুমেলার উদ্দেশ্য ও স্বদেশিবোধকে প্রকাশ করা হতো। সর্বপ্রথম 'জাতীয় সংগীত' রচনা মূলত হিন্দুমেলা'তেই হয়। এই সময়ে রচিত হয় সত্যেন্দ্রনাথের

'মিলে সব ভারত সন্তান' এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 'মলিন মুখচন্দ্রমা ভারত তোমারি' স্বদেশি গান। মুখে মুখে এই গান দুটি গীত হতো এবং হিন্দুমেলা যুগের পরেও যেকোনো জাতীয়তাবোধ বা ঐক্যের আহ্বানের ডাক আসলেই সমস্বরে এই সকল গান গাওয়া হতো। স্বদেশপর্বের এই দুটি গান সম্পর্কে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন, 'এই হল আমাদের আমলের সকাল হবার পূর্বেকার সুর, যেন সূর্যোদয় হবার আগে ভোরের পাখি ডেকে উঠল। আমরাও ছেলেবেলায় এই সকল গান খুব গাইতুম।'[৫]

ড. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা* গ্রন্থে উল্লেখ পাই যে, জাতীয় সংগীত রচয়িতা হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং গগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং হিন্দুমেলার সবচেয়ে জনপ্রিয় গান হিসেবে খ্যাত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'গাও ভারতের জয়' গানটি যা হিন্দুমেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গীত হয়।

"মিলে সব ভারত সন্তান
এক তান মনঃপ্রাণ
গাও ভারতের যশগান॥"[৬]

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত এই গানটি এতটাই আলোচিত ও সকলের প্রশংসিত ছিলো যে, এই গানকে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন ভারতবর্ষের প্রথম জাতীয় সংগীত বলে দাবি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রও তাঁর 'বঙ্গদর্শনে' এই গানটির বহুল প্রশংসা করেন। তিনি বলেন–'এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! এই বিংশতিকোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।[৭]

বঙ্কিমযুগের রচিত স্বদেশপ্রেমের গানে স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনার ধারাটি পরিলক্ষিত হয়। পরবর্তীকালের গীতিকবি যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেনসহ অন্যান্য অনেক গীতিকবিই স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন।

হিন্দুমেলার পরিকল্পনা থেকে শুরু করে এর বাস্তবরূপ দান এবং সুষ্ঠু পরিকল্পনা সবটাই ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের অবদান। তবে জাতীয় মেলা প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগীদের মধ্যে নব গোপাল মিত্র মহাশয় প্রথম ও প্রধান হিসেবেই গণ্য ছিলেন। রাজনারায়ণ বসু এ বিষয়ে তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন–

> "শ্রীযুক্তবাবু নবগোপাল মিত্র মহোদয় আমার প্রণীত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' অনুষ্ঠান পত্র পাঠ করাতে হিন্দমেলার ভাব তাঁহার মনে প্রথম উদিত হয়। ইহা তিনি আমার নিকট স্পষ্ট স্বীকার করিয়াছেন। ঐ হিন্দুমেলা সংস্থাপনের পর উহার অধ্যক্ষতা করিবার জন্য মিত্র মহাশয় জাতীয় সভা সংস্থাপন করেন। উহা আমার প্রস্তাবিত 'জাতীয় গৌরবেচ্ছা সঞ্চারিণী সভার' আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রথম যে বৎসর (১৮৬৭ সাল) হিন্দুমেলা হয় আমি মস্তকের পীড়ার জন্য মেদিনীপুর হইতে ছুটী লইয়া বোড়ালে অবস্থিতি করিতেছিলাম।"[৮]

বলাবাহুল্য হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির পাশাপাশি অন্যান্য খ্যাত-অখ্যাত কবি স্বদেশি সংগীত রচনায় ব্রতী হন-

> "হিন্দুমেলা থেকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) পূর্ব পর্যন্ত স্বদেশি সংগীত রচয়িতাদের নামের তালিকা দেওয়া যেতে পারে, নবকান্ত চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী' (১৮৯৩ খ্রি. ১৩০০ ব. ৩য় সং) বইটি থেকে। 'সংগীত মুক্তাবলী'তে প্রকাশিত স্বদেশ সংগীতগুলির পর্যায় লক্ষ্য করলে দেখা যায়, এতে মূল বিভাগ দু'টি–'উদ্দীপনামূলক' ও

'সূচনা-সূচক'। এছাড়া মুদ্রা শাসন আইন, জন্মভূমি, বঙ্গভাষা, দিল্লী দরবার, নব্য বঙ্গের প্রতি, ভিক্টোরিয়ার প্রতি, জাতীয় মহাসমিতি ইত্যাদি বিভিন্ন সমসাময়িক ঘটনাকে ভিত্তি করে বিভিন্ন সংগীত রচয়িতাগণ স্বদেশ সংগীত রচনা করেছেন।"[৯]

প্রায় ত্রিশজন স্বদেশ সংগীত রচয়িতার নাম নবকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থে সংকলিত হয়। এঁদের মধ্যে ঠাকুর পরিবারসহ বাইরের খ্যাত অন্যান্য কবিদের নামও রয়েছে। যেমন ঠাকুর পরিবার থেকে রয়েছে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এছাড়াও রয়েছে কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শিবনাথ শাস্ত্রী, রাধানাথ মিত্র, কালীচরণ চট্টোপাধ্যায়, কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজকৃষ্ণ রায়, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র বসু, শীতলকান্ত চট্টোপাধ্যায়, বিষ্ণুরাম চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন, বেদারনাথ ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ দাস, গোবিন্দচন্দ্র রায়, আনন্দচন্দ্র মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, দ্বীননাথ ধর, গোবিন্দচন্দ্র দাস, অবিনাশচন্দ্র মিত্র, জগদীশ্বর সেন, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সুরেন্দ্রচন্দ্র বসু এবং কামিনী রায়। এছাড়াও 'ভারতীয় সংগীত মুক্তাবলী' গ্রন্থে আরো কয়েকজন অজ্ঞাত কবির স্বদেশ সংগীতের সন্ধান পাওয়া যায়। ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ভারতীয় জাতীয়তাবোধে স্বদেশপ্রীতির এক নতুন অধ্যায়। সংঘবদ্ধতা, স্বদেশব্রত ও ঐক্যের আদর্শের সাথে পরাধীনতার বেদনাবোধ থেকে মুক্তি লাভের প্রত্যাশায় বুদ্ধিজীবীদের সহমর্মিতা পেতে শুরু করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনকে কেন্দ্র করে অনেক দেশাত্মবোধক গান রচিত হয়। দেশের শাসন ব্যবস্থায় দেশবাসীর অধিকার লাভের আশায় জাতীয়তাবোধের বিবর্তনের ধারায় রাজনৈতিক অধিকারবোধ যুক্ত হতে থাকে, যার ফলশ্রুতি মূলত কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা লাভ। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য উক্তি–

"দেশবাসীর মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং দেশের শাসন সম্পর্কিত চিন্তা যখন জেগে উঠছে, সেই সময়কার (১৮৮৩) দুটি ঘটনা–ইলবার্ট বিল নিয়ে আন্দোলন ও সুরেন্দ্রনাথের কারাদণ্ড যা দেশবাসীকে আরও গভীরভাবে রাজনীতি সচেতন হতে সহায়তা করে। ছাত্রসমাজ দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন হয়ে আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করলে দেশব্যাপী এক উত্তপ্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা এই কারণে অনুভূত হয়। ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশনের বীজ থেকে জাতীয় কংগ্রেস পত্রে সুশোভিত, বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে।"[১০]

ঐক্যতার আদর্শকে মূল করে দেশের সকল মানুষকে দেশপ্রীতির ব্রতে সম্মিলিত হবার আহ্বানে অনুষ্ঠিত হয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন (১৮৮৬); তারই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' গানটি রচিত হয়। হিন্দুমেলা এবং বঙ্কিমযুগের স্বদেশপ্রেমবোধটি দেশের শিক্ষিত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও কংগ্রেসের যুগে এসে তা বিস্তৃতি লাভ করে। অর্থাৎ স্বদেশপ্রেম বোধটি কেবল মুষ্টিমেয় শিক্ষিতজনের চিন্তার বিষয় না থেকে তা দেশের গণমানুষের মধ্যে বিস্তারলাভ করতে থাকে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ও সম্প্রীতির বিষয়টি স্থান পায় দেশপ্রেমের ভাবনায় যা বঙ্কিমযুগে বা তাঁর পূর্বে প্রায় অসম্ভব ছিলো।

কংগ্রেসের সম্মেলন শুরু হতো 'বন্দে মাতরম' গান দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের 'অয়ি ভুবনমোহিনী', 'জনগণমন অধিনায়ক হে', 'দেশ দেশ নন্দিত করি' গানসমূহ কংগ্রেসের সভায় গাওয়া হতো। হিন্দুমেলা ও

বঙ্কিমযুগে স্বদেশপ্রেম চেতনার যে ধারাটি প্রতিষ্ঠা ও অগ্রসর হয় তা কংগ্রেসের সময় আরও কিছুদূর এগিয়ে যায় এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবে তা ফল্গুধারার ন্যায় জেগে ওঠে। বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশপ্রেমের গান বাংলার উৎসমুখ আবেগের জোয়ারে উন্মুক্ত হয়ে যায়। স্বদেশপ্রেমকে প্রতিষ্ঠিত করবার প্রয়াসে ১৯০৫ সালে বিদেশি পণ্য বর্জনের ঘোষণা দেওয়া বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক আন্দোলনের বহুবিধ ভাবনা প্রকাশের পথ পায়, এ সময়ে রচিত স্বদেশপ্রেমের গানগুলোতে। তবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গান এ সময়ের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তিনি বঙ্গভঙ্গ রদের পর বেশকিছু দেশাত্মবোধের গান রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রেমের গান রচনায় শ্রেষ্ঠ আসনে আসীন ছিলেন। এ ধারায় আরেকজন গীতিকবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় গান রচনা করে জনমনে স্থান করে নেন। অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দ দাসসহ অনেকেই স্বদেশভাবনার ও স্বদেশচেতনা সমৃদ্ধ গান রচনা করেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে। রবীন্দ্রনাথের দেশবন্দনার গানে পাই যেমন দেশের প্রতি মমতা ও গৌরববোধ তেমনি তা স্বদেশের ভিতর দিয়ে বিশ্বপ্রেমেরও প্রকাশ। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গান কোলাহলবর্জিত শান্তির আধার, গভীর ও মর্মস্পর্শী। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের গানের মধ্যে তিনি বিচিত্র ধারার সমন্বয় করেছেন, কখনো দেশের প্রকৃতি বন্দনা, কখনো দেশকে মাতৃরূপে দর্শন, আবার কখনো জাতীয় আন্দোলনের প্রেরণাদায়ী একলা চলার আহ্বান। তিনি মূলত দেশের গানের মধ্যে কর্মের আদর্শকে তুলে ধরেছেন। আত্মবিশ্বাস ও নিষ্ঠা দিয়ে দুর্জয়কে জয় করবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বদেশপর্বের গানে। যেমন–

"বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিসনে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিসনে ভাই ॥"[১১]

রবীন্দ্রসমসাময়িক যে সকল গীতিকবি স্বদেশের গান রচনা করেছেন তাদের গানে রবীন্দ্রপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গানের বাণী ও সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও এই অনুকরণপ্রিয়তা বা প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। যেমন–রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' গানটির ভাবগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয় ডি. এল. রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটিতে। আবার 'বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি' গানটির আদর্শ খুঁজে পাওয়া যায় অতুলপ্রসাদের 'হও ধর্মেতে ধীর, কর্মেতে বীর' গানটিতে। রবীন্দ্রনাথ মোট ৪৬টি স্বদেশপর্বের গান রচনা করেন, যা গীতবিতানের 'স্বদেশ' নামক পর্বে অন্তর্ভুক্ত আছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশপর্বের গানের সংখ্যা ১৯টি। এই সকল স্বদেশি গানে নিজস্ব ভঙ্গিমায় স্বদেশের স্তুতি বন্দনা ও মহিমার জয়গান গেয়েছেন। মূলত দেশের অতীত গৌরবকে তিনি গানের ভিতর দিয়ে চেতনায় আঘাত করতে দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছেন অতি সচেতনে। রজনীকান্ত সেনের গানের মূল বৈশিষ্ট্য কাতরতা। তাঁর স্বদেশপর্বের গান স্বদেশের দুঃখ-দুর্দশায় মৃয়মান। এই দুর্দশা প্রতিকারের পন্থা তিনি দিয়ে গেছেন তাঁর গানে। যেমন তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি একটি কালোত্তীর্ণ গান। এছাড়াও 'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত' গানটি অত্যন্ত বাস্তবতা নিরুপণকারী গান। রজনীকান্ত সেনের ১৬টি গানে স্বদেশানুভূতি পরিলক্ষিত হয়, যেখানে অতি সাধারণ সাদামাটা সুরে ও বাণীর বাস্তবতায় নিজস্ব ধারায় তিনি সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। অতুলপ্রসাদ সেন মাত্র ১৩টি স্বদেশপর্বের গান

রচনা করেছেন। দেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের বর্ণনার সাথে তাঁর স্বদেশপর্বের গানে চেতনা হয়ে ফুটে ওঠে অতীত, বর্তমানসহ ভবিষ্যতের আশার সুর। তাঁর 'ওঠ গো ভারতলক্ষ্মী', 'বল বল বল সবে' প্রভৃতি গানের ভিতর দিয়ে দেশের অস্তিত্বের উপলব্ধি ব্যক্ত করেছেন আপন স্বতন্ত্র ভঙ্গিতে। রচনা করেছেন মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের গান। এই সকল কবির গান রবীন্দ্রসমসাময়িক হবার কারণে নানাভাবে রবীন্দ্রপ্রভাব পরিলক্ষিত হলেও প্রত্যেকে সুর ও বাণীর সমন্বয়ে স্বতন্ত্র। স্বদেশপর্বের গানের ক্ষেত্রে একেবারে ব্যতিক্রম ধারাটি নিয়ে হঠাৎ ধূমকেতুর মতো আবির্ভাব হন কাজী নজরুল ইসলাম। তির্যকভঙ্গিতে ছুঁড়ে দেন তাঁর বিখ্যাত গান 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' (১৯২৬)।

"দুর্গমগিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে
লংঘিতে হবে রাত্রি নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার ॥"[১২]

স্বদেশভাবনার এই গানটি বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের জন্য কবি নজরুল লিখেছিলেন। তাঁর গানে ফুটে ওঠে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ উচ্চারণে শাসকের বিরুদ্ধে বিপ্লব আর বিদ্রোহের ডাক। অসহযোগ আন্দোলনকালে কেবল স্বদেশের গান বা কবিতাই রচনা করেননি, সরাসরি সম্পৃক্ততার কারণে তিনি কারাবরণ করেছিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের যুগে স্বদেশিযুগের স্বদেশ তপস্যা আরও ব্যাপকতা ও দৃঢ়তা লাভ করে। স্বদেশি আন্দোলনের বিবর্তনের পথ বেয়ে একই সোপানে পরিণত হয় অসহযোগ আন্দোলন। মূলত কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অর্থাৎ ১৮৮৫ সাল থেকেই যে নিয়মতান্ত্রিক আইনভিত্তিক আন্দোলন চলমান ছিলো তাতে আশার আলো দেখতে পায়নি বলেই গণআন্দোলনের পথ বেছে নেয়া হয়েছিল। স্বাদেশিকতার এ ক্ষেত্রে সূর্যবীরের মতো আবির্ভূত হলেন মহাত্মা গান্ধী।

তবে স্বদেশসংগীত রচনার ক্ষেত্রে এই সময়টি ছিলো ভাটাকাল। মূলত বঙ্গভঙ্গপর্বে রচিত গানই গীত হতো এই সময়টাতে সর্বত্র। কারণ স্বদেশি গান রচনার গীতিকবিদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে মারা যান এবং রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে। অতুলপ্রসাদও অন্যধারার গান রচনায় বেশি মনোযোগী ছিলেন। আর রবীন্দ্রনাথের যে সরব উপস্থিতি ছিলো বঙ্গভঙ্গের পরবর্তী কিছুকাল পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলনের শুরুর কাল থেকে তা একেবারেই থেমে যায়। এই যুগে তিনি কোনো স্বদেশপর্বের গান রচনা করেননি। বস্তুত অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করলেও ভাবের বিচারে তা গ্রহণ করতে পারেননি তিনি। তেমনি প্রবীণ গীতিকারের প্রায় সবাই এই পথ থেকে দূরে সরে যান। রবীন্দ্রনাথ এবং মহাত্মা গান্ধীর ভাবনার আদর্শগত ব্যবধান মূলত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশসংগীত রচনার নীরবতার কারণ। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বমানবতার কবি। স্বদেশের মুক্তি আর স্বাধীনতার অর্থ এই নয় যে, বিদেশি কাপড় 'অপবিত্র'। তাই গান্ধীজী কর্তৃক বিদেশি কাপড় পুড়িয়ে ফেলার নীতিকে তিনি যেমন মেনে নিতে পারেননি, তেমনি এক বছরের মধ্যে চরকা কেটে সুতা তৈরি করলে স্বরাজ লাভ হবে– এই উক্তি বা যুক্তিকেও মেনে নিতে পারেননি বলে অসহযোগ আন্দোলনের সকল কর্ম ও ভাবনা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন। রবীন্দ্রনাথের মতে, অসহযোগ আন্দোলন ব্যক্তির ক্ষেত্রে বিশাল হলেও দেশপ্রেমবোধটি সংকীর্ণ সীমায় বন্দী হয়ে যায় বিধায় এই ভাবনার সাথে তিনি একাত্ম হতে পারেননি। ফলশ্রুতিতে জাতি আরও বহু স্বদেশপর্বের গান প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়েন। তবে রবীন্দ্রনাথের

অনেক গান বিপ্লবীদের কর্মের প্রেরণার উৎস হয়েছিলো। যেমন 'সার্থক জনম আমার', 'যদি তোর ডাক শুনে আর', 'অমল ধবল পালে' প্রভৃতি গান বিপ্লবীদের অনুপ্রাণিত করতো। নজরুলের 'কাণ্ডারী হুশিয়ার' গানটি বিপ্লবীদের কাছে অতি প্রিয় একটি গান হয়ে ওঠে। এছাড়াও 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'শিকল পরা ছল' প্রভৃতি গানে তারা জীবনের ছন্দ খুঁজে পাওয়া যেত স্বদেশবোধের নতুন আঙ্গিকে। নজরুলের গানের উন্মাদনা জনমানসকে উদ্দীপ্ত করতো এবং হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে অসহযোগ আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত রচিত বহু স্বদেশি গান আজও অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে আছে দেশপ্রেমী প্রতিটি মানুষের কাছে। বিশেষ সময়ে রচিত হলেও বাঙালির গৌরব অর্জনে যুগের পর যুগ এই গান উদ্দীপনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে। সে সময়ের স্বদেশচেতনা এ কালের স্বদেশ ভাবনাকে প্রভাবিত করে। এ গবেষণায় স্বদেশি গান রচনার মহাপুরুষ রবীন্দ্র-নজরুলসহ ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেনের কর্মজীবন, স্বদেশপ্রেম, স্বদেশ চেতনার গান বিষয়ক বিশদ পর্যালোচনার মাধ্যমে নতুন তথ্য আবিষ্কারে ব্রতি হবো।

তথ্যসূত্র

১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতে জাতীয় আন্দোলন*, গ্রন্থম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬০, পৃ. ৩৩-৩৪
২. ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (সম্পা.) *ভাষা ও দেশের গান*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭৩
৩. সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, বসুধারা প্রকাশনী, ১৯৬০, পৃ. ০৭
৪. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী, ১৯৮৩, পৃ. ১১
৫. ঘরোয়া, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ.৭২
৬. ড. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ৭৪
৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
৮. শ্রী হরিহর শেঠ, *রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত*, (লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত), কলিকাতা, ১৩১৫, পৃ.২০৮
৯. ড. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, *পৃ.* ১০৮
১০. গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী , ১৯৮৩ পৃ. ২৫
১১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী, ১৪২৪, পৃ. ২৬০
১২. রফিকুল ইসলাম, (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ২০০৭, পৃ. ১২২

দ্বিতীয় অধ্যায়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে স্বদেশচেতনা
(১৮৬১-১৯৪১)

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনা

স্বাদেশিক রবীন্দ্রনাথের পরিচয় মেলে তাঁর গান, কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও গীতিনাট্যে। জাতিধর্ম-গোত্র-সম্প্রদায় ভেদাভেদ ও প্রকৃত শিক্ষার অপ্রতুলতা মানুষের মানবিক সংকীর্ণতার মূল কাণ্ডারী। এইভাবনাটিই তিনি নানাভাবে তাঁর প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, ভাষণ ও গানে চিহ্নিত করেছেন। জাতীয়তাবোধের অন্তরীক্ষে দানা বাঁধা অপশক্তি দূর করতে চলেছে তাঁর অন্তহীন প্রয়াস। মানুষে মানুষে মিলন, ঐক্য ও সংহতি রবীন্দ্রনাথের রচনায় রসদ জুগিয়েছে বারংবার। মানুষকেই তিনি সর্বাগ্রে গণ্য করেছেন, সমস্বরে আহ্বান করেছেন আনন্দ পথযাত্রায়। সেখানে স্থান পায়নি ধর্ম-শ্রেণির ভেদাভেদ। তাঁর কাছে স্বদেশের মাটি ও মানুষের মূল্য সবচেয়ে বেশি। তাদের কথা না ভেবে কেবল শহুরে স্লোগানমুখর আন্দোলনকে তিনি যথার্থ প্রতিরোধ মনে করতেন না কখনো। স্বাদেশিকতার অর্থ আগে মাটিকে ভালোবাসা এবং সেই মাটির মানুষকে পরম আত্মীয়ের মতো আগলে রাখা। সেই মনোবাঞ্ছাকেই তিনি যথার্থ রূপ দিলেন জমিদারির কাজে যখন গ্রাম বাংলার মানুষের সান্নিধ্য প্রাপ্তির সুযোগ হলো। সর্বহারা কৃষকদের কষ্টে তিনি ব্যথিত হন, জমিদারি দায়িত্বে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথ কৃষিনির্ভর শ্রমিকদের অপমান ও কষ্টাতুর জীবন থেকে পরিত্রাণ ও হিন্দু-মুসলিম ঐক্য বিনির্মাণের জন্য তাঁর জমিদারি এলাকায় সর্বোচ্চ চেষ্টা করেন। অভিজাত পরিবারে জন্মেও তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন কৃষক বাঁচলে দেশ বাঁচবে। তাই কৃষকদের দুঃখ-কষ্ট মোচন, সার্বিক শিক্ষা, পানীয় জলের ব্যবস্থা, পথঘাট সংস্কার, শিক্ষার জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন, কৃষকসহ গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের জন্য চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন এমনকি গ্রামীণ বিচার ব্যবস্থাও তিনি স্থাপন করলেন পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার মাধ্যমে। এ সবই তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি মমত্ববোধ তথা স্বদেশচেতনার বহিঃপ্রকাশ। দরিদ্র ও নিচু বর্ণের শ্রমজীবী মানুষের মুক্তিই তাঁর মূল স্বাদেশিক স্বপ্ন ছিলো। গতানুগতিক স্বাদেশিক আলোচনা থেকে রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার ভাবনা আগাগোড়াই ভিন্নতর। প্রতিবাদের থেকে তাঁর কবিতা ও গানে প্রাধান্য পেয়েছে ঐক্য ও সংহতির কথা। পুরোনো ও কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেদ করে বেরিয়ে আসার, আত্মমুক্তির সংকল্পের কথা।

ইংরেজ বিতাড়ন আন্দোলনের সময় রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ রক্ষায় তাঁর আত্ম-উপলব্ধির সতর্কবাণী দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, ইংরেজের আবির্ভাব ব্যাপারটি মূলত বহুরূপী একটি বিষয়। আজ তা ইংরেজের মূর্তিতে আবির্ভূত, কাল সে অন্য কোনো বিদেশির মূর্তিতে আসবে এবং পরে নিশ্চয়ই নিজের দেশি লোকের মূর্তিতে আরো কঠিনরূপে দেখা দিবে।

এই বাণীর সত্যতা প্রতিটি বাঙালির কাছে আজ স্পষ্ট। ইংরেজেদের থেকে মুক্তির পর, শুরু হলো পাকিস্তানের শাসনামল, সে যুদ্ধেও স্বাধীন হয়েছে দেশ, জাতি হিসেবে পেয়েছে নিজ অস্তিত্বের নাম 'বাংলাদেশ'। যদিও আজও শঙ্কা ঘরে, ঘরের বাইরে। যুদ্ধ ধর্মের সাথে ধর্মের। দৃশ্যত প্রকাশ্য শত্রুর থেকেও ভয়াবহ অদৃশ্য শত্রু। যে সাবধান বাণী রবীন্দ্রনাথ করে গিয়েছিলেন, আজ যেন সেই সত্যের বাস্তবরূপ দৃশ্যমান।

জাতি হিসেবে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে পারিনি, আত্মমুক্তি তথা আত্মশক্তির দীক্ষা নিতে পারিনি বলেই বারবার পরাধীনতা এ জাতিকে গ্রাস করে। অপমানিত হয় আমাদের কষ্টে অর্জিত স্বাধীনতা। স্বজাতীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিই পারে যেকোনো প্রতিকূলতায় স্বদেশ রক্ষার জন্য সকল প্রজন্মকে সঙ্ঘবদ্ধ করতে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মাঝে স্বদেশপ্রেমবোধ জাগ্রত করতে ও স্বাধীনতাকে নিজ সত্তায় ধারণের মানসিকতা সৃষ্টি করতে। তাই স্বাধীনতার চেতনা প্রতিনিয়ত চর্চার অভ্যাস করতে হবে নানাবিধ জাতীয় আয়োজনে, শিক্ষা ও পারিবারিক বলয়ে। প্রাণে ধারণ করতে হবে রবীন্দ্রনাথের উদ্দীপনার বাণী–

"চলো যাই, চলো, যাই চলো যাই–
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে–
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।"[১]

এ প্রসঙ্গে *রবীন্দ্রবিশ্বাসে মানব-অভ্যুদয়* গ্রন্থ থেকে সন্‌জীদা খাতুনের উক্তি উদ্ধৃত প্রাসঙ্গিক বোধ করি–

> 'পহেলা বৈশাখে 'আলোকের এই ঝরনাধারায় ধুইয়ে দাও' গেয়ে আমরা মনের উপরের ধূলির আস্তরণ ধুয়ে নেবার প্রার্থনা জানাতাম। এ প্রার্থনা অনন্ত হোক। 'আনন্দ ধ্বনি জাগাও গগনে' গেয়ে আমরা বলতাম 'চলো যাই কাজে, মানব সমাজে/চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে'। এ প্রার্থনা চিরন্তর হোক। নিজের সঙ্গে, পরিবেশ-পরিস্থিতির সঙ্গে নিরলস যুঝে আমরা যেন দেশবাসী সকলকে সঙ্গে নিয়ে মানুষ হয়ে উঠতে পারি। সংস্কৃতিকর্মীদের নিরন্তর যাত্রা বাঙালিকে নিয়ে চলুক মানুষ মানবতার তীর্থে।'[২]

জাতীয়তাবোধে ব্যতিক্রমী স্বতন্ত্র সংকল্পই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশভাবনাকে অন্য সকল স্বদেশি আন্দোলন থেকে ভিন্ন মাত্রা দান করেছে। যে কারণে ১৯২০ সালে গান্ধীজী প্রবর্তিত স্বদেশি আন্দোলনের সময় ভিন্নমত পোষণ করেছিলেন তিনি। বাহ্যিক আন্দোলন থেকে আত্মশক্তি সংগঠনের প্রতিজ্ঞাকে রবীন্দ্রনাথ বেশি জোরালো মনে করেছেন। গান্ধীজীর সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হয়েছেন। সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং পৃথিবীতে মানবিকতা প্রতিষ্ঠাই রবীন্দ্র-স্বাদেশিকতার মূলমন্ত্র। সে লক্ষ্যেই তিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সম্ভাবনায় ইউরোপীয় যুদ্ধ-বিরোধী মনীষীদের সাথে একাত্ম হয়ে সোভিয়েত পরিদর্শনে গিয়ে স্বদেশের মানুষের উন্নয়নের পরিকল্পনা নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু দেশীয় মনীষীরা ইংরেজ বিতাড়নকেই প্রধান লক্ষ্য মনে করতেন, ইংরেজ হঠলে মানুষের উন্নতি ত্বরান্বিত হবে এই বিশ্বাসে। তাদের ভাবনা সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদ দূর না হলে পৃথিবীতে শান্তি আসবে না, এমন কি ভারতও মুক্ত হবে না। রবীন্দ্রনাথ এ ভাবনার বিরুদ্ধে সকলকে একমত করতে পারলেন না, বরং নিজেকে সরিয়ে নিলেন। তবে প্রত্যক্ষ স্বাদেশিক আন্দোলনে মতবিরোধ থাকলেও তাঁর রচনায় নানা ইঙ্গিতে শ্রী অরবিন্দ, গান্ধীজী বা সুভাষ চন্দ্রের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন এবং তাঁদের মতোই ইংরেজ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন তাঁর রচনার সর্বক্ষেত্রে।

পারিবারিক বলয়ে স্বদেশপ্রেম

পারিবারিক আবহেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা অর্থাৎ স্বাদেশিকতার গোড়াপত্তন ঘটে। ইংরেজদের উপনিবেশবাদী শাসন-শোষণ জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। জাতীয়তাবোধ ও স্বাদেশিকতার আদর্শের মূল মন্ত্র প্রায় সমতুল্য হলেও দেশকে পরাধীনতার গ্রাস থেকে মুক্ত করার যে চেতনা তাই জাতীয়তাবোধ। আর সকল সংকটের উর্ধ্বে দেশকে মাতৃরূপে গণ্য করাকেই স্বাদেশিকতা বলা যেতে পারে। জাতীয়তাবাদী চেতনাই মূলত স্বদেশচেতনার জন্ম দিয়ে দেশকে পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তির পথ দেখায়। আন্দোলন, অনশন প্রমুখ পন্থার মধ্যদিয়ে মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত রূপ। রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ ঘটে কৈশোরে হিন্দুমেলায় জাতীয়তাবাদী উত্তাপের মধ্যদিয়ে। সে বিষয়ে আহমেদ রফিকের *নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থ থেকে বক্তব্য তুলে ধরা হলো–

> "রবীন্দ্রনাথের স্বাদেশিকতার প্রকাশ যদিও চৈত্রমেলা তথা হিন্দুমেলার জাতীয়তাবাদী উত্তাপে, তবু এর প্রকাশ মূলত বিশ্বে সাম্রাজ্যবাদী নির্মমতার প্রতিবাদী রচনায়; যেমন–আফ্রিকায় বুয়র যুদ্ধে এবং চীনে বক্সার যুদ্ধে ইংরেজ সেনাবাহিনীর বর্বরতার বিরুদ্ধে বক্তব্যে। উনিশ শতকের শেষ দিনটিতে শিলাইদহে বসে লেখা 'শতাব্দীর সূর্য আজি রক্তমেঘ মাঝে অস্ত গেল' এবং অনুরূপ কবিতায় তীব্র সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিরোধিতার প্রকাশ ঘটেছে। বিশ শতকের প্রথমদিকে রবীন্দ্রনাথ এমন ভাবনায় নিশ্চিত হন যে স্বাদেশিকতার কাজ শুরু করতে হবে দেশের বৃহত্তর জনশ্রেণী গ্রামবাসীদের মধ্য দিয়ে। তাঁর চোখে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে ইংরেজি শিক্ষিত সচ্ছল রাজধানীর এলিট শ্রেণীর নগর-শহরের সঙ্গে গ্রামের বিশাল ফারাক। একসময় এমন কথাও লেখেন যে শহর রয়েছে বিশ শতকের আধুনিকতায়, অন্য দিকে গ্রাম পড়ে আছে মধ্যযুগে।"[৩]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে শিক্ষিত লোকজন দেশের ভাষা ও দেশের ভাব দূরে ঠেলে রেখেছিলো। সময়টি মোটেই স্বদেশপ্রেমের ছিলো না। যদিও রবীন্দ্র-পরিবারে এর ব্যতিক্রমী ছবি দৃশ্যত। জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির লোকেরা ছোটবেলা থেকে স্বদেশের প্রতি গভীর অনুভূতি পোষণ করে বেড়ে উঠেছে। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের কথা সর্বাগ্রে গণ্য। তিনি ছিলেন যেমন ধনী তেমনি সৌখিন। শুধু তাই নয় স্বদেশের মঙ্গলের জন্য তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করেছেন।

প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর নিজস্ব ঐতিহ্য তথা ভারতীয় জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদার প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। যা তাঁর স্বজাত্যবোধ, পোশাক-আশাক এবং চালচলনে পরিলক্ষিত হয়।

এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন–'আমাদের পিতৃদেব যখন স্বদেশের প্রচলিত পূজাবিধি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন তখনো তিনি স্বদেশী শাস্ত্রকে ত্যাগ করেন নাই ও স্বদেশি সমাজকে দৃঢ়ভাবে আশ্রয় করিয়াছিলেন।'[৪] তিনি বিলেতে থাকাকালীন সময়েও নিজের দেশের জাতীয় পোষাক পরিধান করতেন। তাঁর এ সকল বৈশিষ্ট্য ঠাকুর পরিবারের অন্য সদস্যদের সদা অনুপ্রাণিত করেছে। দ্বারকানাথপুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের মধ্যে স্বাদেশিকতার প্রভাব আরো স্পষ্টত দৃষ্ট হয়। খুব ভালো ইংরেজি জানা সত্ত্বেও তিনি কোনো সভা-সমিতিতে ইংরেজিতে বক্তৃতা দিতেন না। অথচ ইংরেজিতে বক্তৃতা দেওয়া বা কথা বলাই ছিলো তখনকার উচ্চশিক্ষার পরিচয়। উপরন্তু নিজ পরিবারে ও আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে নিজ মাতৃভাষার উন্নতি ও প্রসারের জন্য গভীরভাবে চেষ্টা করে গেছেন। যে কারণে তিনি ইংরেজিতে চিঠি পর্যন্ত লিখতেন না। সকল বিষয়ের চর্চা মাতৃভাষায় সাধিত হোক–এইছিলো তাঁর জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর *জীবনস্মৃতি পাতায়* বলেছেন :

> "বাহির হইতে দেখিলে আমাদের পরিবারে অনেক বিদেশীপ্রথার চলন ছিলো, কিন্তু আমাদের পরিবারের হৃদয়ের মধ্যে একটি স্বদেশাভিমান স্থির দীপ্তিতে জাগিতেছিল। স্বদেশের প্রতি পিতৃদেবের যে একটি আন্তরিক শ্রদ্ধা তাঁহার জীবনের সকলপ্রকার বিপ্লবের মধ্যেও অক্ষত ছিলো, তাহাই আমাদের পরিবারস্থ সকলের মধ্যে একটি প্রবল স্বদেশপ্রেম সঞ্চার করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুত সে সময়টা স্বদেশপ্রেমের সময় নয়। তখন শিক্ষিত লোকে দেশের ভাষা এবং দেশের ভাব উভয়কেই দূরে ঠেকাইয়া রাখিয়াছিলেন। আমাদের বাড়িতে দাদারা চিরকাল মাতৃভাষার চর্চা করিয়া আসিয়াছেন। আমার পিতাকে তাহার কোনো নূতন আত্মীয় ইংরেজীতে পত্র লিখিয়াছিলেন, সে পত্র লেখকের নিকটে তখনই ফিরিয়া আসিয়াছিল।"[৫]

রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ পাহাড়ে থাকতেন তাই মায়ের মন প্রায়ই উচাটন থাকত। বাড়ির কর্তা বাইরে থাকলে যেকোনো শঙ্কা যেমন দ্বিগুণ মনে হয় তেমনি রবীন্দ্র মাতারও ছিলো ভয়ে কাতর মন। তাই রাশিয়ান বিপ্লবের আশঙ্কায় সহসা বালক রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে পাঠান মায়ের উদ্বেগবাহী পিতার কাছে রবীন্দ্রনাথের লেখা প্রথম চিঠি। সেই চিঠির উত্তরে পিতা লিখেছিলেন, 'ভয় করিবার কোনো কারণ নাই, রাসিয়ানকে তিনি স্বয়ং তাড়াইয়া দিবেন। এই প্রবল আশ্বাসবাণীতেও মাতার রাসিয়ানভীতি দূর হইল বলিয়া বোধ হইল না–কিন্তু পিতার সম্বন্ধে আমার সাহস খুব বাড়িয়া উঠিল।'[৬]

পারিবারিক এমনি ভয় ভাঙ্গানিয়া আশ্বাসে ছোটবেলা থেকেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভীষণ সাহসী যা তাঁর পরবর্তী সকল পদক্ষেপেই দেখতে পাই। রবীন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে আরো জানা যায়, রবীন্দ্রনাথের পিতামহ বেলগাছিয়ার বাড়িতে প্রায়ই ইংরেজ রাজপরিবারের সদস্যদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়াতেন। কিন্তু তিনি নিজেই পুত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে কোনো ইংরেজকে যেন বাড়িতে ডেকে না খাওয়ানো হয় তার নিষেধাজ্ঞা দিয়ে গিয়েছিলেন। তখন থেকেই ঠাকুর পরিবারের সাথে ইংরেজদের সংশ্রব প্রায় শেষ হয়ে যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের রাজনীতিতে যোগদান খুব অল্প সময়ের জন্য হলেও তাঁর অদম্য উৎসাহ ও উপদেশ তৎকালীন রাজনৈতিক কর্মীদের অনুপ্রেরণা জোগায় এবং লক্ষ্য স্থিরতায় সহায়তা করে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকাতে এইরূপ উদ্দীপনামূলক ও তেজস্বী প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। বেদান্তধর্ম অনুসারী দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৪৫ সালে মিশনারীদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সংগঠিত হন এবং *তত্ত্ববোধিনী* পত্রিকায় লেখেন, "সমাজ সংস্কারের আন্দোলনের একেবারে গোড়া হইতে দেবেন্দ্রনাথ তাহার সহিত যুক্ত ছিলেন। প্রথম আন্দোলন স্ত্রীশিক্ষার আন্দোলন, বিদ্যাসাগরীয় বিধবা বিবাহের আন্দোলন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা তাঁহার প্রধান পৃষ্ঠপোষাক।"[৭] ঠাকুর পরিবারে স্বাদেশিকতার বীজ বপন হয় রবীন্দ্র বাল্যেই। তারই ফলস্বরূপ ছেলেরা শুরু করে 'হিন্দুমেলা'। মূলত 'ভারতবর্ষকে স্বদেশ বলিয়া ভঙ্গির সহিত উপলব্ধির বোধ সেই প্রথম হয়।[৮]

হিন্দুমেলার ভূমিকা

১৮৬৭ সালের ১২ এপ্রিল হিন্দুমেলার উদ্বোধন হয়। জাতীয় সংগীত, কবিতা পাঠ, ক্রীড়া, কৌতুকসহ নানাবিধ সাংস্কৃতিক আয়োজন ও বক্তৃতাদির মাধ্যমে জনগণের মনে দেশভক্তি উজ্জীবিত করাই এ মেলার মূল উদ্দেশ্য। শুরুর দিকে কয়েক বছর কলকাতার উপকণ্ঠে এক উদ্যান স্থানে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে মেলাটি অনুষ্ঠিত হতো বলে একে চৈত্রমেলাও বলা হতো। পরে নাম বদলে নামকরণ হয় 'হিন্দুমেলা'। এই মেলাতে যোগ্য গুণিজনদের পুরস্কৃতও করা হতো। দ্বিজেন্দ্রনাথ, গণেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও গুণেন্দ্রনাথ–এই মেলা উপলক্ষ্যে স্বদেশি গানের রচনা শুরু করেন এবং এই স্বদেশি গানের প্রেরণাই পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথে প্রবাহিত হয়, যদিও তৎসময়ে রবীন্দ্রনাথ নিতান্তই ছোট। হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের রচিত স্বদেশি গানের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সত্যেন্দ্রনাথ রচিত 'মিলে সবে ভারত সন্তান/একতান মন-প্রাণ/গাও ভারতের যশোগান/'[৯], গণেন্দ্রনাথ রচিত 'লজ্জায় ভারতযশ গাইব কী করে/লুঠিতেছে পরে এই রত্নের আকরে/সাধিলে রতন পাই, তাহতে যতন নাই/হারাই আমোদে মাতি অবহেলা করি'[১০] এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ রচিত 'মলিন মুখ চন্দ্রমা ভারত তোমারি/রাত্রি দিবা ঝরিছে লোচনো বারি/চন্দ্রজিনি-কান্তি নিরখিয়ে, ভাসিতাম আনন্দে/ আজিয়ে এ মলিনমুখ কেমনে নেহারি; এ দুঃখ তুমার হায় সহিতে না পারি।'[১১] এই সকল গানের মধ্যদিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের নিদারুণ অবস্থার কথা বর্ণিত হয়েছে এবং এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান করা হয়েছে। এই হিন্দুমেলাতেই বালক রবীন্দ্রনাথ প্রথমবারের মতো সাধারণের সামনে আত্মপ্রকাশ করেন। তারিখটি ছিলো ১৮৭৫ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার। দিনটি বিশেষভাবে স্মরণযোগ্য। কারণ ঐ দিন তেরো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ হিন্দুমেলার একটি দীর্ঘ কবিতা স্মৃতি থেকে আবৃত্তি করে সকলকে মুগ্ধ করে দিয়েছিলো।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে স্বদেশি গান রচনার যে আবহ গড়ে তুলেছিল হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে তাতেই রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব হয়, তেমনি সেই স্বদেশি গানের পটভূমিকে কেন্দ্র করেই তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানের আত্মপ্রকাশ। তাই হিন্দুমেলা বিশেষভাবে তাৎপর্যমণ্ডিত স্বদেশি গান ও জাতীয়তাবোধ তৈরির প্রেক্ষাপট হিসেবে।

সঞ্জীবনী সভার ভূমিকা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে সঞ্জীবনী সভা নামে আরেকটি সভা গড়ে উঠেছিলো জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। রবীন্দ্রনাথ একে স্বাদেশিকদের সভা বলতেন। এই সভা বসতো কলকাতার এক পোড়োবাড়িতে, ছিলো রহস্যে আবৃত। তাদের কার্যপদ্ধতি ছিলো অদ্ভুত : 'দ্বার আমাদের রুদ্ধ, ঘর আমাদের অন্ধকার, দীক্ষা আমাদের ঋক্‌মন্ত্রে, কথা আমাদের চুপিচুপি।'[১২]

এই রকম রোমহর্ষক সব কাণ্ডই ছিলো সঞ্জীবনী সভার কার্যবিবরণীতে। তবে স্বাদেশিকতার মূল ভাবনা গোড়াপত্তন ঘটে এই সভায় এবং তা থেকে পরিত্রাণের উপায় সন্ধান ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের মাথায়

জেঁকে বসেছিল। সভায় প্রতি সদস্যকে বলা হতো সভ্য–যেখানে রবীন্দ্রনাথ ছিলো সর্বকনিষ্ঠ সভ্য এবং সঞ্জীবনী সভার অধ্যক্ষ ছিলেন বিজ্ঞ রাজনারায়ণ বসু। আর এর কার্যক্রম আরম্ভ হতো বেদমন্ত্র পাঠ করে। ভারতের হিত সাধিত হয় এবং কল্যাণ বয়ে আনে এরূপ সকল কার্যসাধনই ছিলো এই সভার লক্ষ্য। তবে এর সমস্ত কার্যকলাপই ছিলো আশ্চর্য ধরনের ও ব্যতিক্রম। 'টেবিলের দুইপাশে দুইটি মড়ার মাথা থাকিত, তাহার দুইটি চক্ষু কোটরে দুইটি মোমবাতি বসানো ছিলো। মড়ার মাথাটি মৃত-ভারতের সাংকেতিক চিহ্ন। বাতি দুইটি জ্বালাইবার অর্থ এই যে, মৃত-ভারতের প্রাণসঞ্চার করিতে হইবে ও তাহার জ্ঞানচক্ষু ফুটাইয়া তুলিতে হইবে।'[১৩] শুধু তাই নয় সভার শুরুতে বেদমন্ত্র গায়নের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম আরম্ভ হতো এবং এর কার্যবিবরণী এক অদ্ভুত ধরনের গোপন ভাষায় লেখা হতো, যেই ভাষার উদ্ভাবক ছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সময় থেকেই সংঘবদ্ধতা ও ঐক্যের এক সোপান রবীন্দ্রনাথের মনে স্থাপিত হয়ে যায় এবং স্বদেশপ্রেম মানেই স্বদেশকে বাহ্যিক ও অভ্যন্তরিক সকলপ্রকার জরাজীর্ণতা থেকে মুক্ত করা–এই বিশ্বাসে রবীন্দ্রভাবনা বিকশিত হতে থাকে। হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার কার্যাবলি বালক রবীন্দ্রনাথকে এতো অভিভূত করেছিল যে তিনি ভয়, লজ্জা ও শঙ্কামুক্ত হয়ে অন্য জাত সদস্যদের সাথে স্বদেশমাতৃকা রক্ষার ব্রতে ভাসতে থাকলেন। অতি উৎসাহে তিনি সঞ্জীবনী সভার জন্য জাতীয় সংগীত রচনায় ব্রতী হলেন, যা রবীন্দ্রনাথের কালজয়ী স্বদেশপর্বের গান।

"ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি–
যতদিন না ফেলিবে গ্রাসি–ততদিন তুই কাঁদ রে।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ১৩ অথবা ১৪ বছর হবার কথা। সেই সময়ে রচিত, প্রায় অনেক গানেই অবহেলিত ও পরাধীন ভারতের দুর্ভাগা মানুষের আকুতির কথা ব্যক্ত হয়েছে, রয়েছে ঐক্যবদ্ধের আহ্বান। তৎকালীন সময়ের অন্যান্য সকল লেখকের গানের বিষয়বস্তুও প্রায় এই রকমই ছিলো অর্থাৎ দেশমাতৃকাকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্তি প্রসঙ্গে বালক রবীন্দ্রনাথ তার লেখনীর মধ্যদিয়ে তখনই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও অভিনবত্ব প্রকাশ করতে সক্ষম ছিলেন। নিম্নের গানটি এর একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ –

"অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী,
গা লো সেই সব পুরানো গান।"[১৫]

এছাড়াও 'একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি প্রাণ' প্রভৃতি গানের মধ্যে রয়েছে সম্মিলনের আহ্বান। মূলত সঞ্জীবনী সভার কার্যাবলির উদ্দেশ্যকে সফল করবার মানসেই এই সকল গান রচিত হয়েছে, যার মধ্যে অনেক গানই অশ্রুত রয়ে গেছে, আবার কিছু গান এখনো দেশবাসীর মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্ব

ভারত গভর্মেন্টের আদেশক্রমে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা দেওয়া হয়। বঙ্গভঙ্গ ছিলো বাঙালির আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বজ্রঘাত সমান। সমগ্র বাংলায় আগুন জ্বলে উঠল। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে ও প্রতিবাদে ব্রতী হন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গভীর

আবেগে বন্ধু-বান্ধব নিয়ে যোগ দেন বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে এবং দেশবাসীর কাছে স্বয়ং একটি প্রস্তাব তুলে ধরে বলেন যে, ঈশ্বর বাঙালিকে এক করে পাঠিয়েছেন, বিচ্ছিন্ন করেননি সুতরাং তা রক্ষা করবার জন্য বঙ্গভঙ্গের দিনটি 'রাখি বাঁধনের' দিন হিসেবে পালিত হবে। প্রত্যেক বাঙালি কী হিন্দু কি মুসলিম, কি দরিদ্র ও কি ধনী একে অপরকে হলুদ রং-এর রাখি পরাবেন। রাখিবন্ধনের মন্ত্রটিও হবে 'ভাই ভাই এক বাহু'। এই রাখিবন্ধন উপলক্ষ্যেই কবি স্বদেশবাসীকে উপহার দেন তাদের প্রিয় সেই স্বদেশ মন্ত্রটি 'বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল'। রাখিবন্ধনের দিন সকালে গঙ্গাস্নান সেরে খালি পায়ে কবি 'বন্দে মাতরম্' সম্প্রদায়ের সাথে ফিরবার পথে হিন্দু-মুসলমান জাতি বর্ণ-নির্বিশেষে সকলকে রাখি পরিয়েছেন। সবাই তাঁর সাথে আনন্দচিত্তে হাত মিলিয়েছিল। এই দিনই বিকেলে আরো দু'টি উদ্দীপনামূলক ও প্রতিবাদী স্বদেশি সংগীত রচনা করেন তিনি–

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে
ততই বাঁধন টুটবে।"[১৬]
ও
"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি,
এমন শক্তিমান।"[১৭]

এই গান দু'টি গেয়ে গেয়ে বিকেলে কলকাতার পথে শোভাযাত্রাও করেন। সেদিন বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সমগ্র বাংলা জুড়ে আন্দোলনে আবেগের যে জোয়ার সাড়া জাগিয়েছিলো বাঙালি জাতির মনে তার মূল শ্লোগানের বার্তা দেয় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গান।

তবে সমগ্র জাতির এইরূপ একাত্মতা প্রকাশ সত্ত্বেও সকলের মতামত অগ্রাহ্য করে পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী বঙ্গচ্ছেদ হলো। কিন্তু বাঙালির মনের সেই শক্তিকে অবদমন করতে পারেনি। বরং তা ক্রমশ ব্যাপকতা লাভ করতে থাকে।

বলাবাহুল্য তৎকালীন সময়ে কবি, সাহিত্যিক, বাগ্মী পুরুষ, সংবাদিক, শিল্পী সবাই মিলে দেশমাতৃকার মহাসেবায় নিজেদের সমর্পণের মধ্যদিয়ে নবজাগরণের উন্মেষ ঘটায়; বাংলা তখন জেগে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলনের মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক ভাবনায় সাম্প্রদায়িক ঐক্য বিশেষ গুরুত্ব পায় এবং জাতীয় জীবনের বিভিন্ন স্তরে জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত তিনি এই চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিলেন।

রবীন্দ্র রচনার বিভিন্ন আঙ্গিকে স্বদেশ

হিন্দুমেলা থেকে জীবনের শেষবেলা পর্যন্ত নানাভাবে নানাআঙ্গিকে তার বহুমাত্রিক সৃষ্টির ছন্দে তিনি স্বদেশ ভক্তির কথা ব্যক্ত করেছেন। বহু কবিতা, গান, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও নাটকে এমনকি গীতিনাট্যেও স্পষ্ট, কখনো অস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পেয়েছে দেশমাতৃকার প্রতি তাঁর অন্তরের গভীর অনুভূতি। সেখানে স্থান পেয়েছে রাজনীতি, ঐক্য, প্রকৃতি থেকে শুরু করে স্বদেশের ধর্ম ও মানুষ। রয়েছে বহুবিধ ভাবনার মিশ্রণ ও স্ববিরোধিতা। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ ভাবনার মোটামুটি দুটি দিক প্রকাশ্য– যেমন রাজনৈতিক চিন্তা ও অন্যটি সমাজকেন্দ্রিক ভাবনা। সমাজনির্ভর প্রাচীন ও সনাতনী ভারতবর্ষের উন্নয়নে এক পর্যায়ে যুক্ত হয় পল্লী উন্নয়নের নানা আধুনিক উপকরণ। অপরদিকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, হিন্দু-মুসলিম

দ্বন্দ্ব, ধনী-গরিবের বিভেদ ও বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ নিয়ে তাঁর স্বদেশ ভাবনার রাজনৈতিক দিক। পাশ্চাত্য সভ্যতা সংস্কৃতি রেনেসাঁর জন্য রবীন্দ্রনাথসহ উনিশ শতকের নবজাগরণবাদী রামমোহন, বিদ্যাসাগরসহ ব্রাহ্মসমাজের সদস্যদের কাছে ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতি ও আধুনিক ব্যবস্থার পত্তন গুরুত্ব পায়। যদিও সেই সময় আধুনিকতার অন্তরালে চলতে থাকে ভারতীয়দের প্রতি ইংরেজদের বর্বর অত্যাচার, ঘৃণা, নিপীড়ন, শোষণ ও বঞ্চনা। রাজনৈতিক আন্দোলন ছাড়া যার প্রতিকার কখনো সম্ভবপর ছিলো না। রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য এবং বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহ প্রবর্তন ও শিক্ষাব্যবস্থা বিস্তারের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন সমাজ সংস্কারক ভূমিকা হিসেবে। কারণ তাঁরা বিশ্বাস করতেন সমাজ, সংস্কৃত, কুসংস্কারমুক্ত ও ঐক্যবদ্ধ হলে শাসক– শোষকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণযোগ্য ও সহজতর হবে। রবীন্দ্রনাথ সমন্বয়বাদী মানসিকতার অধিকারী ছিলেন বলে এক্ষেত্রেও চেয়েছিলেন শাসকগোষ্ঠীর ভুলগুলো ধরিয়ে দিতে। যে কারণে বহু প্রবন্ধে ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর জোরালো বক্তব্য রেখেছেন এবং অতঃপর সমন্বয়ের পন্থা খুঁজতে চেয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ সারাজীবন ঐক্যের জয়গান গেয়েছেন তাঁর জীবনের সামগ্রিক রচনায়। তিনি কল্পনা করতে পারেননি উপনিবেশবাদী শোষকগোষ্ঠী কখনো ভারতবর্ষকে নিজের দেশ ভাবতে পারেনি। নিজস্বার্থ কায়েমের জন্য বহুবিধ প্রচেষ্টায় জর্জরিত করেছে ভারতবর্ষের মানুষের জীবন, রক্ত চোষা হয়ে নিরীহ মানুষকে করে দিয়েছে কাঙাল। রবীন্দ্রনাথের সংগীতে স্বদেশ ভাবনা বা চেতনার বিষয়টি আলোচনার পূর্বে তাঁর সৃষ্টির অন্য আঙ্গিকে এর প্রতিচ্ছায়া বিষয়ে আলোকপাত প্রাসঙ্গিক।

রবীন্দ্র প্রবন্ধে স্বদেশ

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু প্রবন্ধে ইংরেজদের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর শাণিত বক্তব্য রেখেছেন। মানুষের চেতনাকে জাগ্রত করতে এ সকল প্রবন্ধের ভূমিকা অতুলনীয়। বহুবিধ রূপক ও সংকেতের মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতিবাদের চিহ্ন রেখে গেছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর "পূর্ব-পশ্চিম" প্রবন্ধ সম্পর্কে আহমদ রফিকের উক্তি উল্লেখযোগ্য–'পূর্ব ও পশ্চিম (১৯০৮ খ্রি.) প্রবন্ধটি যেন তাঁর ভারতবর্ষ বিষয়ক ইতিহাস ভাবনার প্রতিফলন। এখানে রবীন্দ্রনাথ পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনে প্রত্যাশী। কিন্তু পশ্চিম বলতে এখানে তিনি ইংরেজকেই বুঝিয়েছেন।'[১৮]

এই প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ ঐক্যের কথা বলেছেন। তিনি তাঁর 'মহাভারত' বিষয়ে হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান এমনকি ইংরেজকেও বাদ রাখতে রাজি নন। কারণ তিনি ইউরোপের উন্নয়নের ধারাকে অগ্রাহ্য না করে বরং তা থেকে ভারতবর্ষকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। মুক্ত করতে চেয়েছিলেন অভ্যন্তরীন জরাজীর্ণতা থেকে। যদিও ইংরেজদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তাঁর কলম কখনো থেমে থাকেনি বরং ভারতে অবস্থানকারী 'ছোট ইংরেজ'দের অন্যায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে তিনি সর্বদা সাহসী ভূমিকা পালন করেছেন। তেমনি ইংরেজরা যখন বুঝতে পেরেছিল স্বাধীনতা হরণের পূর্বশর্ত বাকস্বাধীনতা হরণ এবং সেই উদ্দেশ্যে ভারতবাসীর বাকস্বাধীনতার কণ্ঠরোধ করতে 'মিডিশন বিল' প্রকাশ করলে রবীন্দ্রনাথ

তাঁর 'কণ্ঠরোধ' প্রবন্ধটি লেখেন এবং কলকাতা টাউন হলে তা পাঠ করেন। তেমনি ১৩২২ সালে 'বহুরাজকতা' প্রবন্ধটি প্রকাশ করেন। সেখানেও রয়েছে বিদেশি শোষণের নিপীড়নের কথা।

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ ভাবনার সুচিন্তিত মতামত প্রকাশ করেন তাঁর 'স্বদেশী সমাজ' (১৯০৪) প্রবন্ধে এবং এরই সম্পূরক রচনা ১৯০৫ সালে প্রকাশ করেন 'অবস্থা ও ব্যবস্থায়' নামে। রবীন্দ্রনাথের 'স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধটির পাঠ শুনতে ভীষণ ভীড় হয়েছিল। জানা যায় যে প্রায় সহস্র ব্যক্তি এর প্রথম সভায় সভাগৃহে স্থান না পেয়ে ফিরে যায় এবং পরে এ কারণে রবীন্দ্রনাথকে অসুস্থ শরীরে জ্বর নিয়ে ২য় সভায় এই প্রবন্ধ পুনরায় পাঠ করতে হয় এবং ২য় সভার জন্য ৪ ঘণ্টায় ১২০০ টিকিট বিতরণ করা হয়ে গিয়েছিল বলে জানা যায়। *স্বদেশী সমাজ* প্রবন্ধ সম্বন্ধে সভাপতি রমেশ দত্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "সভাপতি শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় বলিলেন, রবীন্দ্রবাবুর প্রবন্ধের ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ তিনি কখনও শুনিয়াছেন বলিয়া তাঁহার স্মরণ নাই। একটি কথা এই যে, কেবল রাজনীতি বা কেবল সামাজিক বিষয় লইয়া কোন জাতি উন্নত হয় না। উন্নতি সমস্ত দিক হইতেই হইয়া থাকে। কোন গাছ বৃদ্ধি পাইবার পূর্বে যদি নিয়ম বাধিয়া দেওয়া হয় উহা একদিন শুধু লম্বা হইতে থাকিবে কিংবা একদিন শুধু চওড়া হইতে থাকিবে, তাহা যেরূপ অস্বাভাবিক একসঙ্গে লম্বা ও চওড়া হইয়া বৃদ্ধি পাওয়া নিয়ম সেইরূপ। জাতীয় উন্নতি চতুর্দিক হইতে হইয়া থাকে, শুধু সমাজনীতি বা রাজনীতি লইয়া থাকা এক দেশদর্শিতা। ভাগীরথী যেমন রাজমহল হইতে শতধারায় সমুদ্রাভিমুখী গতি লইয়াছে, আমাদের চেষ্টাও সেই রূপ শতমুখী হইয়া উন্নতির পথে প্রবাহিত হইবে। ঐক্য অবলম্বন করিয়া যে কোন বিষয়ে কাজ করা যায় তাহাতেই স্বার্থকতা হইবে। এই সুফল আমাদের রাজার হাতে ততটা নহে যতটা আমাদের হাতে।"[১৯]

রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধে সমাজভাবনার মধ্যদিয়ে মূলত রাজনৈতিক চিন্তাটিই প্রবাহিত। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন রচনায় যেমন–সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রভৃতির মাধ্যমে চিন্তার ঐক্য, ভাষার ঐক্য, ভাবের ঐক্য এবং সাহিত্যের ঐক্য সাধনের মধ্যদিয়ে বাঙালির জাতীয় ঐক্য সাধনের কথা বলেছেন, সাথে চালিয়ে গেছেন তাঁর সরকার বিরোধী ভাষণ-বক্তৃতা। বক্তব্যের মূল বিষয় মূলত স্বনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠা। এ প্রসঙ্গে তাঁর *ব্যাধি ও প্রতিকার* প্রবন্ধটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১৯৩৭ সালে তাঁর *প্রচলিত দণ্ড বিধি* প্রবন্ধে তিনি ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে তাদের দণ্ড প্রয়োগের রূপকে বর্বরতা এবং শাসকশ্রেণিকে বর্বর বলে চিহ্নিত করেন। তখন তিনি লিখলেন :

> "দামামা ঐ বাজে,
> দিন-বদলের পালা এল
> ঝোড়ো যুগের মাঝে।
> শুরু হবে নির্মম এক নূতন অধ্যায়
> নইলে কেন এত অপব্যয়,
> আসছে নেমে নিষ্ঠুর অন্যায়,
> অন্যায়েরে টেনে আনে অন্যায়েরই ভূত।"[২০]

ভবিষ্যতের দূত, *কালান্তর*-এ সংকলিত প্রবন্ধেও তাঁর শাসক বিরোধিতা, সাম্রাজ্যবাদের ভয়াবহতা ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের বিষয়সমূহ প্রাধান্য পায়। ১৯০৪ সালে *সফলতার সদুপায়* প্রবন্ধে তিনি লিখলেন :

> "ক্ষুধিত ইম্পীরিয়ালিজম স্বার্থজাল বিস্তার করাকেই মহত্ত্ব বলিয়া বিবেচনা করিতেছেন। ...ইম্পীরিয়ালতন্ত্র নিরীহ তিব্বতে লড়াই করিতে যাইবেন, আমাদের অধিকার তাহাদের খরচ যোগানো, সোমালিল্যাণ্ডে বিপ্লব নিবারণ করিবেন, আমাদের অধিকার প্রাণ দান করা, উষ্ণ প্রধান উপনিবেশে ফসল উৎপাদন করিবেন, আমাদের অধিকার সস্তায় মজুর যোগান দেওয়া। বড়োয়, ছোটোয় মিলিয়া যজ্ঞ করিবার এই নিয়ম।"[২১]

যে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন রেনেসাঁসের ভক্ত সেই পরে সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর তীব্র প্রতিবাদী উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করে 'কালান্তর'-এ বলেন, 'ইউরোপের বাইরে ইউরোপীয় সভ্যতার মশালটি মূলত আলো দেখাবার জন্য নয়, বরং আগুন লাগাবার জন্য।' পারস্য, চীন ও মায়া সভ্যতার উদাহরণে তিনি সাম্রাজ্যবাদী রেনেসাঁসের ভয়ঙ্কর রূপটি তুলে ধরেন। তাঁর *ন্যাশনালিজম গ্রন্থ*টি থেকে এর আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধসমূহে স্বদেশ রূপান্তরিত হয় বিশ্বভাবনায়। কারণ উনিশ শতকের শেষ দিকে তিনি উপলব্ধি করেন যে, ব্রিটিশ উপনিবেশবাদ মূলত বিশ্বশাসনের বিশাল সাম্রাজ্যবাদী শক্তিতে পরিণত হয়। তাই জীবন সায়াহ্নে রচনা করেন *সভ্যতার সংকট* প্রবন্ধটি। যেখানে পাশ্চাত্য সভ্যতার মহামারী রূপের প্রতি ঘৃণা ও অভিশাপ ব্যক্ত করেছেন তিনি। জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার এই ঘাতক চরিত্রের সমালোচনা ও শ্রমজীবী মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন তাঁর লেখনীর মধ্য দিয়ে।

এক্ষেত্রে ড. মানস মজুমদারের *রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গ গ্রন্থ* থেকে রবীন্দ্রনাথের যে সকল প্রবন্ধে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্তরূপ তুলে ধরা হলো–

> "স্বদেশ ও সমাজের নৈষ্কর্ম ও ভীরুতা যদি ধিকৃত হয় 'কালান্তর' (১৩৪৪) এর 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' (১৩২৪) প্রবন্ধে, তো ইংরেজ শাসককুলের দমননীতি নীচতা আর শঠতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপিত হয় 'রাজা প্রজা'র (১৩১৫) 'কণ্ঠরোধ' (১৩০৫) এবং কালান্তরের 'ছোট ও বড়ো'তে (১৩২৪)। আবার বিশ্বসভ্যতার সংকটলগ্নে সংকটসৃষ্টিকারীদের নির্ভুলভাবে চিহ্নিত করেন কালান্তরের 'সভ্যতার সংকট' (১৩৪৮) প্রবন্ধে, শ্লেষক্ষুব্ধ প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় তাঁর লেখনীতে। প্রত্যাশা করেন সংকটত্রাতা মহামানবের। নানা রচনার ভেতর দিয়ে তাঁর প্রতিবাদপ্রবণ মানসিকতাটিকে সহজেই চিনে নেওয়া যায়।"[২২]

সমগ্র বিশ্বব্যাপী শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতা, অমানবিকতা রবীন্দ্রনাথের মর্মবেদনার কারণ হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা রূপান্তরিত হয় বিশ্বসাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের প্রতিবাদস্বরূপ। চীন, পারস্য ও মায়া সভ্যতার উদাহরণে তিনি তুলে ধরেন সাম্রাজ্যবাদী রেনেসাঁসের ভয়ঙ্কর রূপের বর্ণনা। উনিশ শতকের শেষের দিকে শিলাইদহের পদ্মা তীরে বসেও তিনি বিশ্ব হাহাকারের অমানবিকতায় শান্তি খুঁজে পাননি।

> "শিলাইদহে পদ্মাতীরে বসে ১৯ শতকের শেষ দিনে সূর্যাস্ত শোভা তাঁর জন্য সৌন্দর্য্য উপভোগ ছিলো না, ছিলো যন্ত্রণার বহিঃপ্রকাশ। আফ্রিকায় বিট্রিশ বাহিনীর নির্মমতার সংবাদে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ লেখেন বহুখ্যাত কবিতা যার সূচনা পঙ্ক্তি–'শতাব্দী সূর্য আজি রক্ত মেঘ-মাঝে/অস্ত গেল।' গোটা কবিতাটি সাম্রাজ্যবাদবিরোধী প্রতিবাদে সাগ্নিক।"[২৩]

রবীন্দ্র কবিতায় স্বদেশ

শাসক ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভাষা ব্যক্ত করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায়, তেমনি আবার ঐক্যের জন্য আহ্বানও করেছেন। তবে ইংরেজ উপনিবেশবাদী জাতিকে যতই আহ্বান করা হোক না কেন তারা কখনোই ভারতকে তাদের স্বদেশ ভাবতে পারেনি। 'ভারত তীর্থ' কবিতায় সেই আহ্বানের সাড়া পাই। তেমনি ১৮৯৪ সালের 'এবার ফিরাও মোরে' কবিতায় উদ্দীপনার সুর পাই, পাই স্বদেশচেতনার উদ্বেগ। তাঁর বহুবিধ কবিতার বিষয়বস্তু ভিন্ন হলেও অন্তরের বাণী মূলত একভাবেই প্রতিধ্বনিত হয়েছে অর্থাৎ শাসকবিরোধী ও অন্যায় বিরুদ্ধ বক্তব্য, যেমন তাঁর 'নৈবেদ্য' কবিতায় ভক্তিবান ও তপোবন সংস্কৃতির পাশাপাশি এমন প্রতিবাদী ইঙ্গিত পাই। তাছাড়া বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলনকালে রচনা করে 'স্বদেশবন্দনা'সহ বহু প্রতিবাদী কবিতা। তাঁর 'সুপ্রভাত' কবিতায় রয়েছে স্বদেশের জন্য আত্মদানের আহ্বান। যেমন-

"নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই, তার ক্ষয় নাই।"[২৪]

মানবতাবাদ ও জাতীয়তাবাদ রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার সাথে মিশ্রিত ছিলো, তারই উদাহরণ পাই *পরিশেষ* কাব্যগ্রন্থের 'বক্সাদুর্গস্থ রাজবন্দীদের প্রতি' কবিতাটিতে–

"নিশীথের লজ্জা দিল অন্ধকারে রবির বন্দন।
পিঞ্জরে বিহঙ্গ বাঁধা, সংগীত না মানিল বন্ধন।"[২৫]

এখানে উল্লেখ যে, ১৯২২ সালে রবীন্দ্রনাথ কাজী নজরুলের বিপ্লবী পত্রিকা 'ধূমকেতু'-র জন্য কবিতা পাঠান। তাঁর সেই *আশির্বাণী* কাব্যগ্রন্থে রয়েছে স্বাদেশিকতা সচেতনতার বাণী–

"জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধ চেতন।"[২৬]

তাঁর *কণিকা* কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'স্বদেশী' কবিতায় পাই একই রূপকতার ইঙ্গিত–

"কেঁচো কয়, নীচ মাটি, কালো তার রূপ।
কবি তারে রাগ ক'রে বলে, চুপ চুপ !
তুমি যে মাটির কীট, খাও তারি রস,
মাটির নিন্দায় বাড়ে তোমারি কি যশ !"[২৭]

১৯৩১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর কারাপ্রহরীরা গুলি করে বন্দী শিবিরের কয়েকজন বিপ্লবীকে হত্যা করেছিল। তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেকটাই অসুস্থ ও বয়সের ভারে জীর্ণ, তবুও তিনি থেমে থাকেননি। তিনি লিখেছিলেন প্রতিবাদী কবিতা 'প্রশ্ন'–

"...আমি যে দেখেছি গোপন হিংসা কপট রাত্রিছায়ে
হেনেছে নিঃসহায়ে,
আমি যে দেখেছি প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে
বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে।..."[২৮]

রবীন্দ্রনাথের কবিতা-গানে, গল্প-উপন্যাসে, নাটক-প্রবন্ধের বহু ক্ষেত্রে প্রতিবাদী ভূমিকা দেখা যায়। কারণ এটি মূলত তাঁর শৈশবের হিন্দুমেলা ও সঞ্জীবনী সভার প্রভাব। স্বদেশভক্তি তথা স্বাদেশিকতার

বীজ, স্বদেশভাবনা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের সন্ধান মেলে তাঁর বাল্যকাল থেকে। কেবল সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিবাদের বাহন বদলেছে, বদলছে এর ধরন। 'মানবী' (১২৯২) ও 'দুরন্ত আশা' (১৮৮৮) কবিতার আলস্য বিলাসী বাঙালি সমাজের প্রতি তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন। কবি *গীতাঞ্জলি*র (১৩১৭) ১০৮ সংখ্যক কবিতায় 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ'-এ ভারতের অভিজাতশ্রেণির প্রতি সমালোচনা করেন। 'প্রশ্ন' কবিতাসম্পর্কে পুনরায় ব্যক্ত করছি প্রতিকার শব্দের অপবাদে যেখানে বিচারের বাণী নিভৃতে কাঁদে (পরিশেষ কাব্য, ১৩৩৯)। বলাকা কাব্যের (১৩২৩) 'শঙ্খ' (১৩২১) কবিতায় বিশ্বসভ্যতার শত্রু অসভ্য নির্লজ্জের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান কবি। তাঁর 'প্রায়শ্চিত্য' (১৩৪৫) কবিতায় স্বদেশের একই ভাবনা প্রতিধ্বনিত হয়। স্বদেশের বহুবিধ দুঃখ লাঞ্ছনা অপমানের গ্লানি রবীন্দ্রনাথকে ব্যথিত করত। অভ্যন্তরীণ এ সকল দৈন্যতা থেকে মুক্ত হতে প্রতিবাদের আহ্বান করেন কবি। প্রতিবাদই প্রতিকার এ মর্মবাণী বারবার তাঁর রচনার নানা ধাপে ব্যক্ত করেছেন।

চিঠিপত্রে স্বদেশ

রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষভাবে যারা ভারত শাসন করতেন তাদেরকে বলতেন 'ছোট ইংরেজ'; এরা মূলত অত্যাচারী শাসকশ্রেণি।আর বিলেতে অবস্থানরত 'বড় ইংরেজ'-কে ভারতের হিতৈষী বলে মনে করতেন। কিন্তু এই 'বড় ইংরেজই' যে মূল উপনিবেশবাদী শোষকশ্রেণি তা বুঝতে কিছুটা সময় নিলেও তাদের বিরুদ্ধে স্বদেশি আন্দোলনের পক্ষে বজ্র প্রতিবাদী কণ্ঠ তুলতে কালক্ষেপণ করেননি। এর প্রমাণ মেলে তাঁর কবিতা, প্রবন্ধ ও চিঠিপত্রে। উদাহরণস্বরূপ লোয়েস ডিকিনসনের লেখা 'চীনেম্যানের চিঠি'র সতর্কবাণীস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের উক্তি উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষসহ এশিয়া আগ্রাসনের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের জঘন্য পরিচয় মিলবে এই চিঠিতে–'ইংরেজ মানব ইতিহাস হেয়তম যে পাপ করেছে সে হচ্ছে চীনের মত অত বড়ো দেশের কণ্ঠে জোর করে আফিম ঠেসে দিয়ে। নিজের উদর পূরণের জন্য এত বড় পরহিংসা সভ্যবর্বরতার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত।'[২৯]

রবীন্দ্র গল্পে স্বদেশ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধের পাশাপাশি বহু গল্পেওস্বদেশি আন্দোলনে সরকারের দমননীতির বিরুদ্ধে কখনো সরাসরি, কখনো- বা রূপকের আশ্রয়ে সমালোচনা করেছেন। তাঁরশাসকবিরোধী গল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য গল্প 'মেঘ ও রৌদ্র' ও 'রাজটিকা'। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটি লেখা হয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়টাতে, রবীন্দ্রনাথ যখন প্রকাশ্য রাজপথে আন্দোলনকারীদের মধ্যবর্তী হয়ে থাকতেন। তখনকার সকল রচনাতেই সরাসরি প্রতিবাদের বিষয়টি স্পষ্ট। ভারতবাসীর প্রতি ইংরেজদের অবজ্ঞাপূর্ণ আচরণ, অত্যাচার সম্বন্ধীয় কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজদের প্রতিটি আইনের প্রতি পক্ষপাত করা হতো। 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পটিতে তিনি তৎকালীন সময়ের বাস্তব রূপটিকেই তুলে ধরেছিলেন। এ গল্পে তিনি শশীভূষণ নামক মুখ্য চরিত্রের মাধ্যমে নানা পরিক্রমায় তৎকালীন

সময়ের সমাজের নিচুতা, স্বার্থপরতা, স্বজাতিবিদ্বেষ, শ্রেণিবৈষম্য, ভীরুতা প্রভৃতির সমালোচনা করেছেন। তিনি তুলে ধরেছেন তৎসমাজের রুঢ় বাস্তব সত্যকে, যে কারণে ভারতবাসীকে ইংরেজরা অতি সহজে শোষণের পাত্র করে তুলেছিল। এ প্রসঙ্গে নিম্নের উক্তিটি অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক–

> "আমাদের স্বজাতিকে যে সম্মান আমরা নিজে দিতে জানি না, আশা করি এবং আবদার করি সেই সম্মান ইংরেজ আমাদিগকে যাচিয়া সাধিয়া দিবে। এক বাঙ্গালী যখন নীরবে মার খায় এবং অন্য বাঙ্গালী যখন তাহা কৌতূহলভরে দেখে এবং স্বহস্তে অপমানের প্রতিকার সাধন বাঙ্গালীর নিকট প্রত্যাশাই করা যায় না এ কথা যখন বাঙ্গালী বিনা লজ্জায় ইঙ্গিতেও স্বীকার করে তখন ইহা বুঝিতে হইবে যে, ইংরেজ দ্বারা হত ও আহত হইবার মূল প্রধান কারণ আমাদের নিজেদের স্বভাবের মধ্যে।"[৩০]

গল্পের মূল নায়ক স্বদেশ ও স্বজাতিবৎসল শশীভূষণ ইংরেজদের কৌতুকপ্রবণতা ও অপমানের বিরোধিতা করলে তাকে চরম লাঞ্ছনার শিকার হতে হয় এবং এর পেছনে থাকে সুবিধাবাদী দুর্বলচিত্তের কতক স্বদেশীয়; যা মূলত 'মেঘ ও রৌদ্র' গল্পের বিষয়বস্তু হলেও তৎকালীন ভারতবর্ষের রূপটি ছিলো এমনই। তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গল্পে এইরূপ অভ্যন্তরীণ কোন্দল, উঁচু-নিচু প্রভেদ, ইংরেজ-বিপ্লবী জমিদার প্রজার নিষ্ঠুর দিকগুলো তুলে ধরেছেন কোনো-না-কোনো চরিত্রের প্রতিবাদী ভূমিকায়। উদাহরণ হিসেবে পাই, 'একটা আষাঢ়ে গল্প' (১২৯৯), 'কর্তার ভূত' (১৩২৯), 'হালদার গোষ্ঠী' (১৩২১) 'উলুখড়ের বিপদ' ও 'বদনাম' প্রভৃতি গল্পের মধ্যদিয়ে মূলত প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের দর্শন পাই। সকল গল্পের দৃষ্টান্ত না বাড়িয়ে নিচের ছকের মাধ্যমে এই রূপ প্রতিবাদ প্রবণতাস্বরূপ লক্ষণসমূহ নির্দেশ করা হলো–

সারনিঃ রবীন্দ্রগল্পে প্রতিবাদ

গল্প	গ্রন্থ	প্রতিবাদের লক্ষ্য	কারণ	প্রতিবাদী পুত্র
একটা আষাঢ়ে গল্প	গল্পগুচ্ছ	সমাজ	প্রাণহীন প্রথানুগত্য	রাজপুত্র সদাগরপুত্র কৌটালপুত্র
কর্তার ভূত	লিপিকা	ঐ	অকারণভীতি চিন্তাদৈন্য	অর্বাচীনের দল
হালদার গোষ্ঠী	গল্পগুচ্ছ	পরিবারতন্ত্র নায়েব নীলকণ্ঠ	ব্যক্তিত্বের অবমাননা, প্রজাপীড়ন	বানোয়ারি লাল
মেঘ ও রৌদ্র	ঐ	স্বদেশি সমাজ বিদেশি শাসককুল	ভীরুতা, অবিচার	শশীভূষণ
উলুখড়ের বিপদ	ঐ	নায়ের গিরিস বসু	অত্যাচার উৎপীড়ন	হরিহর ভট্টাচার্য
বদনাম	ঐ	প্রশাসন	বিপ্লবীদের ওপর উৎপীড়ন	সৌদামিনী

৩১

রবীন্দ্র নাটকে স্বদেশ

নিশ্চল, গতিহীন জড়াগ্রস্ত সমাজ রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে মৃত সমাজ এবং এহেন সমাজব্যবস্থার প্রতিবাদ চেয়েছেন, প্রতিবাদ করেছেন নাটকের মাধ্যমেও। *অচলায়তন* নাটকটিতেও রবীন্দ্রনাথ সেই স্থবির সমাজ ভাবনারই ইঙ্গিত করেছেন। অচলায়তনের বাসিন্দারা মন্ত্রে তন্ত্রে বিশ্বাসী, বিচিত্র সংস্কারের অধীন। আটান্ন প্রকার আচরণ বিধি, বিশ-পঁচিশ হাজার রকমের প্রায়শ্চিত্য ও দেবদেবীর প্রভাব দ্বারা তাদের জীবন নিয়ন্ত্রিত। শাস্ত্র-পুথি তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। পাথরের প্রাচীর ঘেরা *অচলায়তন*

এর সকল দরজা-জানালা থাকে বন্ধ। *অচলায়তন*-এর বাইরে শোনপাংশু ও দর্ভকদের বাস, তারা সকলেই অস্পৃর্শ অশুচি। *অচলায়ন* এর এই রূপটির মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ তৎকালীন সমাজব্যবস্থাকে ইঙ্গিত করেছেন। প্রতিবাদী চরিত্র হিসেবে দেখিয়েছে পঞ্চককে যে এ *অচলায়তন* এর কুসংস্কারের দেয়াল ভাঙ্গতে চায়,চায় পরিবর্তন। এ যেন প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথেরই প্রতিরূপ। পঞ্চক যেন অচলায়তনের মূর্তিমান বিদ্রোহের নাম। প্রতিবাদী আরেকটি চরিত্র পাই এখানে তিনি অচলায়তনের গুরু। শোনপাংশুদের কাছে তিনি দাদা ঠাকুর আর দর্ভকদের কাছে তিনি গোসাই। বিদ্রোহের প্রয়োজনে তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। অচলায়তনের সংকীর্ণতার প্রাচীর ভেঙ্গে দেন,আবার নতুন উদ্যমে পঞ্চক, মহাপঞ্চক এমনকি শোনপাংশুদের সঙ্গে নিয়ে নতুন করে গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। যে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্রটি তিনি জ্ঞান-প্রেম-কর্ম ও আনন্দের জন্য গড়ে তুলেছিলেন তা আর্দশ ও লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে তিনি নিজেই তার বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং অচলায়তনের সংকীর্ণতার প্রাচীর ধূলিসাৎ করেন। এরূপ বিদ্রোহী প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথের সন্ধান মেলে তাঁর সৃষ্ট রচনাতে। প্রকৃত স্বদেশের অভ্যন্তরীণ এই অচলায়তনকে রবীন্দ্রনাথ ভাঙতে চেয়েছেন। এরূপ স্থবিরতা ও যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথকে পাই তাঁর 'তাসের দেশ' (১৩৪০) নাটকের বক্তব্যে। পরিবর্তনের রাজপুত্র জাতিভেদ প্রথা বিলুপ্ত চান, যান্ত্রিক নিয়মানুগত্যের পরিবর্তন ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির বিকাশ চান। শুধু তাই নয় 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' (১২৯১) নাটকে রবীন্দ্রনাথ জীবনবিমুখ সন্ন্যাস জীবনের প্রতিবাদ জানান। 'বিসর্জন' (১২৯৭) নাটকটি তাঁর সংস্কার মূঢ়তার বিরুদ্ধাচারণ। 'গুরু' (১৩২৪) নাটকটিও তদ্রূপ। 'মুক্তধারা' ও 'রক্ত করবী' নাটকের মধ্যদিয়ে যন্ত্র সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

রবীন্দ্র উপন্যাসে স্বদেশ

সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনের বহুবিধ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ পাই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের *গোরা* উপন্যাসে। উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে কলকাতাকেন্দ্রিক উপন্যাস 'গোরা'। 'গোরা' সম্পর্কে তাঁর উক্তি- 'একটু বয়স হইতেই সে ছাত্রদের ক্লাবে 'স্বাধীনতা-হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে' এবং 'বিংশতি কোটি মানবের বাস' আওড়াইয়া, ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা করিয়া ক্ষুদ্র বিদ্রোহীদের দলপতি হইয়া উঠিল।'[৩২] এমন কি নিজ বাবার আচরণের প্রতিও 'গোরা'র মন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। সে বলে : 'আমি এ সমস্ত মূঢ়তা সহ্য করিতে পারি না–এ আমার চক্ষুশূল।'[৩৩] *চতুরঙ্গ* উপন্যাসের প্রতিবাদী চরিত্র জ্যাঠামশায় উনিশ শতকের নব্যশিক্ষিত যুবসমাজের পথিকৃৎ। অন্ধপ্রথা ও সংস্কারের বিরোধিতা করেন এই পৌঢ় প্রতিভূ। যুক্তি, বিচারবুদ্ধি, সত্যসন্ধানী তিনি। স্বদেশ চিন্তাশীল এহেন চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি যুক্তি ও ভক্তির দ্বন্দ্বকে ঘোচাতে চেয়েছেন। বহু সাংকেতিকতায় তিনি মূঢ়তা-সংকীর্ণতার বিরুদ্ধাচারণ করেছেন। সকলকে উঁচু-নিচু, হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্ব ভুলে এক হতে আহ্বান করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসের বিভিন্ন চরিত্রের সহায়তায় তিনি নিজের ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশমাতৃকার প্রতি নিজের কর্তব্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন–*চোখের বালি*র (১৩০৯)

বিহারীলাল চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনি সংস্কার, অন্ধ সমাজ ও ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। সুযোগসন্ধানী, স্বার্থপর, ভণ্ড দেশপ্রেমিকদের বিরুদ্ধে তিনি প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাঁর *ঘরে-বাইরে* (১৩২৩) উপন্যাসের মধ্যদিয়ে। রবীন্দ্রনাথের *ঘরে-বাইরে* ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে এক নতুন ধারার সংযোজন। নতুন ধারা বলতে এর বিষয়বস্তুর অভিনবত্বকেই বোঝানো হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সময়ে লেখা উপন্যাস নিঃসন্দেহে একটি রাজনৈতিক উপন্যাস। সামাজিক ও পারিবারিক বিষয়বস্তু থেকে রাজনৈতিক পটভূমিই এর মূল আলোচ্য বিষয়। তাই *ঘরে-বাইরে* উপন্যাসটি তৎসময়ের একটি উপযুক্ত রচনা। তবে এর পটভূমি রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক আন্দোলন বা মত পার্থক্যের দ্বন্দ্ব-সংঘাত এই উপন্যাসের মূল উপজীব্য–

> "ঘরে-বাইরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য মননশীলতা। 'গোরা' থেকে আরম্ভ করে রবীন্দ্রনাথ হৃদয়বৃত্তির সঙ্গে বুদ্ধিবৃত্তির অসামঞ্জস্যের সমস্যাকে অবলম্বন করে কাহিনী গ্রন্থন করেছেন। 'গোরা'তে প্রেমের কাহিনী যা আছে : সামাজিক ও রাজনৈতিক পটভূমিকার Canvas-এর বিশালতা বাদ দিলে তার উপভোগ্যতা তো দূরের কথা, মনন-চিন্তনের আলোকে উপলব্ধির বিষয় বলে গ্রাহ্যই হতে পারে না। 'ঘরে-বাইরে'র মধ্যে বিমলা নিখিলেশ সন্দীপের ত্রিভুজ প্রেম সমস্যার টানাপোড়েন আবেগ-প্রবাহের তরঙ্গভঙ্গ ও বিচার বিশ্লেষণ কখনোই বিশালতা ও ব্যাপ্তি লাভ করতে পারত না যদি না তার মধ্যে রাজনৈতিক সমস্যা এমন সংশয় ও দ্বন্দ্ব-জটিলতা সৃষ্টি করত। জাতীয় আন্দোলন আশু কর্তব্য না স্বদেশি সমাজ গঠন অবশ্য কর্তব্য এ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছিলোই। বলা বাহুল্য, উত্তেজনার পথ অবলম্বনে অসহযোগ এবং প্রয়োজনে সহিংস সন্ত্রাসবাদকে কাজে লাগানো রবীন্দ্রনাথের কাছে ছিলো প্রতিবাদের বিষয়। দেশ গঠনের কাজ এবং জাতীয় জীবনপ্রবাহকে গতিশক্তিদানে কর্মোদ্দীপনা ছিলো রবীন্দ্রনাথের মতে প্রয়োজন।"[৩৪]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলন সময়কাল এবং তার পূর্ব ও পরবর্তী সময়ের সকল প্রতিকূলতা ও বিরুদ্ধাচারণের প্রতিবাদের অন্তরালে যুগান্তরের অবোধ ও আশার বাণী শুনতে পেয়েছিলেন ভারতবাসী তৎকালে রচিত রবীন্দ্রসাথের স্বদেশি সংগীতগুলো মধ্যদিয়ে–

> "এই গানগুলির দ্বারা কেবল দেশজননীর বন্দনাই যে রচিত হয়েছিল তা নয়, তাঁর সঙ্গে দেশের সর্বসাধারণের মনে ঐক্যমন্ত্র ও সংঘশক্তিরই উদ্বোধন ঘটেছিল। রুদ্রপন্থার প্রতি ক্ষোভ, জাতীয়তা ও বিশ্বজাগতিকতাবোধের সমন্বয়ের সাধনা তাঁর মনে স্থান পেলেও দেশবাসীর মানসনেত্রে মুক্তির যে আলোকভাসন তাদের আশান্বিত করে তুলেছিল, তাঁর প্রতি তিনি সহানুভূতি জানাতে কুণ্ঠা প্রকাশ করেন নি।"[৩৫]

সেই বাল্যের হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা, জাতীয় নাট্যশালা, বঙ্গদর্শন, নীল দর্পণের অভিনয় ও অনুবাদ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, হিন্দু পেট্রিয়ট ও পত্র-পত্রিকার রাষ্ট্রীয় চেতনা বৃদ্ধির যে প্রবাহ ছিলো তা রবীন্দ্রনাথে প্রবাহিত বহুমাত্রিক ছন্দে এবং এর প্রকাশভূমি তাঁর লেখনীর উর্বর হৃদয়। স্বদেশের যেকোনো সংকট নিরসনের পন্থা খোঁজার যে অভিপ্রায় তা-ই দেশপ্রেম। রবীন্দ্রনাথসহ সমসাময়িক সকলের মধ্যে সেই অভিপ্রায় ব্যাপ্ত ছিলো। তাঁর পারিবারিক বলয়ে এ স্বাদেশিকতার শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই চর্চিত ছিলো, দেশি চালচলন, স্বদেশি ভাষা থেকে স্বদেশীয় সংস্কৃতির চর্চা ছোট বড় সকলের মধ্যেই ছিলো প্রাত্যহিক জীবনের অন্যান্য আচারের মতোই অতি সাধারণ একটি ঘটনা। যা কিছু

নিজস্ব, তাতেই গড়িমা সবচেয়ে বেশি। তাই বলে সকলকে বাদ দিয়ে নয়, সমগোত্রীয় করে রবীন্দ্রনাথ পথ চলতে পেরেছিলেন; যার ছায়া-প্রতিছায়া পাই প্রত্যক্ষ পরোক্ষভাবে তাঁর বহু রচনায়। তাঁর সৃষ্টির বহুমাত্রিক আঙ্গিনায় স্বদেশভক্তি, স্বদেশের মানুষকে অপমানের প্রতিবাদ দেখেছি তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, গল্প, পত্রাবলি ও নাটকে। ভয়কম্পিত অসহায় দেশবাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ একজন মূর্তিমান অভয়দাতা ছিলেন। যেমন–

"...শুধু মুহূর্তের তরে, দুঃখ যদি পায় তার ভাষা,
সুপ্তি হতে জেগে ওঠে অন্তরের গভীর পিপাসা
স্বর্গের অমৃত লাগি–তবে ধন্য হবে মোর গান,
শত শত অসন্তোষ লভিবে নির্বাণ।"...[৩৬]

এরূপ বহু উদ্দীপনার বাণী, আত্মমুক্তির তথা সংস্কারের বেড়াজাল থেকে মুক্তির উপায় তিনি ব্যক্ত করেছেন তাঁর সংগীতে। তাঁর বাল্যকাল, প্রাক-যৌবন পর্ব থেকে যৌবন পর্বে, কবি থেকে মহাকবিতে উত্তরণের যে বিস্ময়কর যাত্রা তাতে সংগীতকে পেয়েছি স্বদেশ সংকট থেকে উত্তরণের মহাহাতিয়ার স্বরূপ। সংগীত ছাড়াও তাঁর সৃষ্টির সকল ক্ষেত্রেই তিনি স্বাদেশিকতার স্বাক্ষর রেখে গেছেন কখনো প্রত্যক্ষ ভূমিকায়, কখনো অন্তরালে থেকে। কারণ সংকীর্ণ প্রাদেশিকতা, রাজনৈতিকতা, উৎকট দলাদলি, উত্তেজনা, শহুরে বড় লোকদের স্বার্থ হাসিলের জন্য দরিদ্র-অসহায়কে ব্যবহার প্রভৃতি দেখে কবি রবীন্দ্রনাথের মন ভারাক্রান্ত হয়ে পড়ে। তাই তিনি সরাসরি আন্দোলনের ক্ষেত্র থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন স্বাভাবিক কারণেই। কিন্তু তাঁর স্বদেশমাতৃকার সংকট নিরসনের জন্য স্বদেশের মানুষের প্রতি অত্যাচার নিষ্ঠুরতার প্রতিবাদ থেমে থাকেনি। একের পর এক প্রবন্ধ, গল্প, উপন্যাসে তুলে ধরেছেন নানা রূপকের আশ্রয়ে প্রতিবাদের ঝড়। তাছাড়া 'নোবেল' পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক কবির মনে তখন স্বদেশ মিশেছে ভারতবর্ষের সাথে, ভারতবর্ষ মিশেছে বিশ্ববসুধার সাথে। বিশ্বপথের পথিকের মনে তখন বিশ্ব চেতনায় ভারত মাতা বিরাজমান। তাই কবির স্বপ্নসৃষ্টি বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের নীতিবাক্য করেছেন– 'যত্র বিশ্বং ভবত্যেক নীড়ম্।'[৩৭]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার গান রচনার কালানুক্রমিক ধারা

ব্যতিক্রমী প্রতিভাবান রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনকালব্যাপী সৃষ্টি করেছেন বহুমুখী বিস্ময়কর ও বিচিত্র সাহিত্যসম্ভার। সংগীত, প্রবন্ধ, নাটক, কাব্য, গল্প, গদ্য ও চিত্রকলায় বিপুল ঐতিহ্যে ঐশ্বর্যশালী রবীন্দ্রনাথের সংগীতেই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বোত্তম অবস্থান বলে সর্বজন স্বীকৃত। এক সংগীতেই জীবনের সকল প্রকার আবেগের মহাসমারোহ সুস্পষ্ট, যা তিনি স্থান দিয়েছেন গীতবিতানের ছয়টি পর্যায়ে। রচিত দ্বি-সহস্রাধিক গানে পূজা, স্বদেশ, প্রেম, প্রকৃতি, বিচিত্র ও আনুষ্ঠানিক পর্যায়সমূহের বৈচিত্র্যতায় জীবনের বহুবিধ দিক-নির্দেশনা পাই তাঁর দার্শনিক ভাবনায়। অনন্য সাধারণ এই গানসমূহের মধ্যে তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম হলেও সহজ সুর ও ছন্দে রচিত এই গানসমূহের বিশেষ গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে এর বৈশিষ্ট্যে ও স্বকীয়তায়। উজ্জীবনী বাণীর সংযোগে

সহজে অনুধাবনযোগ্য স্বদেশ পর্যায়ের এই গান রচনার মূল উদ্দেশ্য সম্ভবত এই ছিলো– জনমনে তৎকালীন সামাজিক সংকট সম্পর্কে বোধ জাগ্রত করা। সেই মহান উদ্দেশ্যই দেশ জাতি ও সময়ের গণ্ডি পেরিয়ে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এক দর্শন এবং স্বদেশবোধ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত–

> "ঊনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত সুব্যাপ্ত সেই মহাজীবন প্রায় সপ্ত দশক কালের সর্বাশ্রয়ী ভাব সৃষ্টি, অমোঘ কর্মসাধনা ও দুর্বার আত্মজাগরণের মন্ত্রে জাতির চৈতন্য-মূলকে আন্দোলিত করেছেন। বিস্ময়কর ভাবয়িত্রী ও কারয়িত্রী প্রতিভা এবং দেশ ও বিশ্বহিতৈষণার কর্মব্রত দিয়ে নবজাগরণের স্বর্ণদুয়ারে চালনা করেছেন আমাদের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ।"[৩৮]

ঊনবিংশ শতাব্দীর রেনেসাঁস ভক্ত রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নবজাগরণের যাত্রায় অগ্রজের ভূমিকা পালন করেছেন। কখনো রাজপথে, কখনো তাঁর অনন্য সৃষ্টিতে, যার সুস্পষ্ট ছাপ পড়েছে তাঁর রচিত সংগীতেও। স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশীয় মানুষের প্রতি প্রেমের চেতনা তথা জনকল্যাণের আকাঙ্ক্ষা শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে সাহিত্য, সংগীতচর্চা ও ঠাকুরবাড়ির বড় দাদাদের কর্মসংগঠনের সাথে যুক্ত হন ও কর্মতৎপরতার স্বাক্ষর রেখে হয়ে ওঠেন তৎকালীন মনীষীদের সমকক্ষ। সংস্কারমুক্ত, বাস্তববাদী ও তেজস্বী রবীন্দ্রনাথ স্বদেশব্রতে ছিলেন নির্ভীক প্রতিবাদী। মানুষের আত্মসম্মান, মনুষ্যত্ববোধ, আত্মশক্তির জাগরণ থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষাব্যবস্থা, গ্রামোন্নয়ন ভাবনাসহ রাজনৈতিক অস্থির মুহূর্তে স্বদেশপ্রেমের গান প্রেরণা জুগিয়েছে, শক্তি দিয়েছে দেশমাতৃকাকে কলঙ্কমুক্তির প্রতিজ্ঞায়। ব্রিটিশ সরকারের দমন-পীড়ন ও হিংস্রতার বিরুদ্ধে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি যথার্থ দেশপ্রেমিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। দেশের চরম ক্রান্তিকালে দেশবাসীকে প্রেরণা জোগাতে ও উদ্বেগী করতে স্বদেশভাবনায় রচিত গানসমূহ অন্যতম বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তাতে রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশ পর্যায়ের গানের অবদানই সবচেয়ে বেশি উল্লেখযোগ্য।

দেশ-গৌরবী সংগীতসমূহের সৃষ্টি উপলক্ষ্য কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। সেদিক থেকেরবীন্দ্রনাথের সামগ্রিক সংগীত রচনার তুলনায় স্বদেশপর্বের গান স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল। স্বদেশি গান বিষয়ক আলোচনার সুবিধার্থে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের (১৯০৫) সময়টাকে মধ্যবর্তী পর্ব ধরে, এর আগের সময়কালকে পূর্ববর্তী ও বঙ্গভঙ্গের পরের সময়কে স্বদেশ গান রচনার পরবর্তী সময়–এই সমান ভাগে বিভক্ত করে অগ্রসর হওয়া যুক্তি সাপেক্ষ। অর্থাৎ কালানুক্রমিকভাবে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান রচনার শুরু কিশোর কাল থেকে ৪৩ বছর পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ চলাকালীন সময় তাঁর বয়স আনুমানিক ৪৪ বছর, সেই সময়ের রচনা ও এর পরবর্তী ৪৫ বছর বয়স থেকে শেষ স্বদেশি গান লেখা পর্যন্ত সময়কালকে মোটামুটি তিনটি পর্বে ভাগ করলে–এই তিনটি পর্বে রচিত তাঁর স্বদেশী গানের সংখ্যা প্রথম পর্বে ২৩টি, দ্বিতীয় পর্বে ২৫টি ও তৃতীয় ও শেষ পর্বে ১৬টি অর্থাৎ মোট ৬৪টি স্বদেশপর্বের গান পাই। বহু ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের মোট গানের সংখ্যা নিয়ে দ্বিধা থাকলেও তাঁর জীবনকাল প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের গবেষণালব্ধ মোট গানের সংখ্যা ২২৩২টি[৩৯]; যদিও এই বিশাল গানের সংখ্যার তুলনায় স্বদেশপর্বের তথা দেশ ও জাতীয়তাভাবোদ্দীপ্ত গানের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে কম। যদিও স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর

গানের ভাবের অনুষদ রক্ষা করে গানগুলিকে যে পর্যায়ভিত্তিক করেছেন তাতে তিনি 'স্বদেশ' পর্যায়ের গানের সংখ্যা রেখেছিলেন ৪৬টি। অর্থাৎ ২টি গান গীতবিতানে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিরোধানের পর আরো বর্জিত ১৬টি স্বদেশপর্বের গান সংকলন করা হয় 'জাতীয় সংগীত' শিরোনামে গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে–তাতে স্বদেশপর্বের গানের সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২টি। সুধাংশু শেখর শাসমলের 'রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা : ধারা ও রাগান্তর' শীর্ষক জার্নালের আলোকে এবং প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি'র সহযোগিতায় এই পর্বের আলোচনায় অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা পাই।

হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা ও পারিবারিক উৎসাহে স্বদেশ উদ্দীপনায় রচিত তাঁর কবিতা-প্রবন্ধ প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে পূর্বেই আলোচনা হয়েছে 'পারিবারিক বলয়ে স্বদেশ ভাবনা' ও 'রচনার বিভিন্ন আঙ্গিকে রবীন্দ্র স্বদেশ ভাবনা' বিষয়ক পরিচ্ছেদে। এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্যায়ের গান বিষয়ক বিশ্লেষণই মূল আলোচ্য বিষয়। তেরো বছরের বালক রবীন্দ্রনাথ বিনা নামে দাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের 'সরোজিনী' নাটকে লিখলেন বীরুদ্দীপনার গান 'জ্বল জ্বল চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ'। ১৮৮৫ সাল পর্যন্ত অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ২৩ বছর বয়স পর্যন্ত এই ১০ বছরে বিভিন্ন বিষয়ের ৩০৭টি গান রচনা করেন, তাতে স্বদেশি গানের সংখ্যা ৯টি।

১৬ বছর বয়সের রচনা :

"তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ।
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে, এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ॥"[৪০]

এটি *ভারতী* পত্রিকাতে প্রকাশিত হয় ১২৮৪ সালে এবং ১২৯২ বৈশাখে প্রকাশিত প্রথম গীত সংকলন *রবিচ্ছায়া*তে। 'জাতীয় সংগীত' শিরোনামে যে ৬টি গান গৃহীত হয়েছিল তারমধ্যে এই অনন্য সুন্দর গানটিও রয়েছে। সঞ্জীবনী সভার জন্য গানটি রচিত হয়েছে বলে অনুমান করা যায় এবং এই গানটিই সম্ভবত স্বদেশভাবনার প্রথম রচনা। রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম রচিত স্বদেশবন্দনার গানেই দেশকে 'মা' বলে সম্বোধন করেছেন। দেশমাতৃকার জন্য যে প্রাণ উৎসর্গ করা যায় কিশোর বালক রবীন্দ্রনাথ তা নিজে উপলব্ধি করে সকলের মাঝে এ বীণা সুধা ছড়িয়ে দিতে চেয়েছেন। দেশকে দেবী বলে, মাতা বলে সম্বোধন করে আত্ম নিবেদনের যে গভীর ভাবনা পোষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচিত প্রথম স্বদেশপর্বের গানে তা অভিনব। তাই এ গানটি সে সময় যথেষ্ট সমাদৃত হয়। এ গানটি জয়জয়ন্তী রাগে ও চৌতালে নিবদ্ধ করা হয়।

১৭ বছর বয়সের রচনা :

১.

"অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী, গা লো সেই-সব পুরানো গান
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥"[৪১]

২.

"ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে।
বিহগেরা থামো থামো আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা ॥"[৪২]

৩.

"ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি তত দিন তুই কাঁদ্ রে ॥"[৪৩]

এই গান তিনটি গীতবিতানের শেষে 'জাতীয় সংগীত' পর্বে সংযুক্ত করা হয়।

১৮ বছর বয়সের রচনা :

"এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন,
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্ ॥"[৪৪]

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু বিক্রম' নাটকের জন্য অসাধারণ একটি স্বদেশ পর্বের গান লেখা হয়েছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে স্বদেশি আন্দোলনের সময় ১৩১১ সালে গানটিতে খানিকটা পরিবর্তন আনা হয় অর্থাৎ 'বন্দে মাতরম্' শব্দটি যুক্ত করে এর ছন্দের গতি বাড়ানো হয় এবং সুর বাড়িয়ে তাতে বীর রসপূর্ণ সমবেত সংগীতরূপে গাওয়ার উপযুক্ত করে তোলা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, 'বন্দে মাতরম্' গানটি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের রচনা এবং *আনন্দ মঠ* উপাখ্যানের অন্তর্গত। তিনি এর সাথে 'মল্লার রাগ ও কাওয়ালী তালের' কথাটিও সংযুক্ত করে দেন। কিন্তু তাঁর প্রদত্ত সুর ও তালে গানটি গাওয়া হয়নি বা এর কোনো স্বরলিপিও পাওয়া যায়নি। এই বিখ্যাত গানটি সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথেরমতামত প্রকাশ করেন যে, তিনিই সর্বপ্রথম বন্দে মাতরম্ সংগীতের প্রথম অংশ সুরযোজনা করেছেন। কংগ্রেসের প্রথম যুগের এক অধিবেশনে কবি কংগ্রেস সমবেত জনতার সম্মুখে গানটিপরিবেশন করেন। স্বদেশমাতৃকার গুণবর্ণনা সম্বলিত গানটি শুনে উপস্থিত সকলেই আকৃষ্ট হয়। এ গানটির সাথে জাতীয় সংগ্রামের স্মৃতি জড়িত থাকায় এবং গানটির জন্য বহু দেশসেবককে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে বিধায় সকলে শ্রদ্ধার সাথে গান করে থাকে।

১৯৭৩ সালে শারদিয়া সুরছন্দা পত্রিকায় লেখক কিরণশশী দে রচিত "বন্দে মাতরম্ গানের সুর প্রসঙ্গ" প্রবন্ধটিতে এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ আছে যে, H. Bose's pathephone রেকর্ডেও 'বন্দে মাতরম্' এই গানটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নিজে গেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে এই গানটি স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। বঙ্কিমচন্দ্র রচিত 'বন্দে মাতরম্' গানটির অনুমোদিত সুরটি রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত। 'দেশ-রাগিণী'তে করা এই গানের ভাষা ও অভ্যন্তরীণ ভাব স্বদেশভক্তির একটি প্রকৃত রূপ। মূল গানটির অংশবিশেষ স্বরলিপিসহ সংযুক্ত করা হলো।

"বন্দেমাতরম্।
সুজলাং সুফলাং মলয়জ-শীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্।
শুভ্র জ্যোৎস্না-পুলকিত-যামিনীম্
ফুল্ল-কুসুমিতে-দ্রুমদল-শোভিনীম্,
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।..."

র্সা র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা নর্সা র্রার্সা | ণাধা পা পা ধপা | মপা মগা গরা রা

ব ন্ দে ০ ০ ০ ০০ ০০ ০০ ০ মা ০০ ০০ ত০ রম্ ০

০

া ঠ া ঠ | মা রা মা এা | গমা পা মপা ধা | পধা ণা ধনা র্সা

০ ০ ০ ০ মা ০ ০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০ ০০ ০

ণর্সা র্রা র্রা র্সা | র্সার্রার্সা ণা ধপা মা | পা -া -া -া | র্সা -া -া -া

০০ ০ ০ ত রা০০ ০ ০০ ০ ম্ ০ ০ ০ বন্ ০ ০ ০

II ণা র্সার্রার্সা ণা ণধা | পা ধপা মপা মগা | গরা রা রা রা | রা মা মা মা I

দে ০০০ ০ ০ মা ০০ ০০ ০ত রম্ ০ ০ ০ সু জ লা ০

I মা গা রা গা | রসা ন্া সা সা | সা া া া | রা -া মা -া I

০ ম্ সু উ লা০ ০ ম্ ০ ০ ০ ০ ০ ম ল য় জ

গমা

I পা পা পা ধপা | মা গপা পা পা | পা -া -া -া | মা া পা -া I

শী ০ ০ ০০ ত লাম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ ০ স্য ০

অনা

I নি -া নি -া | র্সা র্সা র্সা না | র্সা -া -া -া | র্সা -া -া না I

শ্যা ০ ০ ০০ ত লাম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ শ ০ স্য ০

I র্রা ঠ া র্সা | র্সার্রার্সা ণা ধপা মা | পা -া -া -া | র্সা -া -া -া I

০ ০ ০ ত র০০ ০ ০০ ০ ম্ ০ ০ ০ বন্ ০ ০ ০

গ

I র্সার্রার্সা ণা ধা পা | রা গা মা গা | রা রা রা রা | মা -া পা -া I

দে০০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত রম্ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ভ্র

I না ইা না র্সারা | র্রা র্সা -া -া | র্সা -া র্সা -া | নি -া -া -া I

জ্যো জ স্না ০০ পু ল কি ত যা মি নী ং ফু ল্ ল কু

I র্সা া র্সা া | ঈা না র্সা র্সা | নার্সার্রা র্সা র্রা র্রা | র্সা ণা ণা ধা I

সু মি ত ০ দ্রু ম দ ঔ শো০০ ভি নী ং সু হা ০ সি

I ণা ণা আ ণা | ধা ণা র্সা র্রা | র্সা ণধা পা মা | পা ণা র্সা র্সা I

নী ০ ০ ম্ সু ম ধু ও ভা সি০ নী ং সু খ দা ং

I গা মা পা র্সা | র্সা ইা র্রা র্সা | র্সার্রার্সা ণা ধপমা পা |

ব র দা ম্ মা ০ ০ ত র০০ ০ ০০০ ম্

৪৫

২০ বছর বয়সের রচনা :

"দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে
নগরে প্রান্তরে বনে বনে অশ্রু ঝরে দু'নয়নে,
পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।"[৪৬]

এই গানটি ১২৮৮ সনে রচিত হয় এবং গীত সংকলনে 'রবিচ্ছায়া'তে এই অতুলনীয় গানটিও স্থান পায়। এখানে কবি দেশমাতার দুঃখে অন্তর ক্ষরণের কথা ব্যক্ত করেছেন। দেশমাতাকে একান্তের ব্যক্তিরূপে কল্পনা করে তারজন্য প্রাণ ত্যাগ করার বাসনাও ব্যক্ত করেন কবি।

২৩ বছর বয়সের রচনা :

"এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি!
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি।
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে কে তারে উদ্ধার করিবে ॥"[৪৭]

২৩ বছর বয়সের রচনা :

"শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেব, প্রভু, দয়াময়
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ॥"[৪৮]

এটি 'রবিচ্ছায়া'র অন্তর্গত মুক্তছন্দের একটি গান। মূলত এ পর্বে রচিত স্বদেশি গানসমূহে দেশপ্রেমের একটি ভাব ও সুরের সমন্বয়ে গঠিত কোমল আভা মনকে ছুঁয়ে যায়। এসব গানে কবির ব্রহ্মজ্ঞান বিশ্বপ্রেম ও দেশাত্মবোধ মিলেমিশে একাকার। যদিও এই গানগুলোর সাথে দেশের জাতীয় আন্দোলনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র ছিলো না। কিন্তু ভারতের প্রভাত গগনে একদিন জয়গান আলো ছড়াবে, কবি সেই আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

১২৯৯ সনের দিকে তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গানগুলি স্বদেশি স্বকীয়তার আরো বলিষ্ঠ রূপ প্রকাশ করে। গানের বাণী, ভাব ও সুরের সমন্বয়ে বিশেষ বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যের কিছু স্বদেশি গান কবি এ পর্বে রচনা করেন।

২৪ বছর বয়সের রচনা :

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, জগতজনের শ্রবণ জুড়াক,
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক মুখ তুলে আজি চাহো রে ॥"[৪৯]

এই গানটিতে প্রথম রাগের সাথে বাউল, কীর্তন-রামপ্রসাদী সুরের সম্মিলন ঘটান কবি। আত্মপর ভুলে সকলে একাত্ম হলে কোটি সন্তানের সম্মিলিত পদচারণায় সকল দুঃখ পাপ তাপ দূর হয়ে যাবে। দেশমাতা পূর্ণ প্রেমের ভূমিতে পরিণত হবে– এই ছিলো কবির বিশ্বাস।

২৫ বছর বয়সের রচনা :

"কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে, আপন মায়েরে নাহি জানে।"[৫০]

এই গানটি গীতবিতানের 'জাতীয় সংগীত' পর্বের অন্তর্গত। এই অসাধারণ গানটিতে কবির অনুশোচনার বাণী উদ্ধৃত। কবি অধৈর্য হয়ে পড়েন জনগণের আচরণে। নিরুত্তাপ সকল দেশবাসীকে কবি হীন, নির্মম, চেতনাহীন বলেছেন। কারণ, যে দেশমাতা স্বর্ণশস্য জ্ঞান ধর্ম দান করেন তারই সেবায় সন্তানদের কোনো আগ্রহ আন্তরিকতা কিংবা যত্নের প্রয়াস চোখে পড়ে না।

২৫ বছর বয়সের রচনা :

"আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমাদের মেলা, শুধু মিছে কথা ছলনা?"[৫১]

২৫ বছর বয়সের রচনা :

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে?"[৫২]

উপরের গান দুটি মূলত দেশবাসীর জন্য 'কড়ি কোমল'-এর দুটি কবিতার গীতরূপ। 'আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না' গানটিতে অন্য একটি গল্প আছে। তারকনাথ পালিত কংগ্রেসের বড় বড় নেতাদের তার বাড়িতে অভ্যর্থনার জন্য আমন্ত্রণ জানান। তিনি রবীন্দ্রনাথকেও সে অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে আমন্ত্রণ জানান। আমন্ত্রিত অতিথিদের খানাপিনা ও আচরণে রবীন্দ্রনাথ খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথকে গান গাইতে অনুরোধ করলে তিনি উপস্থিত কথিত দেশপ্রেমিকদের কাজে ও আচরণে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তাদের সচেতন করার উদ্দেশ্যে তৎক্ষণাৎ এই গান রচনা করে ও সুর বসিয়ে বলিষ্ঠ ধিক্কার উচ্চারণ করেছেন শিক্ষিত লোভী মেকি নেতাদের উদ্দেশ্যে। জানা যায়–'এই গান গাইবার পরে আর আসর জমল না। সভাস্থগণ খুশি হননি।'[৫৩]

এই সময়ে রচিত গানসমূহের প্রত্যেকটিতে রাগ-রাগিণীর প্রভাব সুস্পষ্ট। রাগ-রাগিণীর সুরের মধ্যদিয়ে বাউল কীর্তনের সুরের সংযুক্তিও চোখে পড়ে। ১৮৮৬ সালের ডিসেম্বর কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনে কবি রামপ্রসাদী সুরের অসাধারণ গান 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' পরিবেশন করেন, যেখানে দেশমাতৃকার সকল সন্তানের সম্মিলনে এক নিবিড় প্রশান্তির বাণী নিঃসৃত হয়েছে।

২৬ বছর বয়সের রচনা :

"তবু পারি নে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান ॥"[৫৪]

প্রাণ পেতে চাইলে আগে প্রাণ দান করতে হবে–এহেন সুন্দর উপলব্ধি রয়েছে গানটির শেষ পঙক্তিতে। প্রতি পদে পদে অপমানের কলঙ্ক নিয়ে ভিখারির মতো কেঁদে বেড়ানোর চেয়ে প্রাণের বিনিময়ে হলেও মানের সাথে বাঁচবার আকুতি প্রকাশ করেছেন কবি এখানে।

২৬ বছর বয়সের রচনা :

"আগে চল্, আগে চল্ ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই!"[৫৫]

উপরের গান দুটি কবি ১৮৮৭ সালের ১০ এপ্রিল কলকাতার ছাত্রদের ইস্টার উৎসব উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক সম্মিলনে পরিবেশন করেন। এই একটি উৎসবকে কেন্দ্র করেও তিনি এমন দুটি গান রচনা করলেন ছাত্রদের উদ্দেশ্যে যেখানে দেশমাতার দুঃখ কষ্ট অপমানের বাণী রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ নিপুণভাবে সকলের মনে দেশের এহেন দুরবস্থার কথা, উদ্বেগের কথা, স্মরণে রাখবার আহ্বান জানিয়ে সকলকে সম্মিলিত করবার প্রয়াসে নিয়োজিত ছিলেন নিভৃতে। এই গান দু'টি তারই উদাহরণ।

৩১ বছর বয়সের রচনা :

"আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে, কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো 'উঠ উঠ' সঘনে গভীর নিদ্রামগনে ॥"[৫৬]

১৩০০ সালে রবীন্দ্রনাথ মোট ৪২৩টি গান রচনা করেন এবং 'জাতীয় সংগীত' বিভাগে 'রবিচ্ছায়া' এবং নতুন গান মিলে স্বদেশ পর্বের গান ছিলো ৯টি।

'বন্দে মাতরম্' গান সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। এই পর্বেই মূলত রবীন্দ্রনাথ গানটিতে দেশ রাগ যুক্ত করে বঙ্কিমচন্দ্রকে শোনান ১৮৮৬ সালে। তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনেও গানটি শুনিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের ৩৫ থেকে ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত সময়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ ১৩০০ থেকে ১৩১১ সাল পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বের সময়টাতে বেশ কিছু অতুলনীয় স্বদেশ গৌরবের নতুন গান তিনি রচনা করেন।

৩৫ বছর বয়সের রচনা :

"অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী ॥"[৫৭]

কাব্যসমৃদ্ধ রাগাশ্রয়ী এটি একটি অনবদ্য স্বদেশ সংগীত। কথিত আছে যে, বিপিনচন্দ্র পাল ও তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দ কবিকে অনুরোধ করলেন, দুর্গামাতার প্রতিমার ভাবরূপটিতে যেন দেশমাতৃকার চিত্রকল্প ফুটে ওঠে এমন একটি গান রচনার জন্য। কিন্তু তিনি দেশমাতা ও দেবী দুর্গাকে নিয়ে এমন একটি গান রচনা করলেন–যা আর্য ভারতের ঐতিহ্যের গর্ব ও হিন্দুত্ববাদের পরম্পরার সংস্কৃতির বাকচিত্র। যে কারণে এই অসাধারণ গান অহিন্দুদের পক্ষে অসহনীয় হতে পারে আশঙ্কায় এটিকে রাষ্ট্রসভায় গাওয়ার অনুপযুক্ত মনে করা হলো। রবীন্দ্রনাথ এতে মনঃক্ষুণ্ন হলেন এবং নিজে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে একটি আপ্যায়ন সভায় গান্ধীজীসহ নেতৃবৃন্দকে এই গানটি গেয়ে শোনান।

৩৬ বছর বয়সের রচনা :

"কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে।
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ 'পরে।
সে যে আমার জননী রে ॥"[৫৮]

বীণাবাদিনী পত্রিকাতে এটি ১৩০৪ সনে প্রকাশিত হয়। গীতবিতানের জাতীয় সংগীত পর্বের অন্তর্গত এবং সরলা দেবীর *শত গান* বইতে এর স্থান হয়। জননীস্বরূপ বিষন্ন দেশমাতৃকার ভাষা, স্নেহকোল, স্নেহ উপহার, সাজানো অন্নের প্রতি অনাদর-অবহেলার এক করুণ চিত্র এবং চাপা আর্তনাদ এই গানে সুস্পষ্ট।

৩৮ বছর বয়সের রচনা :

"আজি এ ভারত লজ্জিত হে,
হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে ॥"[৫৯]

অতুলনীয় এই গানটি রচনা করেন কবি ১৩০৬ সনে যা 'কাব্যগ্রন্থে'র ৮ম খণ্ডের গান (জাতীয়) অংশের অন্তর্গত হয়। এ পর্বে রচিত স্বদেশপর্বের যে ক'টি গান তিনি রচনা করেছেন তাতে নিজেদের প্রতি

ধিক্কার ও লজ্জার বিষয়টি জোরালোভাবে প্রকাশ পায়। ভারতবর্ষের প্রতি, এর মানুষের প্রতি ইংরেজদের এত অন্যায়-অত্যাচার, অভ্যন্তরীণ এত দলাদলি থাকা সত্ত্বেও কোথাও কোনো প্রতিকার ছিলো না। কোনো উদ্দীপক প্রতিবাদ ছিলো না বিধায় রবীন্দ্রনাথের রচিত এ গানে ভারত-মাতা লজ্জিত বলা হয়েছে। কারণ এ মায়ের কোনো সন্তানের সেই রুদ্র, ত্যেজ-দীপ্ত পৌরুষত্ব নেই, সেই সত্য সাধনা নেই যে ব্রতে দেশমাতাকে কলঙ্ক থেকে মুক্ত করা যায়।

৪১ বছর বয়সের রচনা :

"হে ভারত, আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান।
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান।"[৬০]

৪১ বছর বয়সের রচনা :

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা–
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।"[৬১]

৪১ বছর বয়সের রচনা :

"এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ–
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা ॥"[৬২]

রবীন্দ্রনাথের এ বয়সে স্বদেশপর্বের গানসমূহে দেশমাতৃকার সেবায় দীক্ষা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। নিজ দেশের ধর্ম, কর্ম ও শিক্ষাকে একমাত্র মন্ত্র বলে বিচার করেন কবি এ পর্বে। পূর্বে রচিত গানসমূহে যে অভিমান, অনুযোগ ও আফসোসের বাণী ছিলো ৪১ বছর বয়সের রচনায় তা আশাবাদে পরিণত হয়। দেহের শক্তি ও মনের ভক্তি নিয়ে দেশমাতার সেবা এবং প্রয়োজনে মৃত্যুতোরণকে শঙ্কাহরণ করবার, মুক্ত দীপ্ত মহা সে জীবনের জন্য কবির গানে ব্যক্ত করেছেন ঐক্যমন্ত্রের আহ্বান।

৪৩ বছর বয়সের রচনা :

"মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মঙ্গলোজ্জ্বল আজ হে।
বর পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।"[৬৩]

'বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন' গানটি মূলত স্বদেশ সংগীতে ছিলো না। বরোদারাজ গাইকোয়াড়ের অভ্যর্থনা উপলক্ষ্যে ১৯০৪ সালে এ গানটি রচিত। বিভিন্ন উপলক্ষ্যে এর রূপান্তর হয়। ইতালির পণ্ডিত কার্লো ফরমিকি যেবার শান্তি নিকেতন এলেন তাঁর অভ্যর্থনায় এর শাব্দিক পরিবর্তন হলো–'শান্তি মন্দির' পুণ্য অঙ্গনে হোক সুমঙ্গল আজ হে'। শুধু তাই নয়, ১৯০৪ এর আগস্টে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে অবস্থানরত অবস্থায় লন্ডনের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক রবীন্দ্রনাথকে উপাধি প্রদানকালে এর বাণী পরিবর্তিত হয়–'বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণ–কর মহোজ্জ্বল'রূপে। তবে বসুবিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকালে ১৯১৭ সালে এই গানটি অসাধারণ কাব্য রূপ পায়–'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর মহোজ্জ্বল আজ হে' রূপে। পরবর্তীকালে এই রূপান্তরিত রচনাটিকে কবি তাঁর ৫৬ বছর বয়সে দেশ-গৌরবী গান হিসেবে গীতবিতানের স্বদেশ গানের অন্তর্ভুক্ত করেন।

এর পরেই শুরু হয় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্ব যেখানে কবি স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ব্রতচারণার কিছু অসাধারণ গান রচনা করেন। তবে বঙ্গভঙ্গ পূর্ব পর্যন্ত কবির ৪৩ বছর বয়স পর্যন্ত তিনি ৭৪১টি (কালানুক্রমিক সূচি পৃষ্ঠা-১২৬) গান রচনা করেন যার মাত্র ২৩/২৪টি স্বদেশ রচিত গান। সংখ্যায় তা কম হলেও প্রতিটি গানের বাণী পর্যালোচনায় আমরা পেয়েছি স্বদেশ মাতৃকার জন্য তাঁর শঙ্কার কথা, কখনো আশা জাগরণের কথা। প্রতিটি গানের স্বতন্ত্র রূপ তৎকালীন সময়ের জন্য ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক ছিলো এবং স্বদেশমাতার প্রতি আরো নিবেদনের জন্য প্রাণ উচ্ছ্বসিত অর্ঘ্য বাণী ও সুরের দ্যোতনায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করতো।

বঙ্গভঙ্গকালে রচিত স্বদেশচেতনার গান

১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময়কালকে রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক জীবনের ক্রান্তিকাল বলা যেতে পারে। এ পর্বে মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে ঘিরে তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গান ও এর তাৎপর্য নিয়ে আলোচনাই উদ্দেশ্য। বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার সাথে সাথে সারা বাংলা জুড়ে প্রতিবাদের যে ঢেউ ওঠে তাতে রবীন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী ও জাতীয় নেতৃবৃন্দসহ সকলে ওই দিন অর্থাৎ ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ রাখি বন্ধন ও অরন্ধন ব্রত পালন করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত স্বদেশি গান তখন সমগ্র জাতিকে স্বাধীনতা চেতনা ও আত্মোপলব্ধির দীক্ষায় উজ্জীবিত করে তার সাথে ছিলো 'বন্দে মাতরম্' ধ্বনি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে রবীন্দ্রনাথের বয়স ছিলো ৪৪ বছর। এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয় যে, এর আগে রচিত তাঁর প্রায় সকল স্বদেশ ভাবনার গানেই রাগাশ্রিত ও গম্ভীর তালের প্রয়োগ ছিলো। কিন্তু এ পর্বে এসে রবীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন সাধারণের সহজ সরল সুর ও ছন্দ অর্থাৎ বাউল, কীর্তনের সুর। যাতে জনমন অনায়াসেই নিজেকে একাত্ম করতে পারে এসব গানের সাথে। স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ নিয়ে আমরা অন্যত্র বিস্তারিত আলোচনা করবো। এ পর্বে মূলত তাঁর যে সকল অসাধারণ স্বদেশি গণসংগীতের সুর দেশকে স্বদেশি আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করেছিলো তার তালিকা ও ভাবার্থ নির্ভর সাংগীতিক চেতনার বিষয়টি আলোচনার মূল প্রতিপাদ্য হবে।

বঙ্গভঙ্গ সময়েই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ গৌরবী গানের বিশেষ তালিকাটি পাওয়া যায়। পদ্মাতীরের বাউল ও কীর্তনীয়াদের মাটির সুরকেই তিনি গ্রহণ করলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হিসেবে। সহজ সরল বাণীর হৃদয়স্পর্শী সুর সকল বাঙালিকে এক করার মন্ত্রে আবদ্ধ করলেন কবি। স্বাদেশিকতা ও জাতির ব্রতচারণার চরণ কবি এ সময় রচনা করেন ২৫টি স্বদেশ ভাবনার গান।

৪৪ বছর বয়সের রচনা :

১.

"এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
'জয় মা' ব'লে ভাসা তরী ॥"[৬৪]

সারিগানের সরল ঢেউয়ের ছন্দে ও অপূর্ব বাণীর রূপক সমন্বয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের প্রাক্কালে রচিত এই গানটি সর্বকালের একটি সর্বজন গৃহীত গানে পরিণত হয়। নদীমাতৃক দেশ বাংলাদেশ। তাই নদীকে

দেশের সাথে তুলনা করে মাঝিকে আন্দোলনরত সকল সাধারণের মনে স্থাপিত করেছেন কবি। সেই ১৯০৫ সালের উত্তাল সময়ের রচিত গান আজো তেমনি আন্দোলিত করে; উদ্বেলিত করে দেশমাতৃকার প্রেমে। এ গানের সুর ও ছন্দে তৎকালে আন্দোলনরত স্বদেশবাসীর বিমোহিত হবার কথা ব্যক্ত করেন কবি। প্রবীণ অধ্যাপক রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর মন্তব্যে : 'এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে, গানটি শুনে তরী ভাসাইব কি; গঙ্গাগর্ভে ঝাপাইয়া পড়িতে অনেকেই প্রবৃত্তি হইয়াছে।'[৬৫] এ বিষয়ে ব্রাহ্মসমাজের পণ্ডিত সীতারাম তত্ত্বভূষণের কন্যা শান্তিময়ী দত্তের স্মৃতিচারণ উল্লেখ করা হলো–

> "...রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দেখি ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে।...ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরূপে গানের ক্লাশে গান শিখি–হঠাৎ একদিন ডাক এল রাস্তার অপরদিকের স্যার জগদীশ বসুর বাড়ি থেকে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর সদ্য লেখা স্বরচিত স্বদেশী গান শোনাবেন সেখানে। বিদ্যালয়ের গান-জানা মেয়েরা তাঁর মুখ থেকে শুনে গানগুলি শিখে নেবে।... অর্গানে বসেছেন সি আর দাশের ভগ্নী অমলা দাশ। কবি এসে পকেট থেকে ছোট নোটবই খুলে গাইলেন, 'যদি তোর ডাক শুনে...' এবং 'এবার তোর মরা গাঙে...'
> প্রথমে তিনি একবার গাইলেন খালি গলায়। তারপর অমলা দাশের বাজনার সঙ্গে। দরাজ, উচ্চ কণ্ঠস্বর কিন্তু একটু মেয়েলি ধরনের। তাঁর সেই সুউচ্চ মিষ্ট কণ্ঠস্বরে ঘরখানা যেন গমগম করে ভরে গেল।... আমরা মেয়েরা গান শিখব কী–গায়কের চোখ-ধাঁধানো রূপে–অতুলনীয় গানের মাধুর্যে যেন সম্মোহিত হয়ে চেয়ে রইলাম।..."[৬৬]

২.

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥"[৬৭]

একই সময়ে রচিত অতুলনীয় বাউল সুরের গান এটি। পরপর এ দুটি গানই মূলত অন্য গানের আশ্রয়ে রচিত। লোক সুরের মুগ্ধতায় রবীন্দ্রনাথ এ সময়ে এই সুরকেই নিবেদনের একমাত্র অর্ঘ্য করে তুলেছেন। খুব সহজ বাণীর ও বাউল সুরের এ গান স্বদেশচেতনা উদ্দীপনার এক অতুলনীয় নিবন্ধনে পরিণত হয়। প্রতিটি স্তবকে একই সুর অথচ বাণীর অপরিহার্য যোজনায় সর্বকালের উদ্দীপনামূলক গানে পরিণত হয় এটি।

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে" গানটি রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের ছাত্রদেরও শিখিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্র কামাখ্যানাথ রায় লিখেছেন, 'প্রাক্-কুটিরের পুবদিকের উত্তর কোণে একটি জাপানি অরগ্যান ছিলো। সন্ধ্যায় গুরুদেব এটি বাজিয়ে আমাদের শেখাতেন। "একলা চলো রে..." ছাত্রদের কণ্ঠে তুলে দেবার জন্য গানটি তিনি অনেকবার গেয়েছেন, এবং অনেকদিন ধরে।...' (গায়ক রবীন্দ্রনাথ গ্রন্থে উদ্ধৃত)

৩.

"আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!"[৬৮]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত অসাধারণ এই গানটিতে লৌকিক ও বিভাস রাগ মিশ্রিত সুরের দুলনীতে দেশমাতার সোনার মন্দিরের দুয়ার খোলার গল্প বলেছেন কবি। গানে দেবী দুর্গার শক্তির সাথে দেশমাতার শক্তির এবং দুর্গামাতার রূপের সাথে রূপক অর্থে স্বদেশমাতার প্রকৃতির রূপের বর্ণনা

করেছেন। শুধু অন্তরশক্তি বা বাহ্যিকরূপেই পরিপূর্ণ নয় এ দেশমাতা। এর রয়েছে দারিদ্র্যতাপূর্ণ ক্ষুধাতুর সন্তান। তবে দেশমাতার নয়ন ভোলানো রূপ আর এর কোমল পরশে সকল দৈন্যতা শক্তিতে রূপান্তর করা সম্ভব হয়।

৪.

"মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে ?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে ॥"[৬৯]

৫.

"তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে, তা ব'লে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে, হয়তো রে ফল ফলবে না ॥"[৭০]

অপূর্ব সুন্দর আশার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি এই গানটিতে। বড় কোনো অর্জন সহজে আসে না, তার জন্য যেমন ত্যাগের প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন অপেক্ষার। সহজ ও সত্য উপলব্ধির বাণী এবং বাউল সুরের সমন্বয়ে একটি অতুলনীয় উদ্দীপনার গান এটি। হয়তো বারবার কোটার ফলেও বিফলতা আসবে। তাই বলে থেমে গেলে চলবে না। নতুন উদ্দীপনায় আবারও প্রস্তুতি নিয়ে এগুতে হবে। কারণ অন্ধকারের পরেই আলো আসে।

৬.

"ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি–
জোরে বক্ষোদুয়ার আঁটি ॥"[৭১]

স্বদেশপর্বের প্রতিটি গানে কোনো না কোনো দিকনির্দেশনার ইঙ্গিত করেছেন কবি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত হলেও এ সকল গান এতোকাল পরেও ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক হয়ে যেকোনো দুর্যোগ ও দেশ-সমাজের বিপর্যয়ে আমাদের উঠে দাঁড়াবার শক্তি জোগায়। কবি চোখের জলে মাটিকে জরাজীর্ণ না করে নিজেকে শক্ত হতে বলেছেন। কারণ নিজের দুর্বলতা কেবলই অন্যের পরিহাসের বস্তু। কবি এ লজ্জা থেকে নিজেকে, নিজের দেশকে মুক্ত করতে বলেছেন। নিজের ব্যর্থতার গ্লানি নিয়ে শোকের আহাজারি কেবল সময় নষ্ট করা ছাড়া আর কিছু নয়। কবি মুক্তি লাভের জন্যে সব ভুলে কৃতকর্মে ঝাপিয়ে পড়তে আহ্বান করেছেন।

৭.

"যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!"[৭২]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত এই গানটিকে যেভাবে মাতৃরূপ দর্শন হয় তাতে স্বদেশ মাতৃকার প্রতি অপরূপ এক অনুভূতির উদ্রেক হয়। ব্যক্তিজীবনের আকাঙ্ক্ষায় পৃথিবীর যে প্রান্তেই ঘুরে ফিরি না কেন গ্রাম্য দরিদ্র মায়ের আদরের গন্ধমাখা ছেঁড়া কাঁথার তুলনা কিছুতে হয় না। এই দেশমাতা যেন চির শাশ্বত মাতৃরূপ এবং গানটির শেষাংশে কবি উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন যেন এই প্রাণপ্রিয় দেশমাতাকে রক্ষা করতে পারেন। কোনো শক্তির কাছেই যেন পরাজিত হয়ে না যান। উল্লেখ্য, এই গানটির স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী।

৮.

"যে তোরে পাগল বলে তারে তুই বলিস নে কিছু ॥
আজকে তোরে কেমন ভেবে অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে আসবে রে তোর পিছু পিছু ॥"[৭৩]

স্বদেশ পর্যায়ের অন্তর্গত এই গানটিরও স্বরলিপি করেন ইন্দিরা দেবী। অপূর্ব এক প্রাণশক্তি রয়েছে গানটির অন্তরালে। স্বদেশমাতার কথা কোথাও উল্লেখ না করেও কী উপায়ে বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন আনা সম্ভব, সে বিষয়ে দৃঢ়তার বাণী ব্যক্ত করেছেন কবি। দিন বদলায় তবে বদলের দায় নিজেদের। কারো কটাক্ষে পিছুপা হলে চলবে না বরং চুপচাপ সামনে এগুতে হবে। এই গানের প্রতিপাদ্য বিষয় মূলত তাই-ই ইঙ্গিত করে।

৯.

"ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী ॥"[৭৪]

বাউল সুরের অপূর্ব দ্যোতনায় আক্ষেপের বাণীও মধুর। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বে ৪৪ বছর বয়সকালে রবীন্দ্রনাথ রচিত প্রতিটি গানেই দেশ সম্বন্ধীয় নানাবিধ ভাবনারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে যা কখনও আশা জাগানিয়া, কখনো উদ্বেগের আবার কখনো উদ্দীপনার ভাবসমৃদ্ধ। তেমনি এই গানটিতে একপ্রকার চাপা অভিমানের আভাস স্পষ্ট। যদি দেশমাতার এহেন দুর্দশায় কেউ চুপ থাকে, যদি কেউ বাইরে বেরিয়ে না আসে, নিজ কাজকে দেশের কাজের থেকেও বৃহৎ বিবেচনা করে তবে কবি তাদের অগ্রাহ্য করেন।

১০.

"যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।
যদি তোর ভয় থাকে তোর করি মানা ॥"[৭৫]

দ্বিধাদ্বন্দ্ব ভয় নিয়ে কোনো বৃহৎ কাজ সম্ভব নয়। তাই কবি স্বদেশব্রতের কাজে যাদের পিছুটান রয়েছে তাদেরকে এ পথে না আসারই পরামর্শ দিয়েছেন অতি সহজ সুরে ও বাণীর সম্মিলনে। এ গান যেন প্রতিদিনের জীবন যুদ্ধের ইঙ্গিতবাহী বক্তব্য। মনের মধ্যে শঙ্কা থাকলে সেই কাজের পরিণতি শুভ হয় না। বরং একজনের ভয় অন্যের মনে দ্বিধার সঞ্চার করতে পারে। নিজ থেকে শক্তি অনুভব না করলে, প্রাণ দানের উচ্ছ্বাস-সুখ উপলব্ধি না করতে পারলে বৃথা কালক্ষেপন ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাই কবি মহৎ কাজে আত্মনিবেদনে দ্বিধা থাকলে তাদের ফিরে যেতে বলেছেন এই গানটিতে।

১১.

"আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে ?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙ্গে পড়িস না রে ॥"[৭৬]

স্বদেশচেতনার এক সাহসী রূপ পাওয়া যায় এ গানটিতে। কবি সকলকে উঠে দাঁড়াতে বলেছেন। নিজের শক্তি উপলব্ধি না করলে তা অন্যের মাঝে সঞ্চার করা সম্ভব না। ভয়, শঙ্কা, লজ্জা থেকে কবি নিজেকে জয় করতে বলেছেন। তবেই সকলে বৃহৎ কাজে বিশ্বাসী হবে, উদ্যোগী হবে। কবি পিছন পানে ফিরে তাকাতে নিষেধ করেছেন। কারণ মায়ার মরীচিকায় ঘেরা যে পৃথিবী তাতে কেবল পায়ে

বেড়ি পড়বে। তাই সকলকে পথে ডাকতে হলে আগে নিজেকে ঘরের বাহির করতে হবে। 'স্বদেশ' শব্দটি সরাসরি উল্লেখ না করে কবি কী অপরূপ ভঙ্গিমায় আত্মজাগরণসহ ঐক্যের আহ্বানের কথা বলেছেন এই গানটিতে।

১২.

"সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে ॥"[৭৭]

দেশপ্রেমের এক অনন্য গান এটি। ভৈরবী রাগের সুরের আবেশে দেশমাতার প্রতি এক করুণ আকুতি রয়েছে এই গানটি জুড়ে। হৃদয় নিঃসৃত গভীর আবেগে সকলের মন স্তম্ভিত হয় এই গানটির সুর কানে এলে। ১৯০৫ সালের শরতে এই গানটি রচিত হলেও আজো এর নিবেদনে দেশমাতার জন্য প্রাণ কেঁদে ওঠে। ১৯০৮-০৯ সালের একটি ঘটনা এ ক্ষেত্রে উল্লেখ করা যেতে পারে। ২৬ মার্চ ১৯০৯ এর একটি মামলার ১১৩তম দিনের আদালতের ঘটনাটি *দ্য বেঙ্গলী* পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর বঙ্গানুবাদ করা অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো :

> "ধর্মাধিকরণের কার্য্য তখনও আরম্ভ হয় নাই; আসামীদিগের হাতকড়ি খোলা হয় নাই, প্রহরীদিগের বুটের শব্দ থামে নাই–এমন সময় কয়েদীদিগের খাঁচা হইতে একটি উচ্চ কিন্তু মধুর কণ্ঠস্বর নির্গত হইল। বিচারকক্ষের সমস্ত গোলমাল এক লহমায় স্তব্ধ হইল, এমনকি বারান্দার কোলাহলও নিস্তব্ধ হইয়া গেল। ইয়োরোপীয় সার্জেন্টগণের কর্ণে ভারতীয় সুর মাধুর্য্য বর্ষণ করে না, কিন্তু তাহারাও একাগ্র হইয়া সেই মধুর কণ্ঠনিঃসৃত মধুর সংগীত শ্রবণ করিতে লাগিল :
>
> সার্থক জনম আমার, জন্মেছি এই দেশে ॥"[৭৮]

রবীন্দ্রনাথের এ গান নিয়ে বহু আলোচনা রয়েছে। *রবীন্দ্রস্মৃতি* গ্রন্থে আরো একটি ঘটনার বর্ণনা আলোচনাকে আরো প্রাসঙ্গিক করে তুলবে।

> "এই ঘটনার তেত্রিশ বছর পরে বনফুল শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথকে দেখতে, স্মৃতিচারণ করেছেন তাঁর রবীন্দ্রস্মৃতি গ্রন্থে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন হয়েছিল এই রকম :
>
> --আমার গান শুনবে ? আমি এখনও গাইতে পারি, তবে আস্তে আস্তে, গুনগুন করে গাই। বল ত শুনিয়ে দিতে পারি এখনই। কুণ্ঠিত কণ্ঠে বললাম, আপনার কষ্ট হবে না ত ?
>
> না। কোনটা গাইব বল। আপনার যেটা খুশি। আমি আর কী বলব।
>
> রবীন্দ্রনাথ শোনালেন 'সার্থক জনম আমার'। মনে হয়েছিল যেন একটি তীক্ষ্ণকণ্ঠ ভ্রমর সুরের অদ্ভুত মায়াজাল সৃজন করে চলে গেল।
>
> গান শেষ হলে দুজনেই চুপ করে বসে রইলাম কিছুক্ষণ।"[৭৯]

১৩.

"আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে ॥"[৮০]

১৪.

"আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি।
চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি ॥"[৮১]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত গানসমূহের মধ্যে এই গানটি কবির সার্থকতম রচনা বলে বিবেচিত। ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে এই গানটি টাউন হলে গাওয়া হয়েছিল। এই গানটিতে সোনার বাংলার অপরূপ রূপের বর্ণনা করে কবি মায়ের আঁচলের কোমলতাকে শিলাইদহ অঞ্চলের বাউল গগন হরকরার গানের মাটির সুরের সাথে বিলীন করেছেন। এর মূল গান–

"আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।
হারায়ে সেই মানুষে, তার উদ্দেশে দেশ-বিদেশে বেড়াই ঘুরে;
কোথায় পাব তারে, আমার মনের মানুষ যে রে॥"[৮২]

এ গানের কথা অত্যন্ত সজহ হওয়া সত্যেও এর সুরে ও বাণীর সমন্বয়ে এক অপূর্ব উজ্জ্বল জ্যোতির সৃষ্টি করে যা শ্রোতার অন্তরাত্মাকে ছুঁয়ে যায়; হৃদয়কে দোলায়িত করে এক অজানা মনের মানুষের সন্ধানে। রবীন্দ্রমনে বিস্ময় সৃষ্টি করে বাউল গগন হরকরার এ গান। যার ফলশ্রুতি এ অনবদ্য সৃষ্টি আমার সোনার বাংলা গানটি।

পরবর্তীকালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর এই গানটির দুটি স্তবক জাতীয় সংগীতের মর্যাদা পায়। বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোনো প্রান্তেই স্বদেশ পর্যায়ের এই গানটি বেজে উঠলে সকলে দাঁড়িয়ে এর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাংলার প্রতিটি মানুষ এই জাতীয় সংগীতে উল্লেখিত স্বদেশ 'মা'কে নিজের মায়ের মতো ভালোবাসে। একটি গানের কত শক্তি থাকতে পারে তা 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' বলবার সাথে সাথে অন্তরে যে শীতলতা অনুভব হয় তার উপলব্ধি আর অন্য কিছুতে সম্ভব নয়। বাংলার লোকায়ত সুরের সাথে এর মা-মাটির রূপের যে বর্ণনা কবি করেছেন তা ছবির মতো চোখের সামনে ভেসে ওঠে এবং প্রতিটি সন্তানকে অশ্রুসিক্ত করে। প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে যেকোনো সংকটে এর সম্মান রক্ষায়।

জীবনের ঝরাপাতা থেকে সরলা দেবী'র মন্তব্য–

> "কর্তাদাদামহাশয় চুঁচুড়ায় থাকতে তাঁর ওখানে মাঝে মাঝে থাকবার অবসরে তাঁর বোটের মাঝির কাছ থেকে অনেক বাউলের গান আদায় করেছিলুম। যা কিছু শিখতুম তাই রবিমামাকে শোনাবার জন্য প্রাণ ব্যস্ত থাকত--তাঁর মত সমঝদার আর কেউ ছিলো না। যেমন যেমন আমি শোনাতুম-অমনি অমনি তিনি সেই সুর ভেঙে, কখনো কখনো তার কথাগুলিরও কাছাকাছি দিয়ে গিয়ে এক একখানি নিজের গান রচনা করতেন। 'কোন আলোকে প্রাণের প্রদীপ...', 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে...', 'আমার সোনার বাংলা...' প্রভৃতি অনেক গান সেই মাঝির কাছ থেকে আহরিত আমার সুরে বসান।...
>
> প্রশান্তকুমার পাল অনুমান করেছেন, বঙ্গভঙ্গের নির্দিষ্ট তারিখটি জানতে পারার তাৎক্ষণিক আবেগে গানটি রচিত হয় ও ভক্তদের সূত্রে সমগ্র কলকাতায় ছড়িয়ে পড়ে।
>
> তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথ তখন সপরিবারে গিরিডিতে বাস করতেন। সেখানে থাকাকালীন সময়ে তিনি ২২/২৩টি গান রচনা করেন, যেগুলি আজ স্বদেশী গান নামে পরিচিত। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই গানগুলি সেসময় বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র স্থাপিত হলে এই গানটির প্রথম দশ পঙ্ক্তি জাতীয় সংগীত হিসেবে গৃহীত হয়েছে।"[৮৩]

১৫.

"ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা।
তোমাতে বিশ্বময়ীর, তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা ॥"[৮৪]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গানে আরেকটি বিষয় খুব স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে তা হলো আন্তর্জাতিকতা। তাঁর অনেক স্বদেশভাবনার গানেই স্বদেশচেতনা মিশেছে বিশ্বচেতনার সাথে। দেশকে ভালোবেসেছিলেন বলে তিনি বিশ্বকে আপন করতে পেরেছিলেন। তাই তাঁর প্রতিটি গান সর্বকালের ভৌগোলিক সীমারেখা পেরিয়ে পৃথিবীর সব দেশের সব সময়ের। স্বদেশ বিশ্বেরই একটি অংশ, বিশ্বমাতার এক খণ্ড রূপ। তাই তিনি স্বভূমিকে প্রণতি জানিয়েছিলেন বিশ্বজননীর পাতা আঁচলের আশ্রয়ে রেখে। অন্যদিকে তিনি বিশ্বমাতাকে প্রণাম জানিয়েছেন দেশমাতাকে প্রণতি নিবেদনের মধ্যদিয়ে। এ প্রসঙ্গে অমল মুখোপাধ্যায়ের অভিমত স্মরণ করা যায় : 'সন্তানের শিরায় শিরায় প্রবাহিত রক্ত ধারায় থাকে মায়ের নাড়ীর টান, মাতৃসত্ত্বার সপ্রাণ অনুভব তাঁর শরীর জুড়ে। দেশমাতাও তেমনি মিশে আছেন কবির সমগ্র সত্ত্বায় প্রাণে মনে। বঙ্গমাতার শ্যামল-কোমল মূর্তি কবির নয়নে, কবির অন্তরে চির জাগ্রত।'[৮৫] এ মাটিকে কবি সর্বং সহা মাতৃরূপে তুলনা করেছেন। সকল মায়ের যে 'মা' সেই তো স্বদেশ। কোটি সন্তানের অনাচার কদাচারের ভার বহন করে চলেছে এই মাটি অথচ কোনো প্রতিবাদের প্রত্যাশা নেই চিরায়ত মায়েরই মতন। কবি স্বদেশের এই মাটির প্রতি ঋণী। কিন্তু কবি শঙ্কিত-লজ্জিত যে, শক্তিদাতা ও জীবনদাতার সকল দানই বুঝি বৃথা যায়। কবির একমাত্র প্রার্থনা এই মাটিতে যে মায়ের কোলে জন্ম লাভ করেছেন যেন সেই মাটিতেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাই বারংবার এই মাটিকে নানা উপমায় তিনি প্রণতি জানিয়ে গেছেন।

১৬.

"ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে–ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে–ওরে ভাই ॥"[৮৬]

তুলনামূলকভাবে স্বল্প শ্রুত অনবদ্য এই গানটির মধ্যে কবি অন্তরাত্মার সংযোগের কথা বলতে চেয়েছেন। যা কিছু দেখা যায় তাই সঠিক দেখা নয়; অন্তরের রূপটি কবি দর্শন করতে বলেছেন সর্বাগ্রে। আত্মসংযমই যথার্থ ব্রত। তাই নিজের চলার পথে দ্বিধা বিভক্ত না হতে, আপন কাজে শঙ্কামুক্ত হয়ে একাগ্রচিত্তে এগিয়ে যাওয়ার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি।

১৭.

"নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে ॥"[৮৭]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সময়কার আরেকটি অসাধারণ উদ্দীপনার গান এটি। নিজের বিশ্বাসের উপর আশ্বস্ত হলে ইতিবাচক বিশ্বাসই পারে প্রাপ্তির সীমানায় পৌঁছে দিতে। যেখানে বিশ্বাসে পাথরেও প্রাণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব সেখানে দেশমাতৃকার সেবায় ঐক্যের ডাকে সকলে যোগ দেবে একই পথের পথিক হয়ে, এটিই কবির প্রার্থনা। মুক্তির পণই কেবল মুক্ত করতে পারে তাই কবি ভরসা রাখতে বলেছেন।

১৮.

"বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই ॥"[৮৮]

অসাধারণ এ গানে কবি স্বীয় চিত্তে স্থির হতে আহ্বান জানিয়েছেন। মনের সকল অস্থিরতাকে সংবরণ করে বুক বেঁধে কঠিন সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। সিদ্ধান্তের অস্থিরতায় অনেক প্রাপ্য বিষয় দুষ্প্রাপ্যে পরিণত হয়। একবার নেয়া সিদ্ধান্তে অটল থাকতে হবে। আশার ফল নাইবা ফলে তবুও অবিচল থাকতে হবে। কারণ কর্মই মূল। দ্বিধাদ্বন্দ্বে বেলা ফুরায়ে গেলে তখন কৃতকর্মের কোনো সফলতা আসে না।

১৯.

"আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ॥"[৮৯]

অদ্ভুত সুন্দর শক্তি সঞ্চারক এই গানটিতে অন্তরের সাড়া মেলে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের এত বছর পরেও এ গান মনে উদ্দীপনার শক্তি সঞ্চার করে। 'দু'বেলা মরার আগে মরবো না'–এই কথাটির মধ্যদিয়ে কবি মৃত্যুকে তুচ্ছ করেছেন জীবন সংগ্রামের কাছে। এই জীবনযুদ্ধে প্রতিনিয়ত বাধার সম্মুখীন হতে হবে। তাই বলে বাধাকে ভয় পেয়ে ফিরে গেলে চলবে না, একে অতিক্রম করতে হবে। কোনো বড় সাধনার ধন সহজে পাওয়া যায় না। তারজন্য কঠিন তপস্যার প্রয়োজন। প্রয়োজন জীবনধর্মকে দীক্ষা করে সকল বিপদ তুচ্ছ করে সম্মুখে এগিয়ে যাওয়ার দৃঢ়চারণা।

২০.

"ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥"[৯০]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় রচিত স্বদেশি সংগীত বলে পরিচিত না হলেও এই গানটির আবেদন একটি স্বদেশচেতনামূলক সংগীতের সম-মর্যাদার দাবিদার। রবীন্দ্রনাথ বাউল দর্শনে মুগ্ধ ছিলেন। তাই বাউলদের মতো রবীন্দ্রনাথও সারাজীবন সহজ কথায় জীবনের কঠিন সমস্যার সমাধান খুঁজেছেন তাঁর গানে। তাই তাঁর গান সকলের প্রাণের গান, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। রবীন্দ্রনাথ এই গানটিতে 'জোনাকি' চরিত্রটির মাধ্যমে রূপক বৈশিষ্ট্যে আমাদের জীবনের অর্থ বোঝাতে চেয়েছেন। ক্ষুদ্র একটি প্রাণী জোনাকি অথচ এর আলোক বিকিরণের যে ক্ষমতা তা তার ক্ষুদ্রতাকে নয় তার বিশালতাকে প্রকাশ করে। বিকিরণের এই প্রয়াসকে কবি মানবজীবনের আত্মিক উত্তরণের সাথে তুলনা করতে চেয়েছেন। এ যেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকামী মুক্তিকামী অসহায় মানুষের অন্তঃআগুনের উজ্জ্বলরূপের প্রতিকৃতি।

২১.

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল–
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান ॥"[৯১]

স্বদেশ মাতৃকার জন্য রচিত বিখ্যাত এই গানটি নিয়ে এ অধ্যায়ের অন্যত্র বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গচ্ছেদ ঘোষণার সাথে সাথে বাংলাময় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। সাধারণ জনতার সাথে রবীন্দ্রনাথও পথে নেমে এলেন বঙ্গভঙ্গ রদের দাবিতে। রবীন্দ্রনাথের তখন এক গগনচুম্বী রূপ। দিবসটি তিনি রাখি-বন্ধের ও অরন্ধনের দিবস হিসেবে পালনের ঘোষণা দিলেন। সকলের সঙ্গে

মিলে কবি উদাত্ত সুরে গাইলেন সেই গান। এ বিষয়ে 'ঘরোয়া'তে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে স্মৃতিচারণ অংশ তা তুলে ধরা হলো :

> "রবিকাকা একদিন বললেন, রাখীবন্ধন উৎসব করতে হবে আমাদের, সবার হাতে হাতে রাখী পরাতে হবে।... ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গায় স্নান করে সবার হাতে রাখী পরাব।... রবিকাকা বললেন, সবাই হেঁটে যাব, গাড়িঘোড়া নয়। কী বিপদ, আমার আবার হাঁটাহাঁটি ভালো লাগে না। কিন্তু রবিকাকার পাল্লায় পড়েছি, তিনি তো কিছু শুনবেন না। কী আর করি–হেঁটে যেতেই যখন হবে...রওনা হলুম সবাই গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে, রাস্তার দুধারে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে ফুটপাত অবধি লোক দাঁড়িয়ে গেছে–মেয়েরা খৈ ছড়াচ্ছে, শাঁক বাজাচ্ছে মহা ধুমধাম–যেন একটা শোভাযাত্রা। দিনুও ছিলো সঙ্গে, গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলল–
>
> বাংলার মাটি, বাংলার জল,
> বাংলার বায়ু, বাংলার ফল।
>
> এই গানটি সে সময়েই তৈরি হয়েছিল। ঘাটে সকাল থেকে লোকে লোকারণ্য, রবিকাকাকে দেখবার জন্য আমাদের চারদিকে ভিড় জমে গেল। গান সারা হল–সঙ্গে নেওয়া হয়েছিল একগাদা রাখী, সবাই এ ওর হাতে রাখী পরালুম। অন্যরা যারা কাছাকাছি ছিলো তাদেরও রাখী পরানো হল।... পাথুরেঘাটা দিয়ে আসছি, দেখি বীরু মল্লিকের আস্তাবলে কতকগুলো সহিস ঘোড়া মলছে, হঠাৎ রবিকাকারা ধাঁ করে বেঁকে গিয়ে ওদের হাতে রাখী পরিয়ে দিলেন। ভাবলুম রবিকাকারা করলেন কী, ওরা যে মুসলমান, মুসলমানকে রাখী পরালে– এইবার একটা মারপিট হবে। মারপিট আর হবে কী। রাখী পরিয়ে আবার কোলাকুলি, সহিসগুলো তো হতভম্ব, কাণ্ড দেখে।...
>
> রাখীবন্ধনের প্রস্তাব গৃহীত হয় সম্ভবত ২৭ সেপ্টেম্বর ১৯০৫ তারিখে অক্রুর দত্ত লেনে 'সাবিত্রী লাইব্রেরি স্বধর্মসাধন সমিতি'র সভায়; রবীন্দ্রনাথ সভাপতিত্ব করেন, এবং এই প্রস্তাব উপলক্ষে গানটি রচনা করেন। গানটি 'রাখী সংগীত' নামেই প্রথম মুদ্রিত হয়।"[৯২]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান বাংলার প্রাণকে যেভাবে আন্দোলিত করেছিল বড় বড় জনসভায়, অনেক বড় বড় রাজনৈতিক নেতাদের বক্তব্যেও তা সম্ভবপর হয়নি। অতুলপ্রসাদ সেন এ সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন:

> "রবীন্দ্রনাথে স্বদেশ সংগীতের উল্লেখ করিতে গিয়া মনে হইতেছে বঙ্গ বিভক্তি ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তাঁহার জাতীয় সংগীতের প্রভাব। সে সময়কার গানগুলি বঙ্গভাষার ও বাঙালির প্রাণে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। আমার বোধ হয় সে সময় বঙ্গদেশে যে দেশপ্রীতির স্রোত বহিয়াছিল তাহার উৎস রবীন্দ্রনাথের গান। বাংলার ঘরে ঘরে শুনা যাইত 'আমার সোনার বাংলা'। পথে পথে শুনা যাইত–'বাংলার মাটি, বাংলার জল।"[৯৩]

২২.

"বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান–
তুমি কি এমনি শক্তিমান!"[৯৪]

অনন্য সুন্দর এই গানটিও রাখীবন্ধনকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছিল। সকল বাঙালি এক থাকবে, এক পথে হাঁটবে এ যেন বিধাতারই বিধান। বঙ্গচ্ছেদ অশুভ শক্তির চক্রান্ত একে প্রতিহত করতেই হবে, এই বিশ্বাসে কবির আহ্বানে সেদিন সকল বাঙালির মনে ঐক্যের ডাক ধ্বনিত হয়। চিরকাল কাউকে অবদমিত করে রাখা যায় না, একদিন সত্য সূর্যকিরণ সকল অশুভকে ম্লান করে, ধ্বংস করে।

অবদমিত দুর্বল সকল চিত্ত সেদিন জেগে ওঠে। কারণ তাদের প্রাণে থাকে সত্য সুন্দরের স্বপ্ন, স্বদেশ মুক্তির প্রতিজ্ঞা। নিরীহ মানুষের অত্যাচারের পাপে জরাজীর্ণ অশুভ শক্তির বিনাশ একদিন হবেই এই বিশ্বাসই এই গানটির মূল প্রতিপাদ্য।

২৩.

"ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে, মোদের ততই বাঁধন টুটবে,
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে, ততই মোদের আঁখি ফুটবে ॥"[৯৫]

গিরিডি থেকে ট্রেনে যাত্রা পথে গানটি রচনা করেন কবি। ঐক্যের শক্তি যখনই মজবুত হবে শত্রু তখনই দুর্বল হবে। বন্দিদশা থেকে উত্তরণের একমাত্র পন্থা অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে আত্মশক্তির উপলব্ধি। এই সকল গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সেই কাজটিই করেছে সঙ্গোপনে। রাখীবন্ধনের দিন যে জনস্রোত 'ভাই ভাই' রবে সকলে পথে নেমেছিল, তাদের উদ্দীপ্ত করেছিল এই সকল গান। কেবল স্বপ্ন দেখে নষ্ট করবার সময় আর নেই; পথে নেমে কাজ করতে হবে। বাউলের সুরে এমন আকুল করা জাগরণের বাণী এর পূর্বে কোনো কবিকে বলতে শোনা যায়নি। সহজ ও সত্য কথায় সেদিন যে বিশ্বাস মনে বপন করেছিল সকল বাঙালির চিত্তে তা আজো অম্লান। এ যেন চিরদিনের গান। শত্রু বার বার হানা দিবে আঙ্গিনায় এবং এমনিভাবে রবীন্দ্রবাণী আমাদের প্রাণিত করবে, শক্তি দেবে ঐক্যবদ্ধ হবার প্রেরণায়।

২৪.

"আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার ॥"[৯৬]

গিরিডিতে অবস্থানকালীন সময়ে এ গানটি রচনা করেন কবি। এটি ১২ অক্টোবর ১৯০৫-এ কবির স্বাক্ষরসহ বঙ্গজীবনী পত্রিকাতে প্রকাশিত হয়।

২৫.

"এখন আর দেরি নয়, ধর্ গো তোরা হাতে হাতে ধর্ গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ ॥"[৯৭]

শোনা যায় দুর্গা পূজার সময়ে ১৯০৫-এর অক্টোবর থেকে নভেম্বরের কোনো এক দিন গানটি রচিত হয়। পরবর্তীকালে শৈলজারঞ্জন মজুমদার স্বরলিপি তৈরী করেন। বঙ্গভঙ্গকালীন উত্তাল সময়কে কেন্দ্র করে স্বাদেশিকতা ও জাতীয় ব্রতচারণায় কবি যে ২৫টি গান রচনা করেন তার ২০টি গানই 'বাউল' গ্রন্থে সংকলিত হয়। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও গীত সংকলনেও এই সকল বাউল ও রাখীসংগীতগুলো বারবার প্রকাশিত হয়। উল্লেখ যে, ১৯০৮ সালে যোগীন্দ্রনাথ সরকার কর্তৃক সংকলিত *গান* গ্রন্থে পূর্বের ২০টি বাউল গান এবং ১৬টি জাতীয় সংগীত নামে নির্বাচিত স্বদেশি গান মুদ্রিত হয়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বের এই ২৫টি গানে রয়েছে সরল সহজিয়া লোকসুর ও সহজ কথার মিশেল। সহজ সুর-ছন্দ সহযোগেই কেবল জনসাধারণের মর্মমূলে আঘাত করে স্বদেশের প্রতি লুকায়িত প্রেমানুভূতি জাগরণের কাজটি সহজ করে তোলা সম্ভব। এই বাউল ও রাখীসংগীতগুলোতে বাউল, কীর্তন ও লোকসুরের প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপ্রীতির যে জোয়ার এনেছিলেন তা পরবর্তীকালে সময়ে রচিত

স্বদেশ গানেও পরিলক্ষিত হয়। সুরপ্রয়োগ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে স্বদেশসংগীতের সুর পর্যালোচনা বিষয়ক অংশে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বের আগে অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের ৪৩তম বছর বয়স পর্যন্ত ২৩/২৪টি স্বদেশসংগীত পাওয়া যায়। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালীন সময়ে অর্থাৎ তাঁর ৪৪ বছর বয়সেই তিনি রচনা করেন ২৫টি গান। যার প্রতিটি গানই কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে রচিত হলেও তা সর্বকালীন প্রভাব বিস্তার করে, দেশ-জাতি-কালকে অতিক্রম করে।

স্বদেশি গান রচনার ভাটাকাল

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯১১ সালের পরে দেশাত্মবোধক গানের ধারা সংকুচিত হয়ে আসে। ড. করুণাময় গোস্বামীর *নজরুলগীতি প্রসঙ্গে* (পৃ. ১১৯) গ্রন্থের তথ্যানুসারে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে (১৯০৫-১৯১১) কেন্দ্র করে যে বিপুল সংখ্যক গান রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, মুকুন্দ দাস, প্রমথ নাথ রায় চৌধুরী, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, অমৃতলাল বসু, অশ্বিনীকুমার দত্ত, সরলা দেবী চৌধুরানী, মনোমোহন চক্রবর্তী, বাসিনীকুমার ভট্টাচার্য প্রমুখ কর্তৃক তা ১৯১১ সালের পরে আর বিশেষ ডালপালা মেলে ধরেনি। তখন স্বদেশি গানের ভাণ্ডারে এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে মুখ্যসংগীত রচয়িতাদের অকালপ্রয়াণ এবং আন্দোলনের গতিধারার পরিবর্তন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ১৯০৭ সালে, রজনীকান্ত সেন ১৯১০ সালে ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ১৯১৩ সালে পরলোক গমন করেন।

এই অকালমৃত্যু একটি বড় বিপর্যয় ডেকে আনে স্বদেশি গান রচনার ক্ষেত্রে। অন্যদিকে অতুলপ্রসাদ সেন মূলত প্রেমসংগীতের দিকে ঝুঁকে পড়েন। এখানে উল্লেখ্য যে, স্বদেশি গান রচনার যে মূল স্তম্ভ, রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গের পরে আর স্বদেশি গান তেমন রচনা করেননি। তিনি নানা কারণে স্বদেশি গানের ধারা থেকে সরে দাঁড়ান। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের গতি ও ভাবনাকে রবীন্দ্রনাথ মনেপ্রাণে সমর্থন করতে পারছিলেন না বলেই তিনি স্বদেশি গান রচনার উৎসাহ হারিয়ে ফেলেছিলেন।

এছাড়া রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র বিপ্লবের যে ধারা শুরু হয় তা মানবতার আর আত্মমুক্তির চিন্তায় বিভোর রবীন্দ্রনাথ তাকে সমর্থন দিতে পারেনি। তিনি নিজেকে নিভৃত আলোর রচনাশৈলীতে নিমগ্ন হন এবং নিয়োজিত হন শান্তিনিকেতন প্রতিষ্ঠার কাজে। এ সময়ে তিনি যে কয়টি আত্মজাগরণমূলক গান রচনা করেছেন তার সবটাই কোনো- না- কোনো অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। স্বদেশের প্রতি অনুরাগ সেখানে মুখ্য নয়। কারণ কবির ভাবনা তখন মিশেছিল বিশ্বভাবনার সাথে। বিশ্বঘরে পদার্পিত কবির কাছে দেশ বিশ্বেরই একটি অংশ। এই বিশ্বকে আলিঙ্গনের মধ্যদিয়ে তিনি দেশকে আপন করেছেন।

স্বদেশপর্বের গান রচনার এই ভাটালগ্নে কেবল মুকুন্দ দাস সক্রিয় ভূমিকায় ছিলেন। অসহযোগ আন্দোলন ও দেশাত্মবোধের ভাবনাকে তিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দেন তাঁর যাত্রা ও গানের মধ্যদিয়ে।

যদিও সামগ্রিকভাবে অন্যান্য অনুষঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশবোধটি তুলে ধরবার প্রয়াস রয়েছে যেমন, তেমনি অন্যান্য পর্যায়ের গানসহ জীবনের শেষ সময় পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান বা উৎসবকে কেন্দ্র করে তাঁর রচিত স্বদেশ ভাবনার গানে স্বদেশ চেতনার বোধটিকে নিংড়ে নেবার চেষ্টা করা হয়েছে অবচেতনায়। এখানে উল্লেখ করা অবশ্য প্রাসঙ্গিক যে, বঙ্গভঙ্গের পর থেকে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশভাবনা ও জাতীয়তাবাদ বিষয়টি থেকে নিজেকে সরিয়ে দেন। যে সকল গান তিনি বঙ্গভঙ্গের পর রচনা করেছেন তার সবটাই মূলত কোনো উৎসব বা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে রচিত। যেখানে স্বাদেশিকতাবোধ বা জাতীয়তাবোধের উল্লেখ নেই। কারণ সেই সময় রবীন্দ্রনাথের প্রাণ মিশেছিল বিশ্বচেতনায়। সমগ্র বিশ্বকে একটি বিন্দুতে তিনি কল্পনায় মত্ত ছিলেন। তাঁর রচনার উদাহরণে বলতে পারি–

"বিশ্বসাথে যোগে যেথায় বিহারো
সেইখানে যোগ তোমার সাথে আমারো।"[৭৮]

এই বিশ্বযোগে কবির কাছে কেবল স্বদেশের ভাবনা থেকে বিশ্বভাবনায় পরিণতি লাভ করে। সমগ্র বিশ্বকে আপন করে তিনি নিজের দেশ, নিজের ভাষা ও সংস্কৃতিকে বিশ্ববাসীতে ছড়িয়ে দিতে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। একের পর এক গানে সকল বন্ধন ছিন্ন করবার আয়োজন। তাই নোবেল জয়ী বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ সমগ্র বাঙালি জাতিকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরতে পেরেছিলেন। তিনি যা শুরু করেছিলেন তাই আমরা অগ্রসরে ব্যস্ত আছি কেবল। একজন রবীন্দ্রনাথের জন্ম যদি এ বাংলায় না হতো, বাঙালি আরো শতবর্ষ পিছিয়ে থাকতো। তাই বিশ্বভাণ্ডারের অমূল্য সম্পদ এই কবিকে, কবির সৃষ্টিকে তাঁর প্রিয় জন্মভূমিকে শ্রদ্ধাভরে প্রণতি জানাই।

বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে রচিত স্বদেশি গান

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালীন সময়ে স্বদেশি গান রচনার বিপুল উত্তেজনার পর রবীন্দ্রনাথ অনেকটা দমে যান। সংকীর্ণ মানসিকতা ও রাজনৈতিক দলাদলি তাঁকে আহত করে। দুর্বলকে ব্যবহার করে সবলের স্বার্থসিদ্ধির ইঙ্গিত যখন তিনি রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে আন্দাজ করতে পারলেন তখন নিঃশব্দে ক্ষুণ্ন মন নিয়ে সরে এলেন সে প্রাঙ্গণ থেকে। সরাসরি সম্পৃক্ত না থাকলেও নেপথ্যে থেকে দেশ ও জাতির কল্যাণের স্বার্থে স্বদেশসাধনা ও ভাবনার সাথে জড়িত থাকলেন। কিন্তু দেশাত্মবোধক বা স্বদেশপর্বের গান রচনার মনোভূমি প্রায় শুকিয়ে যায়। তাই বঙ্গভঙ্গ পরবর্তীকালে অর্থাৎ তাঁর ৪৮ বছর বয়স থেকে শেষ জীবন পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি মাত্র ১৫/১৬টি স্বদেশপর্বের গান রচনা করেন। বিভিন্ন উৎসবের প্রয়োজনে নাটক বা অন্যকোনো উপলক্ষ্যে গানগুলো রচিত হলেও এদের মূল্যও অনেক। কবির বয়সের কালানুক্রমিক হিসেব অনুযায়ী পরিণত জীবন পর্যন্ত রচিত স্বদেশপর্বের গান নিয়ে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

৪৮ বছর বয়সের রচনা :

"রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে ?
তোমার টানাটানি টিকবে না ভাই, রবার যেটা সেটাই রবে ॥"[৯৯]

অসাধারণ বাউল সুরের এই গানটি রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ সময়ের প্রায় ৩ বছর পর রচনা করেন। এই মধ্যবর্তীকালীন সময়ে তিনি কোনো স্বদেশপর্বের গান রচনা করেননি। এই গানটি তিনি রচনা করেন 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের ধনঞ্জয়ের চরিত্রের জন্য। উপলক্ষ্য যেটাই হোক না কেন জীবন সত্য উপলব্ধির একটি যথার্থ গান এটি। পরবর্তীকালে স্বদেশপর্বের গান হিসেবে সংযুক্ত করা হয়। 'গান', 'মুক্তধারা', 'পরিত্রাণ' প্রভৃতি গ্রন্থে এর সংকলন করা হয়।

৪৯ বছর বয়সের রচনা :

"হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।"[১০০]

"বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্ব থেকে যে সহজ সরল সুর ও বাণীর আশ্রয়ে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছিলেন এই গানটি তার ব্যতিক্রমী উদাহরণ। কবি বোলপুরে বসে ১৩১৭ সনের ১৮ আষাঢ় গানটি রচনা করেন। ভারততীর্থ কবিতার গীতরূপ এই গানটি। এতে সর্বমানবের মিলনতীর্থ হিসেবে ভারতভূমির বন্দনা করা হয়েছে। অপূর্ব এই গানটি সুরের চলনে ও বাণীর সমন্বয়ে ভারতমাতার পুণ্যভূমির একটি স্তুতিমন্ত্র যেন। আর্য-অনার্য, হিন্দু-মুসলমান, ইংরেজ-খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ-পতিত সকলকে এই পুণ্যতীর্থে আহ্বান করেছেন কবি। সকলের স্পর্শেই এই পুণ্যভূমি স্বার্থক হবে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা, বিশ্বচেতনা ও উদার ধর্মচেতনাবোধ–এই গানটিতে একাকার হয়ে গেছে। এটি গীতাঞ্জলির ১০৬ সংখ্যক কবিতা। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকাতে এই কবিতাটি বারংবার প্রকাশিত হয়। মূল কবিতার প্রথম, দ্বিতীয় ও শেষ স্তবক সুরারোপ করে গানে ব্যবহৃত হয়েছে।"[১০১]

৪৯ বছর বয়সের রচনা :

"আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে–
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?"[১০২]

সমতা প্রকাশের এক অপরূপ ভঙ্গি রয়েছে এই গানটির বাণী ও সুরের দোলাচলে। হঠাৎ একে শিশুদের গান বলে বিভ্রান্তি হতে পারে কিন্তু এরমধ্যে রয়েছে রাজতন্ত্রের নিগূঢ় সত্য। 'রাজা' নাটকে এই গানটির ব্যবহার নাটকটির বৈশিষ্ট্য প্রকাশে বিশেষ গুরুত্ব বহন করে।

৫০ বছর বয়সের রচনা :

"জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্যবিধাতা!"[১০৩]

এ গানটি ভারতের জাতীয় সংগীতের মর্যাদা লাভ করেছে। ভারতমাতার প্রাকৃতিক দানের এর সকল ঐশ্বর্যের কথা বর্ণিত হয়েছে এই গানটিতে। গাওয়া হয়েছে ভারতমাতার জয় জয়কার ধ্বনি যেখানে রয়েছে ভারতবর্ষের সকল জনগণের ঐক্যের কথা, শান্তির কথা, জয়ের কথা। অথচ অসাধারণ স্বদেশমাতৃভক্তির এ গানটিও সমালোচনার শিকার হয়। বিতর্ক ওঠে এ গানটি নিয়ে। গানটি নিয়ে নিন্দুকের ভ্রান্ত ধারণায় অহেতুক সমালোচনা করে কবিকে ব্যথিত করেন। কলকাতায় ১৯১১ সালে এই গানটি রচিত হয় মূলত ২৭তম কংগ্রেস অধিবেশনের জন্য জাতীয় নেতাদের অনুরোধে। ১৯১১ সালের

১২ ডিসেম্বর দিল্লির দরবারে বঙ্গচ্ছেদ রদ ঘোষিত হয়। বিহার, উড়িষ্যায় নতুন প্রদেশ গঠনসহ ভারতের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লিতে স্থানান্তর করার কথা ঘোষণা করা হয়। এরপর বড়দিন উৎসব উপলক্ষ্যে পঞ্চম জর্জ কলকাতা আসেন। সেই সময়ই কংগ্রেসের ২৭তম সভাটি অনুষ্ঠিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তখন কলকাতাতেই। আশুতোষ চৌধুরী প্রমুখ নেতাদের অনুরোধে অধিবেশন উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ ভারতমাতার বন্দনাস্বরূপ এই 'জনগণমন' গানটি রচনা করেন এবং ২৮ ডিসেম্বর কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে গানটি প্রথম গাওয়া হয়। কিন্তু অনেকেই একটি ভুল ও অসত্য বিষয় অনুমান করেছে। প্রচার করা হয় যে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি সম্রাটের রাজ্যাভিষেকের প্রস্তুতির জন্য রচনা করেন। ব্যথিত কবি এ বিষয়ে মনঃক্ষুণ্ন হন এবং চিঠিপত্র লেখেন। এ বিষয়ে ১৯৩৯ সালে সুধাময়ী দেবীকে কবি লেখেন, 'শাশ্বত মানব ইতিহাসের যুগ যুগ ধাবিত পথিকদের চির সারথী বলে আমি চতুর্থ বা পঞ্চম জর্জের স্তব করতে পারি, এ রকম অপরিমিত মূঢ়তা আমার সম্বন্ধে যাঁরা সন্দেহ করতে পারেন, তাঁদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়া আত্ম-অবমাননা'। এর ১৬ বছর পরে ১৯৩৬ সালের ২৮ অক্টোবর এই 'জনগণমন অধিনায়ক' গানটির মাহাত্ম্য অনুধাবন করে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি একে স্বাধীন ভারতের জাতীয় সংগীতের স্বীকৃতি দেন।

৫৬ বছর বয়সের রচনা :

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।"[১০৪]

জীবনের প্রতি মুহূর্তের রচনায় রবীন্দ্রনাথকে দেখেছি আত্ম-শক্তি উন্মোচনের সাথে বিধাতাকে সকল শক্তির আধার হিসেবে পাশে রাখতে। স্বদেশিযুগের মতো ১৯১৫ সালে ভারতবর্ষ আইন পাশ হলে অরাজকতা শুরু হয়, তাতে বিনা বিচারে কেবল সন্দেহের বশে যুবকদের বন্দী করে রাখা হয়। কথিত আছে কেবল বাংলাদেশের ১২০০ যুবককে এ আইন বলে জেলে পাঠানো হয়েছিল।

আন্দোলন চালানোর উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সম্পৃক্তের আহ্বান করা হলে প্রাদেশিক সরকার সরকারি বিদ্যায়তনের ছাত্রদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করেন। তাই সমগ্র ভারত জুড়ে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপনের ব্যবস্থা হলো। তাতেও প্রাদেশিক সরকার বাধ সাধলেন। *রবীন্দ্রজীবনী*-২ এ উল্লেখ আছে যে, অ্যানি বেসান্ট মাদ্রাজে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় খোলেন। তখন মাদ্রাজ সরকার তাঁকে এবং তাঁর দুই সহকর্মীকে অন্তরীণ করেন। এতে আন্দোলন আরো ভয়াবহ রূপ পায়।

রবীন্দ্রনাথ তিন মাস পর আমেরিকা থেকে ফিরে এই পরিস্থিতি দেখে প্রতিবাদ শুরু করেন। *বেঙ্গলি* পত্রিকায় খোলা চিঠি লিখে প্রতিবাদ জানালেন। ১৯১৭ সালের ৪ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম' প্রবন্ধটি পাঠ করেন রামমোহন লাইব্রেরি হলে এবং প্রবন্ধের অনুবাদ হিসেবেই রচিত হয় উত্তেজনা ও উদ্দীপনার এই গানটি–

"দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী।"[১০৫]

এ বিষয়ে অমল হোম তাঁর স্মৃতিকথায় লিখেছেন :

> "১৯১৭ সাল। দেশ জুড়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রবল হয়ে উঠছে। অ্যানি বেসান্টের নেতৃত্বে Home Rule for India আন্দোলনে ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত আলোড়িত। মিসেস বেসান্টকে বৃটিশ গভর্নমেন্ট করলেন ইন্টার্ন। টাউনহলে প্রতিবাদসভার আয়োজন চলেছে–গভর্নর রোনাল্ডসে জানালেন যে, মিটিং করা চলবে না। সুরেন্দ্রনাথ, চিত্তরঞ্জন, ওঁরা সব ডেপুটেশনে গেলেন লাটসাহেবের কাছে। অনেক কাকুতি মিনতির পর মিলল মিটিংয়ের অনুমতি। ইতিমধ্যে রবীন্দ্রনাথ এলেন কলকাতা, সঙ্গে নিয়ে তাঁর সেই ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ভাষণ 'কর্তার ইচ্ছায় কর্ম'। একদিন পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয় এলেন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে।... তিনি কবিকে অনুরোধ জানালেন, দেশের এই নবজাগরণের উদ্দীপনা উপলক্ষ্যের দিন তিনি যেন একটি গান বেঁধে দিন।
> পরের দিনই রচিত হলো সেই বিখ্যাত গান : 'দেশ দেশ নন্দিত করি...'।
>
> গানটি প্রথম গাওয়া হয় রামমোহন লাইব্রেরিতে এই প্রবন্ধ পাঠের দিন। দ্য ক্যালকাটা মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ প্রকাশিত Tagore Memorial Special Supplement-এ লেখা হয় :...Composed, at the request of Pandit Malaviya, his famous National song Desha Desha Nandita Kari Mandrita Taba Veri, which is sung for the first time at the meeting at Rammohan Library..."[১০৬]

৫৬ বছর বয়সের রচনা :

"মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে
বর-পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ' হে।"[১০৭]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধু ও আত্মীয় আশুতোষ চৌধুরী ও নাটোরের মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ রায়ের অনুরোধে গাইকোয়াড়ের কলকাতা আগমন উপলক্ষ্যে ১৯০৪ সালে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের জন্য গানটি রচনা করেন। তবে অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না। পূর্বেও এই গানটি সম্পর্কে অন্যত্র আলোচনা হয়েছে যে এই গানটি ভেঙে রবীন্দ্রনাথ পরে বেশ কয়েকটি গান রচনা করেছেন। একই গান ভেঙে অন্য উৎসব বা উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করে আরেকটি গান রচনার উদাহরণে এই গানটি অনন্য। যেহেতু পূর্বেও এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে বিধায় সমীর সেনগুপ্তের *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থ (পৃষ্ঠা-৯৬) থেকে ছকটি তুলে দেওয়া হলো–

সারনি : অনুষ্ঠানভেদে রূপান্তরিত গান

ক্রমিক	গান	রচনার সম	রচনার উপলক্ষ্য
১.	বঙ্গজননী মন্দিরাঙ্গন	১৯০৪	গাইকোয়াড়ের কলকাতায় সংবর্ধনা উপলক্ষ্যে
২.	মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন	১৯১৭	বসুবিজ্ঞান মন্দিরের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে
৩.	শান্তি মন্দির পুণ্য অঙ্গন	১৯২৫	ফর্মিকির শান্তিনিকেতনে আসা উপলক্ষ্যে
৪.	বিশ্ববিদ্যাতীর্থ প্রাঙ্গণে	১৯৪০	অক্সফোর্ডের সম্মানির ডি লিট উপলক্ষ্যে

উৎস : *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, সমীর সেনগুপ্তের বই থেকে গৃহীত।

৬০ বছর বয়সের রচনা :

"সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?
খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে ॥"[১০৮]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গানসমূহে যে কেবল স্বদেশ মাতৃকার স্তুতি, বন্দনা, উদ্দীপনা বা আত্মশক্তির কথা বলা হয়েছে তা নয়। এমন কিছু গান রয়েছে যেখানে জীবনের নিগূঢ় সত্য উদ্ভাসিত। বৈষয়িক জাগতিক কাজ, লোভ-লালসার মধ্যে কোনো সাধনা-র্কম সম্ভব নয়। জীবনের কোনো প্রাপ্তিই হঠাৎ হয় না। দীর্ঘদিনের তপস্যায় কেবল তা বাস্তবে রূপ পায়। ত্বরিত পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় যে সবকিছু ম্লান হতে পারে, চরম অসম্মান প্রাপ্ত হতে পারে–জীবনের এ রূঢ় সত্যটিই প্রতিফলিত হয়েছে এই গানটিতে। দেশমাতৃকাকে মুক্ত করবার প্রয়াসও একটি চরম সাধনা। এই সাধনাকে বাস্তব করতে অনেক ত্যাগ-তিতিক্ষা ও নিষ্ঠার প্রয়োজন। বহুজনের বহুদিনের তপস্যায় একটি ভূ-খণ্ডকে মুক্ত করবার মতো সত্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ১৯২২ সালে কবি শান্তিনিকেতনে বসে অসহযোগ আন্দোলনের সময় এ গানটি রচনা করেন। উল্লেখ্য যে, এই গানটির কোনো স্বরলিপি পাওয়া যায়নি।

৬৪ বছর বয়সের রচনা :

"নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার–
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার ॥"[১০৯]

জার্মানির মিউনিক শহরে লেখা ভাবোদ্দীপনার গান এটি। ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬ সালে রচিত এই গানটিতে আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন কবি। স্বদেশমাতা বন্দীদশা থেকে মুক্ত হবে এবং বিশ্বের অধিকার প্রাপ্ত হবে, কেবল ভয়শূন্য চিত্তই পারে স্বদেশমাতার জন্য এই কর্মসাধনার বাস্তব রূপ দিতে।

৬৪ বছর বয়সের রচনা :

"সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।"[১১০]

এই গানটি গাওয়া বা শ্রবণমাত্র মনের মধ্যে এক ধরনের বোধ জাগ্রত হয়। ভয়শূন্য মনে সম্মুখে এগুবার ভরসা মেলে গানটিতে। এক সুন্দর গল্প রয়েছে এই গানটি রচনার পিছনে। রবীন্দ্রনাথ সর্বদা ব্যতিক্রমকে বরণ করেছেন, নারীমুক্তি তথা মানবমুক্তির পথ উন্মোচন করতে চেয়েছেন। বিশ্বের যে স্থানেই গেছেন ভারত- বর্ষের মানুষ কী করে নিজেদের মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার উন্নতি করতে পারে তার উপায় সংগ্রহ করেছেন প্রাণভরে এবং নিজ মাটিতে তা প্রয়োগ করবার চেষ্টা করেছেন। গানটি রচিত হয়েছিল ১৯২৯ সালের ১৬-১৯ ডিসেম্বরের কোনো একদিন। সমগ্র দেশকে একা পরিবর্তন করতে পারবেন না বলেই গড়ে তুলেছিলেন শান্তিনিকেতন। সেখানে ছাত্র-ছাত্রীদের বহিঃবিশ্বের নানাবিধ বিদ্যাশিক্ষায় সুশিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছিলেন তিনি। যাতে সমগ্র ভারতবর্ষ একদিন এর সুফল পায়। তাঁর সেই স্বপ্ন বৃথা যায়নি। আজ কেবল ভারতবর্ষই নয়, সমগ্র বিশ্বের বাঙালিসহ অন্য ভাষাভাষীর কাছে রবীন্দ্রনাথ একটি বিস্ময়কর নাম।

জুডো ও জুজুৎসু কলাকৌশলের বিদ্যাটিতে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন এবং এর প্রদর্শনীও হয়েছিল কলকাতায়। কিন্তু কাজটি তত সহজ ছিলো না। এ বিষয়ে সমীর সেনগুপ্তের *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো–

> "জাপানে জুজুৎসু ও জুডো পদ্ধতির নিরস্ত্র লড়াইয়ের প্রদর্শনী দেখে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ হয়েছিলেন। অস্ত্র আইনের বেড়াজালে আবদ্ধ ভারতবাসীর হাতে একটা লাঠিও রাখা তখন নিষেধ। রবীন্দ্রনাথ ভেবেছিলেন, জুজুৎসু ভারতবাসীর অস্ত্রের অভাব ঘোচাতে পারবে। জাপানে তিনি ব্যবস্থা করে এসেছিলেন, সেই অনুযায়ী জুজুৎসু ওস্তাদ তাকাগাকি শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছেন ১৯২৯ সালের নভেম্বর মাসে। এঁর জন্যে দু'বছরে প্রায় চৌদ্দ হাজার টাকা খরচ করেছিলেন তিনি। টাকার অঙ্ক থেকে তাঁর উৎসাহের পরিমাণ আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কোনো স্থায়ী কাজ হয়নি। শ্রমবিমুখ বাঙালি মধ্যবিত্ত যুবসমাজকে, এবং লজ্জাভারক্লিষ্ট বাঙালি মধ্যবিত্ত নারীসমাজকে তিনি জুজুৎসু শিক্ষায় উৎসাহিত করতে পারেননি। তাকাগাকি আশ্রম ত্যাগ করবার সঙ্গে সঙ্গেই জুজুৎসুর চর্চা উঠে যায়। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করেছেন, 'একজন কর্মী শিখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাকে স্থায়ীভাবে রাখিবার কোনো ব্যবস্থা করা হইল না।'
>
> কলকাতায় নিউ এম্পায়ার মঞ্চে নবীন উপস্থাপিত হল পরপর চারদিন, ১৭ থেকে ২০ মার্চ ১৯৩১। তার আগে ১৬ মার্চ সেই মঞ্চেই জুজুৎসুর প্রদর্শনী হল–তাকাগাকি এবং শান্তিনিকেতনের ছাত্র-ছাত্রীরা দেখালেন। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি বেঁধে দেন।"[১১১]

উক্ত বিষয়ে তৎকালীন সময়ের ছাত্রী রমা চক্রবর্তীর বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "শান্তিনিকেতনে ছোরা খেলা, লাঠি খেলা ও জুজুৎসু (জুডো) শেখানো হত। গুরুদেব জুজুৎসু শেখাবার জন্য, জাপান থেকে সেখানকার সুবিখ্যাত একজন শিক্ষককে আনিয়েছিলেন। তাঁর নামছিলো তাকাগাকি। এসব শেখা মেয়েদেরও আবশ্যিক ছিলো। জুজুৎসু শিখতে প্রথমটা সংকোচ ও ভয় দুই-ই মনকে বেশ দুর্বল করেছিল, তা স্বীকার করি। কিন্তু শিখতে শিখতে ক্রমে সেই আড়ষ্টতা ও ভয় সব চলে গিয়েছিল। তাকাগাকির মতো বেশ শক্ত সমর্থ দশাসই মানুষকে নিমেষে উল্টে ফেলার চমক আজও মনে পড়ে। ওখানে গিয়ে শুনেছিলাম যে জুজুৎসু শিখতে মেয়েরা সংকোচ করছে জেনে, গুরুদেব "সংকোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান গানটি রচনা করেছিলেন।"[১১২]

উল্লেখ্য যে, এই গানটির অনুরূপ খানিকটা কথার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ গান রচনা করেছেন *চিত্রাঙ্গদা* নৃত্যনাট্যে। সেখানে সংকোচের স্থানে 'সংকট' শব্দটির ব্যবহার করেছেন কবি।

৭২ বছর বয়সের রচনা :

> "ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
> একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো ॥"[১১৩]

কবির এই গানটি যেকোনো বিপদে বাঙালিকে শক্তি দেয়। 'আগুন জ্বালো' কথাটিতে যে প্রতিবাদ ও উদ্দীপনার মিশ্রণ রয়েছে তা সত্যিই বিরল। বিপদ-শঙ্কা-ভয় থেকে পরিত্রাণ পেতে মনের মধ্যে আগুন জ্বালাতে হবে। সেই আগুনে সব অবজ্ঞাশক্তিকে বিনাশ করতে হবে। কবির এই গানটি *বাঁশরী* নাটকে স্থান পেয়েছে। এই নাটকের ২য় দৃশ্যের চরিত্র সোম শংকরের গান এটি।

৭৫ বছর বয়সের রচনা :

"শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গান
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।"[১১৪]

এই গানটি রচিত হয় ১৯৩৭ সালের ২৪ জানুয়ারি। *রবীন্দ্রজীবনী* ৪র্থ খণ্ডের (পৃ. ৮০) প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য মহোদয় শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কবির কাছে অনুরোধ করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী (২৭ জানুয়ারি ১৯১৭) উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ গান লিখে দেবার জন্যে। তাঁর অনুরোধে কবি 'শুভ কর্মপথে ধর' নির্ভয় গানটি লেখেন। যদিও এই অনন্য সুন্দর গানটির বদলে একই দিনে লেখা অন্য আরেকটি গান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করেন। অথচ এই গানটির আবেদন পরবর্তীকালে শ্রোতাদের কাছে বেশি গ্রহণযোগ্যতা পায় এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এই গানটি গাইতে দেখা যায়।

৭৫ বছর বয়সের রচনা :

"চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই–
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।"[১১৫]

এই গানটিও ১৯৩৭ সালে ২৪ জানুয়ারি লেখা হয় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই গান সম্পর্কে লিখেছেন :

> "কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে কবির কাছে অনুরোধ আসিয়াছে আগামী 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবস'-এর (২৭ জানুয়ারি ১৯৩৭) জন্য একটি বিশেষ গান লিখিয়া দিতে হইবে। সেই অনুরোধে কবি প্রথমে লেখেন 'শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান'ও পরে লেখেন 'চলো যাই, চলো যাই' শেষ গানটি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক নির্বাচিত হয়। শান্তিনিকেতনে কয়েক দিন এই গানের মহড়া চলে; ছাত্ররা এই গানটি শিখিয়া শ্রেণীবদ্ধভাবে শিক্ষকদের সঙ্গে অধ্যক্ষ ধীরেন্দ্রমোহন সেনের নেতৃত্বে মন্দিরে যাইত। কিন্তু এ গানটি চালু হইল না। কিন্তু 'শুভ কর্মপথে' গানটি নানা অনুষ্ঠানে গীত হইতে দেখা যায়।
>
> কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা দিবসে ছাত্ররা গানটি গাহিয়াছিল। দুঃখের বিষয় শ্যামাপ্রসাদের আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব সর্বাঙ্গীণ সুন্দর হয় নাই; কারণ মুসলমান ছাত্ররা উৎসবে যোগদান করে নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের সীল (seal)-এ 'পদ্ম' ও 'শ্রী' পৌত্তলিকতার প্রতীক বলিয়া তাহা উঠাইয়া দিবার জন্য মুসলমানরা কিছুকাল হইতে জিদ করিতেছিল। সেই আন্দোলনের অভিঘাতে প্রতিষ্ঠা দিবসের উৎসব অসম্পূর্ণ রহিয়া গেল।"[১১৬]

এই গানটি সম্পর্কে ইতিহাসবিদ সুশোভন সরকারও লিখেছেন যে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিয়ে একটি প্রসেশন করতে চান। তাই রবীন্দ্রনাথকে একটি মার্চ সং লিখে দিতে অনুরোধ করেন। প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন প্রতিটি কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকা নিয়ে কলকাতার রাস্তা দিয়ে 'চলো যাই, চলো যাই' গানটি গাইতে গাইতে ময়দানে সমবেত হলে শ্যামাপ্রসাদ ছেলেদের অভ্যর্থনা করেন।

৭৬ বছর বয়সের রচনা :

"ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে ॥"[১১৭]

একজন রবীন্দ্রনাথই পারেন ৭৬ বছর বয়সে তাঁর জীবনের শেষ স্বদেশিসংগীতে নতুন যুগের ভোরের কথা বলতে। রবীন্দ্রনাথ সবসময় যা কিছু নতুন তা বুক ভরে গ্রহণ করেছেন। অকারণ হিসেব কষে সময় পার করা, সংশয়-দ্বিধায় প্রাপ্যকে দুষ্প্রাপ্য করা কবির মনোবিরুদ্ধ ছিলো। তাই জীবনের এ পর্যায়ে এসেও কবি অজানাতে ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছেন। কবি জানেন যতই বাধা আসবে ততই জীবনের পথ প্রসারিত হবে। কারণ বাধা অতিক্রমের আনন্দে জয় অনিবার্য। সকল বাধাকে অজানাকে বুকে জড়িয়ে আলোর সন্ধান করতে হবে তবেই নতুন যুগের ভোরের সন্ধান মিলবে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালকে মধ্যমপর্ব ধরে এর পূর্বে ও পরের সময়ে এই তিনটি স্তরে রচিত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গানের তাত্ত্বিক আলোচনা করা হলো। এই আলোচনার ভিত্তিতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্যায়ের গানের একটি ইতিহাস-নির্ভর ছক প্রদান করা যায় যেখানে তা গীতবিতানের স্বদেশ ও জাতীয় সংগীত পর্যায়ের গানগুলোর সন্নিবেশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনার আভাস বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তারমধ্যে স্বদেশ পর্যায়, জাতীয় সংগীত পর্যায়, পূজা পর্যায়, বিচিত্র পর্যায় অন্যতম। উল্লেখ্য স্বদেশ পর্যায়, জাতীয় সংগীত পর্যায়ে গানের তালিকা গীতবিতানে সুন্দরভাবে সন্নিবেশ করা আছে। অন্যদিকে গবেষণার স্বার্থে পূজা পর্যায়, বিচিত্র পর্যায়ের গানের মধ্যে থেকে গভীর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে স্বদেশ চেতনামূলক গানের তালিকা নিরূপণ করা হয়েছে।

প্রথমে স্বদেশ পর্যায়ের ৪৬টি এবং জাতীয় সংগীত পর্যায়ের ১৬টি মোট ৬২টি স্বদেশচেতনামূলক গানের তালিকা নিম্নে উপস্থপন করা হলো।

বঙ্গভঙ্গ পূর্ব গান

ক্রমিক	বঙ্গভঙ্গ পূর্ব গান	কবির বয়স	পর্যায়
১.	তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ	১৬	জাতীয়
২.	অয়ি বিষাদিনি বীণা,	১৭	জাতীয়
৩.	ঢাকো রে, মুখ, চন্দ্রমা জলেদে	১৭	জাতীয়
৪.	ভারত রে তোর কলঙ্কিত	১৭	জাতীয়
৫.	একসূত্রে বাঁধিয়াছি	১৮	জাতীয়
৬.	দেশে দেশে ভ্রমি তব	২০	জাতীয়
৭.	একি অন্ধকার এ ভারতভূমি	২৩	জাতীয়
৮.	শোন শোন আমাদের ব্যথা	২৩	জাতীয়
৯.	একবার তোরা মা বলিয়া ডাক	২৪	জাতীয়
১০.	কেন চেয়ে আছো গো মা	২৫	জাতীয়
১১.	আমার বলো না গাহিতে বলো না	২৫	স্বদেশ

ক্রমিক	বঙ্গভঙ্গ পূর্ব গান	কবির বয়স	পর্যায়
১২.	আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে	২৫	স্বদেশ
১৩.	তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ	২৬	জাতীয়
১৪.	আগে চল্ আগে চল্ ভাই	২৬	স্বদেশ
১৫.	খ্যাপা তুই আছিস আপন	৩১	স্বদেশ
১৬.	আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে	৩১	স্বদেশ
১৭.	অয়ি ভুবন মনোমোহিনী	৩৫	স্বদেশ
১৮.	কে এসে যায় ফিরে ফিরে	৩৬	জাতীয়
১৯.	আজি এ ভারতে লজ্জিত হে	৩৮	স্বদেশ
২০.	হে ভারত আজি তুমারি	৪১	জাতীয়
২১.	নব বৎসরে করিলাম পণ	৪১	জাতীয়
২২.	এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু	৪১	স্বদেশ
২৩.	জননীর দ্বারে আজি	৪২	স্বদেশ
২৪.	মাতৃমন্দির পূর্ণ অঙ্গন	৪৩	স্বদেশ

বঙ্গভঙ্গ কালের গান

ক্রমিক	বঙ্গভঙ্গ কালের গান	কবির বয়স	পর্যায়
১.	এবার তোর মরা গাঙ্গে	৪৪	স্বদেশ
২.	যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে	৪৪	স্বদেশ
৩.	আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে	৪৪	স্বদেশ
৪.	মা কি তোর পরের দ্বারে	৪৪	স্বদেশ
৫.	তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে	৪৪	স্বদেশ
৬.	ওরে ভাই মিথ্যা ভেবো না	৪৪	জাতীয়
৭.	আজ সবাই ছুটে আসুক	৪৪	জাতীয়
৮.	ছি ছি চোখের জলে	৪৪	স্বদেশ
৯.	যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক	৪৪	স্বদেশ
১০.	যে তোরে পাগল বলে	৪৪	স্বদেশ
১১.	ওরে তোরা নেই বা কথা বল্লি	৪৪	স্বদেশ
১২.	যদি তোর ভাবনা থাকে	৪৪	স্বদেশ
১৩.	আপনি অবস হলি	৪৪	স্বদেশ

ক্রমিক	বঙ্গভঙ্গ কালের গান	কবির বয়স	পর্যায়
১৪.	সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে	৪৪	স্বদেশ
১৫.	আমরা পথে পথে যাবো সারে সারে	৪৪	স্বদেশ
১৬.	আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়	৪৪	স্বদেশ
১৭.	ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা	৪৪	স্বদেশ
১৮.	ঘরে মুখ মলিন দেখে	৪৪	স্বদেশ
১৯.	নিশিদিন ভরসা রাখিস	৪৪	স্বদেশ
২০.	বুকবেধে তুই দাঁড়া দেখি	৪৪	স্বদেশ
২১.	আমি ভয় করবো না ভয় করবো না	৪৪	স্বদেশ
২২.	বাংলার মাটি বাংলার জল	৪৪	স্বদেশ
২৩.	বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান	৪৪	স্বদেশ
২৪.	ওদের বাঁধন যত	৪৪	স্বদেশ
২৫.	আমাদের যাত্রা হলো শুরু	৪৪	স্বদেশ
২৬.	এখন আর দেরি নয়	৪৪	স্বদেশ

বঙ্গভঙ্গোত্তর কালের গান

ক্রমিক	বঙ্গভঙ্গোত্তর পর্যায়ের গান	কবির বয়স	পর্যায়
১.	রইলো বলে রাখলে কারে	৪৮	স্বদেশ
২.	হে মোর চিত্ত	৪৮	স্বদেশ
৩.	আমরা সবাই রাজা	৪৯	স্বদেশ
৪.	জনগণমন- অধিনায়ক	৫০	স্বদেশ
৫.	দেশে দেশ নন্দিত করি	৫৬	স্বদেশ
৬.	সাধন কি মোর, আসন নেবে	৬০	স্বদেশ
৭.	নাই নাই ভয়	৬৪	স্বদেশ
৮.	সঙ্কোচের বিহ্বলতা	৬৪	স্বদেশ
৯.	ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা	৭২	স্বদেশ
১০.	শুভ কর্মপথে ধর	৭৫	স্বদেশ
১১.	চলো যাই, চলো যাই	৭৫	স্বদেশ
১২.	ওরে নূতন যুগের ভোরে	৭৬	স্বদেশ

উপরে প্রদত্ত তালিকা এবং গানের বিশ্লেষণ থেকে উপলব্ধি হয় যে, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্যায়ের গান জাতিকে তৎসময় যথার্থ দিক নির্দেশনা দিতে সমর্থ হয়েছিলো। বঙ্গভঙ্গোত্তর পর্বের রচনা মূলত বিভিন্ন উৎসব, অনুষ্ঠান, গীত ও নৃত্যনাট্যের প্রয়োজনে রচিত হলেও মানবের অন্তর জাগানিয়া গান গেয়েছেন তিনি বাঙালিসত্তার কল্যাণ সাধনে, কিন্তু ভদ্রলোক খ্যাত সকল বাঙালির মনে এই ভাবনার অপ্রতুলতায় রবীন্দ্রনাথ ব্যথিত হতেন–

> "বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে স্বদেশী আন্দোলনের উত্তাল জোয়ারে নেমে রবীন্দ্রনাথের লাভ হয়েছিল এই যে, রাজনীতি যাঁরা করেন সেই ভদ্রলোকদের সামাজিক অবস্থান ও দৃষ্টিকোণ যেমন তিনি ভিতরের লোক হিসেবে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছিলেন, তেমনি নিজস্ব উপলব্ধি ও চিপ্রবণতাকে স্পষ্টভাবে চিনে ওঠা সম্ভব হয়েছিল তাঁর পক্ষে। স্বদেশীদের দেশহিতৈষণা ও জাতীয়তাবোধে কোনো ফাঁকি ছিল না, কিন্তু জাতিকে যথার্থ পরিত্রাণের ক্ষমতা তাঁদের পেশী ও মননে অনুপস্থিত ছিল তাঁরা 'ভদ্রলোক' বলেই। স্বদেশী আন্দোলনের ইতিহাসকার সুমিত সরকার প্রাঞ্জল ভাষায় গভীর সত্য কথা বলেছেন।"[১১৮]

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

হিন্দুমেলা থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ তৎসময়ের যত স্বদেশপর্বের গান রচনা করেন তা গীতবিতানে স্থান পায়। তবে এই গানগুলোর স্থান হয় গীতবিতানের তৃতীয় খণ্ডে। এ সংকলনের (১৩৫৬ বঙ্গাব্দ) সম্পূর্ণ গীতবিতানের গানগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা এই তিন খণ্ডের গীতবিতানে স্বদেশ ভাবার্থবোধক আরো কিছু গান পাই–যা গীতবিতানের স্বদেশ পর্যায়ভুক্ত নয়, কিন্তু এদের এই শ্রেণিভুক্ত করা যেতে পারে।

পূজা পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

পূজা পর্যায়ের অনেক গানের মধ্যেই ব্রহ্মের পরিদর্শনের ভেতর দিয়ে কবি স্বদেশমাতাকে ইঙ্গিত করেছেন। স্বদেশ পর্যায়ের অনেক গানেই যেমন ঈশ্বর ও ঈশ্বর সৃষ্ট বহুবিধ উপমায় সাজিয়েছেন বা কখনো কখনো পূজা পর্বের গান মনে হয় তেমনি পূজা পর্বের কিছু গানেও স্বদেশ মাতৃরূপ দৃষ্ট হয়। এ বিষয়ে কিছু গানের উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে।

১.

"যেথায় থাকে সবার অধম দীনের হতে দীন
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে।"[১১৯]

পূজা পর্বের এই গানটির মধ্যে স্বদেশের প্রতি আর্তি প্রতিধ্বনিত হয়েছে। এই ভূ-খণ্ড অপমানের গ্লানিতে ভরা, অত্যাচার আর নিপীড়নে সর্বহারা সকলে। সেখানে সেই অপমানের মাটিতে ঈশ্বরকে প্রণতি জানাতে রবীন্দ্রনাথের মন মানতে চায় না। মান-সম্মান-ঐশ্বর্যে এই জন্মভূমিকে পূর্ণ করতে কবি ঈশ্বরে প্রণতি জানাতে চান। এই বিশ্ব-ভূষণ দীন দরিদ্র অবস্থার পরিবর্তন হবে তবেই সেদিন তাঁর

প্রণতি যথার্থ রূপ পাবে। পূজা পর্বের এই গানটি 'প্রণতি' নামক কবিতার গীতরূপ। *গীতাঞ্জলির* ১০৭ সংখ্যক কবিতা এটি। রবীন্দ্রনাথ এটিকে রচনা করেন বোলপুরে ১৩১৭ সনে।

২.

"আর নহে, আর নয়, আমি করি নে আর ভয়।
আমার ঘুচল কাঁদন, ফলল সাধন, হল বাঁধন ক্ষয় ॥"[১২০]

অচলায়তন নাটকের পঞ্চকের গান এটি। অচলায়তন নাটক সম্পর্কে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। যেখানে পরাধীনতার দেয়াল, অর্থহীন মন্ত্রের দাসত্ব মেনে না নেওয়া, পঞ্চকের প্রাচীর ভেঙে বাইরে বেরোবার আকাঙ্ক্ষা ও প্রচেষ্টার গল্প এটি। এ যেন ভারতবর্ষের অগণিত পরাধীন মানুষেরই বুকের হাহাকার। ভয়শূন্য চিত্তে রূপক চরিত্র পঞ্চক আকাশ ছুঁতে চায়। কোনো মায়াজল তাকে বাঁধতে পারে না। তাই অস্ত্র নিয়ে, বর্ম পরে তৈরি পরাধীনতা ও কুসংস্কারের দেওয়াল ভাঙবে বলে, বিশ্বকে ছোঁবে বলে। অতুলনীয় এই গানটিতে পূজা ভাবনা থেকেও অধিক প্রতিফলিত হয় স্বদেশচেতনা। তাই এই গানটিকে স্বদেশভাবনার গান বলা যায়। গানটি 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয় এবং এর রূপকাল আনুমানিক ১৩১৮ এর আশ্বিনের মধ্যে।

৩.

"বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥"[১২১]

অরূপরতন-এর অন্তর্গত গান এটি। শান্তিনিকেতনে বসে কবি এ গানটি রচনা করেন ১৯১৪ সালে জুলাই থেকে আগস্টের মধ্যে। পূজাপর্বের গানে যে ২১টি উপ-পর্যায় রয়েছে তার আত্মবোধনপর্বের গান এটি। মনের জোরে সব বাধাকে অতিক্রম করা যায়। যেকোনো প্রতিকূলতা অতিক্রম করবার জন্য লড়াই করে জিতবার আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে। লজ্জা-সংকোচে কেঁদে বেড়ালে কখনো আত্মমুক্তির পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। লুট করা ধনের যে প্রাচুর্য তাও একদিন ধুলায় মিলাবে।

৪.

"এই কথাটা ধরে রাখিস–মুক্তি তোর পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে সে পথে তোর যেতেই হবে ॥"[১২২]

অসাধারণ পূজাপর্বের এই গানটি রচিত হয়েছিল সুরুলে ১৯১৪ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর। সাধনা ও সংকল্পের কথা বলা হয়েছে এই গানটিতে। আত্মবিশ্বাসে যেকোনো কঠিন পথেও পাড়ি জমালেও পারের কিনার ঠিকই মিলবে। অভয় মনে শুধু সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই পথের যত কাঁটা বাঁধা পদতলে দলে নিজের আরাধ্যে পৌঁছতে পারা যাবে। এবং কবি এটাও বলেছেন, এ জীবন যাত্রা সহজ নয়, জীবনের লক্ষ্য জয়ও সহজ নয়। অনেক ঘাত-প্রতিঘাত রয়েছে, তা অতিক্রম করবার শক্তি অন্তরে লালন করতে হবে তবেই মুক্তি আসবে।

৫.

"আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ॥"[১২৩]

রবীন্দ্রনাথের ৫৩ বছর বয়সের রচনা এই গান। কবি এটি রচনা করেছিলেন ১৯১৪-এর ৪ অক্টোবর শান্তিনিকেতনে। এখানে কবি বিশ্বকে পাবার আকাঙ্ক্ষার কথা বলেছেন। নিজেকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে, বিশ্বের বিপুলতাতে নিজেকে হারাতে এবং বাধাহীন আকাশে নিজের কাছে বন্দী ডানা দুটি মেলে ধরতে বলেছেন কবি। নিজের ভেতরকার সত্তাটাকে কবি বের করে আনতে বলেছেন। বাইরের সাথে একাত্ম হয়ে সকল সংস্কার ও কুসংস্কারের বন্ধন মুক্তিই পারে জীবন দেখাতে। কবি সেই মুক্তির সন্ধান করতে বলেছেন।

৬.

"হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয় ॥"[১২৪]

এই গানটি স্বদেশ ভাবাশ্রিত। কারণ বিবিধ উপ-পর্যায়ে এই গানে বীর ও নির্ভয়ের জয়গাঁথা গাওয়া হয়েছে। বীরের প্রাণের কখনো ক্ষয় হয় না। কবি আলোচ্য গানে সেই জয় প্রার্থনা করেন। প্রেম, ক্ষেমেরও জয় প্রার্থনা করেন কবি। কারণ সকল আঁধার একদিন আলোতে পরিণত হবে। সেই আলোকবর্ষী বীরের জয় জয়কার করেছেন কবি। সকল প্রকার পিছুটান চ্যুত করে আকাঙ্ক্ষার বাস্তবতা দিতে হবে। অরুণালোকে অভ্যুদয় নিশ্চিত করতে হবে। এটি *ফাল্গুনী* নাটকের বাউল চরিত্রের গান।

৭.

"আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিষম ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে ॥"[১২৫]

কবির ৬০ বছর বয়সে রচিত এই গানটিতে স্বদেশপর্বের ভাবাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। এটি শান্তিনিকেতন থাকাকালীন সময়ের রচনা। ১৯২২ সালের ১৪ জানুয়ারি এর রচনা কাল। *মুক্তধারা* নাটকে ধনঞ্জয় চরিত্রের গান এটি। যদিও পূজা পর্যায়ের দুঃখ উপ-পর্যায়ের ইঙ্গিত করেছেন কবি। 'বিষম ঝড়ের বায়' বলতে কবি জীবনের নানা প্রতিকূলতাকে, অসমতাকে, পরাধীনতাকে ইঙ্গিত করেছেন। হয়তো নৌকার পাল ছেঁড়া হতে পারে তবুও মনের শক্তিতে বলীয়ান হলে ছেঁড়া পালেও হাওয়া লাগাতে পারা যায়। সেই হাওয়াই নৌকা ছুটে চলবে এর গন্তব্যে এবং এত ঘাত-প্রতিঘাতের মহাসমুদ্র পাড়ি দিয়ে ঠিকই একদিন আশার ঘাটে পৌঁছাবে। সেদিন এই কঠিনসম ভার জীবনের অর্জন অর্ঘ্যস্বরূপ বিধাতার পায়ে তুলে দিতে বলেছেন কবি।

৮.

"জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময় ॥"[১২৬]

১৩২৮ সনে শান্তিনিকেতনে থাকাকালীন সময়ে কবি আরো একটি অনন্য স্বদেশ ভাবাশ্রিত পূজাপর্বের গান রচনা করেছিলেন। বিবিধ উপ-পর্যায়ভুক্ত এই গানটিরও জয় গান গেয়েছেন তিনি।

৯.

"মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ।
জয় জয় সত্যের জয়।"[১২৭]

অসাধারণ এই গানটি কবি তাঁর ৪০ বছর বয়সে ১৩০৮ সনের ৭ই পৌষ রচনা করেন ব্রহ্মচর্যাশ্রম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে। সেই দিন এই গানটি গাওয়া হয়েছিল এবং ১৩০৮ সনেই কলকাতার আদি ব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবে গানটি গাওয়া হয়। সত্যকে ধ্যান জ্ঞান করে সত্যেরই আরাধনা করা হয়েছে এই গানটিতে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমকে উদ্দেশ্য করে গানটি রচিত হলেও অভয় ব্রহ্মকে স্মরণ করে সত্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসে সকল দুঃখ, দৈন্য ও দণ্ড মাথা পেতে নিতে রাজি থাকার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি। সমাজের তরে, মঙ্গলের তরে অনন্য সুন্দর ভঙ্গিতে কবি দেশ তথা মানবতার সেবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন গানটিতে। কবি অন্তরের জয়গান গেয়েছেন গানটিতে। আনন্দবিহীন সকল কর্ম নিষ্ফল হয়। আনন্দবিহীন প্রাপ্তি মনে দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে না। কবি আনন্দচিত্তে দুঃখ বিপদজালে ও মৃত্যু-বিরহ-শোকে স্থির থাকতে বলেছেন। এ সকল কর্ম যথার্থ তপস্যায় জয় করতে বলেছেন তিনি।

১০.

"ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
আঁধার সাঁঝে বনের মাঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥"[১২৮]

এই গানটির মধ্যে স্বদেশ ভাবাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। এ বিষয়ে পূর্বে আলোচনা হয়েছে। জোনাকির আলোকে কবি অসহায়ের মুক্তি প্রত্যাশার বাসনার সাথে তুলনা করেছেন।

১১.

"খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।"[১২৯]

রূপক শব্দের ব্যবহারে অত্যন্ত সুন্দর ছন্দের প্রয়োগে কবি উদ্দীপনা, শঙ্কা এবং তা থেকে উত্তরণের পথ দেখিয়েছেন এই গানটিতে। এ সকল ইঙ্গিত যেন বাস্তবিক জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। জীবনের হাল শক্ত হাতে ধরতে হবে, পালের সঠিক উত্তোলনেই পারে নির্ধারিত ও আকাঙ্ক্ষিত গন্তব্যে পৌঁছাতে। বড় কাজে সংশয় আসে, বাধা আসে। কিন্তু সেই মহাকালকে বৃহত্তর জয়ের প্রত্যাশায় তুচ্ছ করতে হবে। জয়গান গেয়ে সম্মুখে এগিয়ে যেতে হবে। তবে ব্যক্তিজীবন, সমাজ তথা দেশকে যেকোনো মহাসংকট থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে।

১২.

"ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও।
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও ॥"[১৩০]

তাসের দেশ নৃত্যনাট্যের চতুর্থ দৃশ্যের সমবেত গান এটি। রবীন্দ্রনাথ এই উদ্দীপনামূলক গানটি রচনা করেছিলেন ১৪ জানুয়ারি ১৯৩৯ সালে শান্তি নিকেতনে। এর স্বরলিপি করেন শান্তিদেব ঘোষ। আমরা জানি *তাসের দেশ* নাটকটিতে প্রথাগত যে জড়তা তা উত্তরণের একটি প্রচেষ্টা দেখিয়েছেন কবি। সেই প্রথাগত সংস্কার ভেঙে নতুনের ডাকে পুরাতনকে ছেড়ে সামনে এগুতে হবে। পুরাতন জীর্ণতাকে ভাঙতে হবে অজানার সন্ধানে। রুদ্ধদ্বার উন্মোচনের প্রতিজ্ঞাই কেবল পারে আলোর সন্ধান দিতে।

১৩.

"সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ–
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো ॥"[১৩১]

পূজাপর্বের এই গানটিতেও স্বদেশ ভাবাদর্শ পরিলক্ষিত হয়। **১৯২৯** সালের **১৩** সেপ্টেম্বর কবি ভীষণ ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গানটি রচনা করেন। তাই এই গানটি পূজাপর্বের দুঃখ উপ-পর্যায়ভুক্ত করেছেন কবি। নিম্নে এ প্রসঙ্গে *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ* গ্রন্থে সমীর সেনগুপ্তের উদ্ধৃতিটি তুলে দেওয়া হলো।

এ প্রসঙ্গে শান্তিদেব ঘোষ লিখেছেন :

> "১৩৩৬ সালে যখন যতীন দাস লাহোর জেলে অনশন ব্রত অবলম্বন করেন, সে কথা সকলেরই স্মরণ আছে; তাঁর মৃত্যুপণের সংকল্প ভারতবাসীর চিত্তে খুব আলোড়ন এনেছিল। সেই বেদনাদায়ক আবহাওয়ার মধ্যে তপতী লেখা হয়। আশ্রমবাসীদের নিয়ে গুরুদেব তাঁর মহড়া দিচ্ছিলেন। শেষ পর্যন্ত যতীন দাসের মৃত্যু হল [১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯] সেই সংবাদ যখন শান্তিনিকেতনে এসে পৌঁছল, সেই দিন গুরুদেব মনে যে বেদনা পেয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। সন্ধ্যায় তপতী অভিনয়ের মহড়া বন্ধ না রাখার কথা হল। কিন্তু বার বার তিনি তাঁর পাঠের খেই হারাতে লাগলেন, বহু বার চেষ্টা করেও কিছুতেই ঠিক রাখতে পারছিলেন না, অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিলেন। শেষ পর্যন্ত মহড়া বন্ধ করে দিলেন। সেই রাত্রেই লিখলেন, 'সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ' গানটি। তপতী নাটকে এটিকে পরে জুড়ে দিলেন। এ গানটি যে তাঁর অন্তরের কী তীব্র বেদনার প্রকাশ, আজ সে কথা হয়তো অনেকেই জানেন না; জানা থাকলে এ গানটি সকলের কাছে আরো সত্য হয়ে উঠবে।"[১৩২]

১৪.

"আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা–
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ॥"[১৩৩]

রবীন্দ্রনাথের এই গানটি ব্যক্তিগতভাবে আমার ভেতর স্বদেশভাবনার উদ্রেক করে। দেশমাতৃকার যে আকুতিতে জন্মভূমি, জননী ও বসুন্ধরা বলে আহ্বান করেছেন কবি তাতে স্বদেশবোধটিই স্পষ্ট হয়। জন্মভূমিকে পবিত্রভূমি বলে আখ্যা করেছেন কবি। স্বদেশমাতৃকার মোহিনী শক্তিরূপ হৃদয় প্রাণ জুড়ে থাকে। কারণ তাতে মানবজীবন ধন্য হয়। এ মাটির তৈরি মানবদেহ এই জন্মভূমি পরিপূর্ণ করেছে।

১৫.

"জ্বল জ্বল চিতা, দ্বিগুণ দ্বিগুণ–পরান সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক জ্বলুক চিতার আগুন, জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা ॥"[১৩৪]

নাট্যগীতি পর্বের এই গানটিতে স্বদেশানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের *সরোজিনী* নাটকের জন্য মাত্র **১৪** বছর **৬** মাস বয়সে রবীন্দ্রনাথ **১৮৭৫** সালের নভেম্বর মাসে গানটি রচনা করেছিলেন। এই গানটির মধ্যেও সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে নারীর যে অন্তর দহন ছিলো তা প্রতিভাত হয়েছে মূলত নান্দনিক ভঙ্গিতে নাটকীয় দৃশ্যপটের মাধ্যমে। নিম্নে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের জীবনস্মৃতি থেকে উদ্ধৃতিটি তুলে ধরা হলো :

> "রবীন্দ্রনাথ তখন বাড়ীতে রামসর্ব্বস্ব পণ্ডিতের নিকট সংস্কৃত পড়িতেন। আমি ও রামসর্ব্বস্ব দুইজনে রবির পড়ার ঘরে বসিয়াই, "সরোজিনী"র প্রুফ সংশোধন করিতাম। রামসর্ব্বস্ব খুব জোরে জোরে পড়িতেন। পাশের ঘর হইতে রবি শুনিতেন, ও মাঝে মাঝে পণ্ডিতমহাশয়কে উদ্দেশ্য করিয়া, কোন্ স্থানে কি করিলে ভাল হয় সেই মতামত প্রকাশ করিতেন। রাজপুত মহিলাদের চিতাপ্রবেশের যে একটা দৃশ্য আছে, তাহাতে পূর্ব্বে আমি গদ্যে একটা বক্তৃতা রচনা করিয়া দিয়াছিলাম। যখন এই স্থানটা পড়িয়া প্রুফ দেখা হইতেছিল, তখন রবীন্দ্রনাথ পাশের ঘরে পড়াশুনা বন্ধ করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া শুনিতেছিলেন। গদ্য-রচনাটি এখানে

একেবারেই খাপ খায় নাই বুঝিয়া, কিশোর রবি একেবারে আমাদের ঘরে আসিয়া হাজির। তিনি বলিলেন–এখানে পদ্যরচনা ছাড়া কিছুতেই জোর বাঁধিতে পারে না। প্রস্তাবটা আমি উপেক্ষা করিতে পারিলাম না। কারণ, প্রথম হইতেই আমারও মনটা কেমন খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু এখন আর সময় কৈ ? আমি সময়ভাবের আপত্তি উত্থাপন করিলে, রবীন্দ্রনাথ সেই বক্তৃতাটির পরিবর্ত্তে একটা গান রচনা করিয়া দিবার ভার লইলেন, এবং তখনই খুব অল্প সময়ের মধ্যেই "জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ" এই গানটি রচনা করিয়া আনিয়া, আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া দিলেন।..."[১৩৫]

নাটকের মঞ্চসফলতার মূল কেন্দ্রে থাকে এই গানটি। যদিও তখন অনেকেরই ধারণা গানটি জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা এবং এই গান সংক্রান্ত সকল প্রশংসা মূলত তিনিই পেয়েছিলেন। বিভিন্ন গ্রন্থেও এই গানটির রচয়িতা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের নামই প্রকাশিত হয় এবং এই নাটক প্রকাশের প্রায় ৩৭ বছর পর নিজে জীবনস্মৃতিতে উল্লেখ করেন যে গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা। *সরোজিনী* নাটকটি ১৮৭৬ সালের ১৫ জানুয়ারি গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে ব্যাপক আকারে প্রথম অভিনয় হয়। সরোজিনীর চরিত্রে যিনি অভিনয় করতেন তিনি প্রতিভাময়ী বিনোদিনী, তখন তার বয়স মাত্র ১৪ বছর। বিনোদিনীর অভিনয় এবং এই গানটির আবেদনময় দৃশ্যটি দর্শকদের উন্মাদ করে দিত। এই গানটির বিপুল জনপ্রিয়তার প্রসঙ্গে স্বয়ং অভিনেত্রী বিনোদনী তাঁর *আমার কথায়* উল্লেখ করেন :

"সরোজিনী' নাটকের একটি দৃশ্যে রাজপুত ললনারা গাইতে গাইতে চিতারোহণ করছেন। সে দৃশ্যটি যেন মানুষকে উন্মাদ করে দিত। তিন চার জায়গায় ধূ ধূ করে চিতা জ্বলছে, সে আগুনের শিখা দু'তিন হাত উঁচুতে উঠে লকলকে করছে। তখন ত বিদ্যুতের আলো ছিলো না, স্টেজের ওপর ৪/৫ ফুট লম্বা টিন পেতে তার ওপর সরু কাট জ্বেলে দেওয়া হত। লাল রঙের শাড়ী পরে কেউ বা ফুলের গয়নায় সেজে, কেউ বা ফুলের মালা হাতে নিয়ে এক এক দল রাজপুত রমণী, সেই–

'জ্বল্ জ্বল্ চিতা দ্বিগুণ দ্বিগুণ
পরান সঁপিবে বিধবা বালা।'

গাইতে গাইতে চিতা প্রদক্ষিণ করছে, আর ঝুপ করে সেই আগুনের মধ্যে পড়ছে। সঙ্গে সঙ্গে পিচকারী করে সেই আগুনের মধ্যে কেরোসিন ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে, আর আগুন দাও দাও করে জ্বলে উঠছে তাতে কারু বা চুল পুড়ে যাচ্ছে, কারু বা কাপড় ধরে উঠছে- তবুও কারুর ভ্রূক্ষেপ নেই- তাঁরা আবার ঘুরে আসছে, আবার সেই আগুনের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। তখন যে কি রকমের একটা উত্তেজনা হত তা লিখে ঠিক বোঝাতে পারছি না।"[১৩৬]

উল্লেখ্য যে, এই গানটি রবীন্দ্রনাথের রচনা হলেও সুর সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের। কারণ পর্যালোচনায় দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ তখন সুর সংযোজন শুরু করেননি।

১৬.

"বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী ॥"[১৩৭]

পূজা ও প্রার্থনার এই গানটিতেও স্বদেশানুভূতি পরিলক্ষিত হয়। ২১ বছর বয়সে রচিত এই গানটিতে কবি ঈশ্বরকে যেভাবে জননী বলে সম্মোধন করেছেন তাতে স্বদেশমাতৃকার রূপ পরিস্ফুটিত হয়। গৃহ বলতে যেন জন্মভূমির মাটির কথাই ব্যক্ত করেছেন কবি। রবীন্দ্রনাথ জননী শব্দটি দিয়ে চিরচেনা মায়ের সাথে স্বদেশমাতা ও ব্রহ্ম বা দুর্গামাতার স্নেহের আশ্রয়ের সম্পৃক্তা করতে চেয়েছেন।

১৭.

"পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এসো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান ॥"[১৩৮]

ইন্দিরা দেবী *জীবনস্মৃতি* গ্রন্থে এই গানটি সম্পর্কে লিখেছেন :

> "...একবার মনে আছে, আদি নববিধান সাধারণ—এই তিন সমাজের মিলিত উৎসব উপলক্ষ্যে জোড়াসাঁকোর বাড়িতে একটি ধর্মসভা হয়। সেই সভার জন্য রবিকাকা 'পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান' গানটি রচনা করেন।..."[১৩৯]

২৩ বছর বয়সে পূজা ও প্রার্থনার এই গানটি রচিত হয় 'ব্রহ্ম সম্মেলন' উপলক্ষ্যে। তাই হয়তো গানটি এ পর্বের সংযুক্ত। কিন্তু গানটির অন্তর্নিহিত বাণীতে যে আহ্বান পরিলক্ষিত হয় তা অনায়াসেই স্বদেশানুভূতির উদ্রেক করে।

স্বদেশচেতনার বিষয়বৈচিত্র্যতা

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনা কেবল তাঁর স্বদেশপর্বের গানের ভেতর আবদ্ধ নয়। তাঁর অন্যান্য পর্যায়ের গানের ভেতর দিয়েও ঠিক একই আকুতি দৃষ্ট হয়। বিশেষ করে পূজা, পূজা ও প্রার্থনা এমনকি বিচিত্র পর্যায়ের গানের ভেতর দিয়ে এমন কিছু শাব্দিক ও আত্মিক উপলব্ধির সন্ধান মেলে যা একজন মানবপ্রেমী, প্রকৃতিপ্রেমী তথা স্বদেশপ্রেমী রবীন্দ্রনাথের সন্ধান দেয়। তাঁর বহু গানের গাঁথুনীতেই ভাষা, দেশ, মানুষ, জন্ম-মৃত্যু, মানুষের মন, ধর্ম, প্রকৃতি ও মা অর্থাৎ জননীকে বারবার গুরুত্ব দেয়ার প্রয়াস সুস্পষ্ট। তাঁর স্বদেশপর্বের গানগুলোতে ফুটে উঠে ভারত বন্দনা, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যবন্দনা, একাত্মতা বা ঐক্যশক্তি, ঐতিহাসিক অথবা পুরাণাশ্রিত ঘটনার গৌরবস্মৃতি, সমসাময়িক ঘটনা, আত্মশক্তির বিশ্বাস, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের আত্মপ্রকাশ জন্মধন্যতা, পরাধীনতার ক্ষোভ এবং গণজাগরণের আহ্বান। এই সকল বিষয়ের বিশ্লেষণেই রবীন্দ্রনাথের গানে স্বদেশচেতনা বোধের বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বলা সহজ হবে। কারণ যে শব্দ মনকে অনুরণিত করে, ভাবিত করে তা চেতনা-নির্ভর শব্দ এবং এই চেতনাই জাগ্রত করে সুপ্ত থাকা নিভৃত শক্তিকে। আর এই অজ্ঞাতশক্তিই জাগরণের মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়, হয়ে ওঠে পরিবর্তনের হাতিয়ার। কখনো সহজ শাব্দিক পরিভাষায় কখনো বলিষ্ঠ উচ্চারণে তিনি এই পরিবর্তনের পক্ষে নিরলস কাজ করে গেছেন। কি করে ছোট ছোট শব্দ চয়ন বড় পরিবর্তনের দুয়ার খোলে এই পর্বে সেই বিষয়ে আলোকপাত করা হবে।

পূর্বে তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, গানে জাতীয়তাবোধের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তা এক ব্যতিক্রমী রবীন্দ্রনাথের পরিচয় দেয়। এমনকি স্বদেশপর্বের প্রতিটি গানের বিশ্লেষণেও মেলে স্বদেশমাতৃকাকে অপমান ও লাঞ্ছনার বেড়াজাল থেকে মুক্ত করবার প্রতিনিয়ত নিরলস প্রচেষ্টা। যে বিষয়গুলোকে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশ মুক্তির প্রত্যাশায় চেতনামূলে কড়া নাড়তে চেয়েছেন, তা এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

ছক:

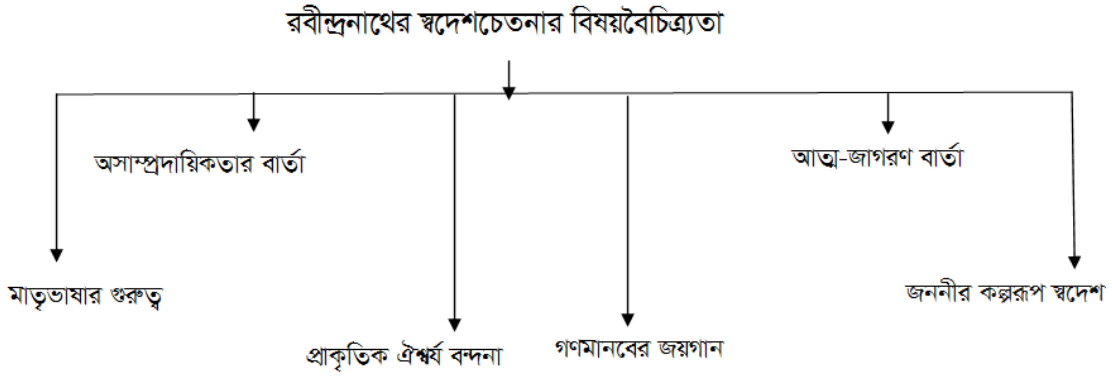

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রণীত

মাতৃভাষার গুরুত্ব

বাংলাগানে স্বদেশপ্রেম বা চেতনা বিষয়টি মূলত নিধুবাবুর পর্বের পরে আলোড়িত হয়। নিধুবাবুর যেহেতু প্রেমের গানেই পদচারণা ছিলো, তাই স্বদেশপ্রেমের গানের সংখ্যা নেই বললেই চলে। তথাপি মাতৃভাষা বাংলার মহিমা নির্ভর তাঁর একটি মাত্র গান আজো অনন্য হয়ে আছে।

"নানান দেশের নানান ভাষা,
বিনে স্বদেশী ভাষা পুরে কি আশা।"[১৪০]

জাতীয় জাগরণের পথিকৃৎ রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩) 'ব্রহ্মসংগীত' ধারা প্রবর্তন করেন এবং তাঁর রচিত সেই ধর্মসংগীতেই আমরা সর্বপ্রথম 'স্বদেশ' কথাটির ব্যবহার দেখতে পাই। ব্রহ্মোপাসনার সাথে দেশমাতৃকার উপাসনার এক অপূর্ব সমন্বয় করেছেন তিনি, যদিও এমনটা পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্বের কিছু গানেও অনুভূত হয়। রামমোহন রায় রচিত ব্রহ্মসংগীতে স্বদেশ কথাটির প্রকাশ পাই নিচের গানটিতে–

"কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি
তোমার রচনার মধ্যে তোমাকে দেখিয়া ডাকি।"[১৪১]

এরপরে আরোও বহু গুণিজনের লেখায় হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে স্বদেশপর্বের গান রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে পূর্বে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। তবে মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে সেসময়ে বিশেষ রচনা চোখে পড়ে না। ঠাকুরবাড়ির পরিবেশে বহুবিধ বাংলা বই ও পত্র-পত্রিকার সাহাচার্য পেয়েই সন্তানরা বড় হয়েছে।

তাই রবীন্দ্রনাথেরও বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা, বোঝাপড়া ও রসদদার হয়ে উঠার কারণ মূলত ঠাকুরবাড়িতে বাংলা চর্চা। সেইকালে বিদ্যালয়গুলোতে ও কর্মক্ষেত্রে 'মাতৃভাষা' প্রতিষ্ঠা লাভ না করলেও ভদ্রলোকদের বাড়িতে এর কদর ছিলো এবং গ্রন্থ ও সাময়িক পত্র মুদ্রণেরও উৎসাহ ছিলো ব্যাপক। কিশোর রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকেই মাতৃভাষাপন্থি হয়ে ওঠেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পড়ে তিনি বড় হয়েছেন। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন–'যখন বঙ্গদর্শন প্রথম বাহির হয়েছিল, তখন আমি যুবা

বা তার চাইতেও কম বয়সের... বাংলা ভাষা এখন অনেক পরিপূর্ণ; তখন নিতান্ত অল্প পরিসর ছিলো।'[১৪২] এখানে প্রকাশ যে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে মাতৃভাষা বাংলার প্রতি মানুষের তেমন আগ্রহ ছিলো না। বরং বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি কম প্রদর্শিত হতো। যে কারণে গানে কবিতায় বা যেকোনো লেখনিতে ভাষার জন্য স্তুতি বন্দনা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। কিন্তু কিশোর রবীন্দ্রনাথ ছোটবেলা থেকে মাতৃভাষার প্রতি তাঁর আগ্রহ ও দায়বোধের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। উনিশ শতকের শেষ দশকে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং মাতৃভাষা প্রচারে নিযুক্ত হন। রবীন্দ্রনাথের *শিক্ষার হেরফের* প্রবন্ধে না বুঝে ও না দেখে বিজাতীয় ভাব ও ইংরেজি বাক্য মুখস্থকামী নির্জীব শিক্ষাব্যবস্থার বিরোধিতা করেছেন। এ থেকে বাঙালি ছাত্রদের মুক্তি প্রার্থনা করেছেন। *সাধনাতে* 'শিক্ষার হেরফের' প্রকাশিত হলে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাবনার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে চিঠি লেখেন এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে বাংলা ভাষা তথা মাতৃভাষা ও এর শিক্ষাব্যবস্থা নিয়ে চিন্তিত ছিলেন বিষয়টি স্পষ্ট হয়। ইংরেজি ভাষায় শিক্ষাব্যবস্থা ছিলো বিধায় ১৮৮৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৃহীত পরীক্ষার ফলাফল ছিলো হতাশাজনক। এ বিষয়ে সিনেট সদস্যরা তাদের এহেন উদ্বেগের কথা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে জানান। একজন সিনেটর হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র এই নৈরাশ্যজনক ফলাফলের কারণ হিসেবে অনুধাবন করলেন যে পাঠক্রমে বাংলা সাহিত্যের অত্যন্ত সংকুচিত অবস্থান। সেই সময় উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় প্রবেশিকা পরীক্ষা থেকে এম এ পর্যন্ত শিক্ষার সকল স্তরে মাতৃভাষার যথাযোগ্য পরিসর প্রদানের প্রস্তাব করেন। যদিও বাংলা ভাষাপন্থিরা ১৭-১১ ভোটে হেরে যায়, তথাপি বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ স্ব স্ব ক্ষেত্রে মাতৃভাষা প্রচারকামী হিসেবে কাজ করতে থাকেন।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনার অনেক ক্ষেত্রে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার স্তুতি বন্দনা করেছেন। এই ভাষার গুরুত্ব আরোপ করেছেন তাঁর স্বদেশপর্বের কতিপয় গানেও। কারণ স্বজাতি মাতৃভূমিকে মুক্তির প্রথম ও প্রধান শর্ত মাতৃভাষাকে রক্ষা করা। নিজের ভাষা তথা মুখের বুলি হারিয়ে গেলে কোনো জাতি তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না। তাই স্বদেশপর্বের ১নং গানে কবি মায়ের মুখের বাণীকে সুধার মতো অনুভূত করেছেন। কারণ নিজ ভাষার মতো এত মিষ্টি কোনো সুর হতে পারে না। মাতৃভাষাতে ভাব প্রকাশে যে আনন্দ তা ধার করা ভাষাতে কখনো সম্ভব হয় না।

আবার ভারতবাসীর কাতর পরিস্থিতির কথা বর্ণনা করতে গিয়ে স্বদেশপর্বের ১৬নং গানে তিনি বলেছেন–

> "...দৈন্য জীর্ণ কক্ষ তার মলিন শীর্ণ আশা,
> ত্রাসরুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।..."[১৪৩]

ভাষাবিহীন কোনো জাতি বলিষ্ঠ হতে পারে না। পারে না পরাধীনতার অভিশাপ থেকে নিজেদের মুক্ত করতে। তাই রবীন্দ্রনাথ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলেন শিক্ষাব্যবস্থায় বাংলা ভাষার গুরুত্ব বৃদ্ধির জন্য। কারণ এরফলে কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে সকলক্ষেত্রে বাঙালিদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবার সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

রবীন্দ্রনাথ বাংলার স্তুতি বন্দনা করেছেন স্বদেশপর্বে অন্তর্গত তাঁর প্রায় সকল গানে। তবে আলাদা করে বাংলা ভাষাকে গুরুত্ব দিয়ে ঈশ্বরের কাছে বাঙালির মন, বাঙালির আশা, বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষাকে সত্য যে প্রার্থনা তিনি করেছেন তা বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সকলের মুখে মুখে গীত হয় এবং সর্বস্তরের মানুষ এই গানটি গাইতে গাইতেই পথে নেমে আসেন। হিন্দু-মুসলিম ভেদাভেদ ভুলে প্রত্যেকে প্রতিজনকে রাখি পরায় বাংলার মাটি, বাংলার জলকে পুণ্য করবার প্রয়াসে। 'কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি–/কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়/সে যে আমার জননী রে।'[১৪৪]

> "জাতীয় সংগীত পর্বের অন্তর্গত এই গানটির মধ্যে দেশমাতার সুধাময়ী বাণী তথা মাতৃভাষার অবমাননার কথা বলেছেন কবি। দেশমাতার প্রতি ভীরু সন্তানের আচরণে শংকিত ও ব্যথিত কবি। কারণ নিজের ভাষার প্রতি যদি সম্মান না থাকে, মায়ের ভাষাকে বিসর্জন দিয়ে অন্য ভাষাতে যে জাতি অভ্যস্ত হয়, সে জাতি কখনো সূর্যোদয় দেখতে পায় না। মাতৃভাষা স্বাধীনতা তথা মুক্তিকামী মানুষের মেরুদণ্ড স্বরূপ। তাই কবি চিন্তিত। এই সকল গানের ভেতর দিয়ে তিনি স্বজাতির চেতনাকে জাগাতে চেয়েছেন। ভাষার গুরুত্ব অনুধাবন বোধে জাগ্রত করবার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। তারই ফলশ্রুতিতে–'ব্রিটিশ আমলে ১৮৪৪ সালেই স্কুলে বাংলা ভাষার পড়া অধিকার সরকারি স্বীকৃতি পায়।"[১৪৫]

অসাম্প্রদায়িকতার বার্তা

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পর বাংলা ভাষাতে বিশ্বমানের বহু উন্নত সাহিত্য রচিত হয়। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে সংগীতে বাংলা ভাষা ও এর গুরুত্ব বিষয়ক আলোচনার রেশ ধরেই বলতে হয়, বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী স্বদেশিযুগের প্রভাব মূলত হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তা সমগ্র দেশবাসীর মনে ভাষা ও সংস্কৃতির প্রতি গভীর আনুগত্যবোধ ও দেশপ্রেম জাগিয়ে এনে দিয়েছে ঐশ্বর্যময় সাহিত্য ও সংগীতের এক অফুরান ভাণ্ডার। বাংলাদেশ আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরাও এই সাহিত্য ও সংগীতের রস আস্বাদনে লিপ্ত হন। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রদায়িকতা বিকশিত হয় এক ইতিবাচক ধারায় যার মূল কেন্দ্রে ছিলো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির ভূমিকা। মূলত ১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত বাঙালির কাছে রবীন্দ্রনাথের যে গ্রহণযোগ্যতা ছিলো; বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় বা তারও আগে অর্থাৎ ১৯৬১ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত উগ্রসাম্প্রদায়িকতা নিরসনে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের প্রাসঙ্গিকতা ছিলো ততটাই যৌক্তিক। ভারতবর্ষের নানা জাতি সম্প্রদায়ের অবস্থান। নানা ঘাতপ্রতিঘাতে স্বদেশ চেতনাবোধটি বিচ্ছিন্ন হলেও তা কখনো নিশ্চিহ্ন হয়নি। এ প্রসঙ্গে শিবাজীর ভারত সাধনা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন–

> "তব ভাল উদ্ভাসিয়া এ ভাবনা তড়িৎ প্রভাবৎ
> এসেছিল নামি–
> এক ধর্ম রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারত
> বেঁধে দিব আমি"[১৪৬]

রবীন্দ্রনাথ অসাম্প্রদায়িক মানবতাবোধের সম্প্রসারণ করেছেন সর্বত্র। তাই সকল ধর্মের প্রতি তাঁর ঐক্যবদ্ধের আহ্বান ছিলো। তিনি হিন্দু-মুসলিমের ভূ-খণ্ডগত বিভাজনটি মনে-প্রাণে কখনো মেনে নিতে

পারতেন না। সমগ্র ভারতবর্ষকে তিনি সকল জাতির নিরাপদ বাসভূমি হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। যেখানে ধর্ম থেকে বাঙালি সত্তার পরিচয়েই সকলে গর্ববোধ করবে বেশি। তাই এ বিষয়ে গভীর ভাবনায় কবি ১৯১১ সালে বলেছেন :

> "আজ আমাদের দেশে মুসলমান স্বতন্ত্র থাকিয়া নিজের উন্নতি সাধনের চেষ্টা করিতেছে। তাহা আমাদের পক্ষে যতই অপ্রিয় এবং তাহাতে আমাদের আপাতত যতই অসুবিধা হউক, একদিন পরস্পরের যথার্থ মিলন সাধনের পক্ষে ইহাই প্রকৃত উপায়। ধনী না হইলে দান করা কষ্টকর। মানুষের যতদিন অভাব ও ক্ষুদ্রতা, ততদিনই তাহার ঈর্ষা ও বিরোধ। ততদিন সে আর কাহারো সঙ্গে যদি মেলে তবে দায়ে পড়িয়া মেলে সে মিলন কৃত্রিম।"[১৪৭]

রবীন্দ্রনাথ হিন্দু-মুসলিম তথা ধর্ম বিষয়ে সকলের একাত্মবোধের কথা বলেছেন। ধর্ম একটি জাতীয় কর্তব্য ও সুন্দরতম দায়িত্ব যা সকলকে কল্যাণের পথে চালিত করে। ধর্মকে উপজীব্য করে তাঁর যে সকল গান স্বদেশচেতনার সঞ্চার করে তার কতিপয় উদাহরণসহ বিশ্লেষণ করা হলো এই পর্বের আলোচনায়।

একটি দেশকে ভালোবাসা মানে সেই দেশের প্রকৃতি, সংস্কৃতি ও ধর্মকে ভালোবাসা। স্বদেশপর্বের 'জনগণমন অধিনায়ক' এই বিখ্যাত গানটিতে তেমনি কবি হিন্দু, বৌদ্ধ, শিখ, জৈন, পারসিক, মুসলমান ও খ্রিষ্টানসহ সকল ধর্মের জয়গান গেয়েছেন । 'হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে' গানটিতে ভারতের মহামানবের সাগরতীরে সকলকে আহ্বান করেছেন। আর্য, অনার্য, হিন্দু-মুসলমান এমনকি ইংরেজ, খ্রিষ্টান, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত সকলকে আহ্বান করেছেন এই গানে। ভারতবর্ষের মঙ্গলঘট ভরতে ভারতবর্ষের সকল জাতির পবিত্র পরশের প্রয়োজন। এই উক্তির মধ্যদিয়ে কবি অসাম্প্রদায়িক এক মানবতাবাদী চেতনার বাণী ব্যক্ত করেছেন তাঁর স্বদেশপর্বের গানের ।

কবি তাঁর গানে ধর্মকে অনির্বাণ আলো বলে চিহ্নিত করেছেন। স্বদেশকে ভালোবাসা মানে সে দেশের ধর্মকেও ভালোবাসা। ধর্মের আলোকে সবার ঊর্ধ্বে জ্বেলে সংকটে দুর্দিনে সম্মুখে এগুতে হবে। যার যার ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস রেখেই স্বদেশের সেবায় নিজেকে নিবেদন করতে বলেছেন কবি। ধর্ম-কর্ম বিবর্জিত হলে মানুষ লক্ষ স্থির করতে পারে না। স্বদেশের মুক্তির জন্য যে কঠিন তপস্যা ও সত্য সাধনার প্রয়োজন তা কেবল অর্জিত হতে পারে ধর্মের পথে ব্রতী হলে। 'নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা-/অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে ॥'[১৪৮]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর বহু স্বদেশচেতনার গানে নিজ ধর্মকে আশ্রয় করে সম্মুখে এগুবার আশা ব্যক্ত করেছেন। যেকোনো ধর্মই মানুষকে সংকল্পে অটল রাখে। তাই স্বদেশপ্রেমের চেতনায় স্ব স্ব ধর্মদীক্ষা সহায়ক হয়। জাতীয় সংগীত বিভাগের অন্তর্গত কিছু গানেও কবি স্বদেশের ধর্মের স্তুতি বন্দনা করেছেন। দেশমাতা যেমন আমাদেরকে তার স্বর্ণশস্য দেন, তেমনি ধর্ম, জ্ঞান ও বহুবিধ পুণ্য কাহিনিতেও আমাদের সমৃদ্ধ করেন। 'তুমি তো দিতেছ মা, যা আছে তোমারি- স্বর্ণশস্য তব, জাহ্নবীবারি, জ্ঞান ও ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।'[১৪৯]

নতুন বছরে কবি স্বদেশের দীক্ষা লাভের, শিক্ষা লাভের পণ করেছেন । পরের ভূষণ, পরের বসন ভিক্ষাবৃত্তি সমান। কবি তা ত্যাগ করতে যেমন পণ করেছেন তেমনি স্বদেশের ধর্ম, কর্ম ও স্বদেশ ভক্তির যে মন্ত্রবাণী অন্তরে লালনের গৌরব, সেই গৌরবের দীক্ষা দিতে চেয়েছেন নতুন বছরে।

"নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা–
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা।"[১৫০]

ধর্ম কবির কাছে দেশ সেবার একটি পন্থা। সকল ধর্ম কল্যাণকামী। প্রকৃত ধর্ম সর্বদা দেশমাতার কল্যাণে নিজেকে বিলীন হতে শেখায়। তাই কবির স্বদেশচেতনার মানদণ্ডে তাঁর গানে ধর্মের অস্তিত্ব প্রতিভাত হয় বারংবার।

শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য ধর্মের ভিন্নতা থাকতে পারে; কিন্তু মতের বিরোধ যেন না থাকে। স্বদেশের সেবায় সকল ধর্মের সকলকে পথে নামতে হবে। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একই ছন্দে পথ চলতে হবে, তা সে যেই হোক না কেন। বাংলা তথা বাঙালিয়ানাই তার প্রধানতম পরিচয়। ধনী, গরিব সবাই এখানে সমান। তাই কবি স্বদেশমাতার সংকটাপন্ন অবস্থায় হিন্দু-মুসলিম সকলকে আহ্বান করেছেন। সকল কাজ ফেলে কেবল দেশমাতার সেবাই মুখ্যতম কাজ বলে কবি সবাইকে দুয়ার খুলে বাইরে বের হতে বলেছেন, পেছনের কর্মের সকল ভাবনা ভুলে। তিনি সকল পিছুটানের ডাককে তুচ্ছ করে স্বদেশমাতার ডাকে পথে নামতে বলেছেন। স্বদেশমাতার সম্মান বাঁচলে প্রতিটি মা বাঁচবে, ঘর বাঁচবে–বাঁচবে মানব অস্তিত্ব।

প্রাকৃতিক ঐশ্বর্য বন্দনা

রবীন্দ্রনাথের রচিত প্রায় সকল গানেই কোনো না কোনোভাবে কবি প্রকৃতির দারস্থ হয়েছেন। কী পূজা কী প্রেম, তেমনি স্বদেশ বন্দনার প্রসঙ্গেও কবি স্বদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যের কথা ব্যক্ত করেছেন পরম আদরে। জীর্ণ শীর্ণ স্বদেশমাতা যে প্রকৃতিগতভাবে অপরূপ সৌন্দর্যের আধার এবং এই রূপকে অক্ষত রাখতে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। এই প্রত্যাশাই কবি বারংবার প্রকাশ করেছেন তাঁর গানে। 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি/চিরদিন তোমার আকাশ; তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশী।'[১৫১]

এই গানটির মধ্যে কবি দেশমাতার যে রাগের বর্ণনা করেছেন তাতে প্রকৃত বাংলাদেশের চিরাচরিত স্বরূপটিই তুলে ধরেছেন। তাঁর এই গানের বাণী ও সুরের মূর্ছনায় দেশসন্তানের হৃদয়কে আকুল করেছেন। ফাল্গুনের আমের বোল আর অঘ্রাণের ভরা খেত যেকোনো বাঙালির হৃদয় হরণ করে। এদেশের প্রকৃতির শোভা আমাদের প্রাণ জুড়ায়, গাছের ছায়া মনকে শান্ত করে। যত দরিদ্রই হোক না কেন এই মা তার রূপের সম্ভারে ঐশ্বর্যমণ্ডিত। বঞ্চিত করেন না তাঁর সন্তানকে।

প্রকৃতির শ্যামলিমায় মাখা এ মায়ের কোমল মূর্তি প্রতিটি বাঙালির মর্মে গ্রন্থিত। সবুজে ঘেরা এর প্রকৃতি বলয়ের কারণেই এই বাঙালির মন সবুজের মতো সুন্দর। বাঙালি অতিথি পরায়ণ।'পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ/বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ।'[১৫২]

বহু বিচিত্র প্রকৃতির সমন্বয়ে সৃষ্ট ভারতবর্ষের ভূমি। পাহাড়, নদী, মরুভূমি সকলের যেন একটি হৃদয় ভাগাভাগি করে প্রস্ফুটিত একটি নীলপদ্ম। কবি এই ভারতমাতার প্রকৃতির বন্দনা করেছেন তাঁর স্বদেশপর্বের গানে।

'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে' গানটির মধ্যেও কবি স্বদেশের প্রকৃতির ঐশ্বর্য বন্দনা করেছেন। বাংলা মায়ের অপরূপ রূপ দেখে তার সন্তানের আঁখি ফেরে না। দুঃখিনী মায়ের দুঃখ, দারিদ্র্য ও মলিন হাসি দীপ্তি ছড়ায় দুয়ার খোলা সোনার মন্দিরের আভায়।

'অয়ি ভুবন মনমোহিনী, মা' গানটিতে স্বদেশমাতার অবিস্মরণীয় রূপের বর্ণনা করেছেন কবি। তিনি নীলসিন্দুজল থেকে হিমাচল পর্যন্ত বিচিত্র রূপের শ্যামলিমায় তুষার আচ্ছাদিত শুভ্র আবরণের বর্ণনা করেছেন। বাহ্যিক রূপের সাথে আত্মিক রূপের ভাণ্ডারেও যে পুণ্যভূমি পরিপূর্ণ সে কথাও কবি ব্যক্ত করেছেন এই গানটিতে। জ্ঞানধর্মের নির্দেশক কত কাব্য-কাহিনি রচয়িতার জন্ম এ ভূমিতে। চিরকল্যাণময়ী এ ভূমি শুধু দেশই নয়, যেকোনো বিপদে বহির্বিশ্বকেও অন্ন বিতরণে সহায়ক হয়। এর জাহ্নবী যমুনার জলে তৃষিত পায় প্রাণ। স্বদেশপর্বের আরেকটি বিখ্যাত গান 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'। এতেও কবি অপরূপ ভাবনায় স্বদেশমাতৃকার রূপের বর্ণনা করেছেন। রূপকতায় প্রকৃতির আশ্রয়ে কবি সকলকে জেগে উঠতে বলেছেন। প্রভাতে শুকতারা নির্দেশিত পথে এগিয়ে যেতে বলেছেন কবি। 'স্বার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে/স্বার্থক জনম মাগো তোমায় ভালোবেসে।'[১৫৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্বে রচিত এই গানটি স্বদেশমাতার প্রকৃতির ছায়ার পরশে অঙ্গ জুড়াবার মতো আত্মনিবেদনের সুর নিঃসৃত। স্বদেশে বনে যে ফুল ফুটে তার গন্ধে আকুলতা রয়েছে। স্বদেশের আকাশে যে চাঁদ ওঠে সেই চাঁদের হাসির মতো মধুরতা কবি কোথাও খুঁজে পাননি। তাই কবি মাতৃভূমিতেই নিজের দেহ ত্যাগ করবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন। যে আলোতে তিনি স্বদেশের ভেতর দিয়ে বিশ্বকে ছুঁয়েছিলেন সেই আলোতেই তিনি তাঁর নয়ন মুদবার বাসনা রেখেছেন। এমন করে স্বদেশের রূপের বর্ণনা খুব বেশি চোখে পড়ে না। এই গানটির মধ্যদিয়ে স্বদেশের বহুবিধ রূপ অবগাহন করতে করতে শেষ পঙতিতে এসে অশ্রুস্নাত হয়ে যায়। প্রতিটি শ্রোতা ও শিল্পীর মন একটি বিন্দুতে এসে দাঁড়ায়, তা হলো কবির মতো প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অপরূপ জন্মভূতিতে নিজের জীবনের শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের বাসনা।

'জাতীয় সংগীত' পর্বের গান 'ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি' গানটিতে কবির আফসোসের গ্লানি ধ্বনিত হয়েছে। এরমধ্যেও কবি ভারতমাতার বিকশিত ফুল, পাখির গান, স্বর্ণশস্যময়ী ভূমি এবং এর উচ্ছ্বসিত নদীর রূপের বর্ণনা করেছেন। ভারতমাতার এ হেন গর্বের কথা স্মরণ করতে বলেছেন তার সন্তানকে। কলঙ্কমুক্ত না হলে এর সকল ঐশ্বর্য ম্লান হবে। এর সিন্ধু, হিমগিরিসহ সকল কীর্তি ইতিহাস শত্রুকুল গ্রাস করবে। তাই কবি সন্তানদের জেগে উঠতে বলেছেন।

স্বদেশপর্যায়ের গানে রবীন্দ্রনাথ যে স্বদেশমাতার রূপের অবগাহন করে তাতে স্বদেশচেতনার বিকিরণ ঘটাতে চেয়েছেন। তেমনি পূজাপর্বসহ অন্যান্য সকল পর্বেই তিনি প্রকৃতির আশ্রয় করেছেন বহুবিধ

বিচিত্র ভাব প্রকাশে। যেমন 'ভুবনজোড়া আসনখানি' পূজাপর্যায়ের গানটিতে রাতের তারা দিনের রবি থেকে শুরু করে ফুল ও ঝড়ের পরশকেও তিনি স্পর্শ করতে চেয়েছেন। তেমনি 'ঝড়ের মেঘের মতো আমি ধাই' পূজাপর্বের গানের মতো অনেক গানেই প্রকৃতির আশ্রয়ে তিনি স্বদেশের রূপের বর্ণনা করেছেন।

গণমানবের জয়গান

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশপর্যায়ের গানসমূহের মধ্যদিয়ে স্বদেশচেতনার যে বহিঃপ্রকাশ ঘটাবার চেষ্টা করেছেন তাতে স্বদেশের মানুষ তথা জনগণের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। স্বাধীনতা তথা সম্মান সরলভাবে অর্জিত হয় না। তা অর্জনের জন্য দেশের সন্তানদের আত্মত্যাগের প্রয়োজন। কখনো ধিক্কার কখনোবা গৌরবানুভূতিতে তিনি স্বদেশ সন্তানের ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি সকল জনগণকে বিপদ সংকটে বুকের পাজর জ্বালিয়ে সম্মুখে এগুবার ডাক দিয়েছেন। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' তেমনি একটি একক আহ্বানের গান। এই জনগণকে তিনি মাঝি, নাবিক, পথিক, যাত্রী, কর্মী, রাজা, ভাই বলে সম্মোধন করেছেন। স্বদেশমাতৃকার মূল শক্তিই এই জনগণ তথা মানবসম্পদ। বহু গানে রূপক অর্থে দেশমাতৃকার সন্তানদের বহু নামে সম্মোধন করলেও সরাসরি 'জনগণ' শব্দটির সন্ধান মেলে 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটিতে। জনগণমাদলদায়ক, জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক, জনগণপথপরিচায়ক, জনগণদুঃখত্রায়ক–এই শব্দগুলোর মাধ্যমে কবি জনগণের শক্তির কথা বলেছেন। জনগণের শক্তির উপর দেশ তথা জাতি দাঁড়িয়ে থাকে। জনগণ দুর্বল হলে সে দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ে। তাই এই গানটিতে জনগণের জয় জয়কার করা হয়েছে। 'জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি/স্পন্দিত করি দিগদিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।'[১৫৪]

অর্থাৎ জনগণ জয়ের রথ পরিচালনায় ব্যস্ত। জয় অর্জনের জন্য তারা পথে নেমেছে। তাদের সেই জয়যাত্রার আনন্দযজ্ঞে চারিদিকে শঙ্খধ্বনি বাঁজছে। 'মাতৃমন্দির পুণ্য অঙ্গন কর' মহোজ্জ্বল আজ হে' গানটিতে কবি সকল সাধক, যোগী, ত্যাগী, দুঃস্থদুঃখভাগী জ্ঞানী, কর্মীসহ সকল বীরকে আহ্বান করেছেন। স্বদেশের সেবাই প্রকৃত বীরের কাজ, সবচেয়ে পুণ্য কর্ম। তাই কবি এসব কর্মীকে দুর্জয়-শক্তি-সম্পদ বলেছেন। জনসম্পদকে যথার্থভাবে কাজে লাগাতে পারলেই দেশমাতার দুঃখ নিবারণ হয়। তাই রবীন্দ্রনাথও এ সত্যকে উপলব্ধি করে দেশমাতার প্রতি ভক্তি প্রকাশে জনগণের স্তুতি বন্দনা করেছেন। বিচিত্রকর্মের মাধ্যমে দেশবাসীকে কবি প্রকৃত সত্য ও মঙ্গলের পথে অগ্রসরের ধ্বনি শুনিয়েছেন :

> "সবাই বড়ো হইলে তবে স্বদেশ বড়ো হবে,
> যে কাজে মোরা লাগাব হাত সিদ্ধ হবে তবে।"[১৫৫]

রবীন্দ্রনাথ তাঁর সমগ্রজীবন জুড়ে মানুষের অন্তরের রূপটি খুঁজে বেড়িয়েছেন। উত্তরবঙ্গে অবস্থানকালে গ্রামবাসীর দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনকে প্রত্যক্ষভাবে দেখবার সুযোগ হয় কবির। তিনি আহত হন এবং তাদের ভাগ্য পরিবর্তনের বহুবিধ পন্থা খুঁজে বের করেন নিজে এবং তার মর্মবাণী ব্যক্ত হয় তাঁর কবিতা ও

গানে। 'নির্যাতিত নিপীড়িত মানুষের দুর্দশার অন্ত' নেই। তারা যেন বিকৃত বিকলাঙ্গ প্রেতপুরীর জীব। দেশের শক্তি আপামর জনসাধারণ, সেই শক্তির অপচয়ে দেশের প্রগতি ও উন্নতি অসম্ভব। দেবতার শঙ্খ ধুলায় অবলুণ্ঠিত; কবি সইতে পারলেন না। কল্পনার গজদণ্ড মিনার থেকে বেদনার্ত বাস্তব জগতে নেমে আসার জন্য কবি চিত্তে আকুলতা ধ্বনিত হয়। 'চিত্রা' কাব্যের (১৩০২) 'এবার ফিরাও মোরে' (১৩০০) কবিতাটিতে মানবের তরে কবির আকুলতা দেখতে পাই :

"...সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে।"[১৫৬]

আত্ম-জাগরণ বার্তা

অনির্বচনীয়:আভাসের কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একের ভেতর দিয়ে:বহুকে প্রকাশ রবীন্দ্ররচনার একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গান রচনার প্রেক্ষাপট যাইহোক মূল উদ্দেশ্য ছিলো আত্মিক-জাগরণের প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাস করতেন নিজে জেগে উঠলে সমগ্রকে জাগানো সম্ভব; তাই কবি মুক্তি খুঁজেছেন আলোয়, ধুলায়,ঘাসের সবুজ আভায়–

"বিশ্বধাতার যজ্ঞশালা আত্মহোমের বহ্নি জ্বালা–
জীবন যেন দিই আহুতি মুক্তি-আশে"[১৫৭]

এমনি মুক্তির প্রত্যাশা পাই ররীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একাধিক গানে। কখানো তিনি ভয় হতে মুক্ত হতে চেয়েছেন আপনা মাঝে শক্তির প্রত্যাশায়, জয়ের আশায়। তেমনি নাই নাই ভয়ে হবে জয় খুলে যাবে দ্বার এই বাসনা তিনি ব্যক্ত করেছেন স্বদেশ চেতনার গানে। শুভ কর্ম পথে নির্ভয় গান কণ্ঠে ধরে সকল দুর্বলতা ও সংশয়কে বিনাশ করে তিনি মুক্তি যাত্রার সাথী হতে সকলকে প্রয়োজনে একলা চলার আহ্বান করেছেন। এ আহ্বান কখনো একান্ত নিজের, কখনো সমষ্টিগত।

জননীর কল্পরূপ স্বদেশ

"আমি তোমারি মাটিরও কন্যা, জননী বসুন্ধরা
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ॥"[১৫৮]

এমনি বহুবিধ রূপ কল্পনার মধ্যদিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশকে অবগাহন করেছেন। এক অখণ্ড প্রেম চেতনায় রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম তথা স্বদেশচেতনা আবৃত। অনুভূতির আলোকে তিনি দেশজননীর যে হিরণ্ময়ী রূপ অবলোকন করেছেন সেখানে দেশমাতাকে বিশ্বমাতার অঙ্গীভূত রূপে কল্পনা করেছেন।

"হে বিশ্বদেব মোর কাছে তুমি
দেখা দিলে আজি কী বেশে।
... ...
মিলে গেছ ওগো বিশ্বদেবতা
মোর সনাতন স্বদেশে।"[১৫৯]

স্বদেশকে মাতৃরূপে কল্পনা রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের গানে এক অনন্য উদাহরণ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্বে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ২৫টি গান। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথ এই ২৫টি গানে ৪৮ বার 'মা' শব্দটির ব্যবহার করেছেন। বহুবিধ উপমায় তিনি দেশকে মাতৃরূপে কল্পনা করেন।

এই 'মা' কখনো সম্মিলনের ডাক দিয়েছে। দেশের সকল জনগণ তখন 'মা'-এর সন্তান। 'মা'-এর কাছে সকল সন্তান সমান। 'মা'-এর উদ্দেশ্যে সদা ভাইয়ের পাশে ভাইয়ের অবস্থান। তাই কবি স্বদেশ 'মাতা'কে বাংলার চিরায়ত শাশ্বত মাতৃরূপে বর্ণনা করেছেন। কারণ এই মাটির মায়ের সন্তান 'মা'কে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে না। 'মা'-এর অসম্মান মেনে নিতে পারে না। 'মা'-এর জন্য সকল বাধা অতিক্রম করে এক হবার বাসনাকে পণ করে এগিয়ে যাবে বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বাংলা মায়ের সন্তানেরা। কবি স্বদেশকে 'মা' বলতে আরামবোধ করেন। কারণ এর থেকে সুন্দর শব্দ আর হয় না। এ শব্দের উচ্চারণে যে প্রশান্তি তা অন্য কোনো শব্দে নেই। এই শব্দে যে স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসা মাখামাখি করে আছে তা অন্য কোনো শব্দে এমন করে নেই। তাই কবি বলেছেন : 'প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ওই ডেকেছে কে/যেন গভীর স্বরে উদাস করে—আর কে কারে ধরে রাখে?' একদিকে কবি মায়ের মুখের বাণীর সুধায় আত্মহারা বিগলিত। তার স্নেহ-মায়ামাখা আঁচলে ছায়াসিক্ত করে গ্রামবাংলার বৃক্ষলতা আবার সেই আঁচলেই বিশ্বলোক অবলোকন করেন কবি, বিশ্বমায়ের আঁচল তলে মাথা ঠেকান পরম শ্রদ্ধায়।

কবি স্বদেশমাতাকে কখনো স্থান দিয়েছেন অতি সাধারণ শাশ্বত মাতৃরূপে। আবার সেই মা-কেই তিনি সোনার মন্দিরে ঠাঁই দিয়েছেন। কবি মনে এ যেন এক চিরন্তন খেলা। কখনো তিনি দুঃখিনী 'মা'-এর ভাঙা ঘরে একলা পড়ে থাকার কষ্টে কাতর, আবার সেই মায়ের ভুবন মনোমোহিনীরূপে মুগ্ধ। জীবনের স্বার্থকতা উপলব্ধি সেই মাতৃক্রোড়ে জন্ম লাভে। কবি সব ছাড়তে পারেন কেবল মায়ের চরণ ছাড়া। তাই কবি বলেছেন : 'মা গো আমি তোমার চরণ করব শরণ;/আর কারো ধার ধরব না ॥'

মা-ছেলের অতি সাধারণ কথোপকথনেও কবি বেঁধেছেন মা'কে। অনন্য কথা-বার্তায় দৃশ্য হয়ে ধরা দিয়েছে দীন দরিদ্র সন্তানের আহাজারি। প্রশ্নবিদ্ধ করেছে 'মা'-কে : 'মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?/তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে।'

এমনি বহুবিধ কথোপকথনে মা-সন্তানের যে নিবিড় সম্পর্ক রবীন্দ্রনাথ সেই সম্পর্কের আবেগকে ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর গানের স্বদেশচেতনাকে ত্বরান্বিত করতে। পৃথিবীর যেকোনো জাতি এমন কি পশু-পাখির কাছেও সবচেয়ে আপন ও আদরের সম্পর্ক মা-সন্তানের। স্বজাতিকে দেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে তাই কবি বারবার এই সম্পর্কের প্রতি, 'মা' ডাকটির প্রতি গভির আবেগে আশ্রয় নিয়েছেন।

হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভায় রচিত স্বদেশিগানের সময়কাল থেকে শুর করে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্যন্ত বিশেষত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের গানের ভিতর সমগ্র জাতির এক প্রকার নির্ভরতা, বিশ্বাস জন্মেছিল। রবীন্দ্রনাথ যে সুর বা যে গানই বাঁধতেন তাই যেন সকলের বুকে স্বদেশ, স্বজাতির মুক্তির জন্য বহুবিধ

অত্যাচারের প্রতিকার বা সমাধানের পথ হয়ে দেখা দিত। তাঁর রচনায় শক্তি বা বিদ্রোহ প্রকাশ না করে সংযত করুণা ও মমতা দিয়ে গানের ভিতরের মর্মবাণী তিনি মানুষের অন্তরে পৌঁছতে চেয়েছিলেন। সর্বত্রভাবে তিনি কতটা সফল তা আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় স্পষ্টই দৃষ্টান্ত পাই। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্যায়ের প্রতিটি গানে বাংলার রূপকে যে মহিমায় তুলে ধরা হয়েছে তাতে স্বদেশের প্রতি নতজানু হতে বাধ্য আমরা প্রতিজন।

দেশপ্রেমকে জাগ্রতকরণে আমরা পাই তাঁর সমসাময়িক আরো কয়েকজন বিশিষ্ট গীতিকবির নাম। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তাঁরা সকলেই স্বদেশপর্যায়ের গান রচনায় স্বদেশের প্রতি অনুরাগ বা চেতনা জাগ্রতকরণে অগ্রণী ভূমিকা রেখে গেছেন।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীত বিতান*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ২৬৩

২. সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রবিশ্বাসে মানব-অভ্যুদয়*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ১৮০

৩. আহমদ রফিক, *নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ*, ২য় খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১১, পৃ. ৭০৪-৭০৫

৪. *রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)*, ঐতিহ্য প্রকাশনী ঢাকা, মার্চ, ২০০৬, পৃ. ৪৩৭

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৬৭

৭. মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৫, পৃ. ২২৪

৮. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (নবম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭

৯. ড. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২য় সং, ২০১১, পৃ. ৭২-৭৪

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৪

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৪

১২. *রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৯৭

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৭

১৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীত বিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৫

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৬

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬

১৮. আহমদ রফিক, *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ৫৯

১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৫১-৫২

২০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জন্মদিনে*, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৩৬৭, পৃ. ৩৪

২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫।

২২. ড. মানস মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ : নানা প্রসঙ্গ*, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ২৩

২৩. আহমদ রফিক, *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*, পৃ. ৬৫

২৪. *রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড)*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮-২০

২৫. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (অষ্টম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫০

২৬. ইন্টারনেট সূত্র. https://www.protidinersangbad.com/todays-newspaper/eid-bises-ayojonVigting Date 15.05.2022

২৭. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

২৮. *রবীন্দ্র রচনাবলী*, (অষ্টম খণ্ড) পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

২৯. আহমদ রফিক, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫

৩০. রবীন্দ্র রচনাবলী, শতবার্ষিক সংস্করণ, ১১শ খণ্ড, পৃ. ৫৩৭

৩১. ড. মানস মজুমদারের '*রবীন্দ্রনাথ : নানা প্রসঙ্গ*', পৃ. ৩৯ ।

৩২. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (তৃতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪।

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪২৪

৩৪. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), *পশ্চিমবঙ্গ*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, ১৪০৫, পৃ. ১৪১-১৪২

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩

৩৬. *রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ.,. ১৪৯

৩৭. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
৩৮. দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
৩৯. *পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা ১৪০৩*, তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা, পৃ. ৮০
৪০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৯
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৬
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৮
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৫
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৮-৮১৯
৪৫. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *ভাষা ও দেশের গান স্বরলিপিসহ*, অনুপম প্রকাশনী ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭-১৮
৪৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৮
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৭
৪৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৬
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২০
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২০
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৬
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
৫৩. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫৪
৫৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮১৯
৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২১
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২১
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২২
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
৬৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫
৬৫. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৬৬. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৭
৬৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৫
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৯
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮

৭৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৮
৭৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
৭৮. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯
৮০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬১
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
৮২. কুমকুম ভট্টাচার্য (সম্পা.), *শতগান*, সরলা দেবী, কলকাতা, পৃ. ২১৫-২১৬
৮৩. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭
৮৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
৮৫. অমল মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রগানের অন্তরভুবন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮, পৃ. ৪৬।
৮৬. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০।
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬
৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২
৯১. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫
৯২. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮-৯৯
৯৩. সীমা বন্দোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা, পৃ. ৬৫
৯৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৬
৯৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬০
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫১
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২
১০০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
১০১. প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ১৩০
১০২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৭
১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১
১০৬. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
১০৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৭
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৮
১১১. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৪
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৫

১১৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৫

১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪

১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩

১১৬. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৭

১১৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৪।

১১৮. হায়াৎ মাহমুদ, *রবীন্দ্রনাথ অধরা মাধুরী*, শুদ্ধস্বর, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ৪৬

১১৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯৩

১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৮

১২১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২

১২২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৬

১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮

১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৫

১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১

১২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২

১২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৫

১৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭

১৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১০২

১৩২. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩-১৭৪

১৩৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৭

১৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬৭

১৩৫. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯-৩০

১৩৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩১

১৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩৮

১৩৯. সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫১

১৪০. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভাষা ও দেশের গান স্বরলিপিসহ, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৫, পৃ. ১৭৩

১৪১. রামমোহন রায়, *রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী*, আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র, কলকাতা, ১৮৮৮, পৃ. ৫০

১৪২. সরকার বিজলি (সম্পা.), *রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র*, নৈহাটি, ২০০৯, পৃ.৩৩

১৪৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১-২৫৩

১৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২১

১৪৫. মোহাম্মদ আমীন, *বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন; সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০৮ পৃ. ১২৭

১৪৬. শ্রীমন্তকুমার জানা, *রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা*, সাহিত্যবিহার, বৈঠকখানা রোড, কলকাতা, জানুয়ারী ২০১৯, পৃ. ৮-৯

১৪৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (প্রবন্ধ : হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়), হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (রবীন্দ্রসংগ্রহ), মৃত্তিকা, কলকাতা, ১৪১৩ (২য় সংস্করণ), পৃ. ৭৪

১৪৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬২

১৪৯.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২০
১৫০.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২২
১৫১.	পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৩
১৫২.	পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯
১৫৩.	পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৭
১৫৪.	পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫১-২৫২
১৫৫.	*রবীন্দ্র রচনাবলী* (প্রথম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০৯
১৫৬.	*রবীন্দ্র রচনাবলী* (দ্বিতীয় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮
১৫৭.	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১
১৫৮.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৭।
১৫৯.	*রবীন্দ্র রচনাবলী* (পঞ্চম খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৮।

তৃতীয় অধ্যায়
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে স্বদেশচেতনা
(১৮৬৩-১৯১৩)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশভাবনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে নিজের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠা করেন, ইতিহাসে নাম লেখান পঞ্চগীতিকবির একজন হিসেবে। স্বরচিত রচনাশৈলী ও স্বদেশপ্রেমের গান রচনার এক ব্যতিক্রমী ও উজ্জ্বল নক্ষত্র দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। একজন সেটেল্‌মেন্ট অফিসার হিসেবে অন্যান্য অফিসারের মতো কেবল দায়িত্বের পুনরাবৃত্তির পক্ষে তিনি ছিলেন না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, স্বদেশের মানুষের পক্ষে কথা বলতে গিয়ে বহু ধিক্কার ও ভর্ৎসনার শিকার হয়েছেন তিনি। ইংরেজদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের কারণে দেশপ্রেমী এই বাঙালিকে তাঁর ২০ বছরের চাকুরি জীবনে ১৫ বার স্থানান্তর হতে হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় নিজেই তাঁর স্বদেশভাবনা সম্পর্কে নিচের বক্তব্য তুলে ধরেছেন–

> "আমার পূর্ববর্তী সেটেল্‌মেন্ট অফিসারেরা জরীপে জমি বেশী পাইলেই খাজনা বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটেল্‌মেন্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এরূপ খাজনা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন-বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্ব জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমির পরিমাণ হস্তবুতে লেখা হয়। এমন কি এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমি এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট বেশী খাজনা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজ্য যদি বেশী জমির জন্য বেশী খাজনা দাবি করেন, ত তাঁহার দেখাইতে হবে যে, প্রজা কোন্ বেশী জমিটুকু অধিকার করিয়াছে। আরও ড্রেনেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমির বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজাদিগের খাজনা কমাইয়া দিই। ঐ রায় হইতে জজের নিকট আপিল হয় এবং তাহাতে জর্জ সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজনা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময়ে স্যার চার্লস এলিয়ট বঙ্গদেশের লেফটেন্যান্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া উক্ত বিষয় তদন্ত করিতে স্বয়ং মেদেনীপুর আসেন ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভর্ৎসনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেল্‌মেন্ট আইন বিষয়ে তাহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোট লাট ক্রুদ্ধ হইয়া আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেল্‌মেন্ট অফিসারদের কর্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তখনই তাহাই আইনে ঢুকাইয়া দেন; এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন। ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপিল হয়। হাই কোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন এবং সেই হাই কোর্ট রুলিং অনুসারে এখন সমস্ত বঙ্গদেশে সেটেল্‌মেন্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমি বেশী পাইলেই প্রজার অমতে আর খাজনা বৃদ্ধি হয় না।"[১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বব্যক্ত এই উক্তির মধ্যদিয়ে মূলত এক অন্যায় আপসহীন দেশপ্রেমী যুবকের সন্ধান পাই। অত্যন্ত বিচক্ষণ, আবেগী, একগুঁয়ে ও মেধাবী দ্বিজেন্দ্রলাল রায় দেশবাসীর নির্বুদ্ধিতার প্রতিবাদস্বরূপ প্রহসন রচনা 'একঘরে' প্রকাশ করে তীব্র আক্রোশের শিকার হন। বিলেত ফেরত

দ্বিজেন্দ্রলালকে কালাপানী পার হওয়ার অপরাধে প্রায়শ্চিত্ত করতে বলেন তাঁর স্বজন ও তথাকথিত সমাজরক্ষকেরা। তিনি তা করতে রাজি না হলে তাঁকে সমাজচ্যুত করা হয়। এর কঠোর প্রতিবাদস্বরূপ সমাজপতিদের ব্যঙ্গ করে তিনি রচনা করেন 'একঘরে' নামক প্রহসন রচনাটি। অত্যন্ত নিপুণ ও প্রাসঙ্গিক এই প্রহসন রচনা সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বলেন, 'ইহার ভাষা ঠাট্টার ভাষা নহে। ইহার ভাষা পদদলিত ভূজঙ্গমের ক্রূদ্ধ দংশন, ইহার ভাষা অগ্নিদাহের জ্বালা।'[২]

সহজ সাদাসিদে জীবনের অধিকারী ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলার রায়। ধর্মীয় ভণ্ডামি ও গোড়ামীকে তিনি তীব্র কষাঘাত করেছেন তাঁর এই 'একঘরে' প্রহসনের মাধ্যমে। এটির অংশবিশেষ নিচে দেয়া হলো

"নদীতীরে কাঁচা পাকা বাড়ী কয়খানা–
অধিকাংশ চালাঘর। ময়লার খনি
জীর্ণ গলি। ওই সব মিষ্টান্ন বিপনি!"[৩]

তিনি অবিরামভাবে কবিতা, গান, নাটক, প্রহসন রচনা করেছেন। প্রতিটি রচনাই তাঁর স্বকীয়তা ও নতুন ধারার স্বাক্ষর বহন করে।

ব্যক্তি-জীবনেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন একজন মানুষ। নিজের ভাবনার কাছে কখনো আপস করেননি তিনি। ছোটবেলা থেকেই সমাজ যা কিছু চাপিয়ে দিতে চেয়েছে তাই তিনি বর্জন করেছেন। বিবেককে তিনি সবচেয়ে বড় বন্ধু মনে করতেন। বিবেকের সাড়া পেলে তিনি সমাজের অনুমতির তোয়াক্কা করতেন না। লেখনি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাঁর এই বলিষ্ঠ রূপটি পরিলক্ষিত হয়। সে কারণেই হয়তো বলিষ্ঠ ও বিদ্রোহী কবি শেলী ছিলেন তাঁর প্রিয় ব্যক্তিত্ব। ঐশ্বরিক ক্ষমতার বিরুদ্ধেও মানব বিদ্রোহের জয়গান গেয়েছেন শেলী। শেলীর মতো পার্থিব কবিদের অনুপ্রেরণা মূলত তাঁর কবিতার স্বদেশপ্রেমবোধ অর্থাৎ কবিমানস গঠনে সহায়তা করে। তাই রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠির উত্তরে পাই তাঁর বলিষ্ঠ উচ্চারণ :

> "আমি ক্ষুদ্র মানুষ, সামান্য জীব যত দূর সাধ্য সংসারের দূষিত বায়ুতে স্বীয় চরিত্র অকলঙ্কিত রাখিব, তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া চলিয়া যাইব, এই বাসনা। ...আমি শৈশব হইতেই সমাজের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করিতে শিক্ষিত হইয়াছি। এখনও বিবেকের নিকট সমাজের আজ্ঞাকে তুচ্ছ করি, ও আশা করি চিরকাল করিতে পারিব, আমি যাহা বিবেকানুমোদিত মনে করি, তাহাতে সমাজের সম্মতির জন্য অপেক্ষা করি না ও বোধ হয় কখন করিব না। ইহার জন্য হয়ত আমাকে অনেক অন্যায় অত্যাচার সহিতে হইবে। তাহা ধীরতার সহিত সহিব মনে করিয়াছি। শেলীর ঐ কয়েক ছত্র আমার জীবনে অন্ততঃ কিছুও পরিবর্তন করিবে আশা করি।"[৪]

এই বলিষ্ঠতা ও আত্মমর্যাদাবোধ তাঁর জীবনের কাল হয়ে উঠেছিলো। বিলেত থেকে ফিরে ছোট লাটের সাথে সাক্ষাৎকালে তাঁর প্রবল আত্মমর্যাদাবোধ মূলত ছোট লাটের বিশেষ পছন্দ হয়নি। কারণ 'নেটিভসুলভ বিনয়' দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে কখনই ছিলো না। তাই প্রবল মর্যাদাবোধ ও স্পষ্টবাদিতার কারণে দ্বিজেন্দ্রলাল কখনই তাঁর যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি করতে পারেননি। বরং তিনি জীবনভর ভোগ করেছেন এক স্থান হতে অন্যত্র ক্রমাগত বদলির বিড়ম্বনা। ফলে দীর্ঘ সময়ের জন্য সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র কলকাতায় তিনি স্থিত হতে পারেননি। তাঁর সংস্কৃতিমনা-সাহিত্যপিপাসু মন বারবার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। যে কারণে গর্ভনমেন্টর কালেক্টর হওয়া সত্ত্বেও চাকরির প্রতি তাঁর কোনো মায়া ছিলো না।

দেশভক্তির নাটক রচনা ও গানের কারণে গর্ভনমেন্টের কাছে তিনি বড্ড অপ্রিয় ছিলেন। সমগ্র চাকরিজীবন তাঁর অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক ছিলো বলেই এই অস্থিরতায় তাঁর সাহিত্য রচনাতেও তিনি মনোযোগী হতে পারেননি, বরং উদাসীন ছিলেন অনেকাংশেই। কর্মজীবনের সব জটিলতা তাঁকে তাঁর রচনায় স্থির হতে দেয়নি। চাকরির এক বছর অর্ধবেতনে ছুটির দরখাস্ত তাঁর ক্ষেত্রে হয় বরখাস্ত। অনেকবার তিনি উদ্ধৃত করেছেন, 'যৎসামান্য বেতন ও একটু ভদ্র ব্যবহার পাইলেই আমার এ বাকি দিন কয়টা কোন মতে কাটিয়া যাইবে।'[৫]

আত্মমর্যাদাসম্পন্ন কবি এই মর্যাদাহানির চাকরিকে জীবন বৃথা হয়ে যাবার কারণ বলে ব্যক্ত করেছেন। কর্মজীবনে হয়রানি তাঁর শিল্পীসত্তাকে বারংবার আঘাত করেছে। ঐতিহাসিক ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে তাঁর দেশভক্তিমূলক নাটক ও গানসমূহ জনপ্রিয়তা পায় এবং জনমনে দেশপ্রেমের উদ্রেক করে–এসবই মূলত তাঁর প্রতি ব্রিটিশ সরকারের মানসিক অত্যাচারের কারণ। এই বিষয়টি অনুভব করে তিনি লিখেছেন :

> "ক্রমাগত এই ট্রান্সফার আমাকে যথার্থই যেন অস্থির করে তুলেছে। এত বদলী কর্চ্ছে কেন জান? আমার বিশ্বাস স্বদেশী-আন্দোলনে যোগদান আর ঐ 'প্রতাপসিংহ' নাটকই তার মূল। কিন্তু, কি বুদ্ধি! এমনি একটু হয়রান কর্লেই বুঝি আমি অমনি আমার সব মত ও বিশ্বাসকে বর্জন কর্ব্ব?"[৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন নিজেস্ব ভাবনায় অটল এক চিরসবুজ দেশপ্রেমিক। এতো অত্যাচারেও তিনি নিজস্ব মতের বাইরে দাঁড়াননি। বরং শেষ জীবনে এই চাকুরি ছাড়তে বাধ্য হন।

স্বদেশভক্ত ও রাজভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

বিলেতে থাকাকালীন সময়ে উন্নত ইংল্যান্ডকে তিনি স্বচক্ষে দেখেন এবং নবজাগরণের সমৃদ্ধ পাশ্চাত্য দর্শন ও সাহিত্য পাঠ তাঁকে দিয়েছিল ব্যতিক্রমী নৈতিক দর্শন ও জীবনবোধ। যে কারণে ইংরেজদের তথা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে তিনি দাঁড়াতে চাননি। তিনি মনে করতেন ইংরেজদের কাছ থেকে বাঙালির অনেক কিছু শিখবার আছে, নেবার আছে। দেশের দুর্দশায় তিনি গভীর দুঃখ পেলেও এই দুঃখ-দুর্দশার কারণ নিরূপণে তাঁর ভাবনার অসংগতি পরিলক্ষিত হয়। এসবের কারণ হিসেবে তিনি কখনই একা ইংরেজদেরকে দায়ী করতে রাজি ছিলেন না। তিনি কল্পনা করতেন বিলেতের মতো উচ্চশিক্ষায় দীক্ষা পাবে স্বদেশ। সাহিত্য-শিল্পে নিজেদের বিকশিত করতে ইংরেজদের সহায়তার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। ইউরোপের উন্নয়নের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও দর্শন ভাবনা এদেশের মানুষের মনেও নবজাগরণের জোয়ার এনে দিয়েছিল। তাই তিনি স্বদেশকে ভালোবাসার সাথে স্বদেশে রাজনীতি তথা ইংরেজ শাসনকেও শ্রদ্ধা করতেন। যদিও আপাতদৃষ্টিতে বিষয়টি অদ্ভুত শোনালেও বাস্তবিক দিক বিবেচনায় যদি ইংরেজদের আগমন এ বঙ্গে না হতো হয়তো উন্নয়নের সূর্য অকল্পনীয় হয়ে থাকতো বা আরো বহু সময় লাগতো উন্নয়নের এ ধারায় আসতে। অন্ধকারাচ্ছন্নতা ও কুসংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ বাঙালিকে মুক্তির জন্য প্রয়োজন ছিলো ইউরোপীয় 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র বাণী। যে বাণী

বাঙালির মনোজগতের দুয়ার খুলে৮ দিয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কংগ্রেস নেতাদের বিরুদ্ধেও কথা বলেছেন। তাঁর মতে, প্রকৃত দেশপ্রেমের লক্ষণ এদের মধ্যে নেই। জাতীয় নেতাদের আপসকামী মনোভাবেও তিনি আহত হতেন। তিনি কেবল আবেগ দিয়ে নয় যুক্তি দিয়ে লড়তে বলেছেন। তাই তিনি লিখেছেন–

> "তারপর এই সৌখীন বন্দেমাতরম্ ধ্বনির উপর আমার বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছে। এর সঙ্গে যে Sincerity নাই, Feeling নাই, তাহা আমি বলি না। কিন্তু সে Feeling ঐ বন্দেমাতরমেই নিঃশেষ হইয়া যায়; কাজ হয় না। কেবল ভাবপ্রবণতা, উত্তেজনা বা Feeling-কবির কাজ হইতে পারে, Patriot কর্ম্মীর কাজ নহে। Patriot-এর কাজ স্বার্থত্যাগ, উৎসর্গ, সেবা। Principle-এর জন্য কয়জন দেশে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছে? দেশ-উদ্ধারন্ত সন্ন্যাসীর কাজ, ত্যাগীর কাজ; ভোগী বা বিলাসীর কাজ নয়। আমাদের সেই ত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। ...হ্যাট টি' পরিত্যাগ করিতে পারেন না, ...সভাপতি না হইলে অহঙ্কারে কোন সভাতে পদার্পণ পর্যন্ত করেন না–বলি, এসব কি দেশ-হিতৈষণা? এঁদের কি দেশের যথার্থ Leader বলিয়া মানিব? কিছু ছাড়িতে চাও না, দেশ-উদ্ধার করিবে Conference করিয়া, ধিক্!' সাহেবদের 'দেবতা' বর্ণনা করে কংগ্রেসী নেতাদের প্রতি ব্যঙ্গ করে লিখেছেন–
>
> "আমরা বিলেতফের্তা কটায়,
> দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই
> আমাদের সাহেব যদিও দেবতা
> তবু ঐ সাহেবগুলোকে চটাই।"[৭]

দেশীয় শিল্পের উন্নতিতে ইংরেজদের নানাবিধ উদ্যোগের পক্ষে বাঙালির সামগ্রিক উন্নয়নে ইংরেজদের ভূমিকাকে তিনি অস্বীকার করতে নারাজ ছিলেন। দেশের দুর্দশায় তিনি বারবার দুঃখ পেয়েছেন তথাপি ইংরেজ হটাবার পক্ষে তিনি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন বাঙালিদের মধ্যকার বিরাজমান হিংসা, রেশারেশি ও কুসংস্কার থেকে আত্মিক মুক্তি না করতে পারলে বাহ্যিক কোনো মুক্তিই প্রকৃত স্বাধীনতা এনে দেবে না । যদিও অসংগতিপূর্ণ এ ভাবনা তাঁকে বহুবিধ সমালোচনার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে। রাজশক্তির বিরুদ্ধে যারা তাঁকে দেশ ও স্বদেশের শত্রু বলে মনে করতেন, তাদের তৎপরতায় তিনি বহুবিধ জটিলতায়ও পড়েছেন। তবুও তিনি ব্রিটিশ রাজশক্তিকে এদেশের জন্য কল্যাণকর বলে মনে করতেন–মূলত দেশকে ভালোবাসার জন্যেই। ব্রিটিশ রাজশক্তি বিস্তৃত হলে এদেশের আরো উন্নতি হবে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন। এ যেন অন্ধ দেশপ্রেমের ভাবনাতুর এক উদাহরণ। এমন কি তিনি সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে 'শোক সংগীত' রচনা করেন। এ প্রসঙ্গে শ্রী সুধীর চক্রবর্তী উল্লেখ করেছেন–

> "ভাবতে একটু কষ্ট লাগে যখন জানি, সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের মৃত্যুতে দ্বিজেন্দ্রলাল স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে 'গুণগ্রাহী শোক সঙ্গীত' রচনা ক'রে কোরাসের দল গঠন ক'রে কলকাতার বিভিন্ন পথে পদব্রজে সেই গানটি গেয়ে পরিক্রমা করেছিলেন। উক্ত শোকসংগীতের উদাহরণ–
>
> গিয়াছে চলি আজ বৃটন মহারাজ
> রাখি এ বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব,
> ধর্ম্ম কর আজ দুঃখ বেদনাই,
> কর্ম্ম কর আজ বন্ধ।"[৮]

এদেশে মানুষের মনে নবজাগরণের ভাবনার উদ্রেক হয় ইউরোপীর জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রভাবের ফলে। তাই তিনি ইংরেজদের কর্মকে কল্যাণকর ও মঙ্গলজনক মনে করতেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মনোভাব শেলী, শেক্সপিয়র, টমাস পেইন, ফ্রান্সিস বেকন ও হার্বাট স্পেন্সার-এর সাহিত্য ও দর্শনে মুগ্ধ ছিলো। তাই তিনি সেই সমৃদ্ধ ও উন্নত পাশ্চাত্য চেতনাকে আবিষ্কার করতে চেয়েছেন স্বদেশপ্রেমের বেলাতেও। স্বদেশকেও সেই জ্ঞানের আলোকচ্ছটায় আলোকিত করবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন তিনি। এই জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে, উন্নয়নের জোয়ার থেকে বাঙালিকে আত্মাহুতি দিতে বাধা দিয়েছেন। স্বদেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল সেই ভাবনায় শত্রুকেও নিজের ও স্বদেশের কল্যাণের স্বার্থে সহ্য করবার কথা বলেছেন। তা সেই উত্তাল সময়ে কারোর পক্ষেই বোঝা সহজতর ছিলো না, বরং প্রায় সকলেই তাঁর ভাবনার সমালোচনা করেছেন। নিজে স্বদেশপ্রেমী বলে সারাজীবন ইংরেজদের যে অত্যাচার সহ্য করেছেন তবুও তিনি বণিক ও ব্যবসায়ী ইংরেজদের চটাতে নিষেধ করতেন। কিন্তু এই বণিক শ্রেণির সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেশের মানুষের স্বাধীনতা হরণ করে, দেশের মানুষকে নির্মমভাবে শোষণ ও অত্যাচার করত। পঞ্চম জর্জের অত্যাচারী শোষক চরিত্রটি পাশ্চাত্য সভ্যতার আলোকচ্ছটার পেছনে যে অন্ধকার লোলুপ রূপটি ছিলো তা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচেতনায় উপলুব্ধ হয়নি। বরং তিনি মানবমনের জড়তা, সংকীর্ণতা ও ভেদাভেদমূলক ভাবনাকে বড় শত্রু বলে বিশ্বাস করতেন। এ প্রসঙ্গে তাঁর স্নেহভাজন প্রমথনাথ ভট্টাচার্য স্মৃতিচারণায় বলেন–

> "তাঁহার রচিত নাটকের অনেক স্থানে আছে যে, প্রতিষ্ঠিত কল্যাণকর কোন রাজশক্তির বিরুদ্ধে যাহারা অযথা অস্ত্রধারণ করে তাহারা কেবল শান্তি ও ধর্মের শত্রু নহে–তাহারা দেশ ও দশের শত্রু। ...তিনি আরও বলিতেন যে, স্বদেশভক্ত লোকও যে রাজভক্ত হইতে পারে–ইহা যাহারা না বুঝে তাহাদের উপরে দয়া হয়।"[৯]

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি আন্দোলনের ভাবনাটি ছিলো রবীন্দ্রনাথের মতোই ব্যতিক্রমী ধারার এবং ভিন্ন। বাহ্যিক আন্দোলন থেকে আত্মশক্তি, আত্মসংগঠন এবং সার্বিক উন্নয়নকে তিনি বেশি গুরুত্ব দিয়ে গেছেন। সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং মানবিকতা প্রতিষ্ঠাকে তিনি সারাজীবন সমর্থন করে গেছেন। সাম্রাজ্যবাদ, ফ্যাসিবাদ দূর না হলে দেশে শান্তি আসবে না, ভারত মুক্ত হবে না, রবীন্দ্রনাথের মতো এ ধারণাকে তিনিও কখনই সমর্থন করতে পারেননি। তবে তাঁর ভাবনার সবচেয়ে বড় দুর্বল দিকছিলো ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে থাকা। তিনি ইংরেজদের কখনো শত্রু বলে মনে করতেন না বরং তাদের শাসন থাকলে দেশের উন্নতি হবে এমন ভাবনাতে ছিলেন বদ্ধ পরিকর। ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আমাদের মনে আত্ম-স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধিকার বোধের জাগ্রত হয়।

সেই স্বাধিকার বোধই ধাবিত করে আমাদের স্বাধিকার লাভের প্রচেষ্টায়। মোঘল সভ্যতার চরম নিস্তেজ ও অকেজো পরিস্থিতিতে এ বাংলায় ইংরেজ শাসনামল শুরু হয়। দেশের শাসনব্যবস্থা থেকে শুরু করে সমাজ উন্নয়ন গতিবেগ, এমন কি জীবনীশক্তিতে সভ্যতার ক্ষয় ধরেছিল। জনসাধারণের আত্মিক

দুরবস্থা অসাধু ও অযোগ্য লোকদের সিংহাসন নিয়ে হীন কলহ সমাজব্যবস্থাকে দুর্বিষহ করে তুলেছিল। এমনই এক চরম অবস্থাতে এ দেশে ইংরেজদের প্রবেশ।

> "অকর্মণ্য শাসকগোষ্ঠীর ও সামন্তশ্রেণীর চরম অপদার্থতা, তাদের শোচনীয় নৈতিক অধোগতি, তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় কুৎসিত ও ইন্দ্রিয়াসক্ত সাহিত্যের পুষ্টি, পবিত্র গৃহজীবনেও দুর্নীতিপরায়ণতার আবির্ভাব, ধর্মের নামে নানা ব্যভিচার, ব্যক্তি স্বাধীনতার একান্ত অভাব ভারতীয় সমাজকে ভীষণভাবে পঙ্কিল ও কলুষিত করে রেখেছিল। এমন দিনে অসার, জীর্ণ, মৃতপ্রায় ভারতীয় সমাজে ইংরেজ শাসন বহন করে আনে এক উন্নততর সভ্যতার জীবনাদর্শ। ভারতে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠাকে তাই মধ্যযুগীয় ভারত-ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গবেষক নবযুগের শুভ অরুণোদয় বলে চিহ্নিত করেছেন। শতধাবিচ্ছিন্ন, আত্মঘাতী অন্তর্দ্বন্দ্বে লিপ্ত ভারত ইংরেজ শাসনে ধীরে ধীরে ঐক্যগ্রথিত, কেন্দ্রীয়শাসিত হয়ে ওঠে এবং সেই সঙ্গে বৃহত্তর ও উন্নততর সমাজ ও সভ্যতার সম্ভাবনা তার জীবনে দেখা দেয় স্পষ্টভাবে।"[১০]

এই সকল পরিস্থিতি সম্পর্কে একটি স্পষ্ট ধারণা ছিলো দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। যে কারণে ইংরেজ শাসনামল ভারতের ইতিহাসে উন্নয়নের যে নবদুয়ার খুলে দিয়েছিল তা তিনি অস্বীকার করতে পারেননি, বরং সারাজীবন এরজন্য কৃতজ্ঞতা পোষণ করেছেন। ইংরেজ বিতাড়িত হলে দেশ যদি আবার অরাজকতায় লিপ্ত হয় ও এই উন্নয়নের ধারা ব্যাহত হয় সেই আশঙ্কায় মূলত তিনি স্বদেশ ভক্তির সাথে সাথে রাজতন্ত্রকেও ভক্তি করতেন।

> "দ্বিজেন্দ্রলাল স্বীয় জীবনের আদর্শ দ্বারা তাহার এক বিচিত্র সাক্ষ্য প্রদান করিয়া গিয়াছেন। দেশের হিতানুধ্যানে তিনি প্রাণপাত করিয়াছেন, মানি; কিন্তু, দেশকে ভালবাসিলেই যে ইংরাজজাতির প্রতি বীতরাগ ও অন্ধভাবে বিদ্বিষ্ট হইতে হইবে,-তদীয় বাক্যে, কর্ম্মে বা চিন্তায়-এরূপ মতের তিনি তিলার্দ্ধও পোষকতা করিয়া যান নাই। মাতৃভূমি ও আপন 'জাত-ভাই'দের মঙ্গলের প্রতি অপলক লক্ষ্য রাখিয়া, শাসকগণের অবৈধ, উদ্ধত ও অন্যায় কার্য্যের তিনি যখন প্রতিবাদ করিতে-থাকিতেন তখন সন্দেহ হইত-বুঝিবা মূলে তিনি মনে মনে ইংরাজ রাজের প্রতি বড়ই বেশী বিদ্বেষপরায়ণ। কিন্তু যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে মিশিয়াছেন তাঁহারা জানেন-তিনি আসলে এ রাজত্বের কতদূর গুণগ্রাহী ও হিতার্থী ছিলেন, এবং যখন তিনি ঐরূপ কোন প্রতিকূল মন্তব্য উত্তেজিত আগ্রহে ব্যক্ত করিতেন, প্রকৃতপক্ষে তখনও কিন্তু সর্ব্বথা এই রাজ্যের ভাবী ও স্থায়ী কল্যাণই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য থাকিত। দেশবাসীরা যাহাতে পরানুগ্রহের জন্য লালায়িত না রহিয়া ক্রমে এখন 'আপন পায়ে' আপনারা 'ভর করিয়া দাঁড়াইতে' শেখে,-স্বজাতি ও মাতৃভূমির সর্ব্ববিধ শুভ-সাধনে, আত্মোন্নতি বিধানে তাহারা যাহাতে একান্ত মনে অবহিত হয়, এ জন্য তিনি নিত্য-নিয়ত, অতঃপর নিতান্তই চিন্তান্বিত ও যত্নবান ছিলেন; এবং সত্য বলিতে কি-ঠিক সেইজন্য,-যতদিন আমরা স্বরাজ্য লাভে যোগ্য ও সমর্থ না হই ততদিনের জন্য-তিনি এই বৃটিশ-রাজত্বেরও উন্নতি ও স্থায়িত্ব সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিতেন। ইংরাজের আগমন যে এ-দেশে আমাদের এই বহুবিধ উন্নতির মূল; আর, এই উদার-নৈতিক রাজত্বের উপরে যে আপাততঃ আমাদের যা-কিছু মঙ্গল, যত-কিছু-উন্নতি,-এমন কি, প্রত্যুতঃ, আমাদের জাতীয় জীবন-মরণও একরূপ নির্ভর করিতেছে, ইহাই তাঁহার অকপট ধারণা বা বদ্ধ-মূল বিশ্বাস ছিলো। এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, সেই স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে অত উদ্দাম উত্তেজনার মধ্যেও, আমরা দেখিয়াছি-তিনি ঐ বৈর-বুদ্ধিসঞ্জাত বিদেশী বহিষ্কার বা "বয়কটে"র বিপক্ষে অমন তীব্র অভিমত প্রচার করিয়া, তাঁহার একান্ত অনুরাগী ও পরম গুণগ্রাহীদের কাছেও তৎকালে যথেষ্ট লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন।"[১১]

স্বদেশপ্রেমী দ্বিজেন্দ্রলাল রূপকতা, হঠকারিতা সহ্য করতে পারতেন না। স্বার্থান্বেষী দেশ নেতাদের তিনি রীতিমতো ঘৃণা করতেন। কেবল বক্তৃতা নির্ভর নেতাদের তিনি তাঁর বাক্যের চাবুকে দেশপ্রেম শেখাতে চেয়েছেন । তিনি কর্মে বিশ্বাসী ছিলেন বলেই বরিশালবাসীর স্বদেশি আন্দোলনকে সাধুবাদ জানিয়েছেন। হিন্দু-মুসলমান এক হয়ে একান্ত নিষ্ঠায় স্বদেশি ধ্যানে তন্ময় ও তাদের আত্মহারা রূপ পরিলক্ষিত হয়। পল্লিগ্রাম পর্যন্ত বিদেশি দ্রব্য বর্জনে সমর্থ হয়েছে। স্বদেশের এইরূপ বিচিত্র ও অপরূপ মূর্তি দেখে বিস্মিত মনে শ্রীদেব কুমার রায় চৌধুরী বরিশাল থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে পত্র লেখেন এবং তাঁর উত্তরে খুলনা থেকে তিনি লিখলেন তাঁর ত্যাজদীপ্ত দেশপ্রেমবোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্পষ্ট উপলব্ধির কথা–

> "পূর্বেও শুনিয়াছিলাম, বরিশালই একাগ্র সাধনায় 'স্বদেশী' ভাবকে স্বভাবে পরিণত করিয়াছে। আজ তোমার পত্রে সে কথার বিস্তৃত বিবরণ জানিয়া আমার যে কত আনন্দ হইল তাহা আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি না। বরিশালবাসী আজ সমগ্র ভারতের আদর্শ, শিক্ষক, নমস্য। ওখানে কার্য্যতঃ তোমরা যে আদর্শ দেখাইতেছ তাহা কল্পনায় প্রত্যক্ষ করিয়া এই দূর হইতেও আমি নিজেকে ধন্য জ্ঞান করিতেছি।
>
> এই যত-সব বাক্য-সর্ব্বস্ব, কপটাচারী নেতাদের কানে ধরিয়া বরিশালে নিয়া দেখাইয়া দাও–কেমন করিয়া কাজ করিতে হয়, স্বার্থত্যাগ করিতে হয়; দেশের যথার্থ যে প্রাণশক্তি, অর্থাৎ এই আমাদের অশিক্ষিত অগণিত চাষা ও গ্রামবাসীদের মধ্যে আপনাদিগকে মিলাইয়া মিশাইয়া দিয়া, কি করিয়া তাহাদিগকেও দেশভক্তির এই মহামন্ত্রে দীক্ষিত ও দৃঢ়-ব্রত করিয়া তুলিতে হয়। কাজের সঙ্গে কোনই সম্বন্ধ নাই,–শুধু কেবল বক্তৃতা, বক্তৃতা, আর বক্তৃতা। এই সৌখীন নেতা বা বক্তাদের (একসঙ্গে দুটো শব্দই বলিলাম; কারণ, বক্তা না হইলে এখন আর দেশের নেতা হওয়া যায় না।) উপরে আমার তো এখন ঘৃণাই জন্মিয়া গিয়াছে। এখন কি উপায়ে এই সব আত্ম-সর্ব্বস্ব, 'নাম-কাওয়াস্তে' নেতাদের হাত থেকে দেশবাসীকে, বিশেষতঃ আমার ভবিষ্যৎ ভরসাস্থল, আশা-কল্পতরু, সোনার চাঁদ ঐ যুবকদিগকে রক্ষা করা যায়, তাই আমি অনেক সময় ভাবি। তা নইলে ত আমি আর মঙ্গল দেখি না। এদের পাল্লায় পড়িয়া পরিণামে আমাদের দেশের যে নানারকম দুর্গতির একশেষ হইবে আমি তাহা দিব্য চক্ষে দেখিতে পাইতেছি। নেতা যদি তেমন কেহ থাকেন, তিনি তোমাদের–ঐ অশ্বিনীকুমার দত্ত মহাশয়। দীর্ঘজীবী হউন তিনি। তাঁহাকে আমার আন্তরিক শ্রদ্ধাপূর্ণ নমস্কার দিও। হৌন না তিনি কায়স্থ;–আমি তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বিবেচনা করি। তাঁহাকে বলিও–তিনিও যেন আবার ঐ কপটমতিদের চক্রান্তজালে আপনাকে জড়াইয়া না ফেলেন। তাহ'লে তাঁহারও সকল শ্রম, সব আশা পণ্ড হইবে এবং তিনি নিজেও পরে বিপদে পড়িবেন। এসব নেতারা কেবল পরের দোষই দেখিতে মজবুদ। পূর্ব্ববঙ্গের ভাইদের এতকাল তাঁরা ত অবজ্ঞাই করিতেন,–এখন তবুও যদিবা প্রকাশ্যে ততটা না করুন, মনে মনে ও কার্য্যতঃ যে তাহাদের তত আমল দিতে রাজী নন, এটা কিন্তু বেশ বোঝা যায়। (বাঙ্গালরা ত কোনদিনই 'কুছ কাম কা নেহি'।) অথচ তাঁদের নিজেদের যে 'সর্ব্বাঙ্গে ঘা ওষুধ দিই কোথা'–অবস্থা, তা তাঁরা একটিবার ভুলেও ভাববার অবকাশ পান না। মাথায় থাকুক আমার 'বাঙ্গাল' ভাই-সব,–তাঁরাই তো মানুষ! জয় বরিশালবাসীর জয়,– জয় আমার 'বাঙ্গাল' ভাইদের জন্য।"[১২]

সত্যনিষ্ঠ দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই সত্যবাদিতার জন্যে অনেক সময় আহত হয়েছেন। মানুষজন তাঁকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে অটল থেকেছেন। যুক্তিবাদী, তার্কিক ও বাস্তবদৃষ্টে তিনি শত্রুকেও আপন করে নিয়েছেন। তাঁর নাটকের অনেক ক্ষেত্রেই ব্যক্ত করতে চেয়েছেন যে কল্যাণকর কোনো

রাজশক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরা যেমন শান্তি ও ধর্মের শত্রু তেমনি দেশেরও শত্রু। কল্যাণকর রাজশক্তির পক্ষে অবস্থান মূলত তাঁর রাজনীতির মূল মন্ত্র ছিলো। তিনি বিশ্বাস করতেন যে দেশভক্ত লোকও রাজভক্ত হতে পারে।

> "বাস্তবিক রাজ-ভক্তি ও দেশ-ভক্তির এমন বিচিত্র সমন্বয়, আধুনিক শিক্ষিত-সম্প্রদায়ের মধ্যে খুবই কম লোকের জীবনে সংঘটিত হইতে দেখা যায়। সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড যখন মেবারে মারা গেলেন তখন দ্বিজেন্দ্রলাল স্বয়ং, স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া, যে গুণগ্রাহী শোকসংগীত রচনা করেন তাহা পাঠ করিলেও তাঁহার রাজ-ভক্তির অকৃত্রিম আন্তরিকতা উপলব্ধি হয়। শুধু যে তিনি সে গানটি রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; তদীয় নেতৃত্বে পরিচালিত "ইভনিং ক্লাবে"র সভ্যগণের সহযোগে, "বহু যন্ত্রাদির সাহায্যে" তিনি সে গানটি গাহিয়া, কলিকাতার বিভিন্ন পথে পদব্রজে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন।"[১৩]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা সংগীত ও সাহিত্যের এক অতুলনীয় নিষ্ঠাবান নাবিক। গুণি এই বাঙালি বাংলার অমূল্য সম্পদ। পরাধীন বাংলার বহুবিধ বাধাপ্রাপ্তির সময়টি অনন্য এই কবির রচনাকাল। তাই পরাধীনতার গ্লানি তাঁকে নিবিষ্ট করেছে স্বদেশপ্রেমে এবং এই দায়িত্ববোধ ও শৃঙ্খল মুক্তির উৎকণ্ঠায় তিনি রচনা করেন বহু নাটক, কবিতা ও গান। কবি জানতেন পরাধীনতার কলঙ্ক থেকে মুক্ত হতে জাতির মানসিক উন্নতির একান্ত প্রয়োজন। যথার্থ মনুষ্যত্ব গঠিত না হলে জাতি স্বাধীনতার মূল্য বুঝতে পারে না। মাতৃভূমির অপমানে আহত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর রচনার সর্বক্ষেত্রে তারই প্রতিবাদি বাণী ব্যক্ত করে গেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন প্রকৃত শত্রু বাহ্যিক নয় সে আত্মিক। অশিক্ষা, কুসংস্কার, জাতি-বিদ্বেষ থেকে নিজেদের কলঙ্ক মুক্ত করতে পারলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব অর্জন সম্ভব। তাই রচনা করেছেন স্বদেশ, জাতির আত্ম জাগানিয়া গান, সে গানের বাণীতে কখনও ব্যক্ত হয়েছে তির্যকপূর্ণ ইঙ্গিত কখনও গভীর প্রেমাবেগ। তাঁর রচিত হাসির গান, প্রহসন ও ব্যঙ্গ নাটকগুলোও মূলত স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রাণেরই ব্যতিক্রমী প্রকাশ। নিষ্ঠুরতার মধ্যদিয়ে স্বজাত্য প্রেম প্রকাশের ধরনে তিনি বিরল। এই ব্যতিক্রমী পন্থায় তিনি বাঙালির মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করতে চেয়েছেন। হুংকারে গর্জে পথে নামবার আহ্বান জানিয়েছেন ।

এক কঠিন সময়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সাহিত্য ও সংগীতের বিকাশ ঘটে। সময়টি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন-কাল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যখন সমগ্র দেশে জাতীয়াবোধের বিকাশ শুরু হয় দ্বিজেন্দ্রলাল তখন সাধারণ মানুষের মনে স্বদেশপ্রেম জাগ্রত করবার প্রয়াসে রচনা করতে থাকেন দেশের প্রাচীন ও ঐতিহাসিক সকল বীরপুরুষদের নিয়ে নাটকের মধ্যদিয়ে বঙ্গবীর গাঁথা। বীরের জয় গাঁথার গল্প মানুষের মনে জাতীয় চেতনার বীজ বপন করতে থাকে। কিন্তু তিনি ছিলেন বাস্তববাদী নাট্যকার। কখনোই তাঁর নাটকে স্থান পায়নি কোনো অলৌকিকতা। এমনকি পৌরাণিক নাটকেও তিনি অলৌকিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তার নাটকে সংগীতের ব্যবহার নাট্যরূপকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলতো।

তাঁর স্বদেশি সংগীত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে যেমন মানুষের মাঝে স্বদেশপ্রেমে প্রাণের সঞ্চার করতো তেমনি একালেও তাঁর গান স্বদেশের সৌন্দর্যের কোমলতায় মনকে ভরিয়ে তোলে। দেশপ্রেমে আত্মবিহ্বল করে।

> "দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু কবি নন, হাস্য-রস-সমুজ্জ্বল, মধুর গানের রচয়িতা নন;–তিনি আমাদের জাতীয়তার পুরোহিত। তিনি বাঙ্গালীর পথ-প্রদর্শক, তিনি 'স্বদেশী' তন্ত্রের মহাকবি। তিনি একনিষ্ঠ ভগীরথের মত বাঙ্গালীর অবদান-হিমাচলে অধিষ্ঠিত দেশাত্মবোধ-মহাদেবের জটাজুট হইতে দেশভক্ত ভাগীরথীর পবিত্র প্রবাহ আনিয়া কোটী কোটী ভারত-সন্তানের জীবন্মুক্তির সাধন দান করিয়া দিয়াছেন। এ ঋণ কি জাতি কখন পরিশোধ করিতে পারিবে ?"[১৪]

দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ এবং রজনীকান্ত সেন–এঁদের গীতিকবিতার রচনাকাল ছিলো দেশপ্রেমের এক উত্তাল সময়। বাংলা সাহিত্য অনুরাগী সকল সাহিত্যিকের রচনায় তখন দেশপ্রেমের কথাটি অনুরণিত হয়েছে। স্বদেশি আন্দোলন বাংলা তথা ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, শিল্প-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই এই আলোড়নের হাওয়া লাগে। এই যুগান্তকারী আন্দোলনে সর্বতোভাবে যে সকল দেশপ্রেমী কবি-সাহিত্যিক তাঁদের রচনার মধ্যদিয়ে মানুষের আগমনকে জাগাতে চেয়েছেন দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁদের অন্যতম একজন। দেশপ্রেমের প্রবল উদ্দীপনায় দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসময়ে যে সকল গান রচনা করেছেন তার একটি তালিকা তুলে ধরা হলো। এই গানগুলো যুগে যুগে স্বদেশের যে কোনো সংকটে মাতৃসম দেশ জননীকে কলঙ্ক মুক্ত করবার প্রেমময় উদ্দীপনার বাণী :

১. "বঙ্গ আমার জননী আমার ধাত্রী আমার, আমার দেশ
২. ওরে আমার সাধের বীণা
৩. যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ
৪. ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র
৫. একবার গালভরা মা ডাকে
৬. তুমি তো মা সেই, তুমি তো মা সেই, চির গরীয়সী ধন্যা অয়ি মা
৭. আনন্দময়ী বসুন্ধরা, চির অভিরামা তরুণী শ্যামা
৮. আজি গো তোমার চরণে জননী আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান
৯. মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর
১০. জাগো জাগো পুরনারী, জিনিয়া সমর আসিছে অমর
১১. ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর, ছিঁড়ে গেছে মোর বীণার তার
১২. যেথা গিয়েছেন তিনি সমরে, আনিতে গৌরবজয় জিনি
১৩. ধনধান্য-পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
১৪. কিসের শোক করিস ভাই, আবার তোরা মানুষ হ'
১৫. ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে, গাহ উচ্চে রণজয় গাথা।"[১৫]

স্বদেশ প্রেমাবেদনপূর্ণ এসব গান অনন্য চিত্রকল্পের রূপকার। স্বদেশপ্রেমের উন্মাদনা সাথে রোমান্টিকতায় মিলেমিশে একাকার। অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা ও উপমায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের এই গানসমূহ বাঙালির অমূল্য সম্পদ।

দ্বিজেন্দ্রনাটকের গানে স্বদেশচেতনা

দ্বিজেন্দ্রলাল একজন বড়মাপের নাট্যকার ছিলেন। চিত্তকে দোলায়িত করতে সংগীতের মাধুর্য ভিন্ন মাত্রার; এর শক্তি অপরিসীম। অন্যদিকে মানবমনের অন্তরীণ রহস্যের সন্ধান করে তাতে রূপ আভরণ দেওয়াই অভিনয়ের পারদর্শিতা। অভিনয় নাটকের প্রাণ আর গান সেই প্রাণকে জাগ্রত করে। নাটকের মাধ্যমে সমকালীন যুগভাবনাকে সহজে ধরতে পারা যায় এবং মানুষের মনে রূপকতার মধ্যদিয়ে বাস্তবিক দৃষ্টির ইঙ্গিত প্রদান করা যায় আর তাতে গান সংযুক্তি হলে কাজটি আরো সহজসাধ্য হয়ে ওঠে। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এই কাজটি করেছিলেন খুবই নিপুণভাবে। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে সারাদেশে যে স্বদেশ প্রেমবোধ জাগ্রত হয়েছিল তারই গোড়াপত্তনে কাজ করেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রচিত স্বদেশিভাবমূলক নাটক ও গান। নূরজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, সিংহল বিজয়, মেবার পতন ইত্যাদি নাটকের নাম এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। এই সকল নাটকের সংযুক্ত স্বদেশি সকল গান মানবমনে বলিষ্ঠ দেশপ্রেম ও উদ্দীপনা জাগ্রত করত। শুধু তাই নয় তাৎক্ষণিক গান বা কবিতা রচনাতেও তিনি সিদ্ধহস্ত ছিলেন–

> "ইতিমধ্যে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন সারা দেশে নতুন করে জাগিয়ে দেয় বাঙালির দেশাত্মবোধ। তার প্রতিক্রিয়ায় কলকাতার রঙ্গমঞ্চ উত্তাল হয়ে ওঠে দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নাটকের আবেগে। তিনি পরপর লেখেন *প্রতাপ সিংহ* (১৯০৫), *দূর্গাদাস* (১৯০৬), *নূরজাহান* (১৯০৮), *মেবার পতন* (১৯০৮), *সাজাহান* (১৯০৯) ও *চন্দ্রগুপ্ত* (১৯১১)। এসব নাটকে তাঁর অসামন্য স্বদেশী গানগুলি সংযোজিত হয়ে এক নতুন মাত্রা আনে। বিশ্বাসের ঐকান্তিকতা, ভাবের গাঢ়তা এবং সুরের নাটকীয় চলন তাঁর স্বদেশী গানে এক অভিনব চমৎকৃতি সৃষ্টি করল। বাঙালি লাভ করল এক নতুন বর্গের ওজস্বী গানের উত্তরাধিকার।"[১৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের সম্ভার পাই মূলত তাঁর নাটকের গানের ভাণ্ডার হতে। এক অভিনব পরিশীলিত ভঙ্গিতে কথা ও সুরের যুগপৎ মিলন ঘটিয়েছেন তাঁর গানে। যে সকল গান পাঠকের হৃদয় হরণ করে সবগুলোই নাটকের উদ্দেশ্যে রচিত গান। কবি ও গীতিকার হিসেবে প্রথম জীবনে তাঁর বিকাশ ঘটলেও পরবর্তীকালে মূলত তিনি নাটক রচনার প্রতি বেশি ঝুঁকে পড়েন। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলালই তাঁর প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটিয়েছিলেন অত্যন্ত সফলভাবে। আর যে গানগুলো হৃদয়ে জায়গা করে নিয়েছে, চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে আছে তার সবটাই প্রায় নাটকের প্রয়োজনে রচিত। তাই গানে সুরে এবং অভিনয়ের সমন্বয়ে তাঁর নাটকগুলো পেয়েছিল এক অন্য মাত্রা। সেই সময়ের উত্তাল ভাবনাকে জাগ্রত করতে তাঁর এই স্বদেশপ্রেমপূর্ণ গানসমেত অভিনয়মালায় যে ভাণ্ডার তিনি দর্শক শ্রোতাদের দিয়েছিলেন তা কালের সাক্ষী হয়ে থাকবে চিরকাল।

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত* গ্রন্থের সহায়তায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের রচিত নাটক ও গানের একটি কালানুক্রমিক ছক নিচে দেওয়া হলো। এতে নাটকের সাথে স্বদেশ প্রেমানুভূতি জাগানিয়া গানসহ নাটকের প্রয়োজনে রচিত অন্যান্য পর্বের উল্লেখযোগ্য কিছু গানের উদাহরণ তুলে ধরা হলো–

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটক ও গানের কালানুক্রমিক তালিকা

ক্রমিক	নাটক	রচনা সাল	উল্লেখযোগ্য গান
১	প্রতাপ সিংহ	১৯০৫	১. সুখের কথা বলো না আর ২. বসিয়া বিজন বনে বসন আঁচল পাতি ৩. ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে ৪. গাও উচ্চে রণজয় গাথা ৫. ভালবাসি যারে, সে বাসিলে মোরে
২	নূরজাহান	১৯০৮	১. আজি নূতন রতনে, ভূষণে যতনে ২. কেন এত সুন্দর শশধর ৩. আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই
৩	মেবার পতন	১৯০৮	১. জাগো জাগো নরনারী ২. নিখিল জগৎ সুন্দর সব পুলকিত তব দরশে ৩. প্রেমে নর আপন হারায় ৪. উঠেছে ঐ নূতন বাতাস চললো কুঞ্জে ব্রজ নারী ৫. ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ৬. কিসের শোক করিস ভাই
৪	সাজাহান	১৯০৯	১. এ জীবনে পূরিল না সাধ ভালোবাসি ২. আজি এসেছি আজি এসেছি এসেছি বঁধু হে ৩. আমি সারা সকালটি বসে বসে এই ৪. তুমি বাঁধিয়ে কি দিয়ে রেখেছ হৃদি এ ৫. বেলা বয়ে যায় ৬. ধনধান্য-পুষ্পভরা
৫	চন্দ্রগুপ্ত	১৯১১	১. তুমি যে হে প্রাণের বঁধু আমরা তোমায় ভালোবাসি ২. আয় রে বসন্ত ও তোর কিরণ মাখা পাখা তুলে ৩. যখন সঘন গগন গরজে ৪. আর কেন মিছে আশা মিছে ভালোবাসা ৫. ঘনতমসাবৃত অম্বরধরণী ৬. আজি গাও মহাগীত মহাআনন্দে ৭. ওই মহাসিন্ধুর ওপার থেকে ৮. সকল ব্যথার ব্যথী আমি হই
৬	সিংহলবিজয়	১৯১৫	১. ওরে আমার সাধের বীণা ২. আমরা খাসা আছি ৩. যাচ্ছে ভেসে সাদা সাদা ৪. বরষা আইল ওই ঘন ঘোর মেঘে ৫. যাও হে সুখ পাও যেখানে সেই ঠাঁই ৬. যেদিন সুনীল জলধি হইতে
৭	বঙ্গনারী	১৯১৬	১. ও কে গান গেয়ে চলে যায় ২. এবার হয়েছে হিন্দু, করুণাসিন্ধু

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত [১৭]

পারিবারিকভাবেই সংস্কৃতির পরিমণ্ডলে বেড়ে উঠেছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। তাঁর সংগীত ও সাহিত্যজীবনের বিকাশ লাভ ঘটে পিতা, অগ্রজ ও অনুজদের অনুপ্রেরণায়। তাছাড়া বাল্যকাল থেকে সংগীতে তাঁর বিশেষ আসক্তি ছিলো। কার্তিকেয়চন্দ্র রায় সুবিখ্যাত গায়ক ছিলেন। শাস্ত্রীয় সংগীতের

উপর তাঁর প্রগাঢ় দখল ছিলো। সেই দিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব কাল থেকে বড় বড় ওস্তাদদের গান শোনার সুযোগ হয়েছিল। তাঁর পিতাও হিন্দুস্থানী সংগীতের গায়ক ছিলেন; যে কারণে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রতি সকাল শুরু হতো ভৈরো, আশাবরী ইত্যাদি সুরের মূর্চ্ছনার মধ্যদিয়ে। এই অর্জিত ও সঞ্চিত সুরের মায়াজালেই তিনি বেঁধেছিলেন তাঁর জীবনের সংগীত রচনার ভাণ্ডারকে। পরবর্তী সময়ে বিলেতে বসবাসকালে পান বিদেশি সুরের উন্মাদনার অনুসন্ধান। তাই তাঁর গানের সুরে পাই দেশি-বিদেশি সুর সম্মিলনে এক অভিনব ও ব্যতিক্রমী সুর মূর্চ্ছনা। সে সুর শুনলেই খুঁজে পাওয়া যায় এক বিশেষ স্বকীয়তার আভাস। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–

> "আমাদের বাড়ি ছিলো হিন্দুস্থানী গানের একটি প্রধান মজলিশ, আম দরবার। আশৈশব, বড় বড় ওস্তাদ কবিকে গান শোনাতে আসতো। গান শোনাতে পেলে ধন্য হয়ে যেত, তাঁর মুখের একটি বাহবা পেলে তারা সেলাম ঠুকে ঠুকে অস্থির।...
> কবি হিন্দুস্থানী গানের মর্মে প্রবেশ করেন কৈশোরেই তাঁর পিতৃদেবের খেয়াল শুনে শুনে। কিন্তু তারপর তিনি খুব বেশী ভক্ত হয়েছিলেন বিলিতি গানের। সুরেন্দ্রনাথই তাঁকে ঘরের ছেলে করে ঘরে ফিরিয়ে আনেন অর্থাৎ ভারতীয় গানের নিজস্ব ক্ষেত্রে।"[১৮]

দ্বিজেন্দ্রলালের রচিত সংগীত ভাণ্ডারে যে সকল অঙ্গের গান পাওয়া যায় তা মূলত সুরের বা ছন্দের দিক থেকে খেয়ালাঙ্গের গান, টপ্পা অঙ্গের গান, হালকা ছন্দের মিশ্রণ রীতির গান এবং কীর্তন ও বাউল অঙ্গের গান। পারিবারিক বলয়সহ তৎকালীন বিখ্যাত খেয়াল গায়ক অন্ধশরৎ ও সুরেন মজুমদারের কাছে পান প্রাচ্য সংগীতের তালিম ও আত্মপ্রস্তুতির পন্থা। অন্যদিকে বিলেতি সুর অর্থাৎ স্কচ, আইরিশ এবং ইংরেজি গানের অভিনব সুর প্রক্ষেপণের ভাবনাতে তিনি ছিলেন মুগ্ধ। তাঁর সামগ্রিক সংগীত রচনার সুরে এ সকল পন্থার মিল থাকলেও স্বদেশি গানের সুরে তিনি নিয়েছেন মূলত রবীন্দ্রনাথেরই মতো সহজ ছন্দের দেশীয় সুর অর্থাৎ কীর্তন-বাউলের সুর এবং মার্চ বা প্যারেডের ভাবনাটি। বাংলা স্বদেশি গানের সুরে যে এক অভিনবত্বের প্রকাশ মেলে তিনি তা গ্রহণ করেন বিদেশি গানের সুরের ভঙ্গি থেকে। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–

> "দ্বিজেন্দ্রলালের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তাঁহার সুরের গতিশীলতা (Dynamic force) ও জঙ্গমতা (Elasticity)। তাঁহার গানকে বাঁধা সুরের দৃঢ়বদ্ধ বাঁধনের মধ্যে রাখা যায় নাই, তাঁহার সুর মুক্ত পক্ষীর মতো সুদূর আকাশে বিহার করিয়া আবার নীড়ে ফিরিয়া আসিয়াছে।"[১৯]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গান রাগসংগীতের আধারে রচিত হলেও কোনো একটি বিশুদ্ধ রাগ সেই গানের পরিচয় নয়। তাঁর প্রতিটি গানই স্বাধীন। তাই রাগ-রাগিণীর গাম্ভীর্যের ভারে তাঁর কোনো একটি গানও ম্রিয়মান নয়।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বদেশ

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বাংলা নাটককে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছেন নিজস্ব উদ্দীপনায়। আধুনিক নাট্যরীতিতে প্রতিষ্ঠা পায় তাঁর নাটক এবং তিনি পান শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের খ্যাতি। বাংলা নাটককে তিনি আধুনিক নাট্যরীতিতে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করতে চেয়েছেন। তাঁর গদ্যনাটকের সংলাপের প্রয়োগরীতিও স্বতন্ত্র। তাই

তিনি ‘রানা প্রতাপ’, ‘দুর্গাদাস’, ‘নূরজাহান’, ‘মেবার পতন’ ও ‘সাজাহান’ নাটকগুলি গদ্যেই রচনা করেন। পদ্য সংলাপের চেয়ে তিনি গদ্য সংলাপকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মানুষ গদ্যেই কথা বলে। এবং গদ্য সাধারণ মানুষের চলমান জীবন রীতির ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস তাঁর নাটকের প্রধান উপজীব্য। হিন্দুযুগ এবং মুসলমান যুগের ইতিহাস সংগ্রহই তাঁর নাটকে ফুটে উঠেছে। তবে তৎকালে প্রচলিত কোনো একটি পন্থাকে তিনি অবলম্বন করেননি। সেই সময়ের বাংলা নাটক ছিলো শেক্সপিয়রের নাট্যরীতির অনুকরণে পরিপূর্ণ। এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। রঙ্গমঞ্চ থেকে শুরু করে অভিনয় সকল ক্ষেত্রেই পাশ্চাত্য কীর্তির প্রভাব। নিজস্ব ঐতিহাসিক পটভূমিকে তিনি পাশ্চাত্য নাট্যরীতির সাথে এক অভিনব ধারায় সন্নিবেশন করেছেন, যে কারণে তাঁর নাটকসমূহ সেই সময়ে বহুল আলোচিত ও সমাদৃত হয়।

> “দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গও স্মরণীয়। বাংলা নাটকে দীর্ঘকাল শেক্সপীয়রের নাট্যরীতিকে অনুসরণ করার চেষ্টা চলেছে। মধুসূদন, দীনবন্ধু, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ প্রভৃতি পূর্ববর্তী নাট্যকারেরাও পাশ্চাত্য নাট্যরীতিকে অনুশীলন করার চেষ্টা করেছেন। গিরিশচন্দ্রও শেক্সপীয়রের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। তবু পাশ্চাত্য নাট্যরীতি দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকেই সবচেয়ে বেশী সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। তাঁর নাটকে পাশ্চাত্য প্রভাব অত্যন্ত স্পষ্ট। নাটকীয় গতিবেগ, চরিত্রসৃষ্টি, অন্তর্দ্বন্দ্ব রচনা, ট্রাজিক রস সৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে তিনি পাশ্চাত্য নাটকের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হন। বিলাত-প্রবাসকালে পাশ্চাত্য জীবনচর্যার প্রতি তিনি শুধু অনুরক্তই হননি, ইউরোপীয় রঙ্গমঞ্চ ও অভিনয়ের সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয়েছিল।”[২০]

দ্বিজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক নাট্যরীতিতে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও, নাটকে মোগল রাজপুতের সংঘাতের কাহিনি সন্নিবেশিত হলেও তাকে বস্তুধর্মী করেছেন তৎকালীন ভারতবর্ষে চলমান দেশকালের পরিস্থিতির আবহে অর্থাৎ নাটকের দৃশ্যপটগুলি যেন ইংরেজ শ্রেণির সাথে ভারতবাসীর ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বন্দ্বের কথাই স্মরণ করিয়ে দিয়েছে বারবার। তুলে ধরেছেন দেশেপ্রেমের জ্বলন্ত উদাহরণ। বিশেষ করে প্রতাপসিংহ, দুর্গাদাস ও মেবার পতন এই নাটকসমূহে দেশপ্রেমের সাথে বিশ্বপ্রেমের সংযোগ ঘটাতে চেয়েছেন কবি। তাঁর গান নাটকে সংযুক্তির কারণে নাটকীয় চমৎকারিত্ব বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে, নাট্যরূপ সুস্পষ্ট হয়েছে। ঐতিহাসিক নাটকগুলিতেই মূলত দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীত সন্নিবেশের কৃতিত্ব ফলপ্রসূ হয়েছে। তাঁর সৃষ্ট নাটকগুলির মধ্যে মেবার পতন নাটকটিতেই নাটকীয় সংঘাতকে সংগীতের মধ্যদিয়ে ফুটিয়ে তুলতে অধিক স্বার্থকতা লাভ করে। এ ক্ষেত্রে তাঁর ঐতিহাসিক নাটক সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথ রায়ের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য–

> “আমার দেশ’, ‘আমার জন্মভূমি’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে’, প্রভৃতি গানে দেশপ্রেমের উন্মাদনায় সেদিন বাংলাদেশের আকাশ বাতাস পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছিল। এই গানগুলি তার বিভিন্ন নাটকে সংযোজিত হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলাল যখন গয়ায় ছিলেন সেই সময় আচার্য জগদীশচন্দ্র তাঁর অতিথি হয়েছিলেন। জগদীশচন্দ্রকে তিনি ‘মেবার পাহাড়’ গান গেয়ে শুনিয়েছিলেন। সেই গান শুনে জগদীশচন্দ্র বলেন: ‘আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করতে পারি, কিন্তু যদি আমি মেবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি, আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাংলার বিষয় ও ঘটনা থাকে।’ দ্বিজেন্দ্রলাল তখন তাঁর ‘আমার দেশ’ নামক সুবিখ্যাত মাতৃবন্দনাটি লেখেন।”[২১]

এছাড়াও রথীন্দ্রনাথ রায় এ বিষয়টিকে আরো স্পষ্ট করে অন্যত্র বলেছেন–

> "'তারাবাই' রচনার পর দ্বিজেন্দ্রলাল সাতখানি ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন : 'প্রতাপসিংহ' (১৯০৫), 'দুর্গাদাস' (১৯০৬), 'নূরজাহান' (১৯০৮), 'মেবার পতন' (১৯০৮), 'সাজাহান' (১৯০৯), 'চন্দ্রগুপ্ত' (১৯১১), 'সিংহল বিজয়' (১৯১৫)। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে এই সাতখানি ঐতিহাসিক নাটককে একই শ্রেণীভুক্ত করা সম্ভব নয়। 'প্রতাপসিংহ' থেকে 'সাজাহান' পর্যন্ত পাঁচখানি নাটকের উপাদান মুসলমান যুগের ইতিহাস থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।... 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস' ও 'মেবার পতন' এই তিনখানি নাটকে রাজপুত ইতিহাসকেই প্রাধান্য দিয়ে তাদের শৌর্য-বীর্য, দেশপ্রেমিকতা ও আদর্শবাদকে উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করা হয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি বিশেষ দর্শন এই তিনখানি নাটকের ভিতর দিয়ে নানা শাখায় পল্লবিত হয়েছে। 'প্রতাপসিংহ' নাটকে যে জ্বলন্ত দেশপ্রেম বহ্নিমান হয়ে উঠেছে, কল্যাণ-মৈত্রী-বিশ্বপ্রেমের ভিতর দিয়ে নাট্যকার তাকেই একটি মহত্তর রূপ দিয়েছেন 'মেবার পতন' নাটকে।"[২২]

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল নাট্যসাহিত্যের ইতিহাসে এক বিরল নাম। নাটকীয় তাৎপর্য সৃষ্টিতে তাঁর প্রত্যেকটি গান সার্থক। নাটকে ব্যবহৃত তাঁর স্বদেশপর্বের গানসমূহের মধ্যে 'ধনধান্য পুষ্পভরা' (সাজাহান), 'ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর' (মেবার পতন), 'কিসের শোক করিস রে ভাই' (মেবার পতন) উল্লেখযোগ্য।

নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায় খ্যাতি ও জনপ্রিয়তা পান মূলত তাঁর ঐতিহাসিক নাটক রচনার মধ্যদিয়েই। এই ঐতিহাসিক নাটকগুলোর মধ্যদিয়ে তিনি জাতীয় আকাঙ্ক্ষা ও বাসনার কথা ব্যক্ত করেছেন। স্বদেশি আন্দোলনের উন্মাদনায় দেশ যখন ভাসছিল তখন তিনি রচনা করলেন ঐতিহাসিক বীরগাঁথা রানাপ্রতাপ সিংহ (১৯০৫)।

"রাজ্যভ্রষ্ট রানা প্রতাপের চিতোর উদ্ধারের কঠোর সংকল্প থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত প্রায় ২৫ বছরের কাহিনি এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। এই নাটকে গানের সংখ্যা ৯। কয়েকটি গান:

১. ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে
২. প্রেম যে মাখা বিষে
৩. বসিয়া বিজন বনে
৪. সুখের কথা বোলো না আর
৫. সে মুখ কেন।"[২৩]

তাঁর *মেবার পতন* (১৯০৮) নাটকে ব্যবহৃত স্বদেশপর্বের গানের মধ্যদিয়ে তিনি স্বদেশ চেতনার নিগূঢ় ইঙ্গিত দিয়েছেন। হতাশ কবি দ্বিজেন্দ্রলালের পরিবর্তনের দিকগুলি এখানে পরিলক্ষিত হয় 'মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়' গানটিতে। এখানে তিনি হতাশার গ্লানিতে আত্মহারা। মূলত এই নাটকটিতে তিনি কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী চরিত্রের মধ্যদিয়ে তিনটি নীতিকে প্রতীকরূপে প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। সত্যবতীকে দেশপ্রেম এবং মানসীকে বিশ্বপ্রেমের প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন কবি। এই নাটকে ব্যবহৃত ১১টি গানের মধ্যে 'মেবার পতন' গানটির মধ্যদিয়ে তৎকালীন ভারতবর্ষের শোকগাঁথা ইঙ্গিতে পরিস্ফুটিত হয়। যেমন–

"মেবার পাহাড়- শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়ে না আর-।
এ হীন সজ্জা- এ ঘোর লজ্জা–
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার–।"[২৪]

সাজাহান নাটকে রয়েছে ৯টি গান। এই নাটকের তৃতীয় অংকের ৬ষ্ঠ দৃশ্যে রয়েছে দেশ বন্দনার বিখ্যাত গানটি।

"ধনধান্যপুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে এ দেশ এক- সকল দেশের সেরা;-
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
(কোরাস)–
এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানী সেযে আমার জন্মভূমি ॥"[২৫]

এই গানটি দিয়ে রাজপুত নারী মহামায়া রাজা যশোবন্ত সিংহকে দেশপ্রেমে উদ্ভাসিত করেছেন। এই নাটকটির দেশপর্বের এ গানটির মধ্যদিয়ে কবি রূপক অর্থে ভারতবর্ষের সকল মানুষে দেশপ্রেমবোধ জাগাবার প্রয়াস ব্যক্ত করেছেন। এ এমনই এক গান যা যুগ যুগ ধরে দেশপ্রেমের উচ্চ আদর্শ ঘোষণা করে চলেছে। *সাজাহান* (১৯০৯) নাটকটি মূলত এই একটি মাত্র গানের কারণেই চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে। যার প্রকাশ রথীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতিতে আরো স্পষ্ট হবে–

> "দ্বিজেন্দ্রলাল রাজপুত-গৌরবের অতীতের ছবি ফুটিয়েছেন। অনেক দেশপ্রেমমূলক গানও রাজপুত নরনারীদের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে। আসলে তিনি রাজপুত জাতির অতীত গরিমার ভেতর দিয়ে নিজেদের কথাই বলেছেন। 'ধনধান্যে-পুষ্পেভরা' গানটি 'সাজাহান' নাটকে চারণ বালকদের দ্বারা গীত হলেও এ যে বাংলাদেশেরই বন্দনা। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমের গানগুলির পশ্চাৎপটে একটি যুগের উন্মাদনা আছে সত্য, কিন্তু এই গানগুলি দেশ ও কালের দাবি মিটিয়েও যে চিরন্তন ও সার্বজনীন ভাবরূপকে ফুটিয়েছে, একথা বোধ হয় আরও সত্য।"[২৬]

এ প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি আরো বলেছেন–

> "দ্বিজেন্দ্রলালের সঙ্গীতগুলিতে জাতি গঠনের প্রচুর উপাদান আছে। স্পষ্টতায়, বলিষ্ঠতায়, পৌরুষে ও হৃদয়াবেগের তীব্র আলোড়নে তাঁর জাতীয় মহাসঙ্গীতগুলি শুধু তাঁর নিজের কালেই নয়, পরবর্তীকালেও সংগ্রামশীল জাতীয় জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত করেছিল। তাঁর অকৃত্রিম ভাবুকতা ও কাল সচেতনতা তাঁকে শুধু আকাশ-প্রসারী স্বপ্নলোকে উধাও করে নিয়ে যায় নি, জাতীয় জীবনের অশ্রু-বেদনা, আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র তরঙ্গধ্বনির মাঝখানে নিয়ে এসেছে।"[২৭]

সম্পদ মূলত এতে ব্যবহৃত সংগীত ভাণ্ডার বা নাট্যসংগীত। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতি-নৃত্যনাট্য ও নাটকসমূহে সংগীতের বহুল ব্যবহার করেছেন কখনো নাটকের একঘেয়েমি কাটানোর জন্য কখনো নাটকের উক্তিকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলবার জন্য বা কখনো চরিত্র ব্যবহারের প্রয়োজনে। যেমন–বাউল, দাদা ঠাকুর প্রভৃতি চরিত্রের সমন্বয় দেখি। রবীন্দ্রনাথের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই তাঁর নাটকে সংগীতের ব্যবহারের কাজটি সফলতার সাথে করেন। কিন্তু ঐতিহাসিক পটভূমিকার কারণেই হোক বা অন্য যেকোনো কারণেই হোক তাঁর সৃষ্ট নাটক বহু সমাদর পায় এবং বহু রঙ্গমঞ্চে বা থিয়েটারে বহু অদক্ষ শিল্পীর সংস্পর্শে বিকৃতির অতল গহ্বরে তলাতে থাকে। পরবর্তীকালে তাঁর নাটকের গানসমূহ নাটকের প্রয়োজন ছাড়াও অদক্ষ-অভদ্র শ্রেণির রঙ্গালয়ের নিছক হালকা আমোদ

প্রমোদের খোরাকে পরিণত হয়। যে কারণে অনেকাংশে এই গানসমূহ এর সৌন্দর্য ও সুরের মোহিনী ক্ষমতা হারায়। এ প্রসঙ্গে দেবকুমার রায় চৌধুরীর উক্তি প্রণিধানযোগ্য–

> "সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 'হরেক' রকমে, 'নানান' বেশে, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ 'ঢঙ্গে' কত-সব বিপুল আয়োজন সহকারে কলিকাতার ইতর-ভদ্র, সংখ্যাতীত, উন্মত্ত জনসংঘ মনমাতানো স্বদেশী সংগীত গাইতে গাইতে, শহরময় পথে পথে পরিভ্রমণ করিয়া-বেড়াইত; আর সেই নয়নরঞ্জন, মনঃপ্রাণ-মোহন, অপূর্ব শোভাযাত্রার দৃশ্য দেখিয়া, দেশপ্রাণ কবি-আমাদের তখন আপন উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কখনও এতটুকু বালকের মত 'আহ্লাদে আট্‌খানা' হইয়া, ছুটিয়া আসিয়া স্বজন-বন্ধুদের জড়াইয়া ধরিতেন; কখনও উৎসাহভরে, উচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া আনন্দে হাতে তালি দিতে দিতে ঐ-সব সঙ্গীতের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিতেন; আবার কখনও বা বাষ্পসিক্ত লোচনযুগল উর্দ্ধপানে উন্মুক্ত করিয়া, প্রেমাকুল প্রাণে 'মা, মা' বলিয়া, যথার্থই যেন কাহার অপার্থিব ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন! এ-সব অবস্থায় তাহার সেই হর্ষোজ্জ্বল, রক্তিম মুখে কিংবা উল্লাস বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে এক জ্বলন্ত জ্যোতিপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতে থাকিত, না দেখিয়া আজ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অনুমান কি কল্পনা করিতে পারে।"[২৮]

সুরশৈলী অনুসন্ধান

স্বদেশি গানের গভীরে থাকে নিজভূমির প্রতি মমতা, নিজ মাটির প্রতি মনের টান। অতি সহজ ও সাবলীল এই সম্পর্ক। এই সকল গানের সুরে কালোয়াতি বা গুরু-গম্ভীর সুরের ব্যবহারে আত্মার সাথে এর সহজ সুন্দর সম্পর্ক বাধাপ্রাপ্ত হয়। রবীন্দ্রনাথ যেমন সহজ মাটির সুর কীর্তন, বাউল, সারি ও রামপ্রসাদীর চিরচেনা সুরকে প্রয়োগ করেছেন তাঁর স্বদেশ পর্যায়ের গানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও ঠিক তাই করেছেন। সহজ কথা ও সুর যেমন করে বিষয়বস্তুকে বোঝাতে সক্ষম হয় কঠিন কালোয়াতি সুর তা করতে ব্যর্থ হয়। স্বদেশের জন্য আন্দোলন দেশের সকল মানুষের সম্পৃক্ততায় পরিপূর্ণতা পায়। তাই যে সুর বা বাণীর প্রক্ষেপণ সহজ বোধগম্য তাই হয় আত্মস্থকরণের সরল উপকরণ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে স্বদেশের গানে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারকে শিথিল করে তাতে কীর্তন-বাউলের সুর ব্যবহার করেছেন। যেমন–

> "একবার গালভরা মা ডাকে
> মা বলে ডাক মা বলে ডাক
> মা বলে ডাক মা কে ॥"[২৯]

এই দেশপ্রেম পর্বের গানের সুরসৃষ্টিতে তিনি সচেতনভাবেই কীর্তন ও বাউল সুরের সহজ এ উপাত্ত আবেগকে গ্রহণ করেছেন। মানুষের মনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্ষেপণ হবে স্বদেশের গান এই ভাবনাতেই সুরের বাউলমতে অন্তরের উদ্দীপনার উচ্চারণকে গুরুত্ব দিয়েছেন সবার আগে। রবীন্দ্র সমসাময়িক প্রায় সকল কবিরই এ ক্ষেত্রে স্বদেশের গান রচনার এই সহজ সুরের বিষয়টি অনুধাবনযোগ্য। তাই সকলের সাথে সমস্বরে গাইবার উপযোগী। এ প্রসঙ্গে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর মন্তব্যে বলেছেন, "রবীন্দ্রনাথ, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ–এঁদের সকলেরই দেশাত্মবোধক 'গানগুলি'র সুর খুব সহজ সরল, অথচ আবেগদীপ্ত। সুরের সূক্ষ্ম কারুকর্মে এই গানগুলি রচিত হলে সম্মেলক কণ্ঠে গীত হয়ে শিকল ভেঙে মন্ত্র

সাধনে সক্ষম হবে না।"[৩০] এ প্রসঙ্গে জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ তাঁর মন্তব্যে বলেছেন 'গানগুলি সুরের দিক দিয়ে খুবই সরল ও অনাবশ্যক অলঙ্কার বিবর্জিত, সেজন্য সম্মেলক গানের উপযুক্ত।'[৩১]

দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গানসমূহে মূলত বিদেশি সুরের প্রভাব অধিক পরিলক্ষিত। এই বিদেশি সুরের সাথেই তিনি সংমিশ্রণ করেছেন লোকসুর কখনো শাস্ত্রীয় সুরের অভিজ্ঞতাকে। ঠিক একই ধারা তিনি প্রবর্তন করেছেন তাঁর স্বদেশি গানে। ইংরেজি গানের সোজা সরল সুরের ওঠানামার ঢং-টিও স্বদেশি গানের সুরকে আরো প্রাণবন্ত করে তুলেছে তাঁর গানে। তাই তাঁর স্বদেশি গানের সুরে একদিকে চোখে পড়ে লোক সুর আবার অন্যদিকে ইংরেজি সুরের অনুপ্রেরণা। এই দুই ধারার মিলনের নিপুণ প্রভাব পাই তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানে :

> "ইংরাজি গানের স্বরগুলি সব সোজা সোজা, একটা স্বরের উপরে আর একটার নির্ভর নাই। প্রতিস্বর স্পষ্ট এবং স্বাধীন। ...ইংরাজী গানে আবার যেরূপ ভাবের বৈচিত্র্য আছে, হিন্দু সংগীতে তাহা নাই। কি করুণ, কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর সব রসই ইংরাজী গানে আছে। ...ইংরাজি সুর ধূমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই, ...যেন হাউয়ের মত একেবারে উর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায়, ...বাঙালী সংগীতাদি একস্থানে শুইয়া মনে মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে, ইংরাজী সংগীতাদি যেন পাইন বৃক্ষের ন্যায় সোজা সংযত নিয়মিত। ইংরাজী গানে সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দু গানে নাই, ...একটি উন্মীলনোন্মুখ, অপরটি অর্ধনিমীলিত। একটি জাগরণ, অপরটি তন্দ্রা, ...একটি দিবা, অপরটি সন্ধ্যা, ...একটি যেন প্রভাত আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল; একটি আশাময়ী, উন্মুখী সূর্যমুখী, অপরটি সভয়া, বিনতনয়না অপরাজিতা।"[৩২]

এই উদ্ধৃতির মধ্যদিয়ে স্পষ্ট হয় ইংরেজি গানের প্রতি তিনি কতোটা অনুরাগী ছিলেন। আর এই গানের রীতিকে তিনি স্বদেশি গানের সুরের প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক মনে করতেন বলেই তাঁর স্বদেশি গানের অনেকাংশে ইংরেজি গানের সুরের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। রবীন্দ্র সমকালীন এই কবির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের মতো বিদেশি সুরের প্রতি প্রেম এবং সেই সুরকে অতি নিপুণ ও যথার্থভাবে বাংলা গানে প্রয়োগের সাবলীল প্রচেষ্টা লক্ষণীয় এবং এর উপস্থাপন অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়ে উঠেছিল। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর রচনাকালের প্রথম পর্যায়ে বিলেত থেকে ফেরার পর বিদেশি সুরের প্রতি তাঁর অনুরাগটি যেভাবে পরিলক্ষিত হয়, পরবর্তীকালে তেমনভাবে তিনি এ সুর আর গ্রহণ করেননি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সারাজীবন কোনো না কোনোভাবে তাঁর গানের সুরে ইংরেজি সুরের ঢং-টি প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব স্বকীয় বৈশিষ্ট্যতায়। তাঁর মতো করে সেই সময়ের অনেকের সৃষ্টিতেই এই প্রভাবটি পরিলক্ষিত হয়। এ প্রসঙ্গে ড. উৎপলা গোস্বামীর নিচের উক্তি স্মরণ করা যেতে পারে :

> "দেশী রাগের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নানাবিধ সুরের মিশ্রণ ব্যবস্থা বাংলা গানে একটি ঐতিহ্যসম্পন্ন সম্পদ। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল–সকলেই বৈচিত্র্য আনার জন্য বাংলা গানে বিদেশি সংগীতের সুর ও ছন্দ এনেছেন। কিন্তু আধুনিক বাংলা গানের উৎসমুখ খুলে দিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর গানে বিবিধ সুরের মিশ্রণ থাকলেও তা মার্গসংগীতের বিশুদ্ধ ছাঁচে ফেলেই তৈরি। বাংলা পল্লীসংগীতের সুর, বিশেষভাবে বাউল, কীর্তন তো তিনি গ্রহণ করলেনই–দেশীয় সুরের মিশ্রণের সঙ্গে তিনি বিদেশি সুরও আনলেন। সুরের অপূর্ব মিলনে বাংলা গানের জগতে সৃষ্টি হল একটি বিশেষ সংগীতরীতি।"[৩৩]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় উপলব্ধি করলেন যে আমাদের কিছু রাগ-রাগিণীর ওঠা-নামাতেও বিদেশি সুরের ধরনটি লক্ষণীয়। সরল ও তুলনামূলকভাবে হাল্কা ছন্দ বা তালের রাগ ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সুরট খাম্বাজ প্রভৃতিতে সুরের ওঠা-নামাতে বিদেশি সুরের লক্ষণটি অনুধাবনযোগ্য। তিনি নিজেই এই সকল রাগ-রাগিণীর সাথে বিদেশি সুরের সংমিশ্রণের এক অভিনব ও স্বতন্ত্র অবয়ব গড়ে তোলেন। যেখানে রাগ-রাগিণী তাদের স্বরূপটি রক্ষা করে চলতে পারে এবং ইংরেজি গানের বৈশিষ্ট্যও সুরের মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। এই ব্যতিক্রমী ভাবনারই প্রয়োগ তিনি করেছেন তাঁর স্বদেশপর্যায়ের কিছু গানে। অসাধারণ এই গানসমূহে নিপুণ ভালোবাসায় তিনি দেশীয় রাগ-রাগিণীর সাথে বিদেশি তথা ইংরেজি সুরের সম্মিলন ঘটিয়েছেন। এই অভিনব সুরভাবনা ও এর প্রয়োগ তাঁকে অনন্য এক কৃতিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে।

স্বদেশপর্যায়ের বা দেশপর্বের গানের সুরে বিদেশি সুর ও রাগ-রাগিণীর যৌথ আভাস পরিলক্ষিত হয় তার একটি তালিকা নিচে প্রদান করা হলো :

স্বদেশপর্যায়ের গানে বিদেশি সুর ও রাগ-রাগিণীর আভাস

স্বদেশপর্বের গান	রাগ	তাল
১. বঙ্গ আমার জননী আমার	মিশ্র ঝিঁঝিট	একতাল
২. যেদিন সুনীল জলধি হইতে	ইমন ভূপালী	একতাল
৩. ভারত আমার ভারত আমার	ইমন ভূপালী	একতাল
৪. তুমি তো মা চিরগরীয়সী	ইমন	একতাল
৫. আজি গো মা তোমার চরণে জননী	ইমন কল্যাণ	একতাল
৬. সেথা গিয়েছেন তিনি সমরে	ইমন	একতাল
৭. ধনধান্যে-পুষ্পভরা	মিশ্র কেদারা	একতাল
৮. ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে	লঘুগুরুছন্দে	একতাল

৩৪

উৎস: গবেষক কর্তৃক প্রস্তুতকৃত

উপরের উদাহরণ থেকে বুঝতে পারা যায় যে স্বদেশি গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর মধ্যে ইমন, ভূপালী ও কেদার রাগটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন তিনি। মূলত এই সকল রাগ-রাগিণীর চলন পদ্ধতিটি বিদেশি সুরের চলার গতির মতো। অর্থাৎ সুরের ওঠা-নামাতে বিদেশি সুরের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাই উল্লেখিত রাগে রচিত গানগুলোর লাফিয়ে চলার গতির কারণে প্রায় বিদেশি সুরের গান বলে মনে হয়। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের দেয়া একটি উদাহরণে বিষয়টি বোঝানো সহজ হবে।

ইমন–ন ধ প ক্ষ গ র, র গ ম র ন র স (উভয় মধ্যম ও নিষাদ প্রবল)।

কেদার–স ম, ম গ, প, ক্ষ প ধ, ম, গ প ধ র্স (উভয় মধ্যম, মধ্যম প্রবল)।

ভূপালী–স র গ প ধ র্স ধ প, গ প ধ প, গ র স (মধ্যম বর্জিত ধৈবত প্রবল)।

যদিও বেহাগ, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, বাগেশ্রী, বাহার, ভৈরবী ও নটমল্লার তাঁর প্রিয় রাগ। কিন্তু স্বদেশি গানের বেলায় তিনি উপরোক্ত রাগগুলো ব্যবহার করেছেন বেশি।

দেখা যাচ্ছে যে, এই প্রতিটি রাগের মধ্যেই একটু লাফিয়ে চলার প্রবণতা আছে ইংরেজি সুরের মতো। তাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও এই শ্রেণির রাগের প্রয়োগে বিদেশি সুরের একটি আলাদা ধারা সৃষ্টি করেছেন–যা একান্তই তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে। 'এই গানগুলিতে দ্বিজেন্দ্রলাল ভারতীয় রাগ-রাগিণীকে আশ্রয় করেছেন। কিন্তু আপাতদৃষ্টিতে তা উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে উঠে।'[৩৫]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিদেশি সুরের ও ভারতীয় রাগ-রাগিণীর মিশ্রণে রচিত গানগুলো এমনই এক বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি যা মূলত অন্য কোনো ধারার সাথে মেলানো মুশকিল। রাগমিশ্রিত হওয়া স্বত্ত্বেও সুরের মহিমায় এতে কোনো রাগই প্রবল হয়ে ওঠে না। 'সংগীতের এই প্রাণোচ্ছল শক্তি আমাদের দেশে ছিলো না। দ্বিজেন্দ্রলাল এই প্রাণশক্তি ইউরোপীয় সংগীত থেকে আত্মসাৎ করে বাংলা গানে সঞ্চার করেছেন।'[৩৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছোটবেলা থেকে তাঁর বাবার কাছে হিন্দুস্তানি গান শিখলেও হুবহু অনুকরণ তাঁর স্বভাবে ছিলো না। নিজস্ব ছোঁয়ায় তাকে হতেই হয়েছে দ্বিজেন্দ্রগীতি। হিন্দুস্তানি সুরের আগে ইংরেজি সুরের সংমিশ্রণের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে এই ইংরেজপ্রীতির জন্য তাঁকে সাহিত্য-রসিকদের অনেক কটুবাক্য সইতে হয়েছে। অক্ষয়কুমার সরকারের একটি ভাষণের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি :

> "য়ূরোপের সঙ্গীতে মীড় মূর্চ্ছনা নাই, এমন নয়; আছে, অল্প আছে–সেই সঙ্গীত প্রধানতঃ খাড়া সুরে গড়া। ভারতবর্ষ মীড় মূর্চ্ছনার দেশ। বাঙ্গালা আবার ভারতের ভারত-বাঙ্গালীর কীর্ত্তনের সুর কেবল মীড় মূর্চ্ছনায় পরিপূর্ণ। ...আমার বর্তমান দুঃখ–নবযুবকদলের মধ্যে ইংরেজি সুরের সঙ্গীতচর্চা দেখিয়া।... যে সুরের কথা আমি বলিতেছিলাম, সেটি প্রধানতঃ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কর্ত্তৃকই নব্যসমাজে প্রচারিত হইয়াছে।... আমার কথা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত ও প্রগাঢ় স্বদেশপ্রেমিক হইলে, তিনি খাড়া সুর বাঙ্গালায় চালাইতে চেষ্টা করিতেন না।"[৩৭]

তবে এ বক্তব্যের প্রতিবাদ করেছেন প্রমথ চৌধুরী ও রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রবীন্দ্রনাথ নিজেই যেহেতু বিলেত ফেরত, পরবর্তী অবস্থায় তাঁর গীতিনাট্য, নৃত্যনাট্য রচনাসহ অনেক গানে বিদেশি সুরের ব্যবহার করেছেন। তাই দ্বিজেন্দ্রলালের এহেন গুণের তিনি সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং এই সংযোজনে হিন্দুস্তানি গানের আরো উন্নতি সাধন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। এই প্রসঙ্গে প্রমথ চৌধুরীর প্রতিবাদপূর্ণ এবং তাঁর কাজের প্রশংসাবাহী বক্তব্যটি তুলে ধরা হলো–

> "দ্বিজেন্দ্রলাল অবশ্য একটি নতুন ঢঙের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু তাতে করে হিন্দুসঙ্গীতের ধর্ম নষ্ট হয়নি–কেননা ওস্তাদি ঢং ভারতবর্ষীয় সঙ্গীতের একমাত্র ঢং নয়। ...দ্বিজেন্দ্রলালের সুরের বিশেষত্ব এবং নূতনত্ব এই যে, সে সুরের ভিতর অতি সহজে একটি বিলেতি চাল চলে এসে পড়েছে। ...আর্টের সৃষ্টির পদ্ধতি হচ্ছে Organic। দ্বিজেন্দ্রলালের হিন্দুসঙ্গীতের ন্যায় ইউরোপীয় সঙ্গীতেও পরিচয় ছিলো। তাঁর অন্তরে এই দুয়ের অলক্ষিত মিলনের ফলে তাঁর সুরের সৃষ্টি। দ্বিজেন্দ্রলাল যে নূতন ঢঙের নবসুরের সৃষ্টি করেছেন, সে সুর তাঁর মগ্ন-চৈতন্যে, দেশি ও বিলাতি সুরের নিগূঢ় মিলনে সৃষ্টি হয়েছে।"[৩৮]

হাসির উপমায় স্বদেশচেতনা

পরাধীন দেশবাসী তথা জননীর বেদনার চিত্র দ্বিজেন্দ্রলালকে আহত করতো, আকুল করতো। সেই ভাবনাই তাঁর রচিত দেশপর্বের গানগুলোর মধ্যে বিস্তৃতভাবে ধরা পড়েছে এবং যে কারণে এই পর্বের গানগুলো জনমনে বিশেষ সমাদর পেয়েছে। দেশমাতৃকার প্রতি প্রেমবোধ ছাড়াও মানুষের পারস্পরিক হিংসা-প্রতিহিংসা, নীতিবিহীন বিচার-বিবেচনাবোধ, মানুষের আত্মিক ও বাহ্যিক রূপের বিশাল ব্যবধান–এই বিষয়গুলোও তাঁকে ভাবাতো। তাঁর গান ও কবিতায় তা প্রবলভাবে প্রকাশ পেয়েছে। স্বদেশপর্বের গান ছাড়াও তাঁর রচিত হাসির গান এসবের ইঙ্গিতবাহী দিকের নিদের্শনা দেয়। হাস্যরসের মধ্যদিয়ে জীবনের কঠিনতর সত্যকে তিনি ব্যক্ত করেছেন নিপুণ পারদর্শিতায়। বাঙালিকে ভাবানোই ছিলো তাঁর মূল লক্ষ্য। ধর্মান্ধতা, ধর্মীয় ও সামাজিক আচার বিষয়ের সংকীর্ণতা এবং পরাধীন ভারতবর্ষের সাহেবী চাল, অথচ মুখে স্বদেশি বুলি–এসবের তীব্র বিরোধিতা করতে তিনি ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের পথ বেছে নিয়েছিলেন। সে কারণেই সৃষ্টির ছোঁয়া পায় তাঁর হাসির গানের এক বিশাল ভাণ্ডার। তাঁর হাসির গানের মূল বিষয় মূলত সমাজের অসংগতি, ভণ্ডামি ও মিথ্যাচার–যা তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারতেন না। তাই হাসির এই ইঙ্গিতবাহী গানের মধ্যদিয়ে তিনি মূলত স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের মানুষের প্রতি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন,

> 'সাময়িক পত্রে মধ্যে মধ্যে 'আষাঢ়ে' রচয়িতার এমন সকল কবিতা বাহির হইয়াছে, যাহাতে হাস্য এবং অশ্রুরেখা, কৌতুক এবং কল্পনা, উপরিতলের ফেনপুঞ্জ এবং নিম্নতলের গভীরতা একত্র প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাই তাঁহার কবিত্বের যথার্থ পরিচয়। তিনি যে সকল বাঙালিকে হাসাইবার জন্য আসেন নাই, সেই সঙ্গে তাহাদিগকে যে ভাবাইবেন এবং মাতাইবেন এমন আশ্বাস দিয়াছেন।'[৩৯]

এ মন্তব্যের মধ্যদিয়ে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের হাসির গানের একটি স্বচ্ছ ধারণা পাওয়া যায়। প্রথাসর্বস্ব আচার-বিচার, ভারতবাসীর সংকীর্ণ মনোভাব, সাহেবী গানের প্রতি মোহ এবং আত্মসিদ্ধি লাভের আশায় দাসত্ব বরণ তাঁকে বেদনার্ত করতো। দেশপ্রেমী দ্বিজেন্দ্রলাল এই সকল বেদনার প্রত্যুত্তর দিয়েছেন কঠিন বিদ্রূপের সাথে তাঁর হাসির গানের মধ্যদিয়ে। স্বদেশচেতনার এক অন্যরকম বহিঃপ্রকাশ যেন এই সকল গান। হাসতে হাসতে জীবনে কঠিনতর সত্যকে, দেশমাতার প্রতি দায়িত্বের বাণীকে তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন এই সকল গানে।

> "জয় জয় মোঘল ব্যাঘ্র মোঘল ব্যাঘ্র
> বলে জোরে ডঙ্কা বাজাই।
> ... ...
> সাধে কি বাবা বলি
> গুঁতোর চোটে বাবা বলায়।"[৪০]

রূপক সাংকেতিকতায় এই গানের মধ্যদিয়ে তিনি এই দেশবাসীরই হীনমন্য ও দৈন্যদশার কথা ব্যক্ত করেছেন। মোঘল, ইংরেজ যতই আমরা পূজি, সামান্য ভুলে যে কোনো সময় গলায় ফাঁসি পড়বে। এর কারণ আমরা পরাধীন। এ ভক্তি সকলই প্রাণের দায়ে। মোঘল, ইংরেজ চটলে আমাদের শান্তি ভঙ্গ হবে

সেই আশঙ্কায় যত স্তুতি বন্দনা। এর মূল বক্তব্য ইচ্ছা না করলেও বিপদের আশঙ্কায় তাদের বশ্যতা স্বীকার করে চলা–যা নিজের ব্যক্তিত্বের পরিপন্থি এবং নিজেরই সাথে প্রতারণা। যেমন–

“আমি একটি শালিক পাখি
(আমার) কাজকর্ম সবই চালাকি;
বেড়িয়ে বেড়াই চালে চালে,
(আর) গান গাই মুদিয়ে আকি।”[৪১]

এই হাসির গানটিতে মূলত আমাদের মানবজীবনের চরিত্রের কথাই ব্যক্ত করেছেন কবি। যা কিছু সহজলভ্য তাতেই আমরা মুগ্ধ। সহজ মনে খ্যাতি আদায়, যা পারি না তা নিয়েই বড়াই। মূলকে ফেলে রেখে বাহ্যিক নিয়ে বাড়াবাড়ি। এ সবই মানুষেরহীন চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ, যা কবি শালিক পাখির চালাকির সঙ্গে মানবচরিত্রের প্রকৃত রূপের তুলনা করেছেন। কবির ভাষায়

“আমরা বিলাত ফেরত ক ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই।
... ...
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা-আর
মুটেদের ডাকি কুলি।”[৪২]

স্বদেশচেতনাকে জাগ্রত করতে যে বিষয়গুলোকে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর হাসির গানে প্রাধান্য দিয়েছেন তা হলো নব্যবাবুয়ানির চাল। যে ছিল মূলত অজ্ঞ মোহসর্বস্ব দাসত্ব। দ্বিজেন্দ্রলাল ভণ্ডামি চরিত্রের তীব্র নিন্দা করেছেন। বাইরে থেকে আমরা ইংরেজ হবার তালে ব্যস্ত, অথচ ইংরেজদের চলন-বলনে আর সাহেবীয়ানায় নিজেকে উন্নত করার চেষ্টায় দ্বিজেন্দ্রলাল অট্টহাসি হাসেন। বাঙালির এহেন বৈপরিত্বের আচরণে, স্বদেশের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে স্বদেশের মানুষের এ রকম বাস্তবজ্ঞানহীন কর্মের নিন্দা করেন দ্বিজেন্দ্রলাল। সেই বিষয়বস্তু নিয়ে রচিত তাঁর কিছু হাসির গানের নমুনা :

১.
“নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু করে, মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো।”[৪৩]

২.
“চম্পটি চম্পটি চম্পটি,
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশালরকমভাবে।
আমরা কজনই এইটি ভবে।”[৪৪]

৩.
“তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে চাও কী
করে মুখে বড়াই?
তা সে হবে কেন!
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে করতে
চাও কী লড়াই?”[৪৫]

এই সকল ব্যঙ্গানুকৃতি গানের ভেতর দিয়ে দেশমাতার সন্তানদের হীনদশার কথা কবি তুলে ধরেছেন। হাস্যরসের মধ্যদিয়ে অন্তরাত্মাকে জাগাতে চেয়েছেন তিনি।

"ছেড়ে দলাদলি, কর গলাগলি
ছেড়ে রেষারেষি, কর মেলামেশি
ছেড়ে ঢাকাঢাকি, কর মাখামাখি।"[৪৬]

এইছিলো কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের জীবনের ভাবনা। তিনি খুব কঠিন, জটিলভাবে জীবনকে দেখতে প্রস্তুত ছিলেন না। হাস্যরসের মধ্যদিয়ে যেমন তিনি নিজে বাঁচতে চেয়েছেন তেমনি অন্যকেও আনন্দ দেওয়ার চেষ্টা করতেন। তিনি দেশের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্যে সর্বদা সচেষ্ট ছিলেন। তাই 'বিলাত ফেরত ক ভাই', 'Reformed Hindus' ও 'ক'টি নবকুলকামিনী' প্রভৃতি গান-কবিতার মধ্যদিয়ে হাসির ছলে দেশমাতার সন্তানদের তাদের কৃতকর্মের জন্য কটাক্ষ করতে ছাড়তেন না। শুধু তাই নয়, কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন ধর্মে নিষ্ঠ। তাই দেশীয় আচারে অনিষ্ঠ সাধক, ভণ্ড ও মিথ্যাচারী স্বজাতি ভ্রাতাদের তিনি আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করতে চাইতেন। ভালো আর মন্দের ব্যবধান তিনি হাসির ছলে, কটাক্ষের ভঙ্গিতে বুঝিয়ে দিতে চাইতেন। একজন দেশপ্রেমী, দেশানুরাগী কবির ছিলো স্থির সমাজের সাথে লড়াই। সমকালীন দেশাচারের ত্রুটি-বিচ্যুতির তীব্র প্রতিবাদ করেছেন হাস্যরসের ছলনায় অত্যন্ত নগ্নভাবে। খুব সাহসী ও আত্মপ্রত্যয়ী কবির পক্ষেই এহেন সাহসী ও বলিষ্ঠ বাণী ব্যক্ত করা সম্ভব। আর স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল সময়ে এই কাজটি একাই সাধন করেছিলেন তিনি।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও জাতীয় জাগরণে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

স্বদেশি আন্দোলন বাঙালির ইতিহাসে এক নতুন যুগের সূচনা করে। রাজনীতি থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক, শিল্প-সংস্কৃতির সকল ক্ষেত্রেই ১৯০৫ সালে এক যুগান্তকারী আন্দোলনের সৃষ্টি করে। উল্লেখ্য এ আন্দোলেনের পূর্বেও বাংলা কবি-সাহিত্যিক সমাজের প্রায় সকলেই দেশাত্মবোধক গান রচনা করেছেন যাদের মধ্যে অন্যতম রামনিধি গুপ্ত (১৭৪১-১৮৩৪), রাজা রামমোহন রায় (১৭৭২-১৮৩৩), ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০-১৮৯১), হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১), রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯), মাইকেল মধুসূদন দত্ত (১৮২৪-১৮৭৩), রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮২৭-১৮৮৭), বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪), গগেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৪১-৬৯), সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (১৮৮৪-১৯২৫) ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রাসাদ সেনের গান বিশেষভাবে ভূমিকা রাখে। এঁদের কারো গানে উঠে এসেছে দেশের অতীত গৌরব কাহিনি, কেউ করেছেন স্বদেশের বর্ণনা।

> "দেশাত্মবোধক গান যাঁ রচনা করেছেন তাঁদের সকলের গান এক ধরনের নয়। কারও কারও গানে দেশের অতীত গৌরব কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে, কারও গানে স্বদেশের গুণগান করা হয়েছে, কারণ গানে দেশমাতৃকার বন্দনা করা হয়েছে, কারও গানে সোজাসুজি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দেশবাসীকে রুখে দাঁড়াবার প্রেরণা দেওয়া হয়েছে।"[৪৭]

এ সকল ব্যক্তিত্বের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাম গীতিকবি হিসেবে অত্যন্ত গৌরবের, বিশেষত স্বদেশচেতনাবাহী সংগীত রচনার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। তাঁর নাটকের জন্য রচিত গানসমূহ বেশি জনসমাদর পায়। মঞ্চের জন্য রচিত এই সকল নাটকে অনেক স্বদেশপর্বের গান ব্যবহৃত হয়েছে–যা নাট্য অভিনেত্রীদের কণ্ঠে গীত হতে হতে অসাধারণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। তাঁর রচিত নাটকগুলো মূলত ইতিহাসের পটভূমিকায় ঐতিহাসিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে রচিত হতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে এবং তার পরবর্তী সময়ে স্বদেশপর্বের এই গানগুলো ঐতিহাসিক নাটকের পাত্র-পাত্রীর কণ্ঠে গীত হতো এবং মানুষ তা দেখে আবেগতাড়িত হতো। বহু মঞ্চে একই নাটক মঞ্চায়ন হতো। কারণ নাট্যকার দিজেন্দ্রলাল খ্যাতিমান নাট্যকারের সুনাম অর্জন করেছিলেন। তাঁর নাটকে ব্যবহৃত গানসমূহ শুনতে শুনতে মানুষের অন্তরমর্মে গ্রথিত হয়ে যেত। সেই স্বদেশি গান আজো আমাদের কাছে তেমনি আদরের ও সম্মানের। ১৯০৫ সালে রচিত তাঁর ‘প্রতাপ সিংহ’ নাটকটি জনমনে ব্যাপক আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল। এই নাটকের দেশপর্বের গানসমূহ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সাধারণ মানুষের মনে বলিষ্ঠ স্বদেশানুভূতির সঞ্চার করে।

> “সেদিন ১৬ই অক্টোবর, ৩০শে আশ্বিন, –বাঙ্গালীর সেই চিরস্মরণীয় ‘অরন্ধন’ ও রাখী বন্ধনের পুণ্যাহ। সেদিন সকালবেলায় নয় কি দশটা বাজিয়াছে, এমন সময়ে, –“কুন্তলীনের” হেমেন্দ্র বসু। (এইচ্ বোস) মহাশয় হঠাৎ দ্বিজেন্দ্রলালের কাছে আসিয়া ‘ব্যস্ত-সমস্ত’ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, –“আজ বিকালে গোলদীঘিতেও একটা প্রকাণ্ড সভা হবে। সেখানকার জন্য একটা গান লিখে দিন। এখনই চাই,– ছাপতে হবে।” বসু মহাশয়কে বিদায় দিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল তদ্দন্ডেই আমার সম্মুখে বসিয়া, অনধিক দশ-পনেরো মিনিটের মধ্যে একটি ‘আশ্চর্য্য রকমের উৎকৃষ্ট’, অগ্নি-গর্ভ গান–ঠিক যেন খেলার ছলে রচনা করিয়া-ফেলিলেন।”[৪৮]

দেশমাতৃকার প্রয়োজনে এমনি বহু তাৎক্ষণিক গান তিনি রচনা করেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গান আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা সকলেরই মন স্বদেশের দৈন্য দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়েছে। তেমনি এ গানেই আবার দুঃখ শোক থেকে পরিত্রাণের জন্য উজ্জীবিত হয়েছে। ‘প্রতাপ সিংহ’ নামক সর্বজন প্রসিদ্ধ নাটকটি তেমনি একটি স্বদেশের প্রতি আত্মজাগানিয়া সৃষ্টি।

স্বদেশমূলক বা স্বদেশের প্রেরণামূলক কোরাস শ্রেণির গান রচনাতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। জাতীয় সংগীত রচনায় তাঁর সাহিত্যিক প্রতিভার অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান মেলে। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সুরের মিলনে তাঁর কোরাস গানসমূহ এক অপূর্ব মাত্রায় পরিপূর্ণ। যদিও পূর্বের আলোচনায় পেয়েছি এই গানগুলোতে ভারতীয় রাগ-রাগিণী মূল উপজীব্য থাকা সত্ত্বেও তা অনুধাবন করা কঠিন। কারণ তিনি রাগ-রাগিণীর সাথে এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভূমিকায় ইউরোপীয় সুরের চলনটির সমন্বয় ঘটিয়েছেন। যেমন-তেমনভাবে শুধু জুড়ে দিয়েই তিনি তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি। বরং এই দুই ধারার সুরের সমন্বয়ের মধ্যদিয়ে স্বদেশপ্রেমের গানের বাণীকে ফুটিয়ে তুলেছেন। দেশের প্রতি অন্তরের গভীর প্রেম জাগানিয়া গানের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন এবং এই কাজে শ্রেষ্ঠ হওয়ার অধিকার অর্জন করেছেন। সুরের রসে তিনি গানের বাণীকে স্বদেশের মর্মবাণী করে তুলেছেন। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুর সমন্বয়ের মাধ্যমে এক সামগ্রিক শিল্পরূপ সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথও প্রথমবার বিলেত

থেকে ফিরে বিদেশি সুরের প্রভাবে রচনা করেন তাঁর অনন্য সৃষ্টি গীতিনাট্য 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া' ও 'মায়ার খেলা'। দেশি-বিদেশি সুরের সমন্বয়ের কাজটিতে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অগ্রগামী। যদিও পরবর্তী জীবনে তাঁর রচনায় বিদেশি সুরের প্রয়োগ আর দেখা যায়নি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সামগ্রিক সুর রচনাতেই বিদেশি সুরের প্রভাব রয়েছে। তবে তা অত্যন্ত পরিমিতি ও পরিশীলিত বোধের মধ্যদিয়ে। স্বদেশি গান রচনার ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ স্পষ্টত পরিলক্ষিত। মূলত বিদেশি সুরের কাটা কাটা সুরের ঢং-টির কারণে জাতীয়তাবাদী সুর রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অধিক অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। এ ক্ষেত্রে রথীন্দ্রনাথ রায়ের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য :

> "দ্বিজেন্দ্রলালের রণ-সঙ্গীত "ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে", "সেথা গিয়েছেন তিনি সমরে আনিতে" প্রভৃতি গান সুবিখ্যাত। উচ্ছ্বসিত আবেগ ও বলিষ্ঠ উদ্দীপনা এই জাতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য। 'ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে', জাতীয় ভূপালীভঙ্গিম গানটি বাংলা গানের ইতিহাসে একটি অদ্বিতীয় সঙ্গীত। দ্বিজেন্দ্রলালের এই শ্রেণীর গানে একটি ওজস্বিতা ও পৌরুষদৃপ্ত ভঙ্গি ফুটে উঠেছে।"[৪৯]

যদিও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সরাসরি স্বদেশি সভায় বক্তৃতা করেননি। কিন্তু শুরু থেকেই তিনি এই আন্দোলনের পক্ষে এদেশবাসীর মনে অনুপ্রেরণার বীজ বপন করে চলেছিলেন। মাতৃপ্রেমে উত্তপ্ত দ্বিজেন্দ্রলাল রায় একান্ত আগ্রহেই স্বদেশি আন্দোলনের সমর্থক ও প্রচারকের কাজ করেন। রাজনৈতিক নেতাদের নানাবিধ আচরণের কারণে তিনি প্রত্যক্ষভাবে রাজনীতিতে বা রাষ্ট্র আন্দোলনে না জড়ালেও তাঁর লেখনির মধ্যদিয়ে সকলের মনে স্বদেশি ভাব জাগাতে বিপুল সহায়তা করেছেন। তিনি দেশমাতার প্রতি কতোটা তন্ময় ছিলেন সমন্বয়ের সাথে কতটা একাত্ম ছিলেন তা দেবকুমার রায় চৌধুরীর বক্তব্যে আরো স্পষ্ট হবে :

> "সে সময়ে প্রায় প্রতিদিনই 'হরেক' রকমে, 'নানান' বেশে, বিচিত্র ভাবে ও বিবিধ 'ঢঙ্গে' কত-সব বিপুল আয়োজন সহকারে কলিকাতার ইতর-ভদ্র, সংখ্যাতীত, উন্মত্ত জনসংঘ মন মাতানো স্বদেশী সঙ্গীত গাইতে-গাইতে, শহরময় পথে-পথে পরিভ্রমণ করিয়া-বেড়াইত; আর, সেই নয়নরঞ্জন, মনঃপ্রাণ-মোহন, অপূর্ব্ব শোভা-যাত্রার দৃশ্য দেখিয়া, দেশপ্রাণ কবি–আমাদের তখন আপন উদ্বেলিত অন্তরের উদ্দাম ভাবাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কখনও এতটুকু বালকের মত 'আহ্লাদে আট্খানা' হইয়া, ছুটিয়া-আসিয়া স্বজন-বন্ধুদের জড়াইয়া ধরিতেন; কখনও উৎসাহভরে, উচ্চকণ্ঠে "বন্দেমাতরম্" বলিয়া আনন্দে হাতে তালি দিতে-দিতে ঐ-সব সঙ্গীতের সঙ্গে-সঙ্গে নৃত্য করিতে থাকিতেন; আবার কখনও বা বাষ্পসিক্ত লোচনযুগল ঊর্দ্ধপানে উন্মুক্ত করিয়া, প্রেমাকুল প্রাণে 'মা, মা' বলিয়া, যথার্থই যেন কাহার অপার্থিব ধ্যানে বিভোর হইয়া যাইতেন! এ-সব অবস্থার তাঁহার সেই হর্ষোজ্জ্বল, রক্তিম মুখে কিংবা উল্লাস-বিস্ফারিত নয়নদ্বয়ে উৎসাহ, আনন্দ ও উদ্দীপনার যে-এক জ্বলন্ত জ্যোতিঃপুঞ্জ বিকীর্ণ হইতে-থাকিত, –না দেখিয়া, আজ কাহারও সাধ্য নাই যে, সে শোভা আংশিকরূপেও অনুমান কি কল্পনা করিতে পারে।"[৫০]

দ্বিজেন্দ্র কাব্যপ্রবাহে স্বদেশচেতনা

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কবিতাসমূহে স্বদেশি আন্দোলনের উত্তেজনার পটভূমিতে কবি মানসের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই। যদিও কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর ব্যাপ্তি বিশাল না হলেও বাংলা কাব্যজগতে দ্বিজেন্দ্রলাল একটি বিশেষ নাম। রবীন্দ্র সমযুগের হওয়া সত্ত্বেও কবি মানসের এক স্বতন্ত্র রূপ ও অনন্য ভঙ্গি দেখা দেয় দ্বিজেন্দ্রলালের কবিতায়। রবীন্দ্রনাথ যে বছর *গীতাঞ্জলি* কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের জন্য

সাহিত্যে নোবেল প্রাইজ পান সেই বছর অর্থাৎ ১৯১৩ সালে ডি.এল. রায় মৃত্যুবরণ করেন। রবীন্দ্রনাথের থেকে বয়সে দুই বছরের ছোট হওয়া সত্ত্বেও এত ক্ষণজন্মা ছিলেন তিনি যে তাঁর কাব্যপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ আমরা দেখতে পাইনি। বিলেত থেকে ফিরে প্রথম জীবনে তিনি রচনা করেছিলেন 'দি লিরিক্স অব দি ইন্ড' নামের একটি ইংরেজি কাব্যগ্রন্থ। এছাড়াও তিনি বাংলায় আরো সাতটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই স্বল্প পরিসরের রচনার মধ্যদিয়েই তিনি তাঁর কবি প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন।

রথীন্দ্রনাথ রায়ের *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার* গ্রন্থে বিশ্লেষণ করে বলতে পারি। দ্বিজেন্দ্রলালের সমগ্র কবি জীবনকে মোটামুটি তিনটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়। যেমন–

ক) আর্যগাঁথা (প্রথম ভাগ) ও ইংরেজি কাব্য নিয়ে কবি জীবনের 'উন্মেষপর্ব'।

খ) আর্যগাঁথা (দ্বিতীয় ভাগ) ও কবি জীবনের 'বিকাশপর্ব' যা কবি জীবনের দ্বিতীয় স্তর।

গ) পরিণতি পর্ব বা কবি জীবনের তৃতীয় স্তর।

দ্বিজেন্দ্রলাল কবি জীবনের প্রথমপর্বের রচনাকালে জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮২) প্রতিষ্ঠিত হয়নি। মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্বদেশি আন্দোলনের প্রকৃত বীজ রোপিত হয়। তাই এর পূববর্তী সময়ে অর্থাৎ 'আর্যগাঁথা'র প্রথমপর্বের রচনাতে জাতীয়তাবোধ প্রকৃত অর্থে পাখা মেলেনি। তাঁর স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলোও ভুল-ত্রুটিতে পূর্ণ ছিলো। কারণ অধিকাংশ কবিতাই তখন ইংরেজদের মহিমা কীর্তনের উপগানে পূর্ণ। উনিশ শতকে তাঁর রচিত কবিতায় পরিলক্ষিত হয় স্ববিরোধিতা। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্বদেশি আন্দোলনে সকলে উদ্বুদ্ধ হয় এবং রচিত হয় স্বদেশি কবিতা-গান। এই আন্দোলনের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে। এই সময়ে মূলত প্রেমের গানে কারোরই আগ্রহ ছিলো না। দ্বিজেন্দ্রলালও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। তাই তিনি রচনা করলেন :

> "রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতি স্বরে রে।
> কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।"[৫১]

এটি দেশপ্রেমমূলক কবিতা 'আর্যবীণা'। এই কবিতার মধ্যদিয়ে কবির স্বদেশি উন্মাদনা প্রথম পরিলক্ষিত হয় এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে স্বদেশি কবিতা-গান মাত্রায় ও ভঙ্গিতে স্বতন্ত্র রূপে দেখা যায়। এ প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি মন্তব্য উল্লেখ করা হলো :

> "Patriotism is assuming a new shape and meaning among us today. There was the patriotism of a kind among the educated classes thirty or forty years back. It was, however, spitepite of its sincerity and exuberance, such as have left a permanent impression upon the mind and character of the older generations of our political and social leaders, something positively more outlandish than indigenous, and decidedly more sentimental than real... Our old *admiration* for Europe has thus been largely supplanted now by an ardent love for our own country. This new love is not, as of old, a vague sentiment and a fairy fancy, such as possesses our hearts when we are under the spell of a great poem or

novel, but something real and true, not merely a subjective attitude but something that yearns for an objective expression and realization, through acts and symbols, as always happens with all real and true love."[৫২]

দ্বিজেন্দ্রলালের কবি জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রচিত স্বদেশপ্রেমের কবিতাগুলোর মধ্যে 'বীণা বাজিরে কি আর', 'জানিনা জননী কেন', 'জন্মভূমি', 'কেন মা তোমারি', 'ভারত মাতা', 'জগমন ভারত' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবিতার নামকরণের মধ্যেও স্বদেশানুরাগ পরিলক্ষিত হয়। তাঁর একটি দেশপ্রেমমূলক কবিতার অংশ দেওয়া হলো :

"কি দুঃখ কহ গো মাতৃ লহ এত অপমান
দেখিতে তোমার দুখ, কাঁদে যে আমার প্রাণ।"[৫৩]

এই কবিতাগুলোর মধ্যদিয়ে কবির স্বদেশচেতনা উদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে অন্যান্য কবিদের মতো দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকাল পর্ব। নিজে সরকারি কর্মকর্তা হওয়া সত্ত্বেও স্বদেশের পরাধীনতায় অন্তরের শোক এই সকল কবিতার মধ্যদিয়ে প্রকাশ করেছেন। সত্যকে সত্য বলতে কখনও পিছপা হননি তিনি। তাই সে সময়ের স্বদেশমাতৃকার ওপরে তাঁর কবিতা-গান মানুষকে দেশপ্রেমে অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের সংগীতে স্বদেশচেতনা

হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক চেতনা যেভাবে স্বদেশচেতনার উদ্ভব ও বিকাশের বীজ বপন করেছিল তেমনি এর প্রধানতম ভিত্তিস্তর নির্মিত হয় কবির মনে বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে। রাজনীতি থেকে শুরু করে জাতীয়তাবাদী এ আন্দোলন ছড়িয়ে পরে সাহিত্য ও সংস্কৃতির নানা ক্ষেত্রে। তবে ভারতীয় রাজনীতিতে যে বিষয়টি বার বার বাধা হয়ে দাঁড়ায় তা হলো অবিচ্ছিন্ন ধারায় কর্মবিযুক্ততা। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও দেখা যায় হিন্দুত্ববাদ ও মুসলিমবাদের আত্মপ্রকাশের দুটি ধারা। যদিও বহুপূর্ব থেকেই এর ধারাবাহিকতা চলমান ছিলো। মুসলিম সমাজ অনেক পিছিয়ে ছিলো। রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য থেকে পাওয়া যায়, হিন্দু ছেলেমেয়েরা ইংরেজদের স্কুলে যাওয়া শুরু করে এবং শিক্ষিত হয়ে বহুবিধ সামাজিক সুযোগ-সুবিধাগুলো আদায়ে সচেষ্ট হয়। কিন্তু মুসলমানদের পক্ষে সেটি সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। সেদিক থেকে মুসলমানদের অবস্থা ছিলো বড়ই করুণ। কারণ তারা শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন পিছিয়ে। মূলত উনিশ শতকে ওই সময়টাতে মুসলমানদের পশ্চাৎপদ জাতি হিসেবে চিহ্নিত করা হতো। যার উল্লেখ পাওয়া যায় সিভিলিয়ান উইলিয়াম হান্টারের *দি ইন্ডিয়ান মুসলমানস* গ্রন্থটিতে (১৮৭১)। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনায় আমরা যাবো না। তবে এ বিষয়ে অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বক্তব্য এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন,

> "দেশপ্রেমিক লেখকরা শুধু হিন্দু কাঠামোবিশিষ্ট প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিকেই মহিমান্বিত করে তুলতেন না, সেই সঙ্গে স্বাধীনতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তুলে ধরতেন রাজপুত, মারাঠা, শিখদের সংগ্রামের কথা। প্রতিটি সংগ্রামেই প্রতিপক্ষ এক ও অভিন্ন–মুসলিমরা। এর ফলে জাতীয় চেতনায় আরো তীব্র হয়ে উঠেছিল হিন্দুপ্রবণতা, তার ফল খুব সুখকর হয়নি, (বাংলার রেনেসাঁস)।"[৫৪]

জাতীয় ঘোষণা এভাবেই দুটি ভিন্ন ধারায় প্রবাহিত হতে থাকে। যার ফলশ্রুতিতে প্রতিষ্ঠিত হয় কংগ্রেস, হিন্দু মহাসভা ও মুসলিম লীগের মতো সংগঠন। আগেই বলেছি হিন্দু শ্রেণি শিক্ষা-দীক্ষায় এগিয়েছিলো বলে রাজনারায়ণ বসু, নবগোপাল মিত্র ও ঠাকুর পরিবারের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সামাজিক সম্মিলন পরিষদ। ভারতীয় মেলার নামের পরিবর্তে নামকরণ করা হয়েছিল 'হিন্দুমেলা' (১৮৬৭)। 'রবীন্দ্রনাথের গানে স্বদেশচেতনা' পর্বে এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে বিধায় এখানে তা নিষ্প্রয়োজন। তবে এটুকু বলতেই হবে যে, এই বৈষম্যকে নির্মূল করবার প্রয়াসেই রবীন্দ্রনাথ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনকালে রাখী বন্ধন প্রবর্তন করেন। যেখানে বঙ্গভঙ্গের থেকে হিন্দু-মুসলিম, ধনী-গরিবের মধ্যকার ব্যবধানকে আগে ঘোচাতে হবে মর্মে পথে নেমেছিলেন রবীন্দ্রনাথসহ অনেকে এবং একান্ত সমর্থক ছিলেন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়। সরাসরি স্বদেশ আন্দোলনের একজন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ না করলেও নিজের রচিত নাটক, কবিতা-গানে এর স্পষ্ট উদাহরণ পাওয়া যায়। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন নতুন করে আবার মনে দেশাত্মচেতনার উন্মেষ ঘটায়। ১৬ অক্টোবর ১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত কার্যকরি হয়। তবে উল্লেখযোগ্য যে, এর বিরোধ আন্দোলনে প্রাধান্য হিন্দু সম্প্রদায়ের হলেও জাতিগত আবেগে অনেক মুসলিম নেতাও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনে যুক্ত হন। তবে নবাব সলিমুল্লাহ, নওয়াব আলী চৌধুরী প্রমুখ বঙ্গভঙ্গের পক্ষে সমর্থন আদায়ের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। এই সকল বিরোধ, আন্দোলনে সকলেই দেশাত্মবোধের উত্তেজনায় ভাসছিলেন। তখনই দ্বিজেন্দ্রলালের *প্রতাপ সিংহ* ঐতিহাসিক নাটকটি জনমনে স্বজাতি-স্বদেশের প্রতি অনুরাগ তৈরিতে সহায়তা করে। আর্যগাঁথার প্রথমপর্বের প্রথম সালটিও তিনি রচনা করেন স্বদেশ অনুরাগে সিক্ত হয়ে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলন এবং এর পরবর্তীকালে দেশ-জাতীয় স্বদেশি আন্দোলনের নানা প্রেক্ষাপটে রচিত হয় কবিতা ও গান। তাঁর দেশপ্রেমের কবিতা ও গান বাঙালি চিত্তে দেশপ্রেমের এক অনন্য চিত্র ফুটিয়ে তোলে। যা সমসাময়িক অনেক কবির পক্ষেই সম্ভবপর হয়ে ওঠেনি। কলকাতার রঙ্গমঞ্চ তখন উত্তাল হয়ে ওঠে তাঁর ঐতিহাসিক ও জাতীয়তাবাদী নাটকের আবেগে। ১৯০৩ সাল থেকে ১৯১৩ সাল পর্যন্ত তাঁর পত্নীবিয়োগের পরবর্তী সময়ের ১০ বছর কবিহৃদয় ভারাক্রান্ত ও বিষাদে ম্রিয়মাণ ছিলো। সেই সময়টাতে কবি প্রেমের গানের তুলনায় স্বদেশি গানের প্রতি ঝুঁকে পড়েন। সময়ের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে স্বদেশি গান করবার এক উন্মাদনা দেখা যায় তাঁর মধ্যে।

সে সময় কবি কর্মসূত্রে গয়াতে ছিলেন। জগদীশ চন্দ্র বসু গয়াতে বেড়াতে গেলে কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁকে মেবার পাহাড় গানটি গেয়ে শুনিয়েছিলেন। গানটি শুনে জগদীশচন্দ্র বসু বলেছিলেন, "আপনার এ গানে আমরা কবিত্ব উপভোগ করিতে পারি, কিন্তু যদি আমি মোবারের লোক হতেম তাহলে আমার প্রাণ দিয়ে আগুন ছুটত। তাই আপনাকে অনুরোধ করি আপনি এমন একটি গান লিখুন যাতে বাঙ্গালার বিষয় ও ঘটনা–বাঙ্গালীর বিষয় ও ঘটনা থাকে।"[৫৫]

বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রলালের সেই দিনের গানের প্রশংসা এবং মুগ্ধ হওয়ার কথা পরবর্তীকালেও তাঁর লেখনিতে উল্লেখ করেছিলেন,

> "কয়েক বৎসব পূর্বে একবার গয়ায় বেড়াইতে গিয়াছিলাম। সেখানে দ্বিজেন্দ্রলাল আমাকে তাঁর কয়েকটি গান শুনাইয়াছিলেন। সেদিনের কথা কখনও ভুলিব না। নিপুণ শিল্পীর হস্তে আমাদের মাতৃভাষার কী যে অসীম ক্ষমতা সেদিন তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলাম।... ধরণী এখন দুর্বলের ভার বহনে প্রপীড়িতা।... বর্তমান যুগে বীর্য অপেক্ষা ভারতের উচ্চ ধর্ম নাই। কে মরণ-সিন্ধু মন্থন করিয়া অমরত্ব লাভ করিবে? ধর্মযুদ্ধের এই আহ্বান দ্বিজেন্দ্রলাল বজ্রধ্বনিতে ঘোষণা করিতেছেন।"[৫৬]

দ্বিজেন্দ্রলাল মারা যাবার কয়েক বছর পরে জগদীশচন্দ্র বসু দ্বিজেন্দ্রপুত্র দিলীপ রায়কে তাঁর বাবার লেখা অসাধারণ স্বদেশ ভঙ্গির গানটি গাইতে বলেন। যে গান বাঙালির হৃদয়ে চির অমরতার দাবি হয়ে জ্বল জ্বল করছে :

১১

"বঙ্গ আমার! জননী আমার!
ধাত্রী আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তার শুষ্ক নয়ন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!"[৫৭]

স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত প্রায় আঠারোটি গান রয়েছে তাঁর দেশপর্বের গানের তালিকায়। এ ছাড়াও তাঁর হাসির গান, প্রবন্ধ, নাটক ও কবিতায় স্বদেশের প্রতি প্রতিফলন ও চেতনার উন্মেষ দেখতে পাওয়া যায়। নির্ভীক এই কবি জীবিকার জন্য বিদেশি রাজতন্ত্রের আমলা হয়েও স্বদেশের জন্য আন্দোলনে গেছেন ভিন্নতর পন্থায়। এমন কিছু স্বদেশি গানও তিনি রচনা করেছিলেন যা পরে নিজেকে পুড়িয়ে ফেলতে হয় সহৃদ বন্ধুত্বের অনুরোধে। নতুবা শুধু বদলি বা চাকুরিচ্যুতিই নয়, শেষ জীবন হয়তো তাকে কাটাতে হতো আন্দামান দ্বীপে।

'বঙ্গ আমার/জননী আমার', গানটি কবির অসামান্য সৃষ্টি–যা স্বদেশচেতনার একটি চিরস্থায়ী গীতিতে পরিণত হয়েছে। এ গানটির রচনা প্রসঙ্গে তাঁর জীবনীকার দেবকুমার রায় চৌধুরী অত্যন্ত সুন্দর একটি গল্পের উল্লেখ করেন–

> "একদিন বোধহয় অষ্টমী পূজার দিন দুপুর বেলায় আহারান্তে বসিয়া আছি, কবিবর হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, 'দেখ, আমার মাথার মধ্যে কয়েকটি লাইন ভারি জ্বালাতন করছে। তুমি একটু বসো ভাই–আমি সেগুলি গেঁথে নিয়ে আসি।' একটু পরে তিনি এসে আমাকে একটা ধাক্কা দিয়া কহিলেন, 'উঃ কী চমৎকার গানই বেঁধেছি শোনো'-এই বলিয়া গাহিয়া উঠিলেন: 'বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার আমার দেশ'... হাততালি দিতে দিতে ঘরময় নাচিয়া নাচিয়া আবার গাইতে লাগিলেন –
>
> কীসের দুঃখ, কীসের দৈন্য, কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ।
> সপ্তকোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'।
>
> পরদিবস প্রাতে জেলা জজ সুকবি বরদাচরণ মিত্র মহাশয় সহসা আসিয়া দ্বিজেন্দ্রলালের অতিথি হইলেন। সেদিনও সন্ধ্যায় দ্বিজেন্দ্রলাল আমাদের অনুরোধে সে গানটি গাহিয়া শুনাইলেন। গান শেষ হইয়া গেলে... সহসা শ্রীলোকেন্দ্রনাথ পালিত কবির করদ্বয় পীড়ন করিতে করিতে কহিলেন, Oh how wonderful-how magnificent! Let me confess, my dear Dwiju, it's undoubtedly the very very very best and noblest national song I've ever heard or read in my life."[৫৮]

লেখক নূপুর ছন্দা ঘোষের লেখনিতে এ তথ্য মেলে যে, এই গানের শেষ চরণ কবিকে পরিবর্তন করতে হয়েছিল। যেখানে বর্তমানের 'মানুষ আমরা নহি তো মেষ' স্থলেছিলো 'হৃদয় রক্ত করিয়া মোষ'–যা ছিলো অত্যন্ত উত্তেজনা সৃষ্টিকারী বাক্য। চারদিকে তখন চলছিল রাজদ্রোহের অপরাধে ধরপাকড়। বোমা বিপ্লবীদের এ বাক্যের মাধ্যমে আরো উত্তেজিত করবার অভিপ্রায়ে চাকুরিচ্যুতি তো বটেই জেল-হাজতও হতে পারে। তাই বন্ধু দেবকুমার বাবু, লোকেন পালিত, বরদা বাবু প্রমুখজন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে লাইনটি পরিবর্তনের অনুরোধ করেন। চরম অনিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও নিতান্ত বাধ্য হয়ে কবি পরে নিম্নরূপ লাইনটি পরিবর্তন করেন।

"ভারত আমার ভারত আমার
যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা,
এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র"[৫৯]

এই গানটিতে কবি ভারত মাতার স্তুতি বন্দনা করেছেন। কর্ম-জ্ঞান-ধর্ম-ধ্যান সকলই এই মায়ের দান। রবীন্দ্রনাথের মতো করে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানেও দেশকে মাতৃরূপে বিবেচনা করার এক অভূতপূর্ব প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়। এই গানটি পরাধীন ভারতবাসীর কাছে দেশমাতার মুক্তি-কামিতার বেদমন্ত্রস্বরূপ। সাধারণ মানুষকে যেভাবে এই সকল গান দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করেছিল, তা অনেক সভায় বক্তৃতার মাধ্যমেও সম্ভবপর নয়। মায়ের সম্মান রক্ষায় মানুষকে প্রতিবাদ করবার অনুপ্রেরণা দেয় তাঁর রচিত স্বদেশপ্রেমের গানে। উদ্দীপনার জোয়ারে দেশ ভাসছিলো এবং সেই জোয়ারে তীব্র বেগ হয়ে সহায়তা করে দ্বিজেন্দ্রলালের গান–

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে
উঠিলে জননী! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব,
সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ।"[৬০]

শ্রী অরবিন্দ 'ভারত আমার ভারত আমার' ও 'যেদিন সুনীল জলধি' গান দুটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন। এই সকল গানে দ্বিজেন্দ্রলাল 'কোরাসে'-এর জন্য কিছু অংশ সংযোজন করেছেন–যা বাংলা সংগীতে এক অন্যরকম চেতনা সৃষ্টি করে। মূলত এই কোরাসের ব্যবহারের ঢংটিও তিনি বিদেশি গানের অনুপ্রেরণায় আয়ত্ত করেন। একদিকে স্বদেশি গানের খাড়া খাড়া সুতীর্যক সুর, আবার কোরাসের সমন্বয়ে সবকিছু মিলিয়ে স্বদেশি চেতনা জাগানিয়া অনন্য সৃষ্টি তাঁর এই সকল গান।

> "১৯৫৩ সালে কবি-পুত্র দিলীপকুমার রায় বিশ্বভ্রমণে গিয়ে বিদেশে সর্বত্রই এই সকল গান প্রাণ খুলে গেয়েছিলেন এবং শ্রোতাদের উচ্ছ্বসিত সাড়া তাঁকে এক আনন্দ সমুদ্রে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আসলে বিদেশি সুরের যে গতি ও Movement এবং তার সঙ্গে আলাইয়া বিলাবল ঠাটের মিশ্রণে 'বঙ্গ আমার জননী আমার' গানটিকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে। সুর ও বাণীর এমন গঙ্গা-যমুনা সংগম একমাত্র দ্বিজেন্দ্রলালের এই দেশাত্মবোধক গানগুলিতে এমনভাবে ফুটে উঠেছে, তার তুলনা মেলা ভার। শুধু 'বঙ্গ আমার' নয় দিলীপকুমার রায় 'যেদিন সুনীল জলধি হইতে' রেডিয়োতে ইংরেজ ও জার্মান ভাষায়ও তরজমা করে মূল বাংলার সুরে গেয়েছেন।"[৬১]

"ভেঙ্গে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর
ছিড়ে গেছে মোর বিনার তার

এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরানে
আজি মা কি গান গাহিবো আর!"৬২

অনন্যসুন্দর কথামালায় গেয়েছেন কবি এই গানটিকে। সৃষ্টিকল্প থেকে জননী ভারতমাতার গুণকীর্তন উপহারে ভরা এই গানটির আদ্যপান্ত। এখানে কবি প্রকৃতির পরিবর্তনের সাথে সাথে এক জীবন্ত মায়ের জীবনীকারের গল্প গেঁথেছেন প্রতিটি ছত্রে।

ঐতিহাসিক নাটক 'মেবার পতন'-এর এক অন্যরকম উদ্দীপনামূলক গান এটি। উদয়পুরের পথে পথে সত্যবতী চারণের দলকে সাথে নিয়ে মেবার পতনের দুঃখগাঁথা গেয়ে চলেছেন এ গানের মধ্য দিয়ে। বর্তমানের দুঃখ- দুর্দশা, হীনতা, লজ্জা লাঘব করা সম্ভব পুরাতনী ঐতিহ্যের কল্পনায়। এই গানটির মধ্যদিয়ে কবি তৎকালীন ভারতমাতার কঙ্কালসার অবস্থারই ছবি এঁকেছেন এবং অতীতের বাণীকে বাঁচিয়ে রাখতে বলেছেন । এই বাণীর এই অতীত চিত্রই দিবে আবার আলোয় ঝলমলে নতুন দিন। এই মেবার পাহাড়কে রক্ষা করতে অযুত লক্ষ বীর প্রাণ দিয়েছেন। কবি বিশ্বাস করেন মেবার পাহাড়ের রক্ত পতাকা চিরকাল উচ্চশিরেই ধাবিত থাকবে। ইংরেজ দ্বারা ভারতবর্ষের মানুষ যেমন নিষ্পেষিত, পদদলিত; অন্যদিকে এর অভ্যন্তরীণ কোন্দলে নিজেরা নিজেদের বিশ্বাস স্থানচ্যুত করে আত্মসিদ্ধির লোভে মাতোয়ারা হয়ে দেশ জননীর অতীত গৌরবকে তুচ্ছ করতে বসেছে। কবি তাই সেই শঠতা, নীচুতা ও কাপুরুষতাকে জয় করতে বলেছেন। দেশমাতাকে রক্ষার আমরণ সংগ্রামের দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন 'মেবার পতন' গানটির মধ্যদিয়ে।

"জাগো জাগো পুরনারী।
জিনিয়া সমর আসিছে অমর–
বীরকুল তুমারি!
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস
মেবারচন্দ্র সূর্য্যবংশ;
গেছে তারা শুরু রঞ্জিত করি
মেবারের তরবারি।"৬৩

মেবার পতন ঐতিহাসিক নাটকের আরো একটি অনবদ্য স্বদেশপ্রেমের গান। এখানে বার বার আবার মানুষ হতে বলে কবি স্বদেশমাতার প্রতিটি সন্তানকে ধিক্কার করছেন। এ গানটির মধ্যে এক অদ্ভুত শক্তি আর উন্মাদনা কাজ করে। আবার মানুষ হবার জন্য রক্তে দোলা জাগে–

"কীসের শোক করিস রে ভাই
আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই,–
আবার তোরা মানুষ হ"৬৪

নিচের গানটির মধ্যে কবি নিপুণ ভঙ্গিমায় দেশী কথার ভাজে ভাজে কোরাসের ব্যবহার করে স্বদেশি আবেগকে আরো ঘনিভূত করেছেন :

"আজি গো তোমার চরণে, জননী
আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান;
ভক্তি-অশ্রু সলিল-সিক্ত
শতেক ভক্ত দীনের গান!"৬৫

অন্যদিকে *রানা প্রতাপসিংহ* নাটকের গান ‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে’। যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার এ গানে দেশবাসীকে রক্ষায় শক্তিমান রণসাজে প্রস্তুত সৈন্যদলের চিত্র এক আশার আলো ছড়ায়। দেশমাতার জন্য আত্মস্তুতি দিতেও কোনো বাধা আসে না মনে এমনি এক উদ্দীপনা জাগানিয়া গান এটি : ‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা।/রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুন ঐ ডাকে ভারতমাতা।’[৬৬] কল্যাণ পর্বের এই গানের সুরে বিদেশি সুরের সংযোজন দ্বিজেন্দ্রলালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। দ্রুত গতির এই গানে জনমনে নতুন প্রাণশক্তিতে দীব্যমান করে। এ নাটকের স্বদেশানুভূতির প্রকাশে যুদ্ধ জয়ের স্বদেশপ্রাণ সমর নেতাদের জয় গান গেয়েছেন কবি।

“একবার গালভরা মা-ডাকে
মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্,
মা ব'লে ডাক্ মাকে।
ডাক্ এম্নি ক'রে আকাশ, ভুবন
সেই ডাকে যাক ভ'রে
আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক
যেখানে যে থাকে।”[৬৭]

দেশপর্বের এই গানটিতে ‘মা’-কে এক অপূর্ব গরিমায় চিত্রায়ণ করেছেন কবি। ‘মা’ ডাকে যে আকুলতা রয়েছে, সমস্বরে ‘মা’ ডাকে যে আহ্বানি শক্তি লুকিয়ে আছে তাই ব্যক্ত করেছেন কবি। কখনও মনে হয় এ ‘মা’ যেন দশভূজা দূর্গা মা, আবার কখনও মনে হয় শক্তিমান এ ‘মা’ যেন শ্যামা মায়ের রূপ, যে মায়ের পায়ের তলায় আছড়ে পরার কথা বলেছেন কবি। পরক্ষণেই মনে হয় এ ‘মা’ চিরায়ত বাংলার মা জননী, এ ‘মা’ সন্তানের বুকের মাঝে। তাই এই ‘মা’ ডাকে এতো শান্তি এতো তৃপ্তি। আবার অন্যত্র পাই এই জননীকে তুষ্টির জন্য কত আয়োজনে অর্ঘ্য সাজিয়ে গানের ডালিতে কবির ভক্ত হৃদয় দান করছেন। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল ছিলেন মূলত ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। তাই তিনি জগৎজননী দুর্গামাতা দেশমাতা ও জন্মধাত্রী মাতাকে এক সূত্রে বেঁধেছেন নিজের সাধনার উৎস রূপে। এ মা জননীর চরণে কবি ক্ষণেক অশ্রুসিক্ত ক্ষণেক অভিমানে ম্রিয়মান। ‘আজি গো তোমার চরণে, জননী!’ গানটির মধ্যদিয়ে এভাবেই কবি দেশমাতৃকার প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন। এ গানটিতে কবি মাতৃভাষাকে জননী বলে সম্মোধন করেছেন। মাতৃভাষার গুরুত্ব উপলব্ধি করেই কবি বার বার কোরাসে যুক্ত করেছেন এ অংশটি। বাংলাভাষা থাকলে এ জীবনে আর কোনো অর্থ-বিত্তের প্রয়োজন হবে না। এই ভাষাকে রক্ষায় কবি মায়ের সন্তানের কঠোর ব্রতের কথা তুলে ধরেছেন। এ গানে কী যে আকুলতায় কবি মায়ের অমল-কমলচরণ সাজাতে চেয়েছেন তার অভিব্যক্তি পাই গানটির আদ্যপ্রান্ত জুড়ে। তিনি দেশমাতার আরাধনার যে চিত্র এঁকেছেন এমন করে সমসাময়িক আর কোনো কবির লেখনিতেই ফুটে ওঠেনি। এ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের দেশ-ভক্ত এক প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়।

> “দেশকে তিনি অন্তর দিয়ে ভালোবেসেছেন। মাতৃবন্দনা করেছেন তিনি নানাভাবে। দেশমাতাকে ভেবেছেন নিজের মা বলে, যে কোনও সন্তানই তার মায়ের সব কিছু সুন্দর মনে করে থাকে। “আমার মায়ের হাতে রান্না অপরূপ।” “মায়ের মুখটি যেন দেবী দুর্গার মতো।” এমন কথা তো সন্তান তার মায়ের সম্পর্কে বলেই থাকে। আর যাঁর মা রূপসি, মহীয়সী,

জগদ্বরেণ্যা, তিনি তো প্রাণের আনন্দে তাঁর মায়ের সৌন্দর্য বর্ণনা করবেন তাঁর কবিত্বের ছোঁয়া দিয়ে। আমরা সরস্বতী বন্দনা করি, লক্ষ্মী বন্দনা করি, দেবী দুর্গার বন্দনা করি। দ্বিজেন্দ্রলাল দেবীরূপে দেখেছেন তাঁর দেশকে।"[৬৮]

তাই কবির দেশমন্ত্রের গান :

"সদ্যঃ স্নান সিক্ত বসনা চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে, অমল কমল আনন দীপ্ত।
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্ত্র মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্ত্র"[৬৯]

দেশপ্রেমের জয়গান যে এমনি মহিমায় বেঁজে উঠেছে দ্বিজেন্দ্রলালের গানে তা অবিস্মরণীয়। দেশপ্রেমের অনুভূতিকে গভীর থেকে গভীরতর করতে বহুবিধ উপমায় তিনি দেশমাতাকে বন্দনা করেছেন। এ আকুলতা কোনো চিরচেনা রূপ নয়, দেশমাতাকে ভালোবাসার, দেশমাতার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবার প্রতিজ্ঞা নিহিত রয়েছে প্রতিটি গানে। কী অপরূপ ভঙ্গিমায় স্বদেশের রূপের বর্ণনা করেছেন কবি। স্বদেশের বুকে যে শান্তি তা আর কোথায়! জগৎপালিনী, জগত্তারিণী, জগজ্জননী, জগন্মোহিনী–এ জননীর চরণ স্পর্শ করে ধন্য হয়, সিক্ত হয়। কবির ভাষায় : 'কী মাধুর্য জন্মভূমি জননী তোমার!/হেরিব কী তোমারে মা নয়নে আবার।'[৭০]

জন্মভূমিকে মাতৃরূপে কল্পনা এবং স্বদেশের প্রকৃতির রাগের বর্ণনার মধ্যদিয়ে 'মা'-এর স্তুতি বন্দনার মতো অভূতপূর্ব সৃষ্টি রবীন্দ্র-দ্বিজেন্দ্র ছাড়া আর কারো গানে সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের 'যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়বো না' গানের ভিতর দিয়ে দেশমাতার জন্য আকুল আবেগে অন্তর ভেসে যায়, দ্বিজেন্দ্রলালের এ গানও তদ্রূপ। এ 'মা'-কে ছেড়ে বাঁচা দায়। এ মায়ে লালিত শৈশব, যাপিত যৌবন ভোলা দায়। যত দূরে যাই যেখানেই থাকি এ মায়ের অভূষণ শোভারাশি এক মুগ্ধতায় মন ভরিয়ে রাখে। এ মা'তেই স্বর্গ সুখ। স্মৃতি চোখ শুধু খুঁজে বেড়ায় দেশমাতার ছবি।

কোরাস গানের আরেকটি উদাহরণ পাই সমরযাত্রার এ গানটিতে–

"সেথা, গিয়াছেন তিনি সমরে,আনিতে
জয়গৌরব যিনি;
সেথা, গিয়াছেন তিনি মহা আহ্বানে–
মানের চরণে প্রাণ বলিদান,
মথিতে অমর মরন সিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।"[৭১]

এ গানটিতে কোরাস অংশে কবি সধবা-বিধবা সকল বীরজায়াকে উচ্চশিরে অশ্রু মুছতে বলেছেন। এখানে কবি সকল নারীকুলকে সম্পৃক্ত করতে চেয়েছেন। যেমনটি আমরা পাই 'জাগো জাগো পুরনারী' গানটিতে। তবে এ গান যে নাটকের প্রয়োজনে লেখা– তা অনুধাবন করা সহজ এর বাণীর বন্ধনীতে। ইরানের নারীদের উদ্দেশ্যে কবির একটি ব্যতিক্রমী দেশপর্বের গান–

"চলো চলো যাই আমরা সবাই
ইরানের বীর নারীগণ।
নাচি রঙ্গে রণতরঙ্গে,
এইখানে শেষ নহে রণ।"[৭২]

তিনি কিছু উচ্চমার্গের ব্যতিক্রমী স্বদেশপর্বের গানও রচনা করেছেন। যেমন পুনরুক্ত–

"ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক–সকল দেশের সেরা,–
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে-আমার জন্মভূমি।"[৭৩]

এ গানটি নাটকের উদ্দেশ্যে রচিত হলেও গানটি মানুষের হৃদয়ে জাগিয়ে তোলে স্বদেশের প্রতি গভীর ভালোবাসা ও ভক্তি। এর মন ভোলানো সুরে আর বাণীর সমন্বয়ে স্বদেশের যে চিত্র কবি তুলে ধরেছেন তাতে কখনোই মনে আসে না এটি কোনো নাটকের দৃশ্যে কোনো একটি চরিত্রের জন্য রচিত গান। এ গানটি বাঙালির হৃদয়ের গানে পরিণত হয়েছে। বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলন পরবর্তী সকল জাতীয় সংকটে একদিকে বেজেছে রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা', 'বন্দে মাতরম', আর অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি। গীতিকবিতার মধ্যদিয়ে কবি স্বদেশের যে নিবিড় বিচিত্র রূপের বর্ণনা দিয়েছেন এর তুলনা হয় না। স্বপ্না বন্দোপাধ্যায়ের মতে *সাজাহান* নাটকের বিষয়বস্তুকে বারবার হার মানায় এই গানটির চিত্ররূপ।

> "নাটকের বিষয়বস্তুতে যত না সার্থকতার দাবি জানায়, তার থেকে বেশি সংগীত রসপিপাসুদের চিত্তে সুরে ও কথায় এক অন্তলীন ভাবমাধুর্যের সৃষ্টি করে। কার চরিত্রে, কোন্ দৃশ্যে, কী ঘটনায় গানগুলি পরিবেশিত, তা নিয়ে আদৌ প্রশ্ন জাগে না। গীতিকবির অন্তরে শেষপর্বে ভক্তি ও প্রেমের যে জীবননিষ্ঠ আবেগ নিত্য রসরূপ লাভ করছিল, গানগুলি সৃষ্টি করে স্রষ্টা পেয়েছেন অন্তরে এক নিবিড় প্রশান্তি, নাটকে স্থান করে দেওয়াটা যেন মনে হয় কার্য-কারণের উপলক্ষ মাত্র। যেমন 'ধন্যধান্য পুষ্পভরা' গানটিতে যে বর্ণনা, তা কিন্তু নাটকের পরিবেশ অনুযায়ী আদৌ উপযুক্ত নয়। 'সাজাহান' নাটকের পঞ্চম অঙ্কের ষষ্ঠ দৃশ্যে, যোধপুরের প্রাসাদ পটভূমে, মধ্যাহ্নে, চারণ বালকদের কণ্ঠে গানটি স্থান পেয়েছে। পরিবেশ ও ঘটনানুযায়ী যোধপুরাধিপতির রানী মহামায়ার দেশপ্রেমের প্রসঙ্গে গানটি পরিবেশিত। কিন্তু জন্মভূমির বর্ণনায় কি রুক্ষ রাজপুতানার রূপৈশ্বর্য বিকাশিত এ তো বঙ্গজননীর স্নিগ্ধ নদীগিরীবেষ্টিত, হরিৎক্ষেত্রশোভিত, রূপমহিমার বর্ণনা। এ রূপ রাজপুতানার নয়। অর্থাৎ বোঝা যায়, দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বোধিত করে তুলতে রাজপুতানার মানুষকে দ্বিজেন্দ্রলাল, যে মাতৃভূমির রূপে গুণে আকৃষ্ট করতে চেয়েছেন, অবচেতনভাবে, গীতিকারের অন্তরে স্বদেশপ্রেমের মহিমা গুঞ্জরিত হয়ে ফিরছিল বলে, স্বতঃই সে বর্ণনা বাংলাদেশের কোমলস্নিগ্ধ শান্তরূপে বর্ণিত। নাটকের বিচারে এখানে কালানৌচিত্য দোষ ঘটেছে বলা যায়। কিন্তু বাংলাদেশের পাঠকরা লাভবান হয়েছেন এমন অপূর্ব একটি বঙ্গভূমির মাতৃবন্দনাগীতি হাতে পেয়ে।"[৭৪]

কখনো স্বদেশের রূপে মুগ্ধ কবি আবার কখনো স্বদেশের প্রতি অভিমানে ম্রিয়মান কবির মন। এ যেন প্রাত্যহিক জীবনের রাগে-অনুরাগে কবি বেঁধেছেন স্বদেশের চেতনাকে। দেশ একটি ভূ-খণ্ডের নাম, এঁকে রক্ষায়, এঁর সম্মান রক্ষায়, দেশমাতার সন্তানদের যে কত শোকতাপ সইতে হয়, এ খবর জানা নেই দেশমাতার। তিনি তো মহিমা-গরিমার অধিকারী পুণ্যময়ী মা। সন্তান রক্তস্রোতে ভেসে যায় মার

উচ্চশির রক্ষায়। কিন্তু মা তো নিশ্চলা, সুজলা-সুফলা। এর রূপে ধরণী মুগ্ধ। এর হিমাদ্রিজঙ্ঘা, যমুনা-গঙ্গা, পুষ্পেভরা কুঞ্জ, শস্যভরা শ্যামল ক্ষেত্র চিরবরণীর আদরের জন্মভূমি।

"তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই
চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন,
হারায়েছি সব বিভার, গরিমা;.."[৭৫]

আবেগভরা অভিমানের বাণী ব্যক্ত করেছেন, কবি ভাগীরথী নদীর প্রতিও। যে মায়ের এ দৈন্যদশা, যে মায়ের আকাশে কলঙ্ক রেখা, সেই মায়েরই বুকে কী করে অনন্তচিত্তে হাসতে হাসতে নাচতে নাচতে চলা যায়। ভাগীরথীর হরষিত মনকে বাধ সাধতে বলেছেন। এ মায়ের কলঙ্করেখা মুছতে এই তটিনীর গম্ভীর রবে গর্জে ওঠার সময় এবার :

"কেন ভাগীরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো।
ঢলিয়ে ঢলিয়ে সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কী সুখ পাও গো ॥"[৭৬]

আবার কবির সাধের বীণায় বাজে করুণ সুর। সাধের গানও কোমল সুরে উপলব্ধ। লোকলজ্জা, সমাজ ভয় ভুলে কবি আবার উচ্চ সুরে গান গাইতে চান। কিন্তু বীণার ঝঙ্কারে কবির বুক কেঁদে ওঠে। স্বদেশের কোনো সন্তানের প্রাণেই আর আনন্দের গান বাজে না। তবুও কবি আশায় বুক বাঁধেন। বাঁধতে চান নতুন গান। নতুন গানের নতুন সুরই হয়তো দেশমাতাকে কলঙ্কমুক্ত করতে পারবে সেই আশায় কবি বীণায় সুর বাঁধেন :

"ওরে আমার সাধের বীণা,
ওরে আমার সাধের গান,
(তোর ওই) কোমল সুরে ব্যথা ঝরে,
আকুল করে আমার প্রাণ!"[৭৭]

তবুও বিপরীত স্রোতে বাতাস বহমান। সকল চেষ্টা ক্লান্তিতে পরিণত হয় বিয়োগের অশ্রুপ্লাবনে–

"প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ী যার,
পারে পাসরিতে সে কী ও মুরতি আর!
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার!"[৭৮]

কবির আক্ষেপ কেন ভাঙাঘরে সিঁধ কাটার এমন আয়োজন। ক্ষত-বিক্ষত মানুষের পায়ের তলার মাটিটুকু ছিনিয়ে নেবার এ কেমন নিষ্ঠুর প্রয়াস। পাপের বন্যায় দেশকে ভাসিয়ে দেবার এমনতর আয়োজনে কবি দিশেহারা প্রাণ। মায়ের বুকে আর আঘাত হানতে বাধ সাধছেন কবি। কোন্দল যদি হয় ঘরের সাথে ঘরের, ভাইয়ের সাথে ভাইয়ের তবে বহিঃশত্রু বিষবাণে জর্জরিত করবেই মায়ের কোমল হৃদয়।

"কেন আর ভাঙা ঘরে মারিস তোরা সিঁধকাটি?
ছিন্ন তরুর মূল হতে কেন তুলে দিস মাটি?"[৭৯]

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল দেশকে নতুন করে গড়বার প্রয়াসে দেশের নবযৌবনের নতুন আদর্শকে স্বাগত জানিয়েছেন। নতুনের আদর্শ হবে নির্ভীকযাত্রার আদর্শ–ভয়শূন্য। বহির্মুখী নতুন প্রজন্মকে ঘরের দিকে, দেশের মাটিতে বেঁধে রাখতে চেয়েছেন তিনি নতুন আদর্শের অনুপ্রেরণার গানে। যেমন–

"সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব
আমরা আজি বীরের প্রাণে।
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন
ছেয়ে দেব গানে গানে।"[৮০]

কবি আমাদের আকাশ ভুবন গানের সুরে মাতোয়ারা করতে চেয়েছেন। এদেশের মাটি, জল, বাতাস, নদী, মেঠোপথ, বাউলের সুর সকল আয়োজনকে তিনি মনের অন্তপুরে ঠাঁই দিয়েছেন। ছবি এঁকেছেন পরম আদরে। তাই তো এদেশের মাটিতে জন্ম নিয়ে কবি ধন্য। তাই এদেশের মাটিতেই মরবার বাসনা ব্যক্ত করেছেন কবি। এদেশের মানুষের মুখের বুলির মতো মিষ্ট সুর আর কোথায় আছে! তাইতো কবি পরম স্নেহে, ভালোবাসায় এদেশের প্রকৃতির ছবি এঁকেছেন তাঁর গানের কথায়। নিবিড়ভাবে একাত্ম হয়েছেন এদেশের প্রকৃতির সাথে, এদেশের মানুষের সাথে। ব্যক্ত করেছেন এ দেশের মাতৃরূপকে বিচিত্র মহিমায়–

> "খাঁটি দেশজ লোকায়ত সুরের ছাঁচে বাণী বসিয়ে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি গান সৃষ্টি করলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তৎসম শব্দবহুল ধ্বনিময় গানে বিলিতি সুরের ওজঃ আর পৌরুষ মিশিয়ে একটা নির্মাণের অভিনবত্ব আনলেন। সঙ্গে বাংলা গানে এই প্রথম সংযোজন হলো সম্মেলক ধরন বা কোরাস। এটাই স্বদেশি গানের উত্তরণ বা ক্রমোর্ধ্ব শিল্পিতার চিহ্ন। এই চিহ্ন ফুটে ওঠার কারণ হলো সত্যিকারের আর্টিস্টের সৃজনসামর্থ্য যুক্ত হয়েছিল স্বাদেশিক আবেগের সঙ্গে। এ জাতীয় স্বদেশি গান সকলের আবেগকে নাড়া দিয়েছে, সকলের কাছে গ্রহণীয় হয়েছে। সেইজন্যই বঙ্গভঙ্গের তাৎক্ষণিক আবেদন পেরিয়ে আজো রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি গান আমরা গাই।"[৮১]

রবীন্দ্রসমকালীন যে কয়েকজন শিল্পী ও সাহিত্যিক নিজ মেধা ও পাণ্ডিত্যে বাংলা সাহিত্য ভুবনকে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে গেছেন তাদের মধ্যে ডিএল রায় অন্যতম। গভীরতম বিশ্লেষণে তাঁর ত্রিকালদর্শী স্বদেশচেতনা নির্ভর গানে প্রকাশশৈলীর যে মমত্ববোধ জাগ্রত হয়েছে তা তৎকালীন থেকে সমকালীন প্রাসঙ্গিক। গানের আকার বিশ্লেষণে কবিতার ন্যায় যে বৃহদাকাররূপ দেখা যায় তা তৎকালীন রাজনৈতিক এবং সমাজজীবনের বিচিত্ররূপ সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলার নিমিত্তেই দরকার ছিলো। তাছাড়া তাঁর গানে যে কোরাসের আধিক্য লক্ষ্য করা যায় তাতে একক কণ্ঠে নয় বরং সামগ্রিক শৈল্পীক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে গানকে স্লোগানে পরিণত করার প্রয়াস দেখা যায়।

তথ্যসূত্র

১. *প্রবন্ধসংগ্রহ দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (স্বরচিত জীবনী)*, অলোক রায় (সম্পা), কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ২৬-২৭

২. *সংবর্তক পত্রিকা, নবম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা*, প্রসুন ধর(সম্পা), কলকাতা, ২০১৩ পৃ. ২৭

৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৮-২৯

৪. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৮

৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৬. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৭. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৪

৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ৩৫

১০. হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, দেশ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ২২।

১১. দেবকুমার রায়চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবনী)*, ড.জগন্নাথ ঘোষ (সম্পা.), করুণা প্রকাশনী, কলকাতা ২০১২, পৃ. ২৯২-২৯৩

১২. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৭৭-২৭৮

১৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৯৭।

১৪. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৯১।

১৫. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস প্রকাশনা, কলকাতা ১৯৯২, পৃ. ৬০-৬১

১৬. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পশ্চিম বাংলা একাডেমি, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১৪

১৭. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ৯৫।

১৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৮।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৮৫।

২০. রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, দ্বিতীয় সংস্করণ,প্রকাশ ভবন (১৫ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট), কলকাতা, ১৪১৯ পৃষ্ঠা. ২৪৩

২১. পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা. ৫৭

২২. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪

২৩. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪ পৃ. ৭৮

২৪. সুধির চক্রবর্তী (সম্পা.), *দ্বিজেন্দ্রগীতি সম্পগ্র.* পৃ. ১৫৭

২৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

২৬. রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪১৯, পৃ. ৫৮

২৭. পুর্বোক্ত, পৃ. ৫৮

২৮. দেবকুমার রায় চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২, পৃ. ২৫৩-২৫৪

২৯. সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্র গীতিসমগ্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, কলকাতা, ২০০৮,পৃ. ১৪৭

৩০. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ৮৯

৩১. পুর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৩২. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯০

৩৩. ড. উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, দীপায়ন কলকাতা, ২০০৮, ভূমিকা অংশ

৩৪. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত* পৃ. ৯২
৩৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৩৬. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৩৭. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯২
৩৮. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পৃ. ২৩-২৪
৩৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪
৪০. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ৬৪
৪১. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.) দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র, পৃ. ২১১
৪২. পুর্বোক্ত, পৃ. ২১১
৪৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৬২-২৬৩
৪৪. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪৬-২৪৭
৪৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৫৩
৪৬. পুর্বোক্ত, পৃ.. ২৬৬-২৬৭
৪৭. ড. উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, পৃ. ১২১
৪৮. দেবকুমার রায় চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, পৃ. ২৫৯
৪৯. রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, পৃ. ৩৩৯
৫০. দেবকুমার রায় চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, পৃ. ২৫৩-২৫৪
৫১. রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, পৃ. ৭৬
৫২. পুর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
৫৩. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ৫৯
৫৪. আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৯০
৫৫. সুধীর চক্রবর্তী (সম্প.), দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র, পৃ. ১৫
৫৬. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল, একটি জীবন কথা*, পৃ. ৫১-৫২
৫৭. সুধীর চক্রবর্তী(সম্প.), *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পৃ. ১৫৩-১৫৪
৫৮. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, পৃ. ৫০-৫১
৫৯. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *দ্বিজেন্দ্র গীতিসমগ্র*, পৃ. ১৬২
৬০. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬৪
৬১. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, পৃ. ৫০-৫১।
৬২. সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্র গীতিসমগ্র*, পৃ. ১৫৬
৬৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫২
৬৪. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৪৯
৬৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৬৬. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, পৃ. ৬০
৬৭. সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্র গীতিসমগ্র*, পৃ.১৪৭
৬৮. নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, পৃ. ৬১
৬৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ৬১
৭০. সুধীর চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র, পৃ. ১৪৯
৭১. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৭২. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৭৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬১

৭৪. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ১০০-১০১

৭৫. সুধীর চক্রবর্তী (সম্পা.), *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পৃ. ১৬০

৭৬. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৭৭. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৪৭

৭৮. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩

৭৯. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৫১

৮০. পুর্বোক্ত, পৃ. ১৬৭

৮১. সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের চার দিগন্ত*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ৫৫

চতুর্থ অধ্যায়
রজনীকান্ত সেনের গানে স্বদেশচেতনা
(১৮৬৫-১৯১০)

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশভাবনা

দেশ জুড়ে চলছে দেশাত্মবোধ জাগরণের প্রস্তুতি। রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আশ্চর্য সংগীত প্রতিভার স্পর্শে সর্বত্র স্বদেশপ্রেমের জাগরণী বার্তা পৌঁছে গিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানের লোকসুর আর দ্বিজেন্দ্রলালের রাগ-রাগিণীর সাথে লোক বা বিদেশি সুরের কোরাস বা সম্মেলক গানের ধরন স্বদেশি গানের ভাবনায় এক অভিনবত্ব নিয়ে আসে। নবপ্রজন্মসহ সকলের কাছে এই গান হয়ে ওঠে স্বদেশি আবেগের অনবদ্য এক হাতিয়ার। একই ধারায় রজনীকান্ত সেনের সংযোজন হয় বাংলা সংগীতের ইতিহাসে–যাঁকে আমরা চিনি তাঁর ঈশ্বর প্রেমের আরাধনার গানে। কিন্তু তাঁর স্বদেশি গান রচনার মধ্যদিয়ে স্বভাবসুলভ সহজিয়া ভাবের প্রকাশ ঘটে। যে উত্তাল সময়ের কথা বলছি তখন সকল কবি-সাহিত্যিকের মানবপ্রেম ও ঈশ্বরপ্রেম মিলিত হয়েছিলেন স্বদেশপ্রেমে। সকলকে এক করছিল মূলত দেশপ্রেম। কি খ্যাত কি অখ্যাত, কি হিন্দু কি মুসলমান প্রত্যকেই যার যার অবস্থান ভুলে স্বদেশকে মুক্ত করবার প্রয়াসে নিজেদের তৈরি করছিলেন। যেমন–'একই মায়ের দুটি সন্তান হিন্দু আর মুসলমান/একটি কুলে জন্ম মোদের একই বুকে দুগ্ধপান।'[১]

এসময়ে শত শত নাম না জানা কবির লেখনিতে অসাম্প্রদায়িকতা ও জাতীয়তাবাদের কথা ব্যক্ত হয়েছিল, উদ্বেলিত করেছিল স্বদেশের মানসচিত্তকে। রজনীকান্ত সেন তাঁদের মধ্যে এক অতি পরিচিত নাম। যাঁর মানবপ্রেম, দেশপ্রেম এবং হাসির গান আমাদের কাছে পরিচিত হলেও মূলত তিনি ছিলেন ভক্তি গীতিতে এক অনন্য এবং অদ্বিতীয়। কবি ও সংগীতজ্ঞ পিতা গুরুপ্রসাদ সেনের সান্নিধ্যে তাঁর সংগীতময় জীবন গড়ে উঠেছিল। যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল বহু সংগীত গুণিদের সাহচর্যে।

রজনীকান্ত সেনের দেশপ্রেমবোধ সমকালীন পরিপ্রেক্ষিতের দ্বারা আবৃত। সেই উত্তাল সময়ে বাংলা সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে অর্থাৎ নাটক, উপন্যাস, কাব্য বা গান সর্বত্রই দেশপ্রেম বোধের উপস্থিতি একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য। সেদিক থেকে ব্যতিক্রম নন কবি রজনীকান্ত সেনও। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো ভারতবর্ষের অতীত গৌবর স্মৃতিচারণ রজনীকান্ত সেনের গানের মূল বিষয়বস্তু। স্বদেশকে মাতৃরূপে গণ্য করে পরাধীন দেশবাসীকে মুক্তির দিশা দেখিয়েছেন তিনি আপন সুরের মহিমায়। যেমন–'পরপদতল লেহনপটু স্বজন বন্ধু যারা/দৈন্য দুঃখ আনিল গৃহে, এমনি লক্ষ্মী ছাড়া।'[২]

রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেমের গান অত্যন্ত বেদনা মাখা অভিমান ও ত্যাজদৃপ্তময়তার ভিতর দিয়ে প্রকাশিত। এই বোধ থেকেই মূলত তাঁর স্বজাত্যবোধের শুরু। বি.এ পাশের পর রজনীকান্তের মানবিক পরিবর্তন আসতে থাকে। হার্মোনিয়াম, তাস ও ফুটবল নিয়ে যে সময়টা কাটিয়েছে তা থেকে বেরিয়ে

অর্থকড়ি উপার্জনের চিন্তা ভর করে। সেই প্রয়াশেই ওকালতি বিষয়ে পড়বার বাসনা স্থির করেন। বি এল পড়বার সিদ্ধান্তের প্রাক্কালেই মূলত তাঁর মনে স্বদেশের জন্য তৃষ্ণা জাগতে থাকে এবং তিনি রচনা করলেন–

"জয় জয় জনমভূমি, জননী!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।"[৩]

রজনীকান্তের স্বদেশ বন্দনার গান বা কাব্যাংশের মূল বৈশিষ্ট্য অতীতের গৌবরময় পটভূমিকে ফুটিয়ে তোলা। এদিক থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের কাব্যগীতির চিত্রকল্প ও ভাষারীতিকে স্মরণ করায়। যদিও এই সকল গান বা বাক্যাংশ বর্তমানে বহুল প্রচলিত নয়। বরং তাঁর সহজ সুরের, সহজ কথার স্বদেশি গানই মানুষের মনে চিরস্থায়ী আসন গড়েছেন। দেশমাতৃকার রূপ বর্ণনাময় যুক্তাক্ষর বিশিষ্ট-ধ্বনি ব্যঞ্জনাময় শব্দভাণ্ডারের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. "ধূর্জটিবাঞ্ছিত হিমাদ্রি মণ্ডিত, সিন্ধু গোদাবরী মাল্যবিলম্বিত
অলিকুলগুঞ্জিত সরসিজ রঞ্জিত" (বাণী, 'ভারতভূমি')

২. "পীযূষসিঞ্চিত, সমীর চঞ্চল, কাঞ্চন অঞ্চল দোলেরে
সংশয় নিরসন, ধী স্মৃতিবিতরণ, চরণে জনমন ভোলেরে" (বাণী, 'বাণী')

৩. "কীর্তি-গীত জিত-স্তম্ভিত-আনত মুগ্ধ এই ধরণী
উজ্জ্বল কানন-হীরক মুক্তা, মণিময়-হার বিভূষণ যুক্তা
শ্যামল শস্য পুষ্প ফল পূরিত, সকল দেশ হয় মুকুটমণি" (বাণী, 'জন্মভূমি')

৪ "দক্ষিণে সুবিশাল জলধি, চুম্বে চরণতল নিরবধি
মধ্যে পুত জাহ্নবী জল-ধৌত শ্যামল ক্ষেত্র সংঘ" (বাণী, 'বঙ্গমাতা')

৫. "হে ভারত চিরদুখ শয়ন বিলীনা
নীতি-ধর্মময় দীপক মন্ত্রে,
জীবিত কর সঞ্জীবনী মন্ত্রে,
জাগিবে রাতুল চরণতলে, যত লুপ্ত পুরাতন গরিমা।" (বাণী, 'উদ্বোধন')

৬. "ওই নীলসিন্ধু জল, চিরগর্বিত চঞ্চল
তীব্র আবেগে কহিছে প্রহত, বধির দুয়ার তোর
বলে 'জাগ জাগ নতুবা ডুবে যা, অতলগর্ভে মোর" (শেষদান, 'উত্তিষ্ঠিত')

৭. "লক্ষ-পুরাতন সন্ধিসমর-ইতিহাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর
দীনে দান কত করিনু অকাতরে, সম্পদ লয়ে গর্বিত নৃপতির।" (বাণী, 'সিন্ধু সংগীত')[৪]

কান্ত কবির স্বভাবের ছায়ামূলক সহজ কথা ও সুরের গানগুলোই মানুষের অন্তলোকে ধাবিত, ঠিক যেমনটি দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশ পর্যায়ের গানে।

দেশপ্রেম বোধটি ছিলো সেই যুগের কবি-সাহিত্যিক বা গীতিকবিদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই ধারায় রজনীকান্ত সেনও প্রবাহিত ছিলেন। স্বদেশের জন্য তাঁর অন্তরে এক সুগভীর কোমল অনুভূতি সদাজাগ্রত ছিলো এবং চটজলদি গান রচনায়ও পারদর্শী ছিলেন তিনি। রাজশাহীর লাইব্রেরির

সভা অনুষ্ঠানের জন্য তাঁকে গান লিখতে বললে মাত্র ঘণ্টাখানেকের মধ্যে অসাধারণ স্বদেশ বন্দনার গান লিখে দেন তিনি। জলধর সেনের লেখায় এর বিশদ বর্ণনা পাই–

> "অক্ষয় বলিল, 'রজনী ভায়া, খালি হাতে সভায় যাইবে। একটা গান বাঁধিয়া লও না।' রজনী যে গান বাঁধিতে পারিত, আমি জানিতাম না। আমি জানিতাম যে সে গান গাহিতেই পারে। আমি বলিলাম, 'এক ঘণ্টা পরে সভা হইবে, এখন কি আর গান বাঁধিবার সময় আছে!' অক্ষয় বলিল, রজনী একটু বসিলেই গান বাঁধিতে পারে।' রজনী অক্ষয়কে বড় ভক্তি করিত। সে তখন একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া অল্পক্ষণের জন্য চুপ করিয়া বসিয়া থাকিল। তাহার পরেই একখানি গান লিখিয়া ফেলিল। আমি তো অবাক! গানটি চাহিয়া লইয়া পড়িয়া দেখি অতি সুন্দর রচনা। গানটি এখন সর্বজন পরিচিত 'তব চরণনিম্নে উৎসবময়ী শ্যামধরণী সরসা।"[৫]

সেই সময়ে প্রত্যেক লেখনির অন্তরালে ছিলো স্বজাতিকে মুক্তির প্রতীক্ষা। এক একজন কবির আপন বৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হলেও মূল উদ্দেশ্য স্বদেশমাতাকে শৃঙ্খল মুক্ত করা। পরাধীনতার শৃঙ্খলে ওষ্ঠাগত প্রাণের পিপাসা নিবারণে রচিত সকল স্বদেশপ্রেমের গানে রয়েছে স্বদেশের সৌন্দর্য বন্দনা, ঐতিহাসিক বিবরণসহ গভীর আবেগের প্রকাশ। এদিক থেকে রজনীকান্তের গানে পাই কোমল মায়াভরা সুরের পুনরাবৃত্তি। সঞ্চারি বর্জিত স্থায়ী ও কতিপয় অন্তরার সহজ অবয়বে কবি ব্যক্ত করেছেন স্বদেশের প্রতি প্রেম-অনুরাগ, স্বজাতির প্রতি তাঁর দায়িত্ব। নারী জাগরণমূলক বিভিন্ন সভা সেমিনারেও তিনি উপস্থিত থেকেছেন, রচনা করেছেন নারী জাগরণী গান। এ কেবল একজন প্রকৃত দেশপ্রেমিকই পারে। তিনি জেনেছিলেন পরাধীনতার অন্ধ কারাগার থেকে দেশকে মুক্ত করতে প্রয়োজন নারী-পুরুষ নির্বিশেষে মায়ের সকল সন্তানের আত্মিক জাগরণ।

তিনি রচনা করেছেন হাসির গান। দ্বিজেন্দ্রলালের লেখনীর অনুপ্রেরণায় চিরসত্য বাণীকে মানুষের অন্তরে সহজে ধাবিত করবার পন্থাও পেয়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল এবং রজনীকান্ত প্রত্যেকেই সাহিত্যের আসরে পরাধীনতার গ্লানি থেকে দেশবাসীর মুক্তির প্রয়াসে ব্যক্ত করেছেন স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যের উচ্চারিত বাণী। সকলেরই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ছিলো এক ও অভিন্ন।

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশচেতনার গানে উত্তেজনা ও উন্মাদনার থেকে প্রকাশ পায় অন্তরের মিনতি ও স্বদেশের প্রতি কাতরতা–যা সর্বজনীন এবং মর্মস্পর্শী।

> "রজনীকান্তের স্বদেশবিষয়ক গানে এমনই ব্যক্তিগত সুরের চেয়ে ফুটে উঠেছে সর্বজনীন স্বদেশানুভূতির সুর। তিনি আমাদের জীবনতন্ত্রীর ঠিক তন্ত্রীটিতে ঘা দিয়ে সঠিক সুরটিকে বাজিয়ে তুলেছিলেন। স্বদেশ কাব্যের কথা নয়, ইতিহাসের রোমান্স নয়, সম্ভ্রমের বস্তু নয়, স্বদেশ আমাদের দীন জননীরূপে একান্ত আপনার হয়ে দেখা দিলেন। এইজন্যই রজনীকান্তের স্বাদেশিক সুরটি এত মর্মস্পর্শী।"[৬]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তথা জাতীয়চেতনায় রজনীকান্তের ভূমিকা

বাংলাদেশকে দ্বিধাবিভক্ত করা হবে বাঙালির চিত্তে এই বিষয়টি প্রচণ্ড ব্যাঘাত করে। বহুকাল যে মায়ের সন্তানেরা একই ভাষা, একই সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠেছে। একই আকাশের নিচে শস্য-শ্যামলা জন্মভূমির একই বাতাসে নিজের আত্মাকে পরিশুদ্ধ করেছে, সেই সন্তানদের এবং তাদের মা'কে দ্বিখণ্ডিত করা

হবে এমন বাক্যে দিশেহারা সকল বাঙালি প্রাণ। গভীর বিষাদের ছায়া ফেলেছিল সকল বাঙালি চিত্তে। বঙ্গমায়ের সকল সন্তান মায়ের সুখে-দুঃখে সকল আবেগ ভাগাভাগি করে নিয়েছে, একজন আরেক জনের কাঁধকে অবলম্বন করেছে, তাদের বঙ্গমাতাকেই দ্বিখন্ডিত করবার যে অভিপ্রায়ের কথা ব্যক্ত করেছে সরকার, তাতে বড্ড চঞ্চল হয়ে ওঠে পেশা-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল বাঙালিপ্রাণ। রাজ আদেশের প্রতি সমগ্র বাঙালি জাতি প্রতিবাদের ঝড় তোলে। সময়টা ১৯০৫ সাল। লর্ড কার্জন বৃহৎ জনগোষ্ঠী বঙ্গবাসীর তথা ভারতবাসীর ভাগ্য বিধাতা। ১৮৬৪ সালের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ভাষায় কোনো স্বদেশপ্রেমের গান রচিত হয়নি। ১৮৭৬ সালে হিন্দুমেলা স্থাপিত হয়। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের সম্পাদনায় সেসময় হিন্দুমেলার উদ্দেশ্যে রচিত হয় 'জাতীয় সংগীত' নামে একটি গ্রন্থ।

> "যে সংগীত জীবন ও চরিত্রের সার্থক ও মৌলিক পরিচয়ের বাহক, তাকেই বলে জাতীয় সংগীত। জাতির স্বরূপ ও স্বধর্মের মান নির্ণয়ের অব্যর্থ সূত্রই জাতীয় সংগীত। এই সংগীতের চরিত্রই জাতীয় চরিত্রের নির্দেশক।...দেশপ্রেম বা স্বাজাত্যবোধ দেশমাত্রেরই এক ও অভিন্ন নয়। এই বোধের বিষমতাই বিভিন্ন দেশের জাতীয় সংগীতের চরিত্র বিষমতার উৎস।...জাতীয়ভাব যতখানি বিশিষ্ট দেশ বা জাতিগত, ততখানি আন্তর্জাতিক নয়, যতখানি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ততখানি নৈর্ব্যাক্তিক যতখানি নয়; যুগ বা প্রয়োজন-ভিত্তিক, ততখানি সর্বকালীন ও প্রয়োজন-সীমাতিক্রমী নয়।'[৭]

অর্থাৎ দেশবাসীর মধ্যে স্বদেশের জন্য স্বজাতিকে সঙ্গবদ্ধ করবার উদাত্ত আহ্বানের ডাক তারা বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণার বহুকাল আগে থেকেই চর্চা করে আসছিলেন। বাঙালির চিত্তে, স্বদেশ ভাবনার এই বীজকে অঙ্কুরে নাশ করবার প্রয়াস ছিলো বঙ্গকে বিভাগ করবার পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য। অন্তরালে যতই শুভভাবনার উদ্দেশ্য থাকুক না কেন বঙ্গবাসীকে, বঙ্গমাতাকে শাসকশ্রেণি কতৃক দ্বিখণ্ডিত করা ছিলো বাঙালি ভাগ্যের অভিশাপ সমান। এটি ছিলো মূলত ভাবপ্রবণ বাঙালির অন্তরাত্মাকে দ্বিখণ্ডিত করবার সমান। তাদের আত্মমর্যাদা, আত্মঅভিমানকে দুর্বল করবার এক সুদূর প্রয়াসী ষড়যন্ত্র। বাঙালিরা বহু আলোচনা ও আন্দোলন করে বঙ্গভঙ্গ রহিত করবার প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। গভর্নমেন্টের কাছে লিখিত আবেদন দিলেন। কিন্তু কোনো কিছুতেই আগের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে তারা দাঁড়ালেন না। বরং বাঙালির এই প্রতিবাদকে গভর্নমেন্ট বিরুদ্ধাচারণ মনে করলেন এবং যথাবিহিত ১৯০৫ সালে ১৬ অক্টোবর বঙ্গদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করা হলো। ঐ দিনটি আজ ইতিহাসের সবচেয়ে স্মরণীয় দিন হয়ে আছে। সমগ্র বাঙালির আশাভঙ্গের ঐ কুঠারাঘাত বাঙালি জাতি কখনও ভুলতে পারেনি, পারবে না। অথচ শাসক ইংরেজ জাতি তা কর্ণপাত করলো না। বাঙালির ভাবাবেগকে তাদের কার্যবিধির অন্তরায় বলে মনে করলেন।

> "কর্ম্মী ইংরাজ ভাব অপেক্ষা কর্ম্মের শ্রেষ্ঠতাই চিরদিন স্বীকার করেন, ভাবের উৎপত্তি যে অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে, প্রাণের স্পন্দন যে ভাবের ভিতর দিয়াই প্রকাশ পায়, তাহা সহজে তাঁহাদের ধারণায় আসে না। তাঁহারা মনে করিলেন, শাসনকার্য্যকে সুকর করিবার জন্য তাঁহারা যে সঙ্কল্প করিয়াছেন,
>
> বাঙ্গালী মাত্র ভাবের আতিশয্যে তাহাতে বাধা দিয়া দেশের ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে অন্তরায় হইতেছে। তাই রাজপুরুষেরা বাঙ্গালীর এই ভাবাধিক্যের মূলে কুঠারাঘাত করিবার জন্য ১৩১২ সালে ৩০এ আশ্বিন (১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর) বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিলেন।

পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী, বর্দ্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও রাজসাহী, –এই পাঁচটি বিভাগ লইয়া বঙ্গদেশ গঠিত ছিলো। বঙ্গদেশকে দুই ভাগে বিভক্ত করিবার পর, প্রেসিডেন্সী ও বর্দ্ধমান, এই দুই বিভাগ লইয়া পশ্চিমবঙ্গ এবং ঢাকা, রাজসাহী ও চট্টগ্রাম, –এই তিন বিভাগ লইয়া পূর্ব্ববঙ্গ গঠিত হইল। বিহার প্রদেশ পশ্চিম-বঙ্গের সহিত সংযুক্ত হইল এবং আসাম প্রদেশকে পূর্ব্ববঙ্গের সহিত সংযুক্ত করা হইল। দুই বঙ্গের জন্য স্বতন্ত্র দুইজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন এবং রাজ্য-শাসনেরও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত হইল।"[৮]

বঙ্গভঙ্গের ঘোষণা থেকে দেশজুড়ে যে আন্দোলন বিপ্লব শুরু হয় তাতে সকল শ্রেণির সকল ধর্মের মানুষ একাত্ম হয়ে পথে নামে। বিষাদের কালো ছায়ায় ঢেকে যায় সাধারণ মানুষের মন। 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ' ঘোষণার প্রায় ২ মাস আগে ১৯০৫ সালের ৭ আগস্ট কলকাতার টাউন হলে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে যে সভা হয় সেখানে বিদেশি পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। সেই সভাতেই সকল বাঙালি প্রতীক্ষা করেন বিদেশি পণ্য বর্জনের। 'যতদিন না বঙ্গভঙ্গ রহিত হয়, ততদিন আমরা বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার ত দূরের কথা, স্পর্শও করিব না।'[৯]

কবি রজনীকান্ত সেনের মনও সমগ্র জাতির ন্যায় বিপ্লবী ভাবাবেগে চঞ্চল হয়ে উঠলো। কোনো বুদ্ধি বিবেকমান মানুষের পক্ষেই 'বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ' ঘটনায় ঘরে বসে থাকা সম্ভবপর ছিলো না। কিন্তু পথে নামলেই সব অর্জিত হয় না, তারজন্য প্রয়োজন আত্মিক সমন্বয়। সেই মনোগত জগতের সংস্কার ও বিকাশের নিভৃত দায়িত্ব নিলেন রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও রজনীকান্তসহ অগণিত গীতিকবিগণ। ডুবে যাওয়া সূর্যের উদয় ঘটাতে প্রয়োজন কঠিন সংযম ও সুযোগ্য নেতৃত্বের। বঙ্গজননীর সন্তানের এক করবার মনোভাবনায় দৃঢ় প্রত্যয়ের। আর এই সকল বাণী সম্বলিত স্বদেশ রচনার মন্ত্র তা পাই তৎকালীন কবিদের লেখনির যাদুস্পর্শে। যার যার অবস্থান থেকে যে যেভাবে সম্ভব বঙ্গচ্ছেদের অভিশাপ থেকে দেশমাতাকে মুক্ত করবার ব্রতি গ্রহণ করেন। হলুদ সুতোর বন্ধনে সমগ্র দেশবাসীকে বাঁধতে চাইলেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্গচ্ছেদের দিন তিনি পথে নেমে এলেন। রবীন্দ্রনাথ সকলের সাথে গঙ্গাস্নান সেরে খালি পায়ে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের হাতে রাখি পরিয়ে বাঙালি সকল ভাই এক ও অবিচ্ছেদ তাই প্রমাণ করতে সচেষ্ট হলেন। সেদিন কোনো বাঙালির ঘরে রান্না হয়নি। দেশমাতার এ-হেন দুঃখে সকলে দিশেহারা। উদাত্ত কণ্ঠে সকলে সমস্বরে গেয়ে বেড়ালেন স্বদেশ বন্দনার গান–

"বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, হে ভগবান।"[১০]

এই গানটির মধ্যদিয়ে স্বদেশাভিমান এক অন্য মাত্রার রূপ পায়। বিদেশি পণ্য বর্জনের যে সিদ্ধান্ত স্পষ্ট সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়েছিল কলকাতার টাউন হলের সভায় তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দেশীয় শিল্প ও স্বদেশজাত পণ্য ব্যবহারে বাধভাঙ্গা আকুলতা দেখা যায়। কিন্তু সকল বাঙালির পক্ষে এ কার্য সহজসাধ্য ছিলো না। বোম্বাই-আমেদাবাদের মানুষের জন্য মোটা কাপড় বয়নের ব্যবস্থা নেওয়া হলো। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভ্যাস মিহিসুতোর কাপড়ে অভ্যস্ত বাঙালির পক্ষে এ কার্য ততোটা সহজ ছিলো না। দেশীয় পণ্য মোটা কাপড় সাদরে গ্রহণ করবার দ্বিধা দেখা দেয় অনেকের মনে। এমনকি এ মোটা কাপড়কে গ্রহণে অনেক বাঙালির মনে তাচ্ছিল্যের অভিপ্রায় দেখা যায়। তাই বিদেশি পণ্য বর্জনের এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে স্বাদেশিকদের অনেক কঠিন সময়ের মধ্যদিয়ে যেতে হয়েছে।

এই স্বদেশি আন্দোলনকে স্থায়ী করবার জন্য বহু দেশপ্রেমীকে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হয়েছে। রজনীকান্ত সেন তাদের অন্যতম। 'মোটা কাপড়' যখন বিলাসী বাঙালির কাছে বিরাগের কারণ হয়ে উঠল, দেশীয় কাপড়ের বয়ন করা মোটা কাপড়ের শুভাগমনকে অনেকেই আনন্দের সাথে গ্রহণ করতে পারছিলেন না। ঠিক তখনই রজনীকান্ত সেনের সহজ সরল সুরে স্বদেশমাতার মোটা কাপড়ের জয়গান সকলের মনে গভীর অনুভূতির সঞ্চার করে। রাজশাহীর পল্লীকবি এ গানে বাঙালিকে পবিত্র সংকল্পে ব্রতী করেন–

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই
দীন-দুখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।"[১১]

এই গানটির মধ্যদিয়ে সর্বস্তরে ছড়িয়ে থাকা দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবসান ঘটালেন কবি। বাঙালির অনেক দিনের ঘুম ভাঙল। অলস এবং আত্মবিস্মৃত বাঙালি যারা জানতো না স্বদেশমাতৃকার গৌরবের মাহাত্ম্যে তাদের জাগিয়ে তুললেন কবি। এ গানটির মধ্যদিয়ে রজনীকান্ত সেনের নাম সর্বস্তরে পৌঁছে গেল। 'মোটা কাপড়ের' কবি রজনীকান্ত পৌঁছে গেলেন সকলের ঘরে ঘরে। এ গান হয়ে উঠলো সকলের প্রাণের গান।

রজনীকান্ত সেন খালি গায়ে কাঁধে হারমোনিয়াম নিয়ে মোহগ্রস্ত বাঙালিকে জাগাতে পথে পথে গেয়ে বেড়িয়েছেন এ গানটি। প্রথমে দুই একজন সাথে থাকলেও দেখতে দেখতে শত শত ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা বা বুদ্ধিজীবী সবাই এই গানের সুরে কণ্ঠ মেলাতে মেলাতে পথে নেমে আসেন,

'ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে মায়ের অপার স্নেহ দেখতে পাই/ আমরা এমনি পাষাণ তাই ফেলে ঐ মায়ের দোরে ভিক্ষা চাই।' এমনই সুশীল বাণীতে রজনীকান্তের চোখের জলে স্নাত হোন সকলে। জন-জোয়ার এই গানের সুরে রবীন্দ্রনাথের 'বাংলার মাটি, বাংলার জল' গানের বেলাতে। গানের যে কত শক্তি 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড়' গানটি তেমনি একটি উদাহরণ। স্কুলের ছাত্রদের হাতে এ গানটির ছাপা কপি তুলে দিলে ছাত্র-ছাত্রীরা এ গানটি গেয়ে গেয়ে পদযাত্রা করতো রজনীকান্তকে ঘিরে। এ দৃশ্যে রজনীকান্তের চোখ-মুখ আনন্দাশ্রুতে ভরে উঠত। এ প্রসঙ্গে কবি তাঁর রোজনামচায় **১৩১৭** সালের **১৮ই** বৈশাখ তারিখে উল্লেখ করেন,

> "স্কুলের ছেলেরা আমাকে বড় ভালবাসে। আমি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ে'র কবি ব'লে তারা আমাকে ভালবাসে।' পুনরায় ২১-এ বৈশাখ তারিখে শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়কে তিনি লিখিয়াছেন, 'আমার মনে পড়ে, যে দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে procession (শোভাযাত্রা) বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সে দিনের কথা মনে হইলে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"[১২]

এ গানটি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র সমাজপতি লিখেছেন,

> "কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দৈববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়,

ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,-নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু- বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করি। স্বদেশীর সূচনাকালে লোকান্তরিত পশুপতিনাথবাবুর বাড়ীতে যে দিন এই গান প্রথম শুনিলাম -সেই দিন মুহূর্ত্তে এই অগ্নিময়ী বাণীর আদেশ শিরোধার্য্য করিয়াছিলাম।"[১৩]

রজনীকান্ত সেন মূলত এই একটি গানের মধ্যদিয়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে বাঙালির মনে তিনি আপন আসন করে নিয়েছিলেন। কান্তকবি যেহেতু নিভৃতচারী ছিলেন, নেতৃত্বের মোহে তিনি আন্দোলনের সম্মুখপ্রান্ত থেকে সড়ে দাঁড়িয়েছিলেন; যেমনটা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যেও। স্বদেশের দুর্দশায় বিচলিতপ্রাণ সারাজীবন দূর থেকে কেঁদে ফিরেছেন, মর্মভেদী অবরুদ্ধ অশ্রু বর্ষণ করেছেন গান ও সুরের বাণীর ভিতর দিয়ে। স্বদেশি আন্দোলনের বহু আগে থেকে এবং বঙ্গভঙ্গ পর্ব ও এর পরবর্তী সময়েও স্বদেশবন্দনার বহু গান রচনা করেছেন তিনি। কখনও হাসির গানের মধ্যদিয়ে তুলে ধরেছেন সমাজের বহুবিধ বৈষম্যের চিত্র এবং হঠকারিতার বিচিত্র রূপ। আবার কখনো ঈশ্বর বন্দনায় দেখেছেন স্বদেশমাতৃকা তথা ভারতমাতার করুণ চিত্র। তবে এসকল রচনার কোনোটিতে ছিলো না সুউচ্চ উন্মাদনার ছায়া বরং পরম মায়ায়, করুণাভরা অনুনয়ের সুরে আচ্ছাদিত তাঁর স্বদেশ বন্দনার গান।

রজনীকান্ত সেনের গানে স্বদেশচেতনা

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের' কবি রজনীকান্তের গানে স্বদেশের প্রতি চেতনার উন্মেষ কতটা তা আত্মকরণে তাঁর রচিত সকল স্বদেশ পর্যায়ের গান পর্যালোচনা প্রয়োজন। তাঁর রচিত স্বদেশ পর্যায়ের গানের নির্ধারিত সংখ্যা বলা যেমন মুশকিল তেমনি মুশকিল এই গানগুলোর রচনাকালসহ প্রেক্ষাপট নিরূপণ করা। তাঁর সামগ্রিক রচনার প্রায় ৩০টি গানে স্বদেশানুভূতি পরিলক্ষিত হয়-যা স্বদেশ, নারীজাগরণ, হাসির গান আবার কখনো ঈশ্বর আরাধনা সম্পর্কীয়। এর প্রায় সকল গানেই কবির আত্মনিবেদনের ভঙ্গীমাটি পরিলক্ষিত হয়। রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেম সৌর্যদীপ্ত সোনালি দিন নয় বরং শ্যামলা বরণে বটবৃক্ষের কোমল ছায়া-যা মনকে শান্ত করে, অন্তরকে ব্রতী করে আত্মত্যাগের মহিমায়। রজনীকান্তের স্বদেশ চেতনার গান স্বদেশের প্রকৃতি ঐশ্বর্যে পরিবেষ্টিত এক চিরায়ত বাংলা মায়ের রূপ-যেখানে কোনো অহংকার নেই, উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই, আছে কেবল আত্মনিবেদনের করুণ আকুতি। দেশমায়ের তরে নিজেকে বিলীন করবার নীরব প্রত্যয়। রজনীকান্তের ব্যক্তি চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই তাঁর স্বদেশানুভূতির গানগুলোতে পরিলক্ষিত। স্বদেশি আন্দোলনের বহু পূর্ব থেকেই তাঁর হৃদয়ে দেশের দুর্দশায়, দেশের মানুষের করুণ অবস্থায় আন্দোলিত হয়ে উঠতো। তাঁর গান ও কবিতার মধ্যদিয়ে দেশমাতৃকার জন্য বিচলিত মনের আকুতি ব্যক্ত করতেন। কবির কবিতা ও গান নিয়ে রজনীকান্তের অজান্তেই অক্ষয়কুমার মৈত্র মহাশয় ছাপার ব্যবস্থা করেন এবং সেই গ্রন্থের নামকরণ করেছিলেন 'বাণী'। এটিই তাঁর প্রথম বই এবং এই বইয়ের গান ও কবিতা মানুষের অন্তরকে ছুঁয়ে গিয়েছিল। সেই থেকে

রজনীকান্তের গান-কবিতার কদর বৃদ্ধি পায়। যখন 'বাণী' প্রকাশিত হয় তখনো স্বদেশি আন্দোলন শুরু হয়নি। অথচ সেই বইতে আমরা পাই 'ভারত মাতা'কে জাগ্রত করবার কবির আকুতি,

"ভারতকাব্যনিকুঞ্জে–
জাগ সুমঙ্গলময়ি মা!
মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি',
করুক প্রচারিত মহিমা।"[১৪]

ভারতমাতাকে কবি অবলোকন করেছেন চির দুঃখ-শয়ন বিলীনা বলে যার বীণা তো আছে কিন্তু সে বীণার গান আর বাজে না। কবি এই গানটির শুরু এবং শেষে ভারতমাতার এই লুপ্ত গরিমাকে জাগিয়ে তুলবার প্রয়াস পেয়েছেন। দুখিনী ভারতমাতার এতো ঐশ্বর্য তবুও লুপ্ত এর আভা। কবি এর পুরাতন লুপ্ত গরিমাকে গীতিধর্মময় দীপক মন্ত্রে জাগিয়ে তুলতে স্বদেশবাসীর কাছে আহ্বান জানিয়েছেন। সুমঙ্গলময়ী মা জেগে উঠলেই ভারত বীণা বেজে উঠবে। সে বীণার সঞ্জীবনী মন্ত্রবলে মায়ের সম্মানকে স্বর্গ জ্ঞানে সকলে পথে নেমে গাইবে এর গীতসুধা। এমনি জন্মভূমির গৌরবগাঁথা স্তুতি বন্দনা গেয়েছেন কবি নিচের গানটিতেও–

"জয় জয় জনমভূমি, জননী!
যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী;
কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত,
মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী।"[১৫]

কবি এই গানে জন্মভূমির জয়গান গেয়েছেন। এই জন্মভূমির স্তুতি বন্দনায় মুগ্ধ ধরণী। শ্যামল-শস্য-পুষ্প আর ফলে পরিপূর্ণ এ ভূমি সকল দেশের রাণী। অপরূপ বাণীর সংযোজনে স্বদেশপ্রেমের গানের এক অন্য রূপ পরিলক্ষিত হয় এই গানটিতে। জন্মভূমির প্রকৃতির নানাদিক তুলে ধরে কবি গানটির মধ্যদিয়ে মায়ের সন্তানদের গৌরবান্বিতের অনুভূতিতে সিক্ত করতে চেয়েছেন। স্বদেশের শ্যামলা রূপের আচ্ছাদনে মুগ্ধ কবি। এমনই উদাহরণ রয়েছে তাঁর বহু গানে,

"তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা,
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।"[১৬]

আর্যগরিমা এবং কীর্তিকাহিনিতে মুগ্ধ রজনীকান্ত স্বদেশবাসীকে মুগ্ধ করবার প্রয়াসে তাঁর প্রায় সকল স্বদেশি গান ঐতিহাসিক পটভূমিসহ দেশমাতার নদী, পাহাড় ও প্রকৃতির ঐশ্বর্যমণ্ডিতরূপে পরিপূর্ণ। রজনীকান্ত সেনের স্বদেশপ্রেমের গানের উপমায় অন্যরকম এক শব্দযোজনা রয়েছে–যা সমসাময়িক অন্য কবিদের গানে অনুপস্থিত। তবে রজনীকান্তের সহজ শব্দের গান মানুষের মনে স্থায়ী আসন লাভ করেছে। কবি মূলত সংস্কৃত সাহিত্যের বিচিত্ররূপে স্বদেশমাতার রূপটি আপন মনে চিত্রায়ন করেছিলেন এবং সেই কল্পনার সূক্ষ্ম ও নিপুণ রূপটি দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন বারবার। কবির ভাষায়–

"তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর,
দ্যাখ্ হয়েছে যামিনী ভোর।
ওই নবীন তপন মহাজাগরণ
আনে না নয়নে তোর!"[১৭]

এই গানটিতে কবি তীব্র আবেগের মধ্যদিয়ে সকলকে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। এতোসব প্রাকৃতিক মহিমা এবং ঐতিহাসিক বীরগাঁথা থাকা সত্ত্বেও অন্ধ হয়ে আছে ভারত মায়ের সন্তানেরা। কবি এ সকল সন্তানদের মায়ের অতল গর্ভে ডুবে মরতে বলেছেন। রাতের অবসান হয়েছে, এবেলা জেগে না উঠলে সকলই বৃথা যাবে। কবি এ গানটিতে 'জাগ জাগ' বলে মহাজাগরণে সকলকে এক হতে আহ্বান করেছেন। তেমনি মায়ের ঘরে শুধু মোটা ভাত, ঘি আর কলার পাতায় খুশি থাকার সম্মান প্রসাদ ভিক্ষা গ্রহণের থেকে অনেক বেশি আত্মতৃপ্তির বলে প্রকাশ করেছেন কবি। তাঁর ভাষায়, 'তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত,/মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত।'[১৮]

এই গানটির মধ্যে কবির সেই বিশ্বখ্যাত জনআন্দোলিত গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটির অনুরণন শুনতে পাওয়া যায়। নিজের দেশের খেতের মোটা ধানে যে সম্মান তা ভিক্ষা করা চালে নেই। নিজের খেতের ধান সোনার মতো খাঁটি। যেচে আনা মিহি কাপড়ে শুধু লজ্জা বাড়ে আর প্রকৃত সম্মান দেয় নিজের বোনা মোটা কাপড়ে। কবি এ সকল উপমায় নিজের দেশের চাষী, তাঁতীকে উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন। অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছেন লাঙ্গল ধরতে, তাঁত চালাতে। নিজের দেশকে সমৃদ্ধ করতে আর অন্য কোনো পথ নেই। তাই ভিক্ষা বৃত্তি নয় নিজের যা আছে তাই নিয়ে শুরু করতে বলেছেন কবি। এই গানেরই আরেকটি ভাষ্য রজনীকান্ত সেনের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি। যে গানে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই;/দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।'[১৯]

এই গানটির মধ্যদিয়ে রজনীকান্ত সেনের নাম বাংলার ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়ে। বাঙালির প্রাণের কবি হয়ে ওঠেন তিনি। বাঙালির কণ্ঠে এ গান ধ্বনিত হয় প্রাণের নিঃসৃত উচ্চারণ হয়ে। বাঙালির বহুদিনের ঘুম ভাঙানিয়া যাদুমন্ত্র যেন এই গান। অলস এবং আত্মবিস্মৃত বাঙালিকে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য এ গানটি হাতিয়ার হিসেবে কাজ করলো। মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়ের বোঝা বহন করা যে প্রতিটি সন্তানের দায়িত্ব। তাই কবি এই গানটির মধ্যদিয়ে সকলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী থেকে শুরু করে সকলের কাছে এই গানটির মধ্যদিয়ে এক অন্য রজনীকান্তের প্রকাশ পায়। এই গানটির মধ্যে স্বদেশমাতার যে মমতাময়ী রূপ অবলোকন করিয়েছিলেন কবি, তাতে বাঙালি মনের ভক্তি বিগলিত হয়, নতজানু হয় স্বদেশ মাতৃকার স্নেহভরা অনাবিল মহিমায়। কবি নিজে '২১শে বৈশাখ শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বক্সী মহাশয়কে লিখেছিলেন,

> "আমার মনে পড়ে, যে দিন 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান লিখে দিলাম, আর এই কলিকাতার ছেলেরা আমাকে আগে করে (শোভাযাত্রা) বের ক'রে এই গান গাইতে গাইতে গেল, সে দিনের কথা মনে করে আমার আজও চক্ষে জল আসে।"[২০]

এই গানটির রচনার ইতিহাস নিয়েও জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। কোন সেই মাহেন্দ্রক্ষণে গানটি রচিত হয়েছিল তা জানবার কৌতূহল অযৌক্তিক নয়। এ প্রসঙ্গে শ্রী জলধর সেনের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো,

> "তখন স্বদেশীর বড় ধুম। একদিন মধ্যাহ্নে একটার সময় আমি 'বসুমতী' আফিসে বসিয়া আছি, এমন সময় রজনী এবং রাজসাহীর খ্যাতনামা আমার পরম শ্রদ্ধেয় হরকুমার সরকার মহাশয়ের পুত্র শ্রীমান অক্ষয়কুমার সরকার আফিসে আসিয়া উপস্থিত। রজনী সেই দিনই দার্জ্জিলিং মেলে

বেলা এগারটার সময় কলিকাতায় পৌঁছিয়া অক্ষয়কুমারের মেসে উঠিয়াছিল। মেসের ছেলেরা তখন তাহাকে চাপিয়া ধরিয়াছে একটা গান বাঁধিয়া দিতে হইবে। গানের নামে রজনী পাগল হইয়া যাইত। তখনই গান লিখিতে বসিয়াছে। গানের মুখ ও একটা অন্তরা লিখিয়াই সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে। সকলেই গানের জন্য উৎসুক; সে বলিল,–'এই ত গান হইয়াছে, চল জল'দার ওখানে যাই। একদিকে গান কম্পোজ হউক আর একদিকে লেখা হউক।' এই জন্য তাহারা সেইবেলা একটার সময় আসিয়া উপস্থিত। অক্ষয়কুমার আমাকে গানের কথা বলিলে–রজনী গানটি বাহির করিল। আমি বলিলাম, "আর কৈ রজনী?" সে বলিল, "এইটুকু কম্পোজ করিতে দাও, ইহারই মধ্যে বাকিটুকু হইয়া যাইবে।" সত্য সত্যই কম্পোজ আরম্ভ করিতে না করিতেই গান শেষ হইয়া গেল। আমরা দুই জনে তখন সুর দিলাম। গান ছাপা আরম্ভ হইল; রজনী ও অক্ষয় ৩০/৪০ খানা গানের কাগজ লইয়া চলিয়া গেল। তাহার পর তাহাদের দলের অন্যান্য ছেলেরা আসিয়া ক্রমে (ছাপা) কাগজ লইয়া গেল।

সন্ধ্যার সময় আমি সুকবি শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ রায় চৌধুরী মহাশয়ের বিডন্ ষ্ট্রীটের বাড়ীর উপরের বারান্দায় প্রমথবাবু ও আরও কয়েকজন বন্ধুর সহিত উপবিষ্ট আছি, এমন সময় দূরে গানের শব্দ শুনিতে পাইলাম। গানের দল ক্রমে নিকটবর্ত্তী হইল। তখন আমরা শুনিলাম, ছেলেরা গাইতেছে–'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই।' এইটি রজনীকান্তের সেই গান–যাহা আমি কয়েক ঘণ্টা আগে ছাপিয়া দিয়াছিলাম। গান শুনিয়া সকলে ধন্য ধন্য করিয়াছিল; তাহার পর ঘাটে, মাঠে, পথে নৌকায়, দেশ-বিদেশে কত জনের মুখে শুনিয়াছি।"[২১]

এ গান প্রসঙ্গে বঙ্গসাহিত্যের অকপট ও নিষ্ঠাবান সেবক সুরেন্দ্রচন্দ্র সমাজপতি মহাশয়ের উদ্ধৃতি উল্লেখযোগ্য–

"কান্তকবির 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' নামক প্রাণপূর্ণ গানটি স্বদেশী সঙ্গীত-সাহিত্যের ভালে পবিত্র তিলকের ন্যায় চিরদিন বিরাজ করিবে। বঙ্গের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্ত পর্য্যন্ত এই গান গীত হইয়াছে। ইহা সফল গান। যে সকল গান ক্ষুদ্র-প্রাণ প্রজাপতির ন্যায় কিয়ৎকাল ফুল-বাগানে প্রাতঃসূর্য্যের মৃদুকিরণ উপভোগ করিয়া মধ্যাহ্নে পঞ্চভূতে বিলীন হইয়া যায়, ইহা সে শ্রেণীর অন্তর্গত নহে। যে গান দেববাণীর ন্যায় আদেশ করে এবং ভবিষ্যদ্বাণীর মত সফল হয়, ইহা সেই শ্রেণীর গান। ইহাতে মিনতির অশ্রু আছে,–নিয়তির বিধান আছে। সে অশ্রু, পুরুষের অশ্রু- বিলাসিনীর নহে। সে আদেশ যাহার কর্ণগোচর হইয়াছে, তাহাকেই পাগল হইতে হইয়াছে। স্বদেশীযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'আমার দেশ' ভিন্ন আর কোন গান ব্যাপ্তি, সৌভাগ্য ও সফলতার এমন চরিতার্থ হয় নাই, তাহা আমরা মুক্তকণ্ঠে নির্দ্দেশ করি। স্বদেশীয় সূচনার কালে লোকান্তরিত পশুপতিনাথবাবুর বাড়ীতে যে দিন এই গান প্রথম শুনিলাম–সেই দিন মুহূর্ত্তে এই অগ্নিময়ী বাণীর আদেশ শিরোধার্য্য।"[২২]

সেই উত্তাল সময়ে এই গান শুনে রোমাঞ্চিত হয়নি এমন ব্যক্তি বিরল। কান্তকবির এই গানটির মধ্যদিয়ে বাঙালি হৃদয়ে স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। মায়ের ঘরের তাঁতে বোনা কাপড়ে যে অপার স্নেহ মায়ের ঝিমিয়ে পড়া ঘুমিয়ে থাকা সন্তানদের মাঝে কবি দেখতে চেয়েছিলেন।

স্বর্গীয় আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এ গান প্রসঙ্গে লিখেছিলেন, '১৩১২ সালের ভাদ্র মাসে বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘোষণার কয়েকদিন পরে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ধরিয়া কতকগুলি যুবক নগ্নপদে 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গান গাহিয়া যাইতেছিল। এখনও মনে আছে, গান শুনিয়া আমার রোমাঞ্চ উপস্থিত হইয়াছিল।'[২৩]

এই গানের এমনই এক শক্তি ছিলো। দেশের ও দশের মঙ্গল কামনায় যখন সুবাতাস বইতে লাগলো সকলের মনে, দেশীয় শিল্প, স্বদেশজাত পণ্য ও বস্ত্র ব্যবহারের আকুলতা দেখা দিল সর্বত্র। সভা-

সমিতিসহ সর্বত্র দেশি পণ্য ব্যবহারের আনন্দ জোয়ার বইতে থাকে। বোম্বাই আহমেদাবাদে সাধারণ বাঙালির জন্য মোটা কাপড় বয়নের ব্যবস্থা করা হল। কিন্তু সকল বাঙালির মনে বিশেষ করে মিহি সুতোয় অভ্যস্ত বাঙালির পক্ষে অত সহজে মোটা সুতোয় অভ্যস্ত হওয়া সহজ ছিলো না। বরং অনেকেই মোটা কাপড়ের প্রতি অনীহা প্রকাশ করেন। এ যেন সকল আয়োজন বৃথার উপক্রম!

ঠিক সেই সময় চারিদিক মুখরিত করে রাজশাহীর কবি রজনীকান্ত সেন গেয়ে ওঠেন বাঙালির আত্ম-শুদ্ধির গান। তিনি খালি গায়ে কাঁধে হার্মোনিয়াম নিয়ে পথে পথে এই গানটি গেয়ে চলেন। প্রথমে দুই-এক জন, পরে ধীরে ধীরে কাতারে কাতারে ছেলে-মেয়ে, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকলে যুক্ত হয় সে পদযাত্রায়। সকলের কণ্ঠে একই গান। ছিটকে পড়া মোহগ্রস্ত বাঙালির চিত্ত জাগানিয়া সেই গান 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়, মাথায় তুলে নেরে ভাই, দীন দুখিনি মা যে তোদের, তাঁর বেশী আর সাধ্য নাই'। এই গানের শক্তি এতো বেশি ছিলো যে জাতিগত ভাবনায় আবেগের জোয়ার বইয়ে দিলেন কবি।

এমনিভাবে এই গানের মধ্যদিয়ে দেশের তাঁতীদের আবার জাগতে বলেছেন, দেশবাসীকে দোকান সাজাতে বলেছেন দেশি পণ্যে। কারণ কবি জানেন মায়ের সাত কোটি সন্তান জেগে উঠলেই 'মা'-কে কলঙ্ক মুক্ত করা সম্ভব নচেৎ নয়, 'আমরা, নেহাৎ গরীব, আমরা নেহাৎ ছোটো;/তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!'[২৪]

কবি এই গানটির মধ্যদিয়ে হাসির ছলে ভারতবর্ষের তৎকালীন চির সত্যকে তুলে ধরেছেন। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী যে বাণিজ্য ঘাটি বানিয়েছিল ভারত মায়ের কোলে, তা শোষণ করে নিচ্ছিল এ মায়ের কোমলতা, মধুরতা। তাই কবি নিজের দেশের কোনো পণ্য বিদেশে পাচার না হতে দিতে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। কারণ নিজের শষ্য-পণ্য বিদেশে পাঠিয়ে নিজেরা উপবাস করা আত্মহননের সামিল। নিজের পণ্য বিদেশে পাঠিয়ে বিদেশি পণ্যে মায়ের সন্তানকে অভ্যস্তে বাধ্য করছিল শোষকশ্রেণি। কবি এর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে বলেছেন। নিজের মায়ের ঘর শূন্য হওয়া থেকে বাঁচাতে সকলকে এক হতে আহ্বান করেছেন এই গানটির মধ্যদিয়ে। কারণ গরিব হলেও সংখ্যাতো সাত কোটি। মায়ের সকল সন্তান এক হলে কোনো প্রতিকূলতাই মায়ের সন্তানদের শক্তির কাছে টিকবে না। এমনি আহ্বান শুনতে পাই কবির এই গানটিতেও, 'রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মনে লাগিয়ে শুনিস্;/ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে, তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্ ॥'[২৫]

এক অপূর্ব বাস্তববাদী চিত্র তুলে ধরেছেন কবি এখানে। তিনি স্ত্রী-পুরুষ সকলকে কাজে হাত লাগাতে বলেছেন। তাঁতে বোনা কাপড় কলের কাপড়ের তুলনায় কমও হয় তবুও কবি মাকু চালাতে বলেছেন। নিজের দৈন্যতা, হীনতা দূর করবার এর থেকে উৎকৃষ্ট পন্থা আর নেই। ঈশ্বর ভক্ত কবির এ এক ব্যতিক্রমী অনুপ্রেরণার বাণী। অবচেতনে জাতির বোধ জাগাবার এমনি নিরলস প্রচেষ্টা কবির। বঙ্গভঙ্গের পর সকল বাঙালির মনে কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে। হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব সকলে এক হয়ে তখন ভারতবর্ষের এই কালিমা ঘুচাতে সংঘবদ্ধ হন। এই ঐক্যবদ্ধতা শাসকশ্রেণির মনে শঙ্কা সৃষ্টি করে। তাই তারা প্রতিনিয়ত নানা কৌশলে, শাসকযন্ত্রের নানা আয়োজনে বাঙালির ঐক্যের এই শক্তি ভাঙতে প্রচেষ্টা চালায়।

তারা প্রতিনিয়ত হিন্দু-মুসলমান উভয় শ্রেণির অন্তরে বিষবৃক্ষ বপনের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করবার কটু প্রচেষ্টা চালিয়েছে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ভেঙ্গে দেওয়া ছিলো 'বঙ্গভঙ্গে'র একটি অন্যতম অসৎ উদ্দেশ্য। যখন শোষকশ্রেণি বুঝতে পারলো ভারতমাতার বাঙালি সন্তানরা দমে যাবার জন্য জন্ম নেয়নি তখন শুরু হলো আরো বহুবিধ পৈশাচিক আচরণ। রজনীকান্ত সেনসহ সকল দেশপ্রেমী কবি-সাহিত্যিক তখন নিভৃতচারী বাঙালি সন্তানদেরকে সোচ্চার করবার চেষ্টা করে চলেছেন। সময় যেন কেবল জেগে উঠবার, হিন্দু-মুসলমান সকলের এক হবার। কবির ভাষায়,'আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান!/ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান।'[২৬]

এই গানটি রচনার পরপরই কবি রাজশাহী ফিরে যান। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের উন্মাদনা রজনীকান্তের মনে যে প্রেরণা জাগিয়েছিল তাই তিনি বহন করে চলেছেন সারাজীবন। রাজশাহীর কর্মজীবি মানুষ, তাঁতী, চাষী সকলকে হীনমন্যতা, নৈরাশ্য ভুলে দেশের কাজে নিয়োজিত থাকবার অবিরাম অনুপ্রেরণা জুগিয়ে চলেছেন কবি। সারাদিন কাটতো ওকালতি কাজের ব্যস্ততায়। কিন্তু সন্ধ্যায় ঠিক চলে যেতেন চাষী, তাঁতীদের কাছে, সান্ধ্য মজলিসে। গানের মধ্যদিয়ে তাঁদের অনুপ্রাণিত করবার প্রয়াসে। কারণ কবি জানতেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' এর প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝতে হলে মোটা কাপড়ের উৎপাদন প্রয়োজন, প্রয়োজন দেশীয় পণ্যের উৎপাদন। শোষকের দেওয়া অন্নে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়তো করা যায়; কিন্তু প্রতিরোধ গড়া যায় না। তাই কবি 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানের মন্ত্রটি চিরজীবী করতে একের পর এক নবভাবনার গান লিখে গেছেন। যেমন–

১. তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত
২. রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মন লাগিয়ে শুনিস
৩. আমরা নেহাৎ গরিব
৪. আর কি ভাবিস মাঝি প্রভৃতি।

কবি দেখলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটির মর্মার্থ লোকে বুঝলেও তা অনুকরণ করা বা জীবনে কার্যত বাস্তবায়ন করা হয়ে উঠছে না, বারংবার একই কাম্য নানাভঙ্গিতে উপস্থাপন করতে লাগলেন তিনি। বার বার দেশের মানুষকে ঘরমুখো করতে এই সকল আয়োজন করেছেন। কখনো শনিবারের পাঁচালী শোনার জমায়েতে গেয়ে উঠেছেন, জনে জনে ডেকে বুঝিয়েছেন এবং তাঁর উদাত্ত কণ্ঠে থাকতো একই আহ্বানের সুর,

ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী, আজকে সুপ্রভাত
ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত
ক'সে চালাও ঘরের তাঁত।[২৭]

দেশজুড়ে চলছে নবজাগরণের জোয়ার। সকল দেশপ্রেমী একযোগে কাজ করে চলেছেন দেশের পণ্যে ধন্য হবার উপলব্ধি বিলাতে। এ বড় কঠিনতর সময়। ঘরের ছেলেকে ঘরমুখো করবার প্রয়াস। শক্ত মনে ধীর চিত্তে এ সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। প্রতিকূল বাতাসে এতোটুকু হেলে পড়া চলবে না। তাই কবি বাউলের সুরে লিখেছেন,

"আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে ?
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক্ ক'সে।"[২৮]

এভাবে একের পর এক গান রচনা করে স্বজাতিকে তিনি জাগাতে চেয়েছেন। বঙ্গবিভাগের পর সমগ্র বাঙালি মানুষের মধ্যেই একপ্রকার স্বদেশিকতার সুর বেজে উঠেছিল। স্বদেশের প্রতি নিবেদিতপ্রাণ কতিপয় গীতিকবির অক্লান্ত প্রচেষ্টা ও অনুপ্রেরণাছিলো এ সুরের মূল বীণাটি। স্বাদেশিকতা বোধে প্রেরণার শক্তি যুগিয়েছে এই সকল গানের নিঃসৃত বাণী। দেশের প্রতি আনুগত্যবোধ জাগাবার প্রয়াসে রজনীকান্ত ওকালতির পাশাপাশি গ্রামের মানুষের মনে আশা জাগাবার উদ্দেশ্যে দিনের পর দিন ছুটে বেড়িয়েছেন। গ্রামের মানুষদের জড়ো করে গেয়ে উঠেছেন ভগ্ন হৃদয়ে স্বপ্ন বুনবার গান। গাছতলায় বা ছায়াঢাকা স্থানে গ্রামবাসীদের কবি একত্রিত করে দেশাত্মপ্রেমের গান শোনাতেন। তবে এ সকল গানের সুরে কখনো তীব্র প্রতিবাদ ঝংকৃত হতো না। ফলে কবির আত্মনিবেদনের সুরে মানুষ মোহিত হতো। স্বদেশের প্রতি, স্বদেশের মানুষের প্রতি, ভারতমাতার দুঃখ-দুর্দশার গল্পে তারা মা'কে তাঁর যোগ্য সম্মান দেবার মন্ত্রে দীক্ষিত হতেন। বঙ্গভঙ্গের পর তীব্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সভা-সমিতি বা একস্থানে বহুলোকের জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু রজনীকান্ত দমে যাবার পাত্র ছিলেন না। তিনি সকল বাধা অতিক্রম করে দেশবাসীকে সত্যের পথে আহ্বান করে চলেছিলেন। জীবনের পরম সত্য স্বভূমির প্রতি ভালোবাসা এবং স্বভূমির সম্মান রক্ষার্থে যতো কঠিন পথই হোক তা অতিক্রমের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা অন্তরে লালন করতেন তিনি।

কবি কখনো কখনো নিরাশ হতেন। আশা ভঙ্গের বেদনায় নিষ্প্রভ হয়ে হতাশা প্রকাশ করতেন। তাঁর ভাষায়, 'নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন, স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন,/ধীর তটিনী মন্দ গমন, স্তব্ধ সকল পাখী।'[২৯]

আলোচ্য গানটি জুড়ে রয়েছে এক করুণ হাহারবের গল্প। শোকে বিহ্বল নিখিল বঙ্গ। স্বজাতির নৈরাশ্যে, হীনমন্যতায় স্তব্ধ সকল প্রাণ, নিষ্প্রভ চন্দ্র-তপন। শাসকের নির্দেশে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও গান নিষিদ্ধ করা হলো। শাসকের অনুগতরা আদিষ্ট হলেন তাদের সকল বন্দোবস্তের আদেশ পালনে। শাসকের এমন সিদ্ধান্তে রজনীকান্ত ক্ষুব্ধ, বেদনার্ত। তাদের আদেশ মানা যায় না। নেতৃস্থানীয়দের আদেশের অপেক্ষা করতে করতে অবশেষে জনসমাগমে উপস্থিত হয়ে একাই তিনি গেয়ে উঠলেন, 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি এবং তাঁর সাথে কণ্ঠ মেলালেন শতকণ্ঠ। উদ্বুদ্ধ কবি উপস্থিত মুহূর্তেই গাইলেন, 'মা বলে ভাই ডাকলে মাকে, ধরবে টিপে গলা/তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে 'মা' বলা?'[৩০]

সেই উত্তাল সময়ে কবি 'ফুল্লার করলে হুকুমজারি' গানটি রচনা করেছিলেন। 'বন্দে মাতরম' নিষিদ্ধ করায় সকলে গভীর ক্ষোভ ও যাতনার অনুতাপে পরিব্যাপ্ত। সেই সময়ে কবি রচনা করলেন নিরেট শুদ্ধ আবেগের গান। এই গানের আদ্যপান্ত জুড়ে রয়েছে শাসকের অন্যায় অত্যাচারের কথা, রয়েছে প্রতিবাদী বলিষ্ঠ সুর। যে কারণে এই গানটি রজনীকান্তের মূল গানের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়নি। আলোচ্য গানটির অংশবিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো,

"বন্দে মাতরম ত' শুধু মায়ের বন্দনাই
এতে তো ভাই সিডিসনের নাম কি গন্ধ নাই!
তবে কেন তা নিয়ে ভাই' এত মারামারি;
হাজার যার, 'মা' বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি?"[৩১]

এই গানটির মধ্যে কবির অন্তরের গভীর দেশপ্রেম ব্যক্ত হয়েছে–যা বাস্তব অবস্থার বলিষ্ঠ উচ্চারণ। 'বন্দে মাতরম' গানটি আইনের চোখে অপরাধ ঘোষিত হলে সর্বসাধারণের মনে এক হাহাকার রবের সৃষ্টি হয়। এ প্রসঙ্গে রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি প্রদান করা হলো,

> "The months that followd the 16th October, 1905, were months of great excitement and unrest. The policy of the government especially that of East Bengal under Sir Bampfylde Fuller, added to the tension of the situation...The partition was followed by a policy of repression which added to the difficulties of the Government and the complexities of the situation. The cry of Bande-Mataram, as I have already observerd was forbidden in the public streets and public meetings in the public places were prohibited."[৩২]

সেই সময়ে আরো দুটি গান বিশেষ সমাদর লাভ করেছিল। গান দুটি হলো 'তব চরণ নিম্নে উৎসময়ী শ্যামধরণী দে সরসা' এবং 'সেথা আমি কি গাহিব গান।' দেশপ্রেমের গভীর অনুরাগে রজনীকান্তের হৃদয় ছিলো পরিপূর্ণ। তেমনি আবেগভরা বাণীর সম্মিলন সেই সময়ের রচিত গানসমূহ,

"সেথা আমি কি গাহিব গান?
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।"[৩৩]

কবি এই গানটিতে ভারতবর্ষের অতীত গরিমার বর্ণনা করেছেন। তুলে ধরেছেন প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের মুগ্ধতার কথা। এতো যার শোভা, এতো যার ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভূমি সে ভারতমাতা আজ অতীতের প্রাণশূন্য। পাখির মধুর কণ্ঠ, মোহনমন্ত্র দূর বিমানের হুঙ্কারে বিরস, মলিন, শোভাহীন। তাই কবি অন্তরের গ্লানি, আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন এই গানটিতে।

এমনি আরো একটি অপরূপ গানের কথা এখানে উল্লেখ করতে পারি। 'নীল সিন্ধু ওই গর্জ্জে গভীর;/ ভৈরব রাগ-মুখর করি' তীর।'[৩৪]

সংস্কৃতপ্রেমী রজনীকান্ত সেন অদ্ভুত বাণীর দ্যোতনায় সাজিয়েছেন সিন্ধু ও ভূমিখণ্ডের অভূতপূর্ব বিপরীত সৌন্দর্যকে। কবি সমগ্র গানটি জুড়ে জলভাগ, ভূমিখাত ও চন্দ্রের অপরূপ শোভার বর্ণনা করেছেন এক নিপুণ সমীকরণে। এতোসব কঠিন বাণীর গান যেমনি রচনা করেছেন রজনীকান্ত, তেমনি রয়েছে একান্ত চেনা সহজ সরল সুরের গান। যে সুরের মধ্যদিয়ে সাধারণের অন্তপুরে প্রবেশ করা সহজতর হয়।

রজনীকান্তের নিজগ্রাম ভাঙ্গাবাড়িতে ফিরে যাওয়ার পর কবি স্বদেশচেতনা জাগাতে গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়াতেন। একবার পাশের গ্রামে গিয়ে কবি হতবাক হয়েছিলেন। যেখানে কবি সকলকে মোটা কাপড়ে উদ্বুদ্ধ করতে ছুটে চলেছেন সেখানে উচ্চ সম্প্রদায়ে চলছে শাক্ত ও বৈষ্ণব ধর্মের মধ্যে রেষারেষি। কবি এ দৃশ্যে খুবই আহত এবং বিব্রত হলেন। যেখানে অন্তরের সংকীর্ণতার কারণে একজন অন্যের ধর্ম বা দীক্ষাকেই শ্রদ্ধা করতে পারছে না, সেখানে কী করে কবি তাদের স্বদেশমাতার ব্রতে এক করবেন। কবি চিন্তিত মনে বাড়ি ফিরে এলেন এবং রচনা করলেন, 'ভেদ-বুদ্ধি, ছাড়, 'দূর্গা', 'হরি', দুই তো নয়,/একেরি দুই পরিচয়।'[৩৫]

কবি গ্রামের পথে পথে গ্রামবাসীদের ঘরে ঘরে গিয়ে এই গানটি গেয়ে শুনাতে লাগলেন। সহজ কথার ও সহজ সুরের সত্য উপলব্ধির এই গান সকলের অন্তরে ভাবের সঞ্চার করে এবং উভয় সম্প্রদায়ের লোক গভীর আবেগে রজনীকান্তের কাছে নিজেদের সমর্পণ করেন। তিনি সকল ভেদাভেদ ভুলে এক হবার পথ দেখালেন এবং তাঁর 'মোটা কাপড়ের মন্ত্রে' সকলকে দীক্ষিত করলেন। কবির ভাষায়,

"তিমিরনাশিনী, মা আমার।
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি'
চিন্ময়ী মূরতি অখিল-আঁধার!"[৩৬]

এই গানটিতে ঈশ্বর প্রেমের কবি ভারতমাতাকে দেবী তুল্য প্রণতি জানিয়েছেন। এই ভারতেই কালিদাসের মতো মহাকবি, বাল্মীকি মুণির মতো অক্ষয় কীর্তির জন্ম হয়। জ্যোতিষ, গণিত বা বাক্য সর্বক্ষেত্রে সর্বস্তরে এ ভারত অনন্য। এ ভারত যেমন এর বাহ্যিক রূপের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ তেমনি এর জ্ঞান-গরিমা ও অতীত ঐশ্বর্যে নিখিল বিশ্বকে কানায় কানায় পূর্ণ করেছে। কবি তাই এই ভারতমাতাকে ভগবতি-ভারতী সমাসনে প্রণতি জানিয়েছেন। 'নমো নমো নমো জননী বঙ্গ! উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,/অতুল, বিপুল, গিরি, অলঙ্ঘ্য। দক্ষিণে সুবিশাল জলধি।'[৩৭]

অপরূপ রূপের আঁধার এ বঙ্গ জননী। উত্তরের অতুল-বিপুল গভীর গিরিশৃঙ্গ আর দক্ষিণে সুবিশাল জলধি এ বঙ্গ জননীকে এর বৈভবে পরিপূর্ণ করেছে। বনে বনে প্রজাপতির মেলা, অমৃত ধারার কোটি নদ-নদী আর সবুজের আবরণে ফুল-ফল শস্যভারে শোভিত এ বঙ্গমাতার ভাণ্ডার। তাই কবি এ বঙ্গ জননীকে বারংবার প্রণতি জানিয়েছেন। মাথা নত করেছেন এর অমৃত সুধা ধারার স্নিগ্ধ আঁচলের মায়া-ছায়া তলে।

জাগরণী গানে স্বদেশচেতনা

জাগরণী বা উদ্দীপনার গান বলতে আমরা যা বুঝি তা প্রথম রচিত হয় মূলত হিন্দুমেলা আন্দোলনকে ঘিরে। সারা বাংলা জুড়ে হীনতা, দৈনতা ও স্বাধীনতার তীব্র আকাঙ্ক্ষায় যে একটি চরম সময়ের মধ্যদিয়ে মুক্তিকামী জাতি জীবন অতিবাহিত করছিল সেই সময় এই সকল জাগরণী গান এর বৈভবে উজ্জীবিত করে, উদ্ভাসিত করে স্বাধীনতা অর্জনের লক্ষ্যে। এক কথায় বলতে পারি, সকল স্বদেশচেতনার গানই জাগরণী গান, উদ্দীপনার গান। এখানে একটি প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো, 'প্রাচীনকাল থেকে শিল্পের নৈতিকতা ও আদর্শের মধ্যে উদ্দীপনা ও জাগরণের নজির পাওয়া যায়। মধ্যযুগের বিভিন্ন ধর্মীয় ও লীলা পদাবলি, চৈতন্যের কীর্তন, রামপ্রসাদী, শাক্তগীতি, পঞ্চকবির গান এবং স্বদেশি গানেও জাগরণের পরিচর্যা প্রধান আকারে ছিলো। এমনকি আধুনিক গান কিংবা চলচ্চিত্রের গানেও এই নমুনা রয়েছে।'[৩৮]

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশপ্রেমের সকল গানেই আমরা একটি আত্মজাগানিয়ার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করছি। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সর্বকালের জন্য প্রযোজ্য একটি আত্মবোধ জাগানিয়া গান। জাগরণী গানের অর্থই ঘুমিয়ে থাকা ব্যক্তিকে জাগিয়ে তোলা, স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করা। এদিক থেকে

বিচার করলে রজনীকান্তের স্বদেশবোধের সকল গানই জাগরণীমূলক গান। তথাপি কবি তাঁর গানের মধ্যদিয়ে ব্যক্তি জীবনের আত্মজাগরণীর বাণী শুধায়েছেন যার কয়েকটিতে মূলত স্বদেশচেতনাই পরিলক্ষিত হয়, 'জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন।/বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন।'[৩৯]
অসাধারণ জনশ্রুত এবং জনপ্রিয় এই গানটিতে ঘুমিয়ে থাকা অচেতনকে জেগে উঠবার তাগিদ দিয়েছেন কবি। অবহেলায় সুসময় বয়ে যায়। সময়ের কাজ তৎক্ষণাৎ না সারলে পরে তা আরো কঠিন অনুভূত হয়। এই সকল সহজ সরল অনুভূতির ভিতর দিয়ে কবি জীবনের কঠিন সত্যকে এই গানটির মধ্যে উন্মোচন করেছেন। জীবনের পথ, স্বদেশ মুক্তির পথ, আলোর পথ মোটেই সহজসাধ্য নয়। এ পথ উন্মোচনে কবি সকলকে জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। আঁকাবাঁকা বিভীষিকাপূর্ণ পথ দিনের আলোতে পাড়ি দেয়া যতোটা কঠিন রাতের অন্ধকারে তা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তাই কবি উপযুক্ত সময়কে কাজে লাগাতে আহ্বান করেছেন ঘুমিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে। যেমন–'জাগ রে দাসদাসী! জাগ রে প্রতিবাসী!/দেখ্ রে কাছে আসি' ফেটে যে গেল বুক।'[৪০]
উমা মায়ের বিদায়বেলার মুহূর্তটিকে কবি অপূর্ব সুন্দর বর্ণনায় রূপায়িত করেছেন। তিনি প্রতি শরতে আমাদের এই বিদায়ের ক্ষত জানান দিয়ে যান। কবি ঘুমিয়ে থাকা সকল শুক-সারি, হংসী, ধেনুসহ প্রকৃতির সকল প্রাণকে জেগে উঠবার তাড়না দিয়েছেন। কারণ একটি বছর পরে যখন আবার মা আসবেন তখন হয়তো এর অনেক কিছুই থাকবে না। তখন পুরাতনের বিদায়ের পর জন্ম নেবে নতুন প্রাণ। তাই কবি উমা মায়ের বিদায়ের এ ক্ষণকে একটি বছরের পূর্ণগ্রাস বলে বর্ণনা করেছেন। কবি বাস্তবিক জীবনের সামগ্রিক দুঃখ, জড়তা ও হাসি-আনন্দে ঘূর্ণায়মান, চক্রায়মান আবর্তনের পুনারম্ভ বলে চিহ্নিত করেছেন। দশমী তিথীকে তাই কবি এই চরমবেলায় সকল দাসদাসী, প্রতিবাসীসহ সকল রাজমহিষীকে এক হতে বলেছেন, জেগে উঠতে বলেছেন। কবির ভাষায়,

"জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর!
নব রবি জাগে,
নব অনুরাগে,
ল'য়ে নব সমাচার।"[৪১]

কবি গানের ভিতর দিয়ে বাস্তবিক জীবনের অলসতাকে ত্যাগ করে জেগে উঠতে বলেছেন। কবি একজন অত্যন্ত পরিশ্রমী মানুষ ছিলেন। চরম অসুখে যখন বিছানা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কণ্ঠের সুরও বিধাতা কেড়ে নিয়েছিলেন তখনও কবির লেখনি থেমে থাকেনি। অসুস্থ রজনীকান্তকে দেখতে এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর নিজের জন্য শ্রদ্ধাঞ্জলি সংগীত রচনা করলেন তিনি জীবনের করুণ সুরধারায়, 'আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে গর্ব্ব করিতে চুর,/যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য সকলি করেছে দূর।'[৪২]
অক্লান্ত পরিশ্রমী এই কবি জাতিকে জাগিয়ে তুলবার আমরণ সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর কাছে সময়ের মূল্য ছিলো অমূল্য। ক্ষণজন্মা এই কবি যতদিন বেঁচেছিলেন প্রতিটি মুহূর্তকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করেছেন। অন্যকে উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াস দেখতে পাই তাঁর রচনার প্রায় সমগ্রটা জুড়ে, 'মোহ-রজনী ভোর হইলে, জাগ নগরবাসী/পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য-কিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী।'[৪৩]

শুধু সময়কে নয় নারীকেও তিনি অমূল্যধন বিবেচনায় সম্মান করেছেন। তিনি নারী জাগরণীমূলক গান রচনা করেছেন। প্রতারণা, বঞ্চনা, কলঙ্ক আর অপবাদে নারী জাতি চিরকাল নিগৃহীত। কবি মাতৃস্নেহাকুল সেই নারীকে এই সকল অন্যায় অপবাদের বিরুদ্ধে জেগে উঠতে বলেছেন। কারণ যে কোনো সক্রিয় আন্দোলনে নারীকে সমউদ্যমে পুরুষের পাশে দাঁড়াবার অনুপ্রেরণা দিয়েছেন কবি। যে সময়ের কথা বলছি তখন ঠাকুর বাড়ির কতিপয় উদাহরণ ছাড়া নারী ছিলো কেবল গৃহকার্য পটিয়সীর ভূমিকায় স্বীকৃত। রজনীকান্ত এই ক্ষুদ্র গণ্ডি ছেদ করে নারীকে বেরিয়ে আসার আহ্বান জানিছেন। কবির ভাষায়,

“জেগে ওঠ্ দেখি মা সকল!
হের নব প্রভাতের নব তপন উজল,
শুন জন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল।”[৪৪]

সীতা, সতী, সাবিত্রী, দ্রৌপদী, খনা সকল মহিয়সী নারী গর্বের পথ দেখিয়েছেন। নারী বৈভবে সকল মানবের মাথা শ্রদ্ধায় নত হয়। কবি বলেছেন, সেখানে কোনো একটি নারীকেও ঘুমে কাতর হলে চলবে না। শক্তিরূপিনীর আত্মবিস্মৃতা হলে চলবে না। দেশের মানুষের মুক্তির লক্ষে নবব্রতে আত্মশক্তিকে অবলম্বন করে এগিয়ে চলতে হবে। কবি নারী জাতিকে বিদ্যা শিক্ষার প্রতি আগ্রহী হতে উৎসাহ দিয়েছেন। প্রতিটি নারীকে উপার্জনক্ষম হতে বলেছেন। তবেই নিজের যথার্থ সম্মান প্রাপ্য হবে বলে কবি বিশ্বাস করেন। পরের স্কন্ধে চাপিয়া কেবল ঘরকন্যার দাসীপনাকে কবি ঘৃণা করতেন। কারণ কেবল পুত্র-কন্যা জন্ম দেওয়া আর ঘরের কোণে অশ্রুপাত করাই নারীর কর্ম হতে পারে না বলে কবি বিশ্বাস করতেন। তাঁর ভাষায়,

“জেগে রাখ, ভায়া নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে;
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার জমি,
চষে নাক’ কভু আধিতে।”[৪৫]

কবি এই গানটিতে নারীকে জাগিয়ে তুলবার লক্ষ্যে কটাক্ষের তীর্যক বাণী ছুড়েছেন। সকল কর্মে পিছিয়ে পড়া নারী জাতিকে সম্মুখে এগোবার এ কবির প্রাণপণ চেষ্টা। দামী শাড়ি আর গহনায় মোড়া কোমল শরীরে বিদ্যা শিক্ষার প্রলেপ নেই বলে কবি চিন্তিত। তাই হাস্যরসযুক্ত কটাক্ষের ইঙ্গিতে কবি নারী জাতিকে তাদের ক্রিয়াকর্ম ও দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করার প্রয়াস পেয়েছেন গানটিতে।

হাসির গানে স্বদেশচেতনা

রজনীকান্ত সেনের প্রতিটি হাসির গানের অন্তরালে রয়েছে ব্যক্তিজীবন বা সমাজজীবনের অসংগতি। পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রসূত নব্য বাবুয়ানার মুখে কষাঘাত করাই ছিলো এ সকল গানের মূল উদ্দেশ্য। তাই তৎকালীন দেশপ্রেমী শিল্পী-সাহিত্যিকদের মতো রজনীকান্ত সেনও গানে-কবিতায় সকল অনাচার, মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে পরাধীন ভারতবাসীকে পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহগ্রস্ততা থেকে বাঁচাবার জন্য কখনো তীর্যকবাক্য, কখনো হাসি-ঠাট্টার পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। অন্যান্য কবি শিল্পীর মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল

রায়ের হাসির গানে মূলত ব্যঙ্গাত্মক রূপটি স্পষ্ট ফুটে ওঠে; অপরদিকে রজনীকান্ত সেনের হাসির গান মানেই হাসির অন্তরালে করুণাধারার অশ্রুপাত। তবে সমাজের মিথ্যাচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে মানবতা ও মনুষ্যত্বের জয়গানই মূলত কবিদের হাসির গান রচনার মূল উদ্দেশ্য। শুধু ব্যক্ত করবার ঢংটি আলাদা।

রজনীকান্ত সেন বহুবিধ কারণে হাসির গান রচনা করেছিলেন। যেমন দেশব্রতের অন্তরালে আত্মসুখের অন্বেষণ, পণপ্রথা, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের ভণ্ডামি, বিদেশি চাল প্রভৃতি। এতো সকল বিষয়কে আশ্রয় করে হাসির গান রচনা করলেও আমাদের আলোচ্য বিষয় মূলত তাঁর হাসির গানের মধ্যদিয়ে স্বদেশ প্রেমবোধ জাগ্রত করবার প্রয়াসকে তুলে ধরা। যেমন–

"তোর ঘরের পানে তাকা;
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,
বাইরে একটু আতর-মাখা।"[৪৬]

এই গানটিতে হাস্যরসের মধ্যদিয়ে সমাজের মূল অসংগতিকে তুলে ধরেছেন কবি। এই দেশের মানুষের স্বাধীনতা নেই অথচ বিলেতি পোশাকে আবৃত অন্তসার শূন্য–এই পরিস্থিতিই বিশাল গানের ছত্রে ছত্রে বহুবিধ উপমায় সাজিয়েছেন কবি। দেশভক্তি ও শ্রদ্ধার অভাবেই মূলত অন্তর আর বাইরের এই অমিল। যেকোনো বড় পরিবর্তনে প্রয়োজন সংঘবদ্ধতা ও সুশিক্ষার। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল থেকে শুরু করে সকল কবিই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে ইংরেজের থেকে মুক্তির উপায় বা প্রাথমিক শর্ত হলো নিজেদের কুসংস্কার ও অনাচার থেকে মুক্ত হওয়া। কুসংস্কার আর অর্থলোভে যে জাতি নিমজ্জিত, যে জাতি আত্মস্বার্থসিদ্ধি ছাড়া কিছু বোঝে না। যেখানে অর্থলোভে সাত বছরের শিশুকন্যাকে বুড়োর কাছে বিয়ে দেন বাবা। বিধবা শিশু মেয়েকে একাদশীতে অভ্যস্ত করেন স্বয়ং পিতা। সে জাতির কাছে স্বাধীনতা বা মুক্তির মূল্য বোঝা ভীষণ দুর্বোধ্য। তাই কবি এই গানটির মধ্যদিয়ে হাস্যোচ্ছলে ভারতবর্ষের চরম দুরবস্থার কথা তুলে ধরেছেন।

হাসির গানের ছলে রূঢ় আঘাতে কবি নব্য বাবুদের নিদ্রা ভাঙাতে চেয়েছেন। রজনীকান্তের হাসির গান মানেই সমাজ সমস্যাকেন্দ্রিক অনুভূতিপূর্ণ বাণী। কখনো তা আত্মজাগরণের ইঙ্গিত–তবে হাস্যচ্ছলে। এ সকল গানের অধিকাংশই কবি রচনা করেছেন বাউলের সুরে। বাউলের সরল সহজিয়া সুরের লোকায়াত ভঙ্গিতে কবি ফুটিয়ে তুলেছেন জীবনের চরম সত্যকে। যার অন্তরালে রয়েছে মূলত কেবলই স্বদেশপ্রেম। কবির ভাষায়, 'তোর ব'দ্‌লে গেল দেহের আকার, ব'দ্‌লে গেল মন,/তবু নয়ন মু'দে অচেতন।'[৪৭]

হাসির গান রচনা মূলত কান্তকবির দ্বিজেন্দ্রলালের অনুগামী অনুসরণ। আমরা জানি রজনীকান্তের চরিত্রের সাথে ব্যঙ্গবিদ্রূপ একেবারেই শোভনীয় নয়। তাই তাঁর হাসির গানের মধ্যদিয়ে তিনি মোহগ্রস্ত, কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ও ভণ্ড মানুষের অন্তরের স্বরূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন। কবির হাসির অনেক কবিতা গানে রূপান্তরিত হয়নি। কারণ তিনি তাতে সুর দিয়ে গান হিসেবে প্রচারের চেয়ে এর মূল বক্তব্যকে কবিতার আকারে প্রকাশেই বেশি আগ্রহী ছিলেন। এই কবিতার মধ্যদিয়ে তিনি বাঙালির মোহগ্রস্ততা

আর কুসংস্কারের আচ্ছন্নতাকে হাস্যরসের আবরণে তুলে ধরেছেন–যা মূলত ব্যঙ্গবিদ্রূপ নয়, বরং করুণ আবরণে আচ্ছাদিত।

> "হাসির গানের ব্যপদেশে রজনীকান্ত সমাজের ক্ষতস্থানগুলি নির্দেশ করিয়া তাহাতে ওষুধ প্রয়োগের চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার মুখে বরের দর সংগীত শ্রবণ করিয়া এক বিবাহ সভায় বরকর্তা যৌতুকের ফর্দ সংক্ষেপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এইরূপ শুনিয়াছি।...
> হাস্যরসের আবরণ দিয়া রজনীকান্ত তাহার মর্মবেদনাই প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার কৌতুক হাসির সঙ্গে বেদনার অশ্রু মিশ্রিত। কমলাকান্তের ভাষা ঈষৎ পরিবর্তিত করিয়া রজনীকান্ত বলিতে পারিতেন 'হাসির ছলনা করি কাঁদি।"[৪৮]

অন্যত্র প্রমথনাথ বিশী বলেছেন,

> "তাঁহার হাসির গান মূলত দ্বিজেন্দ্রলালের দ্বারা প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও, এক জায়গায় রজনীকান্তের জিৎ। তাঁহার হাসিতে করুণায় যেমন মাখামাখি, দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন নয়। দ্বিজেন্দ্রলালের হাসির গান যদি শুষ্কশীতের বাতাস হয়, রজনীকান্তের হাসির গান বর্ষার জলভারাক্রান্ত পূবে বাতাস।"[৪৯]

ডি এল রায়ের 'আমরা বিলেত ফেরত ক'ভাই' গানটির সুরে রজনীকান্ত রচনা করলেন হাসির গান 'দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর'। ইংরেজদের বহুবিধ সূক্ষ্ম অত্যাচারের চিত্র ফুটে উঠেছে গানটিতে। সাথে বাঙালিদের জীবনকাল নিয়ে উদাসিনতাও এই গানটির স্পষ্ট ইঙ্গিত। উকিল রজনীকান্ত তাঁর ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতার কথাই ব্যক্ত করেছেন নিচের হাসির গান দু'টোতে, 'দেখ, আমরা দেওয়ানী হুজুর,/আমরা, মোটা মাইনের মজুর।'[৫০]

নিচের গানটিও ডি এল রায়ের 'আমরা বিলেত ফেরত ক'ভাই' এর অনুরূপ সুরে রচনা করেছেন রজনীকান্ত সেন–'দেখ, আমরা জজের Pleader,/যত, Public Movement -এ leader.'[৫১]

উপরের দুটি গানের মধ্যেই দেশের আইন-কানুনের চরম দুর্দশার কথা ব্যক্ত করেছেন কবি। কেউ আইন জানে না অথচ ওকালতি বিদ্যে ফলাতে কেউ ছাড়ে না। কারণ 'this is dishonest advocacy'; কবি গণ্ডারদেরও ছেড়ে কথা বলেননি অথবা অফিসের বড়বাবুর। সকল ক্ষেত্রে অর্থলোভের ঘোড়দৌড়। নতুন টাকার গন্ধে সকলে মাতোয়ারা। কার ছেলে মরে কি কার বাপ তাতে ডাক্তারদের কিছুই যায় আসে না বরং ছুরি চালালেই মোটা অংকের টাকা। তাই কথায় কথায় অপারেশন। এ যেন আমাদের বর্তমান চালচিত্রেরই প্রতিচ্ছবি। কবির ভাষায়–'দেখ, আমরা হচ্ছি পাশকরা, ডাক্তার মস্ত মস্ত;/ঐ Anatomy, Physiology তে একদম সিদ্ধহস্ত।'[৫২]

যে দেশের চিকিৎসা শাস্ত্র, আইন শাস্ত্রের এই অবস্থা সেই দেশের মানুষকে ইংরেজ শাসকের থেকে নিজেরাই বেশি শোষণ করছে বলে কবির দুঃখ বিলাপ। অসততা আর অনাচারে যখন মানুষের মন কলুষিত হয় তখন বড় কোনো বিষয়ের প্রত্যাশা তারা করতে পারে না। অর্থলোভী আর অসৎ ব্যক্তি দেশের জন্য প্রাণ দিতে কুণ্ঠাবোধ করে। সে কেবল নিজেকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে। কবি তাই এই সকল হাসির গানের মধ্যদিয়ে ভারতবর্ষের করুণ চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

রজনীকান্তের হাসির গানের মূল্যায়ন বা নিগূঢ় সত্য হলো অতি সহজ কথায় হাসির ছলে বিষয়টিকে মর্মগোচর করবার চেষ্টা। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে হাসি উল্লাসের পরিপূর্ণ একজন মানুষ ছিলেন। গান

যেমন গাইতে ভালোবাসতেন তেমনি অন্যকে গান শুনিয়েও পেতেন আনন্দ। যতদিন রাজশাহীতে ছিলেন ওকালতি শেষে তিনি প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় পাড়া-প্রতিবেশীদের কোনো আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই গান শুনাতেন। এমনকি মক্কেলের আনা হাড়ি হাড়ি মিষ্টিও তিনি গেয়ে গেয়ে বিলি করতেন। এমনি হাস্যরসে পরিপূর্ণ মানুষের অন্তরটি ছিলো চির দেশপ্রেমে পরিপূর্ণ। তাই যে কোনো সুযোগে দেশের মানুষকে তিনি গানের মধ্যদিয়ে হাসির ছলনায় সত্য উপলব্ধির আশ্বাস দিতেন। ঘুমিয়ে পড়া, ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে জাগিয়ে তোলার অন্তর থেকে আমৃত্যু সংগ্রাম করেছেন তিনি। নিজের অসুস্থ শরীরের অপারগতা গানের মধ্যদিয়ে তিনি জয় করতে চেয়েছেন। জাতিকে জাগাতে বঙ্গভঙ্গ রদ আন্দোলনে অন্যান্য সকল কবির মতো রজনীকান্ত সেনও একটি বলিষ্ঠ নাম। 'মোহ-রজনী ভোর হইলে, জাগ নগরবাসী/পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য-কিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী।'[৫৩]

আশা জাগানিয়া কবি চিরকাল গেয়ে চলেছেন সূর্য উদয়ের গান। সে আলোয় তিনি পথ দেখাতে চেয়েছেন। সকল দুঃখ-কষ্ট ভুলে প্রাণে প্রাণ মিলানোর আহ্বান ছিলো কবির। নগরবাসীকে জাগিয়ে তুলতে গেয়ে চলেছেন সূর্য স্নানের গান। এ গান হাসি আনন্দে ভরা, উৎসব আলোয় জগৎ সজ্জিত পরিপূর্ণ প্রাণ। তাই কবি ক্ষণিক সুখ বিলাসে নিমজ্জিত না থেকে বিশ্ব আনন্দে যোগ দিতে আহ্বান জানিয়েছেন। এ বেলা আলস্যে ঘুমাবার নয়। এ বেলা বিশ্ব হাসিতে আত্মবিলোবার ক্ষণ। সেই আলোক আনন্দের পথে যুক্ত হতে সকলকে জেগে উঠতে আহ্বান জানিয়েছেন কবি।

তিনি মানুষের বিবেককে জাগিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। বিবেক ভুলে গেছে কে রাজা! কে প্রজা! কে প্রভু! কে দাস! অন্তসারশূন্য জাতি মেটে গর্বে বিভোর। অন্যকে ঠকাতে ঠকাতে নিজের ঠকের হিসাবে পূর্ণ, এ জাতি তা ভুলে বসে আছে। কবি এ সকল কর্মকাণ্ডকে পাপের পাঠশালা বলেছেন। যেখানে অন্তরের সাথে বাইরের কোনো মিল নেই। মুখ দিয়ে যা বলে অন্তর দিয়ে তা বিশ্বাস করে না। এই বিভ্রান্তির ফাঁকা বুলি বেশি দিন থাকবে না বলে কবি সাবধান করেছেন। তাই বিবেককে জাগাতে কবি বাউলের সুরকে অবলম্বন করে লিখেছেন, 'তা'রে যে 'প্রভু' বলিস্, 'দাস' হলি তুই কবে?/তুই, মেটে গর্ব্বে ফেটে মরিস্ তোর বিভবের গৌরবে!'[৫৪]

তথ্যসূত্র

১. সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের চারদিগন্ত*, প্রতিভাস, (১৮/এ গোবিন্দ মণ্ডল রোড, কলকাতা), জানুয়ারী ২০১৩, পৃ. ৫০।

২. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস (২ গনেন্দ্র মিত্র লেন, কলকাতা) ফেব্রুয়ারী ১৯৯২, পৃ.১০৮।

৩. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, রজনীকান্ত সঙ্গীতসমগ্র, সাহিত্যম্ (১৮/বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা) অক্টোবর ২০০৬, পৃ. ১৪৩।

৪. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১০৮।

৫. পূর্বোক্ত পৃ. ১১১।

৬. পূর্বোক্ত পৃ. ১১৩।

৭. সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, (বিটি রোড, কলকাতা), পৃ. ১৯০।

৮. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *কান্তকবি রজনীকান্ত*, পরম্পরা, (২০/এ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা), জুলাই ২০১৮, পৃ. ৯৩-৯৪।

৯. পুর্বোক্ত পৃ. ৯৪।

১০. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী প্রকাশ, কলকাতা, পৃ. ২২৫।

১১. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, *রজনীকান্ত সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০।

১২. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *কান্তকবি রজনীকান্ত*, পৃ. ৯৬।

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

১৪. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ২১৭।

১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৩।

১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৩।

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬।

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০।

২০. নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৬।

২১. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯৭।

২২. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯৬-৯৭।

২৩. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯৮।

২৪. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬১।

২৫. পুর্বোক্ত, পৃ. ২৪৯।

২৬. পুর্বোক্ত, পৃ. ৯৩।

২৭. সুনীলময় ঘোষ, *বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত সেন জীবন ও সংগীত*, আনন্দ প্রকাশন (সি/৮ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট দ্বিতল, কলকাতা), ২০১৭, পৃ. ৯৬।

২৮. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০।

২৯. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১০১৯৬।

৩০. সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৯।

৩১. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত। পৃ. ১১০

৩২. পূর্বোক্ত পৃ. ১১০

৩৩. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু,রজনীকান্ত সঙ্গীতসমগ্র। পৃ. ২৬৫

৩৪. পূর্বোক্ত. পৃ. ১৯৯-২০১

৩৫. পূর্বোক্ত.পৃ. ২২০
৩৬. পূর্বোক্ত.পৃ. ১৬০
৩৭. পূর্বোক্ত.পৃ. ১৯২
৩৮. সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুর বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ১৫৮
৩৯. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, রজনীকান্ত সঙ্গীতসমগ্র, পৃ. ১৪৫
৪০. পুর্বোক্ত পৃ. ১৪৩-১৪৫
৪১. পুর্বোক্ত পৃ. ১৪৫-১৪৬
৪২. পুর্বোক্ত পৃ. ৭৩
৪৩. পুর্বোক্ত পৃ. ২৩৩-২৩৪
৪৪. পুর্বোক্ত পৃ. ১৪৬
৪৫. পুর্বোক্ত পৃ. ১৪৮-১৪৯
৪৬. পুর্বোক্ত পৃ. ১৭৫-১৭৬
৪৭. পুর্বোক্ত পৃ. ১৭৪
৪৮. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, পৃ. ১১৯
৪৯. পুর্বোক্ত পৃ. ১১৯
৫০. সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু,রজনীকান্ত সঙ্গীতসমগ্র, পৃ. ১৭৯-১৮১
৫১. পুর্বোক্ত পৃ. ১৮১-১৮৩
৫২. পুর্বোক্ত পৃ. ১৮৩-১৮৫
৫৩. পুর্বোক্ত পৃ. ২৩৩-২৩৪
৫৪. পুর্বোক্ত পৃ. ১৬০

পঞ্চম অধ্যায়

অতুলপ্রসাদ সেনের গানে স্বদেশচেতনা

(১৮৭১-১৯৩৪)

অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশভাবনা

গীতিকার ও সুরকার অতুলপ্রসাদ সেন বাংলাগানের জগতে এক অবিস্মরণীয় নাম। বাংলাগান সংক্রান্ত যে কোনো আলোচনায় অন্যান্য গীতিকবিদের সাথে অতুলপ্রসাদের নামটিও অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা হয়। তিনি মাত্র ২০৬টি গানের রচয়িতা হলও জীবনকালেই তাঁর গীতিকবি সত্তার পুরস্কার পেয়ে গিয়েছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্নেহসহ অগণিত মানুষের ভালোবাসা ও শ্রদ্ধালাভ করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথের গানের সংখ্যা সোয়া দুই হাজারের মতো, কবি নজরুলের প্রায় সাড়ে তিন হাজার, ডিএল রায়ের গান পাঁচশতকের কিছু বেশি এবং রজনীকান্তের প্রায় তিনশত বারোটি। অতুলপ্রসাদ সেন সমকালীন এই পঞ্চগীতি কবিদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর কেবলই ২০৬টি গান সম্বলিত *গীতিগুচ্ছ* নামক একটি গীতিগ্রন্থ ব্যতীত অন্য কোনো সাহিত্য সৃষ্টি নেই। দুই একটি কবিতা যা লিখেছেন তা সাহিত্য সৃষ্টি হিসেবে স্বীকৃত হয়নি। অর্থাৎ, অতুলপ্রসাদ সেন সুরের সাধনাতেই ছিলেন আত্মপ্রাণ সমর্পিত। তাঁর প্রধান পরিচয় তাঁর গান। মাত্র ২০৬টি গানের একটি গীতিগ্রন্থ দ্বারা সুর-সংগীতের জগতে যে আসন তিনি সৃষ্টি করেছেন তা বিরল। প্রেম-বেদনায় সিক্ত অতুলপ্রসাদের প্রতিটি গান অনন্য মাত্রা অর্জন করেছে। যে কারণে গানের সংখ্যা নয় বরং প্রতিটি গানের গভীরতাই সুরের সাগরে তাঁকে অমরত্ব দান করেছে।

তাঁর গানের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যা বিশেষভাবে লক্ষণীয় এবং বাংলাগানের অন্যান্য দিকপাল গীতরচয়িতার সাথে তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়। উল্লেখ্য যে, বাঙালি এই গীতিকবি বাসা বেঁধেছিলেন সুরের পীঠস্থান লক্ষ্ণৌ শহরে। সুরের মূর্চ্ছনায় যে শহরের বাতাস ভারি থাকতো। সেই সুরই তাঁকে অমরত্বের পথ দেখিয়েছে।

বাংলাদেশে সেই সময়টাতে সাধারণত ধ্রুপদ, খেয়াল ও টপ্পার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের মূলভিত্তি ছিলো ধ্রুপদ। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানের পটভূমিতে রয়েছে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পার একচেটিয়া প্রভাব। রজনীকান্ত সেনের গানে পাই ধ্রুপদ ও খেয়ালের যুগল আদর্শের প্রভাব। লক্ষ্ণৌর গীতিকবি অতুলপ্রসাদ সেনই প্রথম বাংলাগানকে অনুপ্রাণিত করলেন ঠুংরির মায়াভরণে। তাঁর পূর্বে বাংলাগানে ঠুংরির তেমন প্রভাব ছিলো না বললেই চলে। অবশ্য পরবর্তীকালে নজরুল অতুলপ্রসাদের গানে অনুপ্রাণিত হয়ে ঠুংরির এই বিশেষ ধারাকে আরো সম্প্রসারণ করেন। কিন্তু অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর গানে সমকালীন গীতিকবিদেরর মতো ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পাকে গ্রহণ না করে গানের ভিত্তিরূপে ব্যবহার করেন এমন এক সুরভঙ্গি যা ইতিপূর্বে বাংলাগানে ছিলো না। ঠুংরির ছোট ছোট কারুকার্যে তাঁর গান পরিপূর্ণ থাকতো। যদিও বাংলাগানের বৈশিষ্ট্যে বেমানান বলে ঠুংরির

সুরবিস্তার তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু সুরের অলংকরণ রীতিকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন–যা তাঁর গানকে অন্য সকলের গানের থেকে আলাদা সত্তা দান করেছে। শুধু সুরের প্রসঙ্গে বললে সবটা বলা হবে না। অতুলপ্রসাদ কবি হিসেবেও তাঁর গানের বাণীকে দিয়েছেন একটি অনন্য রূপকল্প। এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায়ের উক্তি উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক, 'অতুলপ্রসাদের গানের সুরটাই শুধু বৈশিষ্ট্যময় নয় তাঁর গানের পদযোজনাও সমান বৈশিষ্ট্যপূর্ণ, এমনকি খতিয়ে দেখলে তাঁর বাণীর আবেদন তাঁর সুরের আবদনের চেয়েও বেশী।[১]

অতুলপ্রসাদ সেনের গানের মর্মার্থ গভীরভাবে উপলব্ধি করলে দিলীপকুমার রায়ের এ উক্তি কতটা বাস্তব তা বোঝা যায়। অতুলপ্রসাদ সেন একজন সার্থক সুরকার এবং একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর কবিসত্তায় যেমন প্রকাশিত হয়েছে তাঁর অন্তরের বেদনামিশ্রিত প্রেমাতুর হৃদয়ের নিংড়ানো বাণী, তেমনি স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশপ্রেমের গভীর ভাব ফুটে উঠেছে তাঁর গানের বাণীতে। মানবমনকে ভাবিত করে বিস্মিত করে অপরূপ সুর ও বাণীর মিশেল। অতুলপ্রসাদের রচনাশৈলী সর্ম্পকে নারায়ণ চৌধুরীর উদ্ধৃতি উল্লেখ করা হলো,

> "তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের মধ্যে অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য এক আধারে এসে বিধৃত হয়েছে : তিনি গভীর ঈশ্বরভক্ত, মরমী-আকুতিযুক্ত, স্বদেশপ্রেমিক ও মানবপ্রেমিক। খতিয়ে দেখতে গেলে তাঁর স্বদেশপ্রেম ও মানবপ্রেম তাঁর নিবিড় ঈশ্বরপ্রেম থেকেই উৎসারিত হয়েছে। ভারতীয় সাধনার পরিভাষায় ঠিক যাকে আধ্যাত্মিক পিপাসার কবি বলা হয় তিনি হয়তো সেই স্তরের কবি নন, কিন্তু সেই অসম্পূর্ণতার স্খালন হয়েছে তাঁর নিবিড়-গভীর ভক্তির আকুলতার দ্বারা। এমন ভক্তির আন্তরিকতামণ্ডিত কবি রবীন্দ্রনাথ ও কান্তকবি রজনীকান্তের দৃষ্টান্ত দিলে আধুনিক বাংলা কাব্যের জগতে আর আবির্ভূত হয়েছেন কিনা সন্দেহ। কী প্রসন্ন সুন্দর বিনম্র তাঁর আত্মনিবেদনের ভঙ্গি, কত অনাবিল তাঁর নিজ জীবনে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে সত্য করে তোলবার অভীপ্সা। কি দেশপ্রেমের কবিতায়, কি মানবদেহের কবিতায়, এমন কি প্রেমমূলক গানেও, তাঁর এ নিবিড়-গভীর ঈশ্বরানুভূতি বারেবারেই আপনাকে বিব্যক্ত করেছে।"[২]

অতুলপ্রসাদের অন্তর ছিলো প্রেম আর ভালোবাসায় সিক্ত। এ প্রেম যেমন তাঁর দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবনের একমাত্র সহায়, আলোর দিশারী, গভীর প্রেমের পরশিয়া তাঁর চির অভিমানী দুঃখ জাগানিয়া স্ত্রী হেমকুসুমের প্রতি, তেমনি আহত হৃদয় চরম অপমানে সমর্পিত হয়েছে ঈশ্বরের আরাধনায়। ঈশ্বরের গানে প্রার্থনার মধ্যদিয়ে ইহকালের সকল যন্ত্রণা থেকে তিনি পরিত্রাণের পথ খুঁজেছেন।

আবার এমন একটি সময়ে অতুলপ্রসাদ সেনের জন্ম যখন বাংলার আবহাওয়া স্বদেশ প্রেমের উন্মাদনায় চঞ্চল। গান, সাহিত্য সাধনা থেকে শুরু করে বক্তৃতা, সভা-মিছিলে সর্বত্র স্বদেশ আর স্বাধীনতার জন্য উত্তেজনা। মাতৃভক্ত অতুলপ্রসাদ সেনের অন্তরেওছিলো গভীর দেশপ্রেম। অল্পবয়সে পিতা রামপ্রসাদ সেনের মৃত্যুতে সংসারের বেহাল অবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তিনি প্রায়ই বড় বড় দেশনেতাদের স্বদেশি বক্তৃতা শুনতে যেতেন এবং ফিরে এসে সেই বক্তৃতা হুবহু বন্ধুদের শুনিয়ে মুগ্ধ করতেন। অতুলপ্রসাদ সেনের রাজনৈতিক আদর্শ ছিলেন রাজনীতিবিদ সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী। তাতে অতুলপ্রসাদ এমনই অন্তপ্রাণ ছিলেন যে, তাঁর সাথে দেখা করতে ও বক্তৃতা শুনতে তিনি ঢাকা চলে আসেন। কিশোর বয়সেই

অতুলপ্রসাদের মনে স্বদেশি নেতাদের জন্য, স্বদেশের জন্য যে প্রেমাতুর হৃদয় জেগেছিল তা সুনীলময় ঘোষের বক্তব্য থেকে আরো স্পষ্ট হবে,

> "সুরেন্দ্রনাথও কিশোর অতুলপ্রসাদের দেশ-ভক্তি ও দেশসেবার প্রেরণায় মুগ্ধ হন। অতুলপ্রসাদ ঢাকা থেকেই প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়েছেন–পরীক্ষার পর অফুরন্ত সময় আর অবসর। যখনই দেশনেতাদের আগমনবার্তা শুনতেন, অতুলপ্রসাদ ছুটে যেতেন তাঁদের বক্তৃতা শুনবার জন্য। পণ্ডিত বিজয়চন্দ্র গোস্বামী, মনমোহন ঘোষ, আনন্দমোহন বসু, টি. পালিত, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতি দেশবরেণ্যদের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ-বিস্ময়ে আনমনা হয়ে যেতেন–নিজের ভবিষ্যৎ জীবনের, দেশব্রতের রূপরেখায় আঁচড় দিতেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও প্রবন্ধগুলি যা হাতের কাছে পেতেন নিবিষ্ট মনে পড়তেন।"[৩]

পিতৃহীন বালকের জীবন বহু ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে অবশেষে নিজের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে ব্যারিস্টার হয়ে দেশ ও জাতীয় সেবা করবার মানসে ১৮৯০ সালে বিদেশ যাত্রার উদ্দেশ্যে জাহাজে উঠলেন। মা ও মাতৃভূমির সাথে বাহ্যিক যোগাযোগ ছিন্ন করে সে যাত্রা যেন আত্মিক যোগাযোগ দ্বিগুণ করে তুললো। জাহাজে বহু বছর পর হঠাৎ দেখা বাল্যবন্ধু জ্ঞান রায়ের সাথে। তারই অনুরোধে ক্লান্ত কবি গাইলেন,

"একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগতজনের প্রাণ জুড়াক
হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক
মুখ তুলে আজি চাইরে।"[৪]

গানটি শেষ না হতেই সাদা চামড়ার কতগুলো শাসকদল ছুটে এসে গান বন্ধ করতে বলে এবং ভারতীয়দের সাথে অসভ্য আচরণ করলে অতুলপ্রসাদ সেন ক্ষুব্ধভাবে এ আচরণের তীব্র প্রতিবাদ জানায়। কোনো অন্যায়কে সহ্য করবার পাত্র তিনি কোনোদিনই ছিলেন না। তিনি স্বজাতির প্রতি, স্বদেশের ভাষার প্রতি অপমান কোনোভাবে সহ্য করলেন না, বরং শাসকদলের রূঢ় আচরণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর এ আচরণে অন্য ভারতীয়রাও তাঁকে সমর্থন করলেন এবং শাসকগোষ্ঠীর সেই অশোভনীয় আচরণের প্রতিবাদ জানালেন। এই জাহাজেই কবির মনে স্বদেশপ্রেমের চিরস্মরণীয় গানটির সুর গ্রথিত হয়েছিল। স্বদেশের মাটি ছেড়ে যতই জাহাজ ছুটে চলছিলো ততই এই মাতৃকার জন্য প্রাণ কেঁদে উঠছিল। তাই এই মাটির কোনো অপমান সহ্য করা সম্ভব না। শুধু একা অতুলপ্রসাদের নয় বিলেতে আসার পর কবি অনুভব করলেন স্বদেশের জন্য সকলেরই প্রাণ উদাস। স্বদেশের মাটির স্পর্শ থেকে এত দূরে বিলেতের মাটিতে বসে স্বদেশের প্রতি শাসকের যেকোনো রূঢ় আচরণে প্রাণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠতো বিলেতে পড়তে যাওয়া সকল ছেলেমেয়ের। শুধু তাই নয়, দেশের সাহিত্য সংস্কৃতি তখন আরো বেশি করে টানতো। বাংলার গ্রাম-প্রকৃতির প্রতি মুগ্ধতা ও সাহিত্য সংস্কৃতির মধুর রসকে অন্তরে জাগ্রত রাখার লক্ষ্যে বিলেতের মাটিতে সাহিত্য সংস্কৃতির চর্চা অব্যাহত রাখার জন্য 'স্টাডি সার্কেল' নামে একটি সংগঠন জন্ম নিল। মূলত বিলেতের প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক এডমন্ড গমের উৎসাহ উদ্দীপনায় 'স্টাডি সার্কেল' গঠিত হলেও একে মুখরিত করে রাখতেন সরোজিনী নাইডু, মনমোহন ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রমুখ তাদের স্বরচিত কবিতা ও গানে। 'স্টাডি সার্কেলে'র কোনো এক সভাতেই অতুল প্রসাদ প্রথম গাইলেন তাঁর রচিত স্বদেশ প্রেমের গান। এর সুর মূলত রচিত হয়েছিল ভূমধ্যসাগরের বুকে।

ভেনিস নগরের গন্ডোলা চালকদের সম্মিলিত সুর বুকে সঞ্চিত করে তারই সুরে রচনা করেন তাঁর জগদ্বিখ্যাত স্বদেশপ্রেমের গান–

> "উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ' আদি-জগত-জন পূজ্যা
> দুঃখ দৈন্য করে নাশি করো দূরিত ভারত লজ্জা।
> ছাড়ো গো ছাড়ো শোকযাত্রা, কত সজ্জা।
> পুনঃকমল কনক ধন ধান্যে।"[৫]

ভারত বন্দনার এমন অভূতপূর্ব গানে উপস্থিত সকলেই মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। স্বদেশের মাটি থেকে বহুদূর বসে স্বদেশ মাতৃকার জন্য এমন আকুল করা ভারত আরাধনার গানে বিস্ময়ে উপস্থিত সকল স্বদেশপ্রেমীগণ অশ্রুসিক্ত প্রাণে স্বদেশের মাটির প্রতি মাথা নত করেন।

স্বদেশের প্রতি গভীর ভাবনা অতুলপ্রসাদের সারাজীবন জুড়ে ব্যাপ্তছিলো। তিনি যেমন তাঁর মা-কে ভালোবাসতেন তেমনি ভালোবাসতেন দেশকে। তাই দেশের কাজে তিনি সারাজীবন ছুটে গেছেন, সভা করেছেন। সরাসরি সম্পৃক্ত থেকেছেন স্বদেশের হিতৈষী নানা কর্মকাণ্ডে।

জীবনের ঘটনাচক্রে অতুলপ্রসাদ ওকালতি শুরু করেন লক্ষ্মৌতে। তিনি নিজ কর্মদক্ষতা ও সততায় লক্ষ্মৌবাসীর আন্তরিক আস্থা অর্জন করেন এবং তাদের ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হন। জনহিতকর ও সমাজের মঙ্গলার্থে কৃত কোনো কাজই অতুলপ্রসাদ বিনা সম্ভব হতো না। এমনকি তিনি স্বাগ্রহে প্রধান হয়ে কাজের দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতেন। তবে কাব্যচর্চা থেকে কখনই দূরে সরে থাকেননি তিনি। লক্ষ্মৌর কোর্টে প্র্যাকটিসকালে আদালতের সামান্য অবসরেও চলতো তাঁর কাব্যচর্চা।

বাংলাভাষার প্রতি অনুরাগ

বাংলাভাষা তথা বাংলা সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ অতুলপ্রসাদের স্বদেশভাবনার এক অনন্য দিক। সাহিত্য বিষয়ে আড্ডাও তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। শত কাজের ব্যস্ততাতেও ছুটির দিনে বাড়িতে বসতো গল্প-কবিতা-গান আর চা-পানের আসর। সাহিত্য অনুরাগী কতিপয় ব্যক্তিত্ব সেই আসরের নিয়মিত অতিথি ছিলেন। ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রাধাকমল মুখোপাধ্যায়, নির্মল সিদ্ধার্ত, বিনয়েন্দ্র দাসগুপ্ত, হেমেন্দ্রলাল রায়, রবীন্দ্রলাল রায়, ভীমসেন, অসিত হালদার, অম্বিকাচরণ মজুমদার, প্রশান্ত দাসগুপ্ত, শরীন দত্ত, অশোখপ্রসাদ বন্ধ্যোপাধ্যায়, হামিদ আলী খাঁ-এর মতো সাহিত্যিকদের সমাগম হতো তাঁর বাড়ির সাহিত্য আড্ডায়।

আসরের একটি অন্যতম উদ্দেশ্যছিলো বাংলার প্রতি অতুলপ্রসাদের আত্মিক অনুরাগ। এই সাহিত্য আড্ডা প্রসঙ্গে অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য তুলে ধরা হলো–

> "তাঁর (অতুলপ্রসাদ) কাছে বঙ্কিম, দ্বিজেন্দ্র, রবীন্দ্র প্রভৃতির রচনা বা তাঁদের জীবনের ঘটনাগুলি শুনিতে, পড়িতে, আলোচনা করিতে ভালবাসিতাম। তাঁর নিজের রচিত দেশ-সংগীত বা প্রেম-সংগীত আমাদের শুনিবার বা যাহার ইচ্ছা লিখিবার সুযোগ হইত। হোলীর দিনে হোলীর গান, শ্রাবণের বরিষায় বর্ষাসংগীত, শারদীয়া বৈকালে পূরবীর তানে বারে বারে শুনিতাম, কখনও পুরাতন হইত না। এই সাহিত্যের আখড়ায় অতুল যেমন প্রাণ খুলিয়া

হাসিতেন, গল্প করিতেন এমন কোথাও নয়।...বাঙলা রচনায় তিনি আমাদের উৎসাহ দিতেন। ...বর্ষাসুন্দরীকে বিদায় নিবেদন উপলক্ষে অতুল আমাদের কবিতা রচনা করিতে আদেশ করেন। ...এসব রচনার মূলে অতুলের প্রেরণা। তিনি সব সময় চাহিতেন যেন আমরা বাংলার তুলি দিয়া বাঙালির মর্মকথা গদ্যে ও পদ্যে চিত্রপটে অঙ্কিত করিয়া বঙ্গভারতীর পূজার উপঢৌকন দিই। প্রবাসী বাঙালির কাছে তাঁর এই নিবেদন পরে প্রবাসী সাহিত্য সম্মেলনে পর্যবসিত হইয়াছিল।"[৬]

লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্র-সংবর্ধনার আয়োজন করলেন অতুলপ্রসাদ সেন। লক্ষ্ণৌর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে এ এক অনবদ্য ঘটনা। লক্ষ্ণৌ শহরের রূপ বদলে গেল। সারা শহরের রাস্তা-ঘাট ফুল পাতায় সেজে উঠল। সেইবার বাংলা ভাষার প্রতি অদম্য প্রেমী অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তির আনন্দে রচিত বিখ্যাত 'মোদের গরব, মোদের আশা' গানটি রবীন্দ্রনাথের সামনে প্রথম গেয়ে শোনালেন। সকলে মুগ্ধ চিত্তে তা শ্রবণ করলেন। শুধু তাই নয় শুদ্ধ বাংলার ব্যবহারেও সচেষ্ট ছিলেন তিনি। বাংলা ভাষার সাথে গ্রিক শব্দের প্রচলনেও তাঁর আপত্তি ছিলো। তাই তিনি সেইবার লক্ষ্ণৌতে রাধাকল মুখোপাধ্যায় ও রাধাকুসুম মুখোপাধ্যায়ের বাড়িতে মধ্যাহ্নভোজনকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহৃত ও প্রচলিত গ্রীকশব্দ 'সুরঙ্গ' শব্দের যথার্থ বাংলা প্রতিশব্দ খুঁজে বের করতে অনুরোধ করেন।

অতুলপ্রসাদ সেন ১৯২২ সালে 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে যান। এই উৎসবের কর্ণধার ছিলেন কানপুরের সমাজসেবী ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ সেন এবং সভাপতির দায়িত্ব পড়ে অতুলপ্রসাদ সেনের উপর। 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ'-এর বার্ষিক উৎসবের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায়–

"নানা কারণে বহির্বঙ্গের বাঙ্গালির চিন্তাধারায় বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা ও অনুশীলনের ধারাবাহিকতায় ঘাটতি গভীরভাবে কিছু বাঙালি মনীষার হৃদয়কে বিব্রত করেছিল। সেই সূত্রেই মাতৃভাষা ও মাতৃ সংস্কৃতির প্রতি ঔদাসীন্য দূর করা তথা বাঙলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা স্থাপনের একটা ভাবনা কিছু চিন্তাশীল মানুষের মনে দোল খাচ্ছিল। তারই একটা সংহত রূপের প্রয়াস আকাঙ্ক্ষায় উত্তরপ্রদেশের কানপুরের 'বঙ্গসাহিত্য সমাজ' গৃহে এর বার্ষিক উৎসবে আমন্ত্রিত হয়ে এলেন লক্ষ্ণৌ থেকে অতুলপ্রসাদসহ আরো অনেক।"[৭]

সেই বার্ষিক সভায় অতুলপ্রসাদ বহির্বঙ্গে বসবাসকারী বাঙালিদের একটি 'সম্মিলনী'র গুরুত্ব প্রকাশ করেন। বাঙালিরা ইংরেজ শোষক দ্বারা চরমভাবে অত্যাচারিত ও নিগৃহীত হয়ে চলেছে। তাই বাঙালিদের সম্মিলনের কথা শুনলেই শুরুতেই শোষকশ্রেণি বাঁধা দিবে যুক্তিতে অতুলপ্রসাদ সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক ভাষা ও সাহিত্য সম্মিলনী প্রস্তাব দেন। ডা. সুরেন্দ্রনাথ সেনও বহির্বঙ্গে বাঙালিদের একাত্মতা, আত্মরক্ষা এবং আত্মসমর্থনের লক্ষ্যে এমন একটি সম্মিলনীর গুরুত্ব রয়েছে বলে অতুলপ্রসাদ সেনকে সমর্থন করলেন। সেই মতেই ১৯২৩ সালে কাশীতে রবীন্দ্রনাথের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত হয় 'উত্তরভারতীয় বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন'। নেতৃত্বে এমনিভাবে সকল বাঙালি ভাষা ও সাহিত্য রক্ষার জন্য নিরলস সংগ্রাম করে গেছেন।

অতুলপ্রসাদের স্বদেশ ভাবনার প্রতিফলন দেখতে পাই তাঁর বাংলা সাহিত্যের প্রতি নিবিড় অনুরাগেও। এখানে ১৯২৫ সালে লক্ষ্ণৌ শহরে 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর দ্বিতীয় অধিবেশনে অতুলপ্রসাদের সুচিন্তিত ভাষণের অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো,

> "মনে রাখিবেন আমাদিগকে বঙ্গবাণীর পূজার জন্য নূতন উপাচার সংগ্রহ করিতে হইবে; নূতন ভাষায় তাহাকে ভূষিত করিতে হইবে; বিবিধ সাহিত্য-কুসুম হইতে পরিমল সংগ্রহ করিয়া আমাদের মধুভাণ্ডারকে আরো মধুর করিতে হইবে। সাহিত্য-সম্রাট রবীন্দ্রনাথ আজ বিশ্বজগতে আমাদের সাহিত্যকে যশস্বী করিয়াছেন; ভারতের দেশ-বিদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বাংলা সাহিত্যের মহৎ বার্তা বহন করিবেন এবং প্রচার করিবেন। আমাদের সাহিত্য সত্য, শিব ও সুন্দর। এই সত্য-শিব-সুন্দরের মন্দির ভারতের সর্বত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বাঙ্গালীর সর্বোচ্চ সম্পদ তাহার সাহিত্য; ইহাকে সযত্নে রক্ষিত ও বর্ধিত করিতে হইবে।
>
> সাহিত্যপ্রেমী বন্ধুগণ, আমরা বহুদিন পরে প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব-মন্দির স্থাপন করিলাম। পুরোহিত কিংবা উপাসকের অভাব হইবে না; কিন্তু ইহাকে চিরস্থায়ী করিতে হইলে হৃদয়ে ভক্তি চাই; গভীর নিষ্ঠা চাই; প্রচুর ধৈর্য চাই–নতুবা আমাদের সাহিত্য-সাধনা নিষ্ফল হইবে। ক্ষণিক উৎসাহ কিংবা ভাবুকতায় আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধ হইবে না; কার্যতৎপরতা, অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা, স্বার্থত্যাগ, পরার্থপরতা এ সদগুণসমূহের সমাবেশ হইলে তবে আমরা সফল হইব।"[৮]

এই বক্তব্যের মধ্যদিয়ে একজন দেশপ্রেমী সুচিন্তক নাগরিকের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও পরিকল্পনাগুলো ফুটে উঠেছে। তিনি ছিলেন সাহিত্য ও শিল্পকলার অত্যন্ত প্রগতিশীল এক পরিচালক। বিভিন্ন সভাসমিতি ভাষণের মধ্যদিয়ে তাঁর স্বদেশ ভাবনার এই সুচিন্তিত দিকটিই ফুটে ওঠে। এর মধ্যদিয়ে তিনি জনমনে সাহিত্য-শিল্প তথা স্বদেশের ভাষা ও স্বদেশমাতৃকার গুরুত্বের দিকটিকেই জোরালোভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করতেন। জনচিত্তের স্বাধীনতা আর মুক্তির বীজ বপনের মানসিকতা তৈরির জন্য তিনি শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করেন। এরসাথে গুরুত্বারোপ করেন পাঠাগার স্থাপনের। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন,

> "বাঙ্গালী জনসাধারণের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের প্রচার করিতে হইলে, যেখানে যেখানে সম্ভব বাংলা পুস্তাকাগার সংস্থাপন করা একান্ত প্রয়োজনীয়। লাইব্রেরী সংক্রান্ত একটি কথা নিবেদন করা যুক্তিসঙ্গত মনে করি। পুস্তাকালয়ের উদ্দেশ্য পাঠক সাধারণের মধ্যে সুশিক্ষা বিস্তার করা। যে সাহিত্য পাঠে মনের উচ্চবৃত্তিগুলি পরিস্ফুট হয় সেই সাহিত্য পাঠে জনসাধারণকে প্রলুব্ধ করাই পুস্তকালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। জনসাধারণ যাহা পাঠ করিতে চায় শুধু তাহা সংগ্রহ করাই পুস্তকাগারের কর্তব্য নহে, পুস্তক বিক্রেতার লক্ষ্য হইতে পারে। লঘু সাহিত্যের প্রতি স্বতঃই লোকের আকর্ষণ অধিক; যে সাহিত্য চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে তৎপ্রতি সাধারণের দৃষ্টি অল্প। তাই সচরাচর পুস্তকাগারে গল্প ও উপন্যাসের বাহুল্য দেখিতে পাই। সে বিষয়ে আমাদের একটু সতর্ক হওয়া আবশ্যক।"[৯]

বাঙালি জাতির প্রতি তাঁর গভীর প্রেম চিরকালের। এ সকল বক্তব্য ও চেষ্টায় একটি বিষয় স্পষ্ট, তিনি বাঙালির চিত্তকে জাগাতে চেয়েছিলেন। যথার্থ শিক্ষা, সাহিত্য ও শিল্পচর্চায় তিনি বাঙালির অন্তরাত্মাকে জাগাতে চেয়েছেন, তৃষিত করতে চেয়েছেন স্বাধীনতার প্রত্যাশায়।

শিক্ষা বিস্তারে ভূমিকা

বাংলা ভাষার পথিক সাধক অতুলপ্রসাদ সেন শিক্ষাক্ষেত্রে যথাসাধ্য নিজের অবদান রেখে গেছেন। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়টি স্থাপনের জন্য ১৯৫২ সালে গোমতী নদীর তীরে নবাব নাসিবুদ্দিন হায়দারের বিলাস ভবনটি পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন নির্মাণে অতুলপ্রসাদ সেন এককালীন দশ হাজার টাকা দান করেন। তিনি লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান পরামর্শদাতাসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মকমিটির একুশ জনের একজন সম্মানিত সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হন। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হন জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। পরবর্তীতে অতুলপ্রসাদ সেন এবং গোরকনাথ মিশ্রের চেষ্টায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। অতুলপ্রসাদের প্রচেষ্টাতেই 'সাহিত্য-বিদ্যা' বিভাগটি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় তিনি সারা ভারতবর্ষ থেকে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় সুযোগ্য ও সুনির্বাচিত অধ্যাপকদের লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠদানে জড়ো করতেন। বিশেষ করে তিনি আইন বিভাগের শিক্ষক নির্বাচনী কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, একবার নতুন উপাচার্য পদে অতুলপ্রসাদ সেনের নাম উঠলে শিক্ষা নিয়ে নতুনদের সাথে কাজ করবার সুযোগ বাড়বে ভাবনায় রাজি হন। কিন্তু যখন দেখলেন উক্ত পদে তাঁর নির্বাচন সর্বসম্মতভাবে হবে না, তখন তিনি সহসা সেই নির্বাচন থেকে সড়ে দাঁড়ালেন। এমনি উদারনৈতিক মানসিকতার পূর্ণ পরিচয় দেন তিনি তাঁর এই সিদ্ধান্তে।

হরিজন সভার প্রতি মমতা ও দায়িত্বপালন

লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদ সেন স্থানীয় মানুষদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। অনুন্নত বস্তিবাসীদের মাঝে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। তাদের সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবনযাপনের কথা তাঁকে ভাবিত করলো। একজন ব্যারিস্টার নগরের অত্যন্ত মান্য ব্যক্তি। তিনি নিজে গিয়ে যখন এই সকল হরিজনের সেবা করতে লাগলেন, লক্ষ্ণৌবাসীর মনে অতুলপ্রসাদ সেনের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা আর প্রেম জাগ্রত হলো। তাঁরই জন্য যেন লক্ষ্ণৌবাসী এতোকাল তৃষিত ছিলো এবং সবার অজান্তেই স্বীয় কর্মের জন্যে অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌবাসীর মনে মুকুটবিহীন রাজার আসনটি লাভ করলেন। লক্ষ্ণৌর ছোট-বড় আপামর জনসাধারণের হৃদয়ের রাজা অতুলপ্রসাদ সেন। কারো কাছে তিনি দাদা ভাই–ভাইসাহেব বা সেন সাহেব। সকলের অত্যন্ত প্রিয় তিনি বিশেষ করে রিক্সাওয়ালা, ভিখারী আর হরিজন শ্রেণির কাছে। বন্যাপীড়িতদের জন্য, নিরক্ষর বস্তীবাসীর অক্ষরজ্ঞানের জন্য, গরিব ছাত্রদের লেখাপড়াসহ শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রসার ও প্রচারে সদা কর্মব্যস্ত তিনি। এ ক্ষেত্রে সুনীলময় ঘোষের মন্তব্য তুলে ধরা হলো–

> "লখনাউ শহরে স্থায়ীভাবে বসবাস করার পরিকল্পনা অতুলপ্রসাদ লখনাউবাসীর বিশেষ করে দরিদ্র-বস্তীবাসীদের জীবনযাত্রার প্রতি গভীরভাবে মনসংযোগ করেছিলেন। মুচি-মেথর-সমাজে, অনুন্নত শ্রেণীর পল্লীতে নিজে গিয়ে নর্দমা পরিষ্কার, রাস্তা পরিষ্কার, জল পরিশোধনের ব্যবস্থা–সর্বোপরি একটি 'সুস্থ জীবন' অতিবাহনের পরিবেশের জন্য, যা যা প্রয়োজন তিনি তাতে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এমন ধারার কাজ ও সেবা ইতোপূর্বে লখনউ তথা ভারতের কোন

শহরে কোন জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। 'হরিজন সেবার' কথা তখনও ভারতবর্ষে তেমনভাবে প্রচারিত হয়নি–কেউ তেমন করে ভাবেওনি। মাতা হেমন্তশশীর আদর্শে এবং পিতা রামপ্রসাদ সেনের কর্মপ্রবর্তনায় এবং সর্বোপরি মাতামহ কালীনারায়ণ গুপ্তের সর্ব-মানুষের সেবার জাগ্রত-প্রেরণা সেদিন অতুলপ্রসাদকে ব্যারিস্টারীর বৈভব অতিক্রম করে অবহেলিত অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করেছিল। বহু রাতদিন অতুলপ্রসাদ তাদের সাথে থেকে থেকে তাদের বাসস্থান–স্বাস্থ্য সম্পর্কিত নানাবিধ প্রতিষেধক ব্যবস্থা তদারকি করতেন।"[১০]

গান্ধীজী অতুলপ্রসাদ সেনের এই হরিজন সেবার কথা শুনেছিলেন বলেই তাঁর প্রতি গভীর আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধা জানাতে লক্ষ্মৌতে আসার আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। কারণ ভারতীয় ইতিহাসে এমনভাবে হরিজন সেবার কাজটি আগে কেউ কখনো করেননি বা ভাবেননি। গান্ধীজী লক্ষ্মৌতে এসে হরিজন পল্লী ও অন্যান্য স্থান পরিদর্শন করেছিলেন।

অতুলপ্রসাদের রাজনীতির অন্যতম নীতিগত আদর্শ ছিলো–ভারত ঐতিহ্যে হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত চেতনার উন্মেষ ঘটানো এবং সকল ভারতবাসীকে এই চেতনাবোধের গৌরব উপলব্ধি করানো। তিনি হরিজন সেবা থেকে শুরু করে সর্বত্র এই একটি লক্ষ্যে স্থির থেকে কাজ করছিলেন। কারণ তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের মনে এই একাত্মতা অনুভূত না হলে ভারতের স্বাধীনতার সূর্য বহু দূরের ভাবনার বিষয় হয়েই থাকবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য ভারতের সর্বত্র তখনো হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রশ্নে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের ভাব সর্বত্র বিরাজিত ছিলো। হরিজন সম্প্রদায়ের মধ্যে নিজেকে যুক্ত করে কবি প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন মানুষে মানুষে কোনো ভেদাভেদ নেই, পার্থক্য শুধু নামে। যার যার ধর্ম কেবলই মানুষের ব্যক্তিগত আচরণ তা কখনই বিভেদের কারণ হতে পারে না। হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবোধকেই তিনি তাঁর সামগ্রিক রাজনৈতিক জীবনের প্রধানতম আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করেছেন। বহু মুসলমানের সাথে তাঁর রাজনৈতিক হৃদ্যতার সম্পর্কছিলো। আর গরিব-কুঠিরবাসী, রিক্সাওয়ালা, ফেরিওয়ালা মুসলমানের কাছে তিনি ছিলেন প্রিয় 'ভাই দাদা'।

তাঁর এই উদ্যাগ হিন্দু-মুসলমানের সমনেতৃত্ব বিকাশে ভারতীয় রাজনীতিতে বিশেষ করে উত্তর প্রদেশের রাজনীতিতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়েও কবি হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের কথা বলে গেছেন। তাঁর বহু সাধনায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যের সেতু রচিত হয়েছিল তা যেন কোনোক্রমেই ইংরেজ শাসক নষ্ট করতে না পারে সে বিষয়ে তিনি সকলকে সজাগ থাকতে বলেছিলেন। কারণ তিনি জানতেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকাল থেকে ইংরেজশ্রেণি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য নষ্ট করবার নানাবিধ পায়তারা করতেন। এই ঐক্যকে বিষিয়ে তুলতে পারলেই তাদের কার্যসিদ্ধি অনেক সহজতর হয়ে উঠবে বলে অতুলপ্রসাদ সেন সকলকে সাবধান থাকতে বলতেন।

এই উদ্দেশ্যে কবি নিজের খরচে ১৯০৩ সালে দুস্থ ও অসহায় মানুষের সাহায্য ও সেবার জন্য প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন 'গুড উইল ক্লাব'। এই ক্লাবের সভাপতি ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। এই ক্লাবের উদ্যোগে

শহরে গঠিত হয় অনেক 'সেবাশ্রম সমিতি'। তাঁর সমাজ উন্নয়নের বাসনা ও দুস্থদের প্রতি প্রেমবোধ দেখে প্রতিটি সেবা সমিতিই তাঁকে প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে নির্বাচিত করেছিল।
১৯০৬ সালে বঙ্গভঙ্গের পরের বছর 'সাউধ সেবা সমিতি' নামে একটি সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। এ সমিতির মাধ্যমে গড়ে ওঠে একদল তরুণ স্বেচ্ছাসেবক। তারা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করতো এবং তাতেই অসহায় দুস্থ মানুষের সেবা চলতো। অতুলপ্রসাদ সেনের সভাপতিত্বে এই সমিতির ছেলেরা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে বন্যা-দুর্ভিক্ষ বা যেকোনো বিপদে অসহায়ের পাশে দাঁড়াবে এই ছিলো তাদের মূলমন্ত্র।
অতুলপ্রসাদ সেন ছোট ছোট সভা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করতেন। নেতৃস্থানীয় সম্প্রদায় নেতাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করাসহ হিন্দু-মুসলমান যুবকদের এক করে রাখবার প্রয়াসে নিরলস আত্ম-উদ্বোধনের বাণী ছড়িয়ে বেড়িয়েছেন। তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন ছোট বড় সকল সভাসমিতিতে আকুলতা ভরা কাতর হৃদয় নিয়ে। এই উদ্দেশ্যে রচনা করেন হিন্দু-মুসলমানদের ঐক্যের গান–'পরের শিকল ভাঙিস পরে,/নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।'[১১]

স্বদেশরক্ষার্থে গঠিত সংগঠন ও ভূমিকা

কবি অতুলপ্রসাদ সেন দেশের স্বাধীনতার সূর্যকে লালনের স্বপ্নে বিভোর রাখতে গান রচনা, সভাসমিতি ছাড়াও বহু সংগঠন তৈরি করেছেন। এই সকল সংগঠন তৈরির মূল উদ্দেশ্যই ছিলো দেশবাসীর চিত্তকে সদা জাগ্রত রাখা। স্বাধীনতা প্রত্যাশী জাতি যেন ঝিমিয়ে না পড়ে, যেন ঘরের কোণে সময় অতিবাহিত না করে, যেন দেশের যে কোনো প্রয়োজনে পথে নামতে কুণ্ঠাবোধ না করে, তাই সারা জীবনব্যাপী তিনি বহুবিধ সংগঠন তৈরি করেছেন। যেমন বঙ্গীয় যুবক সমিতি, গুড উইল ক্লাব, মানডে ক্লাব, আওয়ার ডে ক্লাব ছাড়াও লক্ষ্ণৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন, প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মিলন, অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশনের সাথেও যুক্ত ছিলেন তিনি। উত্তর ভারতীয় সাহিত্য সম্মিলনেরও তিনি প্রধান বার্ণিকের ভূমিকা পালন করেন। হিন্দীসভা ও 'হিন্দী গ্রন্থাগার' নির্মাণ করেন। তিনি একজন দেশপ্রেমী বাঙালি হয়েও ভারত ভূ-খণ্ডের অন্য সকলের ভাষা ও অনুভূতিকে শ্রদ্ধা করতেন। তিনি লিবারেল ফেডারেশনের হয়ে লক্ষ্ণৌ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের নির্বাচনও করেছিলেন।
অন্তরের দিক থেকে সদা চঞ্চল ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন অথচ বাহ্যিক অবয়বে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন অদম্য এক অনন্য পুরুষ। সদাব্যস্ততায় তাঁর সকল আনন্দ। দেশের কাজে, দশের কাজে, নিজের ওকালতি কাজে নিজে সর্বদা ডুবে থাকতেন। আর গান রচনায় পেতেন সকল কাজের অনুপ্রেরণা। স্বদেশসাধনায় ব্যপ্ত কবি তাঁর জীবদ্দশায় অনেক গুণী ব্যক্তির সাহচার্য পেয়েছিলেন। তন্মধ্যে শরৎচন্দ্র সেন, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ধূর্জটীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সরলা দেবী, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ জনের একান্তের সহচর ছিলেন। একদিকে বিশ্বপ্রেমিক অন্যদিকে স্বাদেশিকতা ও দেশমাতার অনন্য সাধক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং অসহযোগ আন্দোলনের নেতা গান্ধীজীরও তিনি স্নেহধন্য হতে পেরেছিলেন স্বীয় গুণে।

অতুলপ্রসাদ সেনের জন্য রবীন্দ্রনাথ দুটি কবিতা রচনা করেন। ধীরে ধীরে অতুলপ্রসাদ পরিণত হয়েছিলেন সকলের প্রাণের কবি রবীন্দ্রনাথের পরম বন্ধু। ১৯৩২ সালে 'পরিশেষ' কাব্যটি তিনি উৎসর্গ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনকে। পরম বন্ধু অতুলপ্রসাদের মৃত্যুর পর শোকাহত রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন 'অতুল প্রসাদ সেন' কবিতাটি। এটির অংশবিশেষ,

"বন্ধু, তুমি বন্ধুতার অজস্র অমৃতে
পূর্ণপাত্র এনেছিলে মর্ত্য ধরণীতে।
ছিলো তব অবিরত
হৃদয়ের সদাব্রত,
বঞ্চিত করোনি কভু কারে
তোমার উদার মুক্তদ্বারে।"[১২]

অতুলপ্রসাদ সেনের ছোটবেলা থেকে রবীন্দ্রনাথের গান-কবিতাকে অন্তরে লালন করে তাঁর মানসিক বিকাশের যাত্রা শুরু হয়েছিল। একবার মহামতি গোখলে লক্ষ্মৌ এলে অতুলপ্রসাদ রবীন্দ্রনাথের 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক' গান গেয়ে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। তিনি গোখলেকে লক্ষ্মৌর 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি' আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে নিয়ে যান। গোখলে এই সংগঠনের কার্যাবলি দেখে দারুণ অনুপ্রাণিত হন। শুধু লক্ষ্মৌতেই নয় দেশের প্রতিটি শহরে যুবকদের এইরূপ সমিতি থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন গোখলে। তিনি এই সমিতির মাধ্যমে আর্ত-মানবতার সেবাসহ সকলের মনে দেশাত্মবোধ জাগরণের বিপুল কার্যকারিতার কথা ব্যক্ত করেন।

লক্ষ্মৌ পৌরসভা থেকে যেবার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পৌর সংবর্ধনা জানানো হয় সেবার এই বঙ্গীয় যুবক সমিতির শিল্পীরা ঐকতান বাদনের মাধ্যমে মধুর সুর মূর্চ্ছনায় আকাশ বাতাস বিহ্বল করে তোলে।

লক্ষ্মৌতে যেবার কংগ্রেসের অধিবেশন হলো তখনো দেখা গিয়েছে অতুলপ্রসাদ বিপুল আগ্রহ উদ্দীপনার মধ্যদিয়ে স্বীয় দায়িত্ব পালন করেছেন। যখনই যেকোনো কাজে বাধা এসেছে বলিষ্ঠ নেতৃত্বে ঝড়ের বেগে তিনি তা সমাপন করেছেন। তাঁর কর্ম-চঞ্চলতা কখনো কোমল আবার প্রয়োজনে কঠোর নির্দেশে পরিণত হত, তার অনুরোধে লক্ষ্মৌ কংগ্রেসের অধিবেশনটি বিপুল মানুষের উপস্থিতিতে সম্পন্ন হয়েছিল। অতুলপ্রসাদ এমনই এক অদম্য শক্তি আর উদ্দীপনার নাম–যা কেউ অগ্রাহ্য করতে পারে না। বরং পরম আদরে আপন করে নেয় তাঁকে। কারণ তাঁর প্রতিটি আচরণে থাকতো স্বদেশপ্রেমের আর্তি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর 'আওয়ার ডে'যাত্রার মাধ্যমে অতুলপ্রসাদ সেনও দেশের অসহায় দরিদ্র মানুষের জন্য টাকা উত্তোলন করেন। সীতাপুরে 'আওয়ার ডে' ফান্ড কনসার্টে কবি **'হও ধর্মেতে ধীর, হও কর্মেতে বীর'** স্বরচিত গান গেয়ে প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেন এবং পরবর্তীকালে স্বদেশপ্রেমের এই গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পায়।

দেশ এবং দেশের মানুষের জন্য দরদভরা একটি হৃদয় নিয়ে অতুলপ্রসাদ সারাজীবন কাজ করে গেছেন। তাঁর স্বদেশপ্রেমের গানের সংখ্যা মাত্র তেরোটি অথচ স্বদেশের জন্য নিবেদিত এই প্রাণের তুলনা এই গানের সংখ্যা দিয়ে পরিমাপ করলে মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। দেশমাতাকে যেমন তিনি সাধনা করেছেন তেমনি একজন স্বদেশকর্মীর মতো পথে নেমে কাজ করেছেন। এদিক দিয়ে

অতুলপ্রসাদ সেন একটি বিস্ময়কর চরিত্র। অথচ কখনো মনের বিরুদ্ধ-বিষয়ে আপস করেননি তিনি। যখন দেখলেন সমগ্র দেশ জুড়ে হিংসাত্মক রেষারেষি আর দেশ নেতাদের মধ্যে ক্ষমতার লড়াই আর কর্তৃত্বের বড়াই তখন তিনি গান্ধীজীকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভক্তি করা সত্ত্বেও তাঁর অসহযোগ আন্দোলনকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি নিজেই বহু আরাধ্যের কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। নিজেকে যুক্ত করেছিলেন 'অল ইন্ডিয়া লিবারেল ফেডারেশন'-এর সাথে।

এলাহাবাদে ১৯৩৩ সালে লিবারেল পার্টির সম্মেলনে অতুলপ্রসাদের অসাধারণ ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতে অনেক বাঘা রাজনীতিবিদ যেমন স্যার অতুল চ্যাটার্জী, স্যার বি.এল. মিত্র, সরোজিনী নাইডু, দাশ অরবিন্দ ঘোষ, অধ্যাপক এম এম ঘোষ, গোখলে, স্যার জগদীশচন্দ্র বসুর মতো অনেকই কংগ্রেসের মূলধারা থেকে সরে যান। অতুলপ্রসাদের অতুলনীয় সেই বক্তব্যের খানিক অংশ তুলে ধরা হলো,

> "The constitution proposed in the white paper is certainly not Dominion Status nor any real self-government. It is a catalogue of safeguards rather than proposal for real autonomy. ...I deplore separate electorates more than British dominion has to be maintained no better means could be devised than separate electorats. ....We are not the architects of our own destiny but suppliants before another nation for favour. No self-respecting India can help feeling humilitation for such an object position."[১৩]

অতুলপ্রসাদ সেনের জীবনে যত কাজ, কবিতা, গান বা প্রবন্ধ রচনা করেছেন তাতে স্থান রয়েছে সর্বাগ্রে প্রেম। তিনি এই প্রেম কখনো মানবের জন্য, কখনো দেশের জন্য, কখনো এ দুটিকেই মিলিয়ে-মিশিয়ে একাকার করেছেন। স্বদেশের মাটি আর মানুষ তাঁকে সারাজীবন ভাবিয়েছে। নিজ গৃহে যে সুখ তিনি পাননি তাই কুড়িয়ে নিয়েছেন পথের মানুষের কাছ থেকে। অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী অতুলপ্রসাদ তাই তাঁর কর্মের সর্বত্র একটি মায়াময় আভাস রেখে গেছেন। দুশো ছয়টি গান, চারটি প্রবন্ধ আর কয়েকটি কবিতা একজন গীতিকবিকে চিরস্মরণীয় করে তুলবার জন্য যথেষ্ট নয়। কিন্তু তিনি তাঁর সকল রচনায় তুলে ধরেছেন বাস্তবজীবনে প্রেম-বিরহ আর দ্বন্দ্বের ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি। যে কারণে আমাদের সামনে তাঁর প্রতিটি গান জীবনের গল্পের মতো করে একের পর এক ছবি দেখাতে থাকে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের উপদেশে ১৯২৫ সালে আত্মউদাসীন কবির প্রথম গানের বই *গীতিসংকলন* প্রকাশ পায়। ২০৬টি গানের সমাহারে দ্বিতীয় গ্রন্থ *গীতিগুচ্ছ* প্রকাশিত হয় ১৯৩১ সালে কলকাতা থেকে।

দীপ্ত গীতিময় এই কবির স্বদেশ প্রেমবোধ ছিলো অতুলনীয়। তাঁর গানে স্বদেশ চেতনাবোধ বিশ্লেষণ এক বিস্ময়কর অভিজ্ঞতার স্বাক্ষর।

অতুলপ্রসাদের গানে স্বদেশচেতনা

বাংলার প্রতি জনসাধারণের আগ্রহকে বলিষ্ঠ করবার জন্য বহুগীতিকবি তাঁদের বহু রচনায়, কর্মে স্বদেশবন্দনার বাণী লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে অবশ্যই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন প্রমুখ অগ্রগণ্য। এঁদের পরবর্তী সময়ে স্বদেশ মাতৃকার সেবায় আকর্ষণ বৃদ্ধির এই মহৎ কর্মে যেসকল মহান উদার হৃদয় জাতীয় নেতৃত্বে নিজেদেরকে সমর্পণ করেছিলেন অতুলপ্রসাদ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। হিন্দু-মুসলমানের চেতনাকে সমন্বয় করবার প্রয়াস যেকোনো দেশীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। একটি বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে বাদ রেখে কখনোই ঐক্যের বাণী আওড়ানো সম্ভব নয়। অতুলপ্রসাদ এ সংকটটি খুব ভালোভাবেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই সামাজিক সকল সমস্যা গোড়া থেকে নির্মূল করবার উদ্দেশ্যে তিনি বেছে নিয়েছিলেন ভারতের ঐতিহ্য ও প্রাণের খোরাক সংগীতকে। যেমন তিনি সারাজীবন বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে দেশমাতার সেবা করেছেন, তেমনি গেয়ে গেছেন অন্তর নিঃসৃত গান। ব্যক্তিজীবনের সংকট থেকে যে জাতীয়জীবনের সংকট বৃহত্তর তা নিরূপণের জন্য রচনা করেছেন অসাধারণ সব গান। তিনি এসব গান গেয়ে ঘুমিয়ে থাকা-ঝিমিয়ে পড়া-ঘুণে ধরা মানুষের আত্মাকে জাগানোর প্রয়াসে নিয়োজিত ছিলেন। নিভৃতচারী কবি গীতিকবিতার অমূল্য স্বাদে যখন আত্মমগ্ন, বাংলাদেশের সর্বত্র জেগে উঠেছিল স্বদেশ বন্দনার ঢেউ। সেই উত্তাল ঢেউ-এ আত্মনিবেদন করলেন কবি অতুলপ্রসাদ সেন। ছোটবেলা থেকেই দেশ-ভক্তি ও দেশপ্রেম উন্মাদনায় চঞ্চল হয়ে উঠতেন তিনি। দেশ নেতাদের বক্তৃতা শুনতেন মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে। আর সংগীত ছিলো তাঁর রক্তকণিকায় প্রবাহিত। শৈশবকাল থেকেই সংগীতের সুরাচ্ছন্নতা তাঁকে ডুবিয়ে রাখতো। এ প্রসঙ্গে কল্যাণ কুমার বসুর দুটি উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো–

> "মিরাতারের বাসাবাড়ি প্রথমে ছিলো ডাক্তারদের ক্লাব, এখন সেই সঙ্গে হল নববিতান সমাজের ব্রাহ্ম সভ্যসভাদের মিলন ক্ষেত্র। ...অন্তঃপুরিকারা যোগ দিতেন আলাপ-আলোচনায় এবং উপাসনায়। ছোটরাও যোগ দিত। উপাসনা সভায় ছোট্ট অতুলের নিপুণ পাখোয়াজ বাদ্য উপস্থিত সকলে খুব উপভোগ করতেন।...
>
> মিরাতারের বাসাবাড়ির দক্ষিণের ঘরটা ওদের গান বাজনাচর্চার আসর। গান এবং বাজনা দুইই চলতো। সুবোধের বাবা গোবিন্দবাবু গান লিখতেন, সুবোধ বাবার দেওয়া সুরেই বাবার গান গাইত,'কত কাল পরে বল ভারত রে, দুঃখ সাগর-সাঁতারি হব পার।'...বাবার পাখোয়াজখানা বাবার ঘর থেকে নামিয়ে আনত ও (অতুলপ্রসাদ) বাবার অসাক্ষাতে।"[১৪]

সংগীতে স্বদেশচেতনার বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে অতুলপ্রসাদের সংগীতের রচনাগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোকপাত করলে। ব্যক্তি জীবনের সরলতা তাঁর রচনার সর্বক্ষেত্রে পরিলক্ষিত। কাব্য সংগীতের সর্বত্রই পরিলক্ষিত তাঁর এই বৈশিষ্ট্য। আবেগের শুদ্ধতা নিরাবরণ কাব্যসংগীতকে আরো আবেগঘন করে তুলেছে। সাথে ঠুংরি চালের হালকা সুরে কখনো অন্য সুরের মিশ্রণ এবং রাগ-রাগিণীর আশ্রয় তাঁর গানকে দিয়েছে এক অন্য মাত্রা। দেশজ সুরের অর্থাৎ বাউল, কীর্তন ও রামপ্রসাদী সুরের দোলায়িত ছন্দ তাঁর সংগীতকে করে তুলেছে অনন্য। স্বদেশপ্রেমের গান এক্ষেত্রে এক অতুলনীয় উদাহরণ।

আইন ব্যবসায়ে প্রসিদ্ধ লক্ষ্মৌর সেনবাবুকে এক নামে জানতেন সকলে। তাঁর কর্মনিপুণতা, উদার-আবেগী ও সংগীতপ্রেমী মন সকলের কাছে স্বল্প সময়ে অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল অচিরেই। জীবিকার কর্মব্যস্ততায় অতুলনীয় এই সংগীত প্রতিভা সারাজীবনে রচনা করেন মাত্র ২০৬/৭টি গান। তার মধ্যে গীতিগুচ্ছের স্বদেশ পর্বের গান মাত্র ১৩টি। সংখ্যায় কম হলেও ভাষার দ্যোতনা এবং সুরের মূর্চ্ছনায় তাঁর এক একটি গান অনন্যতার দাবিদার। কবির ভাষায়,

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃকমল-কনক-ধন-ধান্যে!"[১৫]

'ভেনিস নগরের' গন্ডোলা চাকরদের গানের সুরে রচিত এটি অতুলপ্রসাদ সেনের প্রথম স্বদেশপ্রেমের গান। স্বদেশপ্রেমে চঞ্চল অতুলপ্রসাদ ভালোবাসতেন গান গাইতে। রবীন্দ্রনাথের গান ছিলো তাঁর পরম আরাধ্যের। তিনি দেশ ছেড়ে সকল আপনজনকে ছেড়ে যখন বিলেতে গেলেন তখন অন্তরে লুকায়িত স্বদেশের জন্য তাঁর প্রেমবেদনা ফল্গুধারার মতো বিচ্ছুরিত হয়ে বেরিয়ে এলো। এই গানের বাণীর সুধায় মুগ্ধচিত্তে ভারতমাতাকে প্রণতি জানালেন। বিলেতে থাকাকালে সাহিত্যিক এডমন্ড গস গঠন করলেন 'স্টাডি সার্কেল' নামে সাহিত্য সংগীত চর্চার একটি আপন আলয়। যেই আলয়ে সকলে নিজেদের মেলে ধরতেন যার যার অন্তরের অভিব্যক্তি নিয়ে। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সরোজিনী নাইডু, ডি.এল রায় ও মনমোহন ঘোষের স্বরচিত কবিতা ও গান। এমনি এক আসরে কোনো এক সন্ধ্যায় অতুলপ্রসাদ গেয়ে উঠলেন জন্মভূমির মায়াবন্ধনে বাস্তব প্রাণের আকুতি। এক অদ্ভুত ধ্যানমগ্নতায় সেদিন আসরটি স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল এই মাতৃ-বন্দনার ব্যাকুল করা শুদ্ধ প্রাণের অঞ্জলি দানের স্তুতিতে, যেন উপস্থিত ভক্ত পূজারীগণ এক পরম বিস্ময়ে ক্ষণিকের জন্য অনাড়ম্বর শুচি-শুদ্ধ প্রাণের অঞ্জলী দান করে তৃপ্ত হলেন।[১৬] এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক।

> "অরবিন্দ ঘোষ বাঙলা তেমন জানতেন না–কিন্তু ভাষার ও সুরের ধ্বনির তরঙ্গ এমনভাবে হৃদয়ে ঢেউ তুলেছিল যার প্রভাবে তাঁর অন্তরও গভীরভাবে আকৃষ্ট হলো। গানটি শুনতে শুনতে অজানা ভাব তন্ময়তায় বাইরেও উদার উন্মুক্ত আকাশের মধ্যে ভবিষ্যৎ জীবনের অপ্রত্যাশিত রূপরেখাটি দেখতে পেলেন। স্বতোৎসারিত আবেগে তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে গেল। আর সেই জলেই মায়ের চরণ ধুয়ে বাঁধনহারা আনন্দধারায় ভরপুর। সরোজিনি নাইডু a placid and sweet expression এমন করে মাতৃভূমি ও মা-এর জন্য এর আগে অনুভব করিনি বলে অভিমত প্রকাশ করে আনন্দ স্নিগ্ধ তন্ময়তায় আনন্দ-অশ্রু বর্ষণ করলেন।"[১৭]

একবার বারাণসীতে কংগ্রেসের অধিবেশন হলে অতুলপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, গোবরনাথ মিশ্র, বিশ্বেশ্বরনাথ, শ্রীবাস্তব, মমতাজ হোসেনসহ সকল রাজনৈতিক নেতা সেই সভায় যোগ দেন। সভায় অতুলপ্রসাদ লক্ষ্মৌর মনোনিত সদস্য ও নেতা এবং সভাপতি মহামতি গোখলে। বারাণসী কংগ্রেসের সভার প্রতিপাদ্য বিষয় ছিলো বঙ্গভঙ্গ; অথচ বঙ্গভঙ্গ প্রতিহত করার জন্য কোনো কার্যক্রম বা উদ্যোগের ঘোষণাই সভায় গৃহীত বা প্রকাশিত হয়নি। এতে প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ হন অতুলপ্রসাদ সেন। যেখানে সমগ্র

বাংলা জেগেছে, কলকাতা উত্তপ্ত অথচ কংগ্রেসের সভাতে কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে নবসদস্য অতুলপ্রসাদ ক্ষুব্ধ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে গাইলেন–

"আপন কাজে অচল হলে
চলবে না রে চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না।"[১৮]

মঞ্চে উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দ অতুলপ্রসাদের এই গানে বাকরুদ্ধ হয়ে রইলেন। গোখলে স্বয়ং তাঁর কাছে এসে বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে আশ্বাস দিলেন; এহেন দেশপ্রেমে মুগ্ধ হলেন। বারাণসী কংগ্রেসের এই অধিবেশনেই অতুলপ্রসাদ গোখলের বক্তব্যে আশ্বস্ত এবং আকৃষ্ট হন। গোখলেও তাঁর দেশপ্রেমের মোহাবিষ্টতায় মুগ্ধ হন এবং 'বঙ্গীয় যুবক সমিতি'র আয়োজনে অংশ নিতে লক্ষ্মৌতে তাঁর বাড়িতে আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেইবার অতুলপ্রসাদ গোখলেকে তাঁর রচিত প্রথম স্বদেশপ্রেমের গানটি গেয়ে শোনান। স্ত্রী হেমকুসুমও সেদিন দেশমাতার অপূর্ব এই ভক্তিস্তুতিতে কণ্ঠ মিলিয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ সেনের সাথে।

সমগ্র বাংলা তখন উত্তপ্ত স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাপে। সেই তাপে লক্ষ্মৌও জ্বলে উঠল। লক্ষ্মৌর সর্বত্র শুরু হলো ইংরেজ সরকারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল। ক্ষুদিরামের ফাঁসি, যতীন দাসের আত্মত্যাগ এবং বহু তরুণ বাঙালির কারাবরণসহ বহু বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ঘটনায় বাঙালির মন ভারাক্রান্ত। ক্ষিপ্ত অথচ হাত-পা বাধাঁ মন গুমরে মরছে যেন, তবুও সভা সমিতিতে বহুবিধ আলোচনার মধ্যদিয়ে যাঁরা পরিত্রাণের পথ খুঁজছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি যেহেতু একজন ব্যারিস্টার সরাসরি অনেক কাজ করতে না পারলেও গানকে হাতিয়ার করে মানুষের বিক্ষিপ্ত মনকে স্বদেশ মাতার সেবায় সঙ্ঘবদ্ধ করবার প্রাণপণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। সেই উত্তাল সময়ে পূর্বে লেখা গান 'উঠ গো ভারতলক্ষ্মী' পরিপূর্ণ রূপ পায় এবং এই গান তিনি সর্বত্র গাইতে থাকলেন। রবীন্দ্রনাথের গানের সাথে সাথে অতুলপ্রসাদ সেনের গান বিপ্লবীদের সাহস জোগাতে লাগল দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার। লক্ষ্মৌতে অতুলপ্রসাদ স্বদেশচেতনার যে বীজ বপন করেছিলেন তা পরিপক্কতা পায় তাঁর একান্ত যত্নে। উল্লেখ্য যে, জীবনের প্রথম রচিত স্বদেশ ভক্তির এই গান অতুপ্রসাদকে স্বদেশি গান রচনায় আরো অনুপ্রাণিত করে তুলেছিল। এই গানটি তাঁকে কেমন জনপ্রিয়তা দিয়েছিল একটি উদাহরণে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে,

> "ই.বি.এর স্টেশনবাবুরা অতুলপ্রসাদের গান শুনেছেন, কিন্তু মানুষটিকে দেখেননি। টিকিট মাস্টারের জিজ্ঞাসায় সত্যদাদার কাছ থেকে অতুলপ্রসাদের পরিচয় পেয়ে সে কি আনন্দ! গানের মেলা বসে গেল। অনেকেই বলছেন, উঠো গো ভারতলক্ষ্মীর কবি।"[১৯]

এই গানটিতে কবি ভারতলক্ষ্মীর লজ্জা নিবারণ করতে সকলকে জেগে উঠতে বলেছেন। এ বেলা সকল বেদনাকে দূরে ফেলে, শোকসজ্জা ত্যাগ করে ত্রিশ কোটি সন্তানকে মা'কে বুকে তুলে নিতে বলেছেন কবি। মায়ের সন্তানেরা অত্যাচারে নিপীড়নে আজ ভীত-শঙ্কিত। যথার্থ নেতৃত্বহীনতায় আশার তরী যেকোনো মুহূর্তে অন্ধকার সাগরে ডুবে যেতে পারে। তাই ভারতমাতাকে নতুন আনন্দে তাঁর সন্তানদের

উদ্যমিত করতে হবে। শোষণকে পরাহত করতে ত্রিশ কোটি সন্তানের প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ হওয়া যেমন দরকার তেমনি পরস্পরের প্রতি হিংসা-দ্বেষ ভুলে দেশমাতার সেবায় আত্মনিবেদন করতে হবে। এ সকল অভয় ও আশার বাণীই মূলত এই গানটি মূল উপজীব্য। সেইসাথে ভারতমাতাকে বারংবার জননী সম্বোধন ও মায়ের প্রতি আকুলতা বিপ্লবীদের সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে তুলতো। তাই এই গানটি অতুলপ্রসাদ সেনের এক অনন্য সৃষ্টি। লক্ষ্মৌর কংগ্রেস অধিবেশনের উদ্দেশ্যে তিনি রচনা করেছিলেন আরেকটি অনিন্দ্য সুন্দর স্বদেশপ্রেমের গান। পরাধীন ভারতের অলসতা দূর করতে গানটির মধ্যদিয়ে কবি ভারতের অতীত ঐতিহ্যের স্তুতি বন্দনা করেছেন। জগৎসংসারে ভারতমাতাকে শ্রেষ্ঠতর আসনে অধিষ্ঠিত করবার যে সংকল্প বিরাজ করছিল চারিদিকে, তাতে সকলকে দৃঢ়চিত্তে স্থির থাকা ও আত্মশক্তিতে ধাবিত করবার উদ্দেশ্যেই মূলত কবি এ গানটি রচনা করেছিলেন–

"বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগতসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।"[২০]

ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে সকলকে এক করবার আহ্বানে নিবদ্ধ এই গানটি কবি লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনে গেয়ে শুনিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কংগ্রেস অধিবেশনের সমস্ত দায়িত্ব তিনি নিজ কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। জীবনের কঠিনতম পরিশ্রম দিয়ে স্বদেশমাতৃকার স্বার্থে সকলকে এক করবার মানসে কবি এই অধিবেশনের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। একদিকে অধিবেশনের সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন, অন্যদিকে শৃঙ্খলা রক্ষায় স্বেচ্ছাবাহিনীর অধিনায়ক। উদ্দেশ্য কেবল লক্ষ্মৌবাসীকে অধিবেশনে শামিল করা, যা ইতিপূর্বে কখনো হয়নি। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে তা সফলও করে তুলেছিলেন। রাজা-নবাব, ধনী-গরিব, স্কুলমাস্টার, উকিল, এক্সট্রিমিস্ট, রইস, অধ্যাপক, রায়ৎ, হিন্দু-মুসলমান, ব্যারিস্টার, সকল পেশার, সকল ধর্মের, সকল জাতির মানুষ সেদিন তাঁর ডাকে সাড়া দিয়ে কংগ্রেস অধিবেশনে শামিল হয়েছিলেন। সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য! সকলে 'সেন সাহেব'-এর আহ্বানে যুক্ত হয়েছিলেন সেই অধিবেশনে। প্রসঙ্গত বলতে হয় অতুলপ্রসাদ কিন্তু কংগ্রেসের এই অধিবেশনে যে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা গ্রহণ করা হয় তাতে খুশি হতে পারেননি। এমনকি নেতৃবৃন্দের মানসিকতা এবং বিভিন্ন বিষয়ে যে সকল আলোচনা হয় তিনি তাতেও সম্মত হতে পারেননি। এত পরিশ্রমের ফলে সে অধিবেশন সফল করে তুলেছিলেন, তা সত্ত্বেও আত্মমর্যাদার কাছে হার মানতে পারেননি তিনি। দেশপ্রেমী, নিষ্ঠাবান, কবি আপন ভাবনার সাথে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের ভাবনার মিল না হলে ব্যথিত হৃদয়ে নিজেই কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করে লিবারেল ফেডারেশনের সাথে যোগাযোগ করেছিলেন। লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষ্যে লিখিত স্বদেশ ভক্তির এই গানটি মূলত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে এক করবার আহ্বানে পূর্ণ। ভারতের ঐতিহ্যের ভাণ্ডার এখনো পূর্ণ। গৌরব কাহিনিতে এর রাজপথ মুখরিত। ভারতবর্ষের প্রতিটি নারী তেজোদীপ্ত। তাই কবি এই গানটিতে ধর্ম-দ্বেষ, জাত-অভিমান ভুলে দেশের স্বার্থে ত্রিশ কোটি দেহকে এক হবার আহ্বান জানিয়েছেন। সেইসাথে কবি

আশাবাদ ব্যক্ত করে জানিয়েছেন, ভারতমাতার বুকে সাময়িক যে যন্ত্রণার দহন রয়েছে তা চিরস্থায়ী নয়। অচিরেই এ মাটি, বিদ্যা-বৈভব, শিল্প, ধর্ম ও বাণিজ্যে পরিপূর্ণ হবে। লক্ষ্মৌতে কংগ্রেসের অধিবেশনের কিছুকাল পরেই বিশ্বযুদ্ধের সময়টিতে কবি 'আওয়ার ডে' সংগঠনটির জন্য টাকা সংগ্রহ শুরু করেন। তিনি স্বরচিত গান গেয়ে গেয়ে অর্থ সঞ্চয় করতেন। এই 'আওয়ার ডে'-এর অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যেই তিনি রচনা করেছিলেন নিচের গানটি–

"হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর,
হও উন্নতশির–নাহি ভয়।
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান,
সাথে আছে ভগবান–হবে জয়।"[২১]

কবি এই গানটিতে সুন্দর কিছু আশার বাণী ব্যক্ত করেছেন। তিনি সারাজীবন মানুষে মানুষে বিভেদ জ্ঞান থেকে নিজেকে মুক্ত রেখেছেন। তেমনি প্রত্যাশা করতেন নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান, থাকলেও প্রতিটি ভারতীয় এক অপরের পক্ষে থাকবে। একই পথে অগ্রসর হবে ভারতমাতার স্বার্থে। এ ভারতবর্ষে ক্ষুধা আছে, অভাব আছে তাই বলে তারা দরিদ্র নয়। কারণ তেত্রিশ কোটি জনবলে সমৃদ্ধ এ ভারতবর্ষ। তাই সত্যকে মাথার চূড়া করে সম্মুখে এগুবার আশাবাণী ব্যক্ত করেছেন কবি।বাংলার বাঘ বলে খ্যাত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের বড় প্রিয় গান 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে'। ঐতিহ্য, জনশক্তি এবং সত্যের জয়কে কবি এখানে ভারতবর্ষের মূল শক্তি বলে তুলে ধরেছেন। সাধারণত এটি সমবেত কণ্ঠে গীত হয়ে থাকলেও নানাবিধ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এ গানের বাণী হতাশার বুকে আশা জাগিয়েছে। রাজনৈতিক আর্দশিকতার দিকনির্দেশনাও দেওয়া হয়েছে এ গানে। বাঙালির স্বদেশ চেতনাকে তীক্ষ্ণ করতে, উজ্জীবিত করতে এ গানের তুলনা বিরল। ধর্ম ও কর্মকে আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার করে কবি উচ্চস্বরে সম্মুখে এগুবার মন্ত্র লিপিবদ্ধ করেছেন এই গানটিতে।হিন্দু-মুসলমান দুটি ধর্মকে কবি সবসময় একই মায়ের কোলে দুই সহদর বলে কল্পনা করেছেন। কোনো দিন ভেদাভেদ করতে চাননি। তিনি ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের জয়গান গেয়েছেন। নিচের এই গানটি তারই উজ্জ্বল উদাহরণ–

"দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে।
গলে গলে এনু মা, তোর
হিন্দু-মুসলমান দু ছেলে।"[২২]

১৯০৫ সালের উত্তাল সময়টি জন্ম দিয়েছে বহু কবি, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক আত্মনিবেদিত প্রাণের। ইংরেজ সরকার মুসলিমদের জন্য আলাদা আবাস করবার চক্রান্তে বাঙালিকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে এর সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করবার বহুদিন আগে থেকেই কুটবুদ্ধি আটছিলেন। অবশেষে সকল জল্পনা-কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ১৯০৫ সালের ১৬ অক্টোবর বঙ্গব্যবচ্ছেদ ঘোষণা করা হয়। বঙ্গ জাতির বুকে এ আঘাত বজ্রঘাতের সমান। তবে ইংরেজ শাসকদল বুঝতে পারেনি যে বাঙালি সত্তাকে ছিন্ন করবার যে প্রয়াস তারা করেছিলেন সে চেষ্টাই উল্টো সমগ্র বাঙালিকে এক মন্ত্রে সম্মিলিত করবে। সমগ্র ভারতের সকল বাঙালি এ সিদ্ধান্তে ক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং এর প্রতিবাদে রাজপথ মুখরিত হয়ে উঠল। যার

যার অবস্থান থেকে 'বঙ্গবিভাগে'র এ কুচক্রান্ত প্রতিহত করবার জন্য সকল শ্রেণীর মানুষ, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী সকলে এ আইনের বিরুদ্ধে ব্যবচ্ছেদের প্রতিবাদে যুক্ত হলেন। রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে এ দিনটিকে রাখি বন্ধন ও অরন্ধনের দিন বলে ঘোষণা করা হয়। অতুলপ্রসাদ সেন বাংলাদেশের সকল দেশপ্রেমী বাঙালির মতো এ আন্দোলনে যোগ দিতে লক্ষ্ণৌ থেকে কলকাতা আসেন। হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনাকালে হঠাৎ সমবেত কণ্ঠে নিজের গান শুনে থমকে দাঁড়ালেন, বিস্মিত হলেন কবি। এ প্রসঙ্গে সুনীলময় ঘোষের গ্রন্থ থেকে অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো–

> "অতুলপ্রসাদ মস্তক অবনত করে নয়নমুদে গানটি শুনছিলেন। গানটি শেষ হ'বার পর দলের মধ্যে একটি ছেলেকে ডেকে অতুলপ্রসাদ জিজ্ঞাসা করলেন, এ গানটি কার ভাই, তোমরা যা গাইছ! ছেলেটি বেশ আর্শ্চয হয়ে গর্বিত সুরে বলল, কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের গান. আপনি জানেন না! অতুলপ্রসাদ স্মিতহাস্যে পুলকিত গৌরবে সেই গানের দলের সাথে চলেছেন। গঙ্গার ধারে গিয়ে দেখলেন দেশপ্রেমিক জনসাধারণ দলে দলে গান গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন–বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদের অভিশাপ থেকে মুক্ত হবার জন্য। শোভাযাত্রার সামনে একটি অল্প বয়স্ক বালক (মহারাজা জগদীন্দ্রনারায়ণ রায়ের শিশু, অধুনা মহারাজ) মোটাকায় একটি লোকের স্কন্ধে উঠে হাত নেড়ে উদাত্ত কণ্ঠে গাইছে ...'বাঙলার মাটি, বাঙলার জল...' শোভাযাত্রায় সমবেত সকলে তার পুনরাবৃত্তি করছেন। সে দৃশ্য হৃদয়স্পর্শী–অতুলপ্রসাদ মুগ্ধ, প্রণত হলেন সকলের চরণে। রবীন্দ্রনাথও নিজে খালি পায়ে গঙ্গাস্নান করে নতশিরে সেই মহাপুণ্য মিছিলে মাতৃবন্দনায় যোগ দিয়েছিলেন, সকলের কণ্ঠে 'যদি ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চল রে...।"[২৩]

অতুলপ্রসাদ প্রসাদের *গীতিগুচ্ছের* আরেকটি অসাধারণ স্বদেশপ্রেমের গান 'মোরে কে ডাকে, আয়রে বাছা, আয় আয়'। অতুলপ্রসাদ ছিলেন অত্যন্ত মাতৃভক্ত এক সন্তান। মা-কে জানপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন। মায়ের প্রতি প্রকৃত সন্তানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয়ার থেকে অভিমানে-কষ্টে দূরে সরে যেতে হয়েছিল। তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে সেই বিরহ বেদনার আভাস ফুটে উঠেছে তাঁর মানবপর্বের গানসমূহের মাঝে। মায়ের সান্নিধ্য লাভের জন্য তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল প্রিয়ার ছায়া। 'মা' এমনি এক অমূল্য ধন। এমনকি লক্ষ্ণৌতে তাঁর গড়া বাড়িটিও তিনি নামকরণ করেছিলেন জন্মধাত্রী মা হেমন্তশশীর নামে। সেই মাতৃরূপ তিনি দর্শন করেছিলেন স্বদেশ মাতৃকার ছায়ায়। এতো আবেগ, এতো আকুতিতে মাখা তাঁর প্রতিটি স্বদেশপর্বের গানে–আমাদের মনে বিস্ময় জাগায়। কবির ভাষায়–'মোরে কে ডাকে–আয় রে বাছা, আয় আয়!/বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শোনা যায়।'[২৪]

চির শাশ্বত সন্তানের মাতৃ সান্নিধ্যের হাহাকার অনুরণিত হয়েছে এই গানটি জুড়ে। কবি স্বদেশের পরাধীনতাকে আপন দেশে পরবাসী তুল্য মনে করতেন। আপন কাজে মগ্ন থেকে মায়ের অপমানকে চোখ মেলে দেখতে না পারাকে কবি সন্তানের জন্য চরম লজ্জার বলে স্বজাতিকে ধিক্কার জানিয়েছেন। কবি এ সন্তানকে স্নেহের বন্ধনে আগলে রাখবার আকুতি জানিয়েছেন। কোন ধন মোহই এ বাঁধন ছিন্ন করে সন্তানকে মা-এর সান্নিধ্যচ্যুত না হতে হয়। এমনি আরেকটি স্বদেশপর্বের গান–যা আত্মাকে জাগিয়ে তোলে। গভীর বোধের কবি একটি গানের মধ্যদিয়ে জীবনের সকল হিসেবের কথা আওড়ে

যান নিপুণ বাণীর যাদুস্পর্শে। 'কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে?/দু-দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে!'[২৫]

স্বদেশপর্বের এই গানটিতে কবি ধনী-গরিবের ব্যবধান যেমনি ঘুচাতে চেয়েছেন তেমনি জ্ঞানের গুরুত্বের কথা ব্যক্ত করেছেন। 'দীনের ধন' বলতে কবি চাষি, শ্রমিক আর মেহনতি মানুষের পরিশ্রমে গড়ে ওঠা নগর সভ্যতার কথা বলেছেন। সেই দীন দরিদ্র না বাঁচলে দেশ বাঁচবে না, আবার গুটিকয়েক বিদ্যাধারী আর বাকি সমগ্র জ্ঞানহীনতায় থাকলেও সে জ্ঞানের মূল্য থাকবে না। তাই জ্ঞানের আলো ছড়াতে হবে ভারতবর্ষ জুড়ে। অতীত গৌরব ঐতিহ্য এবং ইতিহাসের বাহু থেকেও শিক্ষা নিতে হবে। কারণ অতীতে মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ছিলো সম্পর্কের মূল ভিত–অর্থ বৈভব নয়। মহামানবদের ত্যাগের বিনিময়ে আজকের এই ভারতবর্ষ তা যেন কেউ আমরা ভুলে না যাই। তাই দানকে জীবনের পরম কর্ম করতে বলেছেন কবি। অপরের অপমানে অপমানিত, পরের দুঃখে দুঃখিত হতে বলেছেন কবি। সকল জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা, ভেদ-জ্ঞান ঘুচিয়ে যেদিন স্বামী বিবেকানন্দের মতো 'সকলের তরে সকলে আমরা/প্রত্যেকে মোরা পরের তরে' ধ্যানজ্ঞান করতে পারবো সেদিন দীনজনের যে দীনবন্ধু সে ভারতবাসীর প্রতি মুখ তুলে চাইবেন। তাই ভারতবর্ষের মুক্তির অর্থ সকল জরাজীর্ণতা, ভেদাভেদশূন্য হয়ে ধনী-গরিব নির্বিশেষে আত্মমুক্তির বিকাশ লাভ। কয়েকটি গানে আবার কবির অভিমানের সুর ধ্বনিত হয়। এ গানে কবি কঠিন শাসনে মায়ের সন্তানকে বাঁধতে বলেছেন। অযোগ্য সন্তানের কারণে অতুল-বিভব-শালিনী দেশ আজ কাঙাল প্রায়। মোহমগ্ন কুলাঙ্গার সন্তানদের কবি সকল প্রকার দয়ার অধিকার থেকে চ্যুত করতে বলেছেন জননীর স্বার্থ রক্ষার জন্য। এরা নিজস্বার্থের কারণে আপন ভাইকে পর জ্ঞান করে। সর্বত্র অন্যায়ের অনুতাপশূন্য, মিথ্যা পূজা-অর্চনার অভিনয়ের ভারে পাপাচারে পূর্ণ এ দেশ জননীর সন্তানেরা। এ গানটি প্রসঙ্গে উল্লেখ্য করা যায়–

> "লোকমান্য তিলক বন্দী হলেন। দেশজুড়ে তার প্রতিবাদ ঝড় বইতে লাগল–অতুলপ্রসাদও বিপর্যস্ত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়। ঘরে ফিরে হেমকুসুমকে তিলকের বন্দী হবার সংবাদ দিলেন। হেমকুসুম কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন। বিপিনচন্দ্র পাল ও শিবনাথ শাস্ত্রী সেদিনই অতুলপ্রসাদের বাড়িতে অতিথি। অতুলপ্রসাদ যথাযথভাবে হেমকুসুমের সহযোগিতায় বরেণ্যদ্বয়দের আপ্যায়ন করলেন–পরে অতুলপ্রসাদ আপন সত্তার ব্যাকুলতায় গেয়ে উঠলেন–কঠিন শাসন করো মা শাসিত।"[২৬]

অতুলপ্রসাদ সেনের এখানে সম্পূর্ণ আলোচ্য গানটি তুলে দেওয়া হলো,

"কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী,
ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী,
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙালিনী।"[২৭]

এ গানটির প্রতি তাই সবার গভীর আবেগ নিহিত। কবি এই গানটিতে মায়ের অযোগ্য সন্তানদের ধিক্কার জানিয়েছেন। তিনি কঠিন শাসনে শাসিত করতে বলেছেন। পরক্ষণেই তিনি এ মায়ের সন্তানদের জেগে উঠতে বলেছেন। পূর্বদিগন্তে যে সূর্যালোক পথ দেখাচ্ছে সে আলোতে ভারতবাসীকে

মুক্তির পথে আহ্বান করেছেন কবি। তিনি তাঁর প্রতিটি স্বদেশপর্বের গানের মতো এ গানেও অতীত গৌরবের স্বীকৃতিকে লাভ করে সম্মুখে এগুবার আহ্বান করেছেন। কবির ভাষায়,

"জাগো জাগো জাগো এবে।
হেরো পুরব-প্রান্তে ভানু-রেখা হে ভারতবাসী।
মঙ্গল-সংগীত শোনো বিহগ-কণ্ঠে।
পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি।"[২৮]

আলোচ্য গানটিতে সকল বিপদ-দুঃখকে নাশ করতে সকলকে একাত্ম হওয়ার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন কবি। নবীন উৎসাহে, নবীন আলোয় জাতি আজ দেশপ্রেমের চেতনায় উদ্বুদ্ধ। এই আগ্রহকে সম্বল করে মুক্তি অভিলাষী ভারতবাসীকে শঙ্কামুক্ত হয়ে অতীত গৌরব আর সম্মানের ভিত্তিতে ভারতমাতাকে কলঙ্কমুক্ত করতে হবে। ইংরেজ শাসনের অন্যায় অত্যাচারের বলিষ্ঠ প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে দেশমাতাকে মুক্ত করবার এখনই শ্রেষ্ঠ সময় বলে তিনি উদ্দীপনা দিয়েছেন। বাংলা সাহিত্যের বিস্ময়কর প্রতিভা রবীন্দ্রনাথের ভক্ত ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি ছোটবেলা থেকেই তাঁর গান মর্মে ধারণ করে বেড়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রালয়ে এক অদ্ভুত ছায়াশ্রয় ছিলো তাঁর। অতুলপ্রসাদের পরিবারেও রবীন্দ্রনাথের গান ছিলো প্রাণের শান্তির অপর নাম। যেবার গান্ধীজী অতুলপ্রসাদের বাড়িতে এসেছিলেন, একদিন সন্ধ্যাবেলা লক্ষ্ণৌর গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ গান্ধীজীর সাথে দেখা করতে এলে তাঁর স্ত্রী হেমকুসুম গান্ধীজীর উদ্দেশ্যে গেয়ে শোনান রবীন্দ্রনাথেরই গান–

"তোমারেই প্রাণের আশা কহিব!
সুখে-দুখে-শোকে আঁধারে-আলোকে
চরণে চাহিয়া রহিব।"[২৯]
(সুর : বাউল, গান নং-১৬)

অতুলপ্রসাদের সমগ্র সত্তা জুড়ে ছিলো রবীন্দ্রনাথের প্রভাব। সময়টি ১৯১৩, পরাধীন ভারতবর্ষের বাঙালি সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হলেন। চমকপ্রদ এ খবরে উল্লসিত, আত্মহারা বাংলার সকল সন্তান। ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাসে এ এক বিস্ময়কর ঘটনা। বাংলার সকল সাহিত্যপ্রেমী মানুষ পুলকিত, অত্যন্ত আনন্দিত এ খবরে। বাংলার পরম গর্বের এই দিনটিকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর ভাব-গুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য একটি গান রচনা করেছিলেন। গানটি তিনি প্রতিদিন, প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় গাইতেন। গাইতে গাইতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। রবীন্দ্রপ্রেমে নিমজ্জিত অতুলপ্রসাদ নিজেরই অজান্তে সেদিন রচনা করেছিলেন বাঙালি হৃদয়ে তাঁকে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় করে তুলবার সেই গান–যা তাঁর হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা দিয়ে তৈরি। বাংলা সাহিত্যের কবি, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের অঞ্জলিমাল্য এই গান সমগ্র বিশ্বের সকল বাঙালির অন্তরের গান হয়ে ওঠে,

"মোদের গরব, মোদের আশা,
আ মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে
কতই শান্তি ভালোবাসা।"[৩০]

আলোচ্য গান প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে চাই সুনীলময় ঘোষের মন্তব্য,

> "একটি ভাষা, মাতৃভাষাকে কেন্দ্র করে এমন গান, এমন হৃদয় উজাড় করা মমতার অঞ্জলি এর আগে কেউ শুনেছেন কিনা জানা নেই। অতুলপ্রসাদ প্রতিদিনের গুরু পূজা–মাতৃভাষার বন্দনা, নিজের মধ্যেই আত্মস্থ হয়ে গাইতেন–বেদমন্ত্রের, ঊষা বন্দনার মতই অনুরাগ ও ভক্তিসিক্ত আকুতিতে। প্রকাশ্যে এই গানের তেমন একটা প্রচলন ছিলো না। এ যে অতুলপ্রসাদের আপন-সত্তার উৎসারিত বীজমন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ শুনেছিলেন অতুলপ্রসাদ নোবেল পুরস্কারের গৌরবান্বিত মুহূর্তকে গানের মধ্যদিয়ে চিরকালের জন্য ধরে রেখেছেন–কিন্তু তখনও পর্যন্ত নিজে তা শোনেননি।"[৩১]

১৯২২ সালের কথা। বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এলেন লক্ষ্ণৌতে, আতিথিয়েতা গ্রহণ করলেন অতুলপ্রসাদের বাংলোয়। লক্ষ্ণৌতে কবি তাঁকে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য অভাবনীয় এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বাঙালিদের এহেন মিলনমেলায় মুগ্ধ, গৌরবান্বিত এবং অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং অতুলপ্রসাদকে একটি গান গাইতে অনুরোধ করলেন। সেদিন অতুলপ্রসাদ তন্ময়তার সাথে গাইলেন বাংলা ভাষার জন্য লেখা একমাত্র এই গানটি। ১৯২৩ সালে অতুলপ্রসাদের সাথে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাশীতে দেখা হয়েছিল। যে কবির জন্য অতুলপ্রসাদ এই গানটি রচনা করেছিলেন তাঁকে এই দশ বছরেও গানটি শোনাবার সুযোগ হয়নি তাঁর । এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক,

> "কাশীর এই সাহিত্য সম্মেলনে অতুলপ্রসাদ অতি সর্ন্তপণে নীরব দর্শকমাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি এড়াবার নয়–অন্তরালবর্তী নির্লিপ্ত অতুলপ্রসাদকে চিনতে ভুল করলেন না। তাই অধিবেশনে দিলীপকুমার রায়ের সুধা-ঝরা গান হবার পর রবীন্দ্রনাথ 'অমন আড়াল দিয়ে লুকিয়ে গেলে চলবে না' বলে অতুলপ্রসাদের দিকে অত্যন্ত মায়াভরা দৃষ্টিতে তাঁকে আহ্বান জানালেন। এ যে শুধু আহ্বান নয়–অন্তরভেদী হৃদয় উজাড় করা সমাদর। অতুলপ্রসাদ পদ্মাসনে বসে বাউল সুরে জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার যাঁর গৌরবে রচনা করে মুগ্ধ হয়ে গর্ব অনুভব করেছিলেন, সেই 'মোদের গরব, মোদের আশা আ মরি বাঙলা ভাষা!' গানটি পুরো গাইলেন। সাধা কণ্ঠের উদ্বেল চমকিত আসরে এ যে তুলসীতলে নিবেদিত প্রদীপ-শান্ত, স্নিগ্ধ।"[৩২]

আজ এত বছর পরেও বাংলা ভাষার জন্য রচিত এই গানের আবেগে এতটুকু ভাটা পড়েনি। বাংলা ভাষা নিয়ে গর্বের যেকোনো মুহূর্তে সকল বাঙালির অন্তরে এই গানের সুর হৃদয় কোণে গুন গুন করে বাজতে থাকে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে আজ অবধি এই গানের নিবেদনে কেবল রবীন্দ্রনাথ নয়, বাংলার সকল অতীত গৌরবময় ঐতিহ্যকে প্রণতি জানায়। 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' এই বাণীর মধ্যে যে শক্তি আছে তা নিশ্চয়ই ভাষা সৈনিকদের প্রাণিত করেছিল, উদ্বেলিত করেছিল। ভাষার জন্য রক্ত ঝরানো সেই ২১ ফেব্রুয়ারি যখন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বিশ্ব মর্যাদা পায় সেদিন রফিক, সালাম, শফিক, বরকত-এর সাথে স্মরণ করতে হয় অতুলপ্রসাদ সেনকেও। সমগ্র বাংলা জুড়ে এই একটি গান স্বদেশ চেতনার এক চিরবিস্ময়ের গান হয়ে তাঁকে বাঙালির হৃদয়ে চিরজীবী করে রাখবে। তাঁকে প্রণতি জানাই। স্বদেশপ্রেমী কবি ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন সব সময় ওকালতি কাজে ছুটে বেড়াতেন। তিনি স্বদেশের হিতার্থে বহুবিধ

সভাসমিতিতে যোগ দেবার জন্যও ছুটে বেড়াতেন। কিন্তু মনের নিভৃত কোণে অত্যন্ত আবেগী কবির মন থাকতো স্বদেশ, মা ও প্রাণপ্রিয়া স্ত্রীর জন্য পরিপূর্ণ। যদিও জীবন তাঁকে চিরসুখের সাংসারিক স্বস্তি দেয়নি। সে বিষয়টি আমাদের আলোচ্য নয় বলে এড়িয়ে যাচ্ছি। কিন্তু সকল কাজের ভিড়ে তিনি ডুবে থাকতেন আপন নিজস্ব একাকী সত্তায়। লক্ষ্ণৌয়ের ব্যস্ততম ব্যারিস্টার অতুলপ্রসাদ সেন ছিলেন সকল কাজের নিপুণ কারিগর। তাই তাঁকে ছেড়ে বাঙালি মহলে কোনো কাজই অগ্রসর হতো না। তিনি এই বহুবিধ কর্মযোগের মধ্যেই গান রচনা করতেন। এমন অনেক সময় হয়েছে গান রচনা করে যত্নে সংরক্ষণ করবার সময়টুকু তিনি পাননি। এমনি একটি স্বদেশপ্রেমের চেতনানির্ভর গান এবারের উদাহরণ,

"ভারত-ভানু কোথা লুকালে?
পুনঃউদিবে কবে পুরব-ভালে?
হা রে বিধাতা, সে দেবকান্তি
কালের গর্ভে কেন ডুবালে?"[৩৩]

স্বদেশ মাতৃকার সন্তানদের নৈরাশ্যের হাহাকারে জীর্ণ এক খেদভরা গামালা এই গানটি। বিখ্যাত অনন্য সুন্দর এই গানটিও কবি কর্মব্যস্ততায় সংরক্ষণ করতে ভুলে গিয়েছিলেন। এই গানটি কাজের মুহূর্তে লেখার ফলে ওকালতির কাগজপত্রের মধ্যেই রয়ে গিয়েছিল। এমনই এক সাহিত্য আসরে নানা আলোচনার মধ্যে ধূর্জটিপ্রসাদ ওকালতির ডাইরি নাড়াচাড়া করতে থাকলে গান লেখা কাগজের টুকরাটি বেরিয়ে আসে। হঠাৎ গানটি পেয়ে ধূর্জটিপ্রসাদ খুব খুশি হয়ে যান। আত্মহারা হয়ে নিজেই পড়লেন কয়েক লাইন। তারপর গানের মালিক অতুলপ্রসাদের হাতে গানটি তুলে দিলে চোখ বন্ধ করে নিজেই উদাত্ত কণ্ঠে গানটি গাইতে থাকলেন তিনি। সে এক অতি মনোরম দৃশ্য। উপস্থিত সকলে স্বদেশের এমন বন্দনায় মুগ্ধচিত্তে আনন্দে বিমোহিত হয়ে অতুলপ্রসাদের দরদ ভরা কণ্ঠের আকুতি শুনতে লাগলেন।

এ গানটিতে কবি সুজলা-সুফলা মায়ের রূপ-ঐতিহ্যের বন্দনা করেছেন, আবার শঙ্কা প্রকাশও করেছেন মায়ের এ অপরূপ সৌন্দর্য ও ঐশ্বর্যের সংরক্ষণের রক্ষক নেই বলে। দেশ আজ রাঘব-পাণ্ডবে পূর্ণ এবং ভক্তিশূন্য। দেশের বাহ্যিক সকলকিছু তেমনি আছে কিন্তু অন্তঃসারশূন্য। নেই বিদুষী-বিদ্বান, নেই ত্যাগী ও প্রেমী কর্মী। সর্বত্র কেবল আত্মস্বার্থ সিদ্ধির কোলাহল আর অধর্মের কোন্দল। কবি এ গানের মধ্যে অতীতের গৌরবান্বিত জাতিকে স্মরণ করেছেন। কারণ একটি দেশের মুক্তিকামী মানুষকে একটি সত্য সুন্দরের পথে ধাবিত করতে, একটি লক্ষ্যে স্থির হতে প্রয়োজন সুযোগ্য পথ প্রদর্শকের। অনিন্দ সুন্দর স্বদেশপ্রেমের এই গানটিতে তাঁর এই শঙ্কাই প্রকাশ পেয়েছে। তাই তিনি ভারত ভানুর জেগে উঠবার বাসনায় দিন গুনেছেন শঙ্কার অন্তরাল থেকে।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিলের কারণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে বহু দেশনেতাকে কারাবরণ করতে হয়েছিল এবং রয়েছে আত্মত্যাগের বহু উদাহরণ। দেশে তখন একাত্মতার উত্তেজনার ছবি সর্বত্র বিরাজমান। অতুলপ্রসাদও উত্তেজিত ও ব্যথিত ছিলেন। ক্ষুধিরাম, যতিন দাস, বারীণ-

উল্লাসকর, অরবিন্দ প্রমুখ স্বদেশপ্রেমী বাঙালি তরুণদের অবর্ণনীয় যন্ত্রণায় ব্যথিত কবি রচনা করলেন আত্মজাগরণের গান। কবির ভাষায়,

"খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় ব'সে।
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে।
সোনার শিকল দে রে খুলি,
দুয়ারখানি দে রে তুলি।"[৩৪]

তরুণদের উদ্বুদ্ধকরণে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে এ গানের গুরুত্ব ছিলো অসীম। রচনার কয়েক দিনের মধ্যেই কারাগারে বন্দি দেশসন্তানদের সকলের মুখে মুখে এ গান অনুরণিত হতে থাকে। দেশ সেবার জন্য তারা জীবন বাজি রেখেছিলেন। তাই এই গান তাদের কারাগার আর অত্যাচারের ভয় থেকেও মুক্তি দিয়েছিল। এক আত্মশক্তির আহ্বানে তাই বিপ্লবীদের অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠল অতুলপ্রসাদের গান।

এ গান রচনার বহু বছর পর এক সন্ধ্যায় যতীন বসু এবং বিরাজগুপ্ত অতুলপ্রসাদের বাসভবন হেমন্ত নিবাসে এসেছিলেন। উভয়েই ভারতের টগবগে রাজনৈতিক নেতা এবং অতুলপ্রসাদের বাড়িতে বসেও রাজনীতির নানা দিক নিয়ে আলোচনা করছিলেন। ইংরেজদের দমননীতির অত্যাচার থেকে দেশবাসীকে মুক্ত করবার নেতৃত্বমূলক ভাবনা নিয়ে কথোপকথন চলছিল। এমন এক মুহূর্তে অতুলপ্রসাদ নিজে সমবিষয়ে রচিত বহু বছর আগে লেখা এই গানটির কথা উল্লেখ করলেন এবং নিজেই উদাত্ত কণ্ঠে গাইলেন।

অতুলপ্রসাদ সেনও রবীন্দ্রনাথের মতো বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজদের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনের পূর্বে আমাদের নিজেদের ভিতরকার রেষারেষি থেকে নিজেদের মুক্ত করতে হবে। হিন্দু-মুসলমান প্রত্যেকে প্রত্যেকের পাশে একমত ও মর্যাদায় না দাঁড়াতে পারলে কোনো আন্দোলনই যথার্থ রূপ পাবে না।

যেখানে হিন্দুতে হিন্দুতে দ্বন্দ্ব বর্ণ-বৈষম্য ও পূজা রীতি-নীতি নিয়ে, সেখানে দেশমাতাকে মুক্ত করতে অসহযোগ আন্দোলন বেমানান ঠেকে। অতুলপ্রসাদ সেন গান্ধীজীকে খুবই শ্রদ্ধা করতেন, তবুও অসহযোগ আন্দোলনকে মনে মনে মানতে পারছিলেন না। তাই লিখেছিলেন,

"পরের শিকল ভাঙিস পরে,
নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।
আপন কারায় বন্ধ তোরা,
পরের কারায় বন্দী তাই।"[৩৫]

এই গানটির মধ্যদিয়ে কবি বাঙালির অভ্যন্তরীণ মূর্খতা আর অজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন। কারণ বড় নির্বোধ যে আপন পর নির্ধারণ করতে পারে না। স্বভূমির প্রতিটি জন স্বজাতি তা সে হোক হিন্দু বা মুসলমান। কবি পরের দেওয়া শিকলের থেকে অন্ধতা অজ্ঞতার নিগড়কে বেশি শক্তিশালী মনে করেছেন। বাঙালি চোখ বন্ধ করে পাশের পরম বন্ধুকে শত্রু মনে করে। জাত-পাতের বড়াই করে শক্তি হানি করে। যেখানে হিন্দু-মুসলমান-শিক-বৌদ্ধ সকল সন্তানকে এখন মায়ের সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন

সেখানে জাতে জাতে দ্বন্দ্ব করে নিজেরাই নিজেদের দুর্বল করবার যুদ্ধে মত্ত বাঙালি। তাই স্বাধীনতার সূর্য বহুদূরে। কবি এ সকল প্রতিযোগিতা থেকে নিজেদের মুক্ত করে ভাইয়ে ভাইয়ে এক হতে বলেছেন। মনের সকল কুসংস্কার আর অন্ধ আচার থেকে বেরিয়ে আসতে আহ্বান করেছেন। ইংরেজের শক্তিকে দুর্বল করতে মহাশক্তির প্রয়োজন। সকল বাঙালির আত্মিক সমন্বয় ও মানবিক ঐক্যই পারে মহাশক্তির নিদের্শনা দিতে। তাই কবি তাঁর স্বদেশপর্বের সকল গানেই ভাইয়ের পাশে ভাইয়ের অবস্থানের গুরুত্বারোপ করেছেন। অর্থাৎ তিনি হিন্দু-মুসলমানের দ্বন্দ্বকে ঘুচাতে বলেছেন। আসন্ন নতুন বছরের কাছেও কবির একই প্রার্থনা। তিনি প্রেমের শাসন প্রত্যাশা করেন, কামনা করেন তুচ্ছের সুউচ্চ আসন, তবেই ভেদাভেদ ভুলে জননীর কল্যাণে সকলে এক হবে। কবির ভাষায়,

“নূতন বরষ নূতন বরষ,
তব অঞ্চলে ও কী ঢাকা?
মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা,
তাই কি গোপনে রাখা ?”[৩৬]

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনপর্বে অতুলপ্রসাদ সেন

মহাপূর্ণ মিছিল সেদিন কলকাতার পথে। সমগ্র বাংলার অভিজাত, উচ্চশিক্ষিত, মধ্যবিত্ত আর বুদ্ধিজীবীরা সেদিন প্রতিবাদে মুখর। সময়টি ১৯০৫, বঙ্গব্যবচ্ছেদ কাল। বহুবিধ বাকবিতণ্ডার বেড়াজাল তোয়াক্কা না করে ইংরেজ সরকার অবিভক্ত বাংলায় বিরাজমান হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যে ছেদ আনবার লক্ষ্যে বঙ্গভঙ্গ ঘোষণা দেয়। সাদা চোখেই এই চক্রান্ত বাঙালি বুঝতে পারে বলে বাংলার ঐক্যশক্তিকে দুর্বল করবার এই দুষ্ট অভিপ্রায়কে কেউ সমর্থন করতে পারলো না। বরং সর্বত্র প্রতিবাদের ঝড় উঠলো। বিশেষ করে মুসলমানদের জন্য আলাদা ভু-খণ্ডের প্রলোভন সম্প্রদায়ভিত্তিক দাঙ্গার উদ্দেশ্যেই মূলত এই বঙ্গচ্ছেদের ঘোষণা দেয় ইংরেজ সরকার।

কিন্তু তাদের চক্রান্ত আশীর্বাদে পরিণত হলো। এর পূর্বে কখনো বাঙালি এভাবে সমস্বরে কণ্ঠ মেলায়নি। বাংলাদেশ যেন তার সকল সন্তানকে এক বাহুতে আগলে রাখতে জেগে উঠল। এত বাধা ও আন্দোলনের পরেও বঙ্গচ্ছেদ অবশেষে হলোই।

১৯০৫ সালে অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্মৌর অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তিনি সকল কাজের সম্মুখ ভাগে থাকেন। তিনি দুঃখী মানুষের ত্রাণকর্তা ও অনুরাগী বন্ধু। বিপদে-আপদে লক্ষ্মৌবাসীর একান্তের স্বজন তিনি। বঙ্গভঙ্গের ঘটনায় তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠল। ১৯০৫ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় বেনারসে। তাঁর বাসভবন তখন গণ্যমান্য শীর্ষস্থানীয় নেতাকর্মীতে ভরপুর।

গোবরনাথ মিশ্র, মমতাজ হোসেন, গঙ্গাপ্রসাদ ভার্মা, বিশ্বেশ্বরনাথ শ্রীবাস্তবসহ এমনি অনেকে। বঙ্গভঙ্গের আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই মূলত ১৯০৫ সালে তিনি ভারতীয় কংগ্রেসের রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন। কারণ কংগ্রেসের অভ্যর্থনা সমিতির জন্য লক্ষ্মৌ থেকে আগত যেসকল নেতা নির্বাচিত হয়েছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। শুধু তাই নয়, যোগ্য ব্যক্তিত্বের কারণে তাঁকে সমিতির পরিচালনার দায়িত্বভারও দেওয়া হয়েছিল।

ইতোমধ্যে বাংলা দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। সমগ্র বঙ্গভূমি এক শোকাতুর ভূখণ্ডে পরিণত হলো। অতুলপ্রসাদ সেনও সেই আঘাতে বেদনার্ত, বিক্ষিপ্ত। তিনি বাঙালির এই দুর্দিনে চুপ করে বসে থাকতে পারলেন না। তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন গণআন্দোলনে। তিনি মানুষকে সচেতন করবার প্রয়াসে দূর-দূরান্তে ছুটে চললেন। এই ষড়যন্ত্র থেকে বাঙালিকে মুক্ত করতেই হবে নতুবা সব শেষ হয়ে যাবে। সেই প্রত্যাশা নিয়ে তিনি সরাসরি আন্দোলনে যোগ দিতে লক্ষ্মৌ থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে ছুটে চললেন। দিনটি ১৬ অক্টোবর ১৯০৫। হাওড়া স্টেশন থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা করতেই কানে এলো তার চিরচেনা একটি সুর। থমকে দাঁড়িয়ে তিনি শুনলেন সমবেত কণ্ঠে নিজের সৃষ্টি,

"দেখ মা, এবার দুয়ার খুলে
গলে গলে এনু মা তোর
হিন্দু-মুসলমান দুই ছেলে।"[৩৭]

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী এই আন্দোলনরত জনস্রোতে নিজের গান হঠাৎ শুনে স্তম্ভিত হলেন অতুলপ্রসাদ। সেই অভিজ্ঞতাটি তাঁর বক্তব্যে তুলে ধরা হলো,

> "তখন স্বদেশী আন্দোলন খুব চলিতেছে, আমি কলিকাতায় যাইব বলিয়া রওনা হইয়া হাওড়া স্টেশনে নামিয়া দেখি অনেক ছেলে মিলিয়া আমার একখানি স্বদেশী গান সমবেত কণ্ঠে গাহিতে গাহিতে চলিছে। আমি অল্পক্ষণ দাঁড়িয়ে শুনিলাম এবং ভাবিলাম আমার গান এতো সমাদৃত হইয়াছে! তখন কাছে একটি ছেলেকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম : 'এ গানটি কার ভাই, তোমরা যা গাইছ!' ছেলেটি আশ্চর্য হইয়া বলিল, 'কেন, এ তো অতুলপ্রসাদ সেনের গান!' আমি আর কি বলিব, একটু হেসে নিজ গন্তব্যস্থানে চলিয়া গেলাম।"[৩৮]

পুলকিত মনে গৌরব অনুভবে অতুলপ্রসাদ সেন সেই গানের সাথে গঙ্গার ধারে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে দেশপ্রেমিক শত শত লোক গান গাইতে গাইতে গঙ্গাস্নান করতে যাচ্ছেন। নিজেদের বঙ্গভঙ্গের পাপ থেকে, অভিশাপ থেকে মুক্ত করতে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং গঙ্গা স্নান শেষ করে খালি পায়ে মাথা নিচু করে শোভাযাত্রার সম্মুখপ্রান্তে ছুটে চলেছেন। তারই উদ্দেশ্যে সমগ্র বাংলায় অরন্ধন ঘোষিত হয়েছে এবং ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলকেই রাখি পরিয়ে কলঙ্কমুক্ত হতে ব্রত সকলে। এ এক অভাবনীয় দৃশ্য! সকলের কানে রবীন্দ্রনাথের রাখী বন্ধনের গান,

"বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হোক।"[৩৯]
(সুর : বাউল, স্বদেশ-২০)

মহাপুণ্য এই মিছিলে সকলের মুখে মাতৃবন্দনার গান 'যদি ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চল রে'। এমন দৃশ্যে অতুলপ্রসাদ আত্মপ্রণত হলেন দেশপ্রেমী সকলের চরণে।

মহামতি গোখলের সভাপতিত্বে বেনারসে কংগ্রেসের অধিবেশনের আলোচ্য বিষয় 'বঙ্গভঙ্গ'। সারাদেশে বিরাজমান এই বঙ্গভঙ্গ বিরোধী পরিস্থিতি সত্ত্বেও সভায় কোনো 'বঙ্গভঙ্গ' বিষয়ে কোনো প্রতিরোধ আন্দোলনের কর্মসূচি গোখলে কর্তৃক ঘোষিত না হলে অতুলপ্রসাদ অত্যন্ত দুঃখিত ও লজ্জিত হলেন। কংগ্রেসের নব্য সদস্য হিসেবে অতুলপ্রসাদ নিরুপায় কিন্তু ক্রোধে যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। কিন্তু

বঙ্গভঙ্গ বিষয়ে এমন নিরুত্তাপ অধিবেশনকে মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিবাদস্বরূপ অধিবেশন চলাকালে বেদনাসিক্ত হৃদয়ে গাইলেন,

"আপন কাজে অচল হলে
চলবে না চলবে না।
অলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন
টলবে না রে টলবে না ॥"[৪০]

অধিবেশনে উপস্থিত সকলের টনক নড়লো অতুলপ্রসাদের এই গানে। বঙ্গভঙ্গের প্রতিরোধ পন্থার জন্য কৃতকর্মের সংশোধনের উপায় খুঁজতে লাগলেন। কর্মসূচি গ্রহণ করতেই হবে প্রত্যয়ে সকলেই সম্মত হলেন। গোখলে স্বয়ং অতুলপ্রসাদকে আশ্বাস দিলেন এবং উদার কণ্ঠে ঘোষণা দিলেন,

> ...The tremendous upheaval of popular feeling which has taken place in Bengal in consequance of the partition will constitute a landmark in the history of our national progress. For the first time since British rule began all sections of the community, without distinction of caste or creed, have been moved by a common inpulse and without the stimulous of external pressure to act together in offering resistance to a common wrong.[৪১]

বিবিধ পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

অন্যান্য গীতিকবিদের সামগ্রিক রচনার সাথে স্বদেশ পর্বের গানের সংখ্যার তুলনা করলে অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশের গান সবচেয়ে বেশি বলে গণ্য হবে। তাঁর ২০৬টি গানের মধ্যে ১৩টি গান সরাসরি স্বদেশ এবং বিবিধ পর্বের অনেক গানেও স্বদেশবোধটি বারংবার প্রকাশিত হতে দেখা যায়। সত্য বলতে ছোটবেলা থেকে জীবনের শেষকাল অবধি তিনি সর্বতোভাবে সাধারণ মানুষের দুঃখ-কষ্টের সহায় হয়ে থেকেছেন। তাই বৃহত্তর অর্থে তিনি সারাজীবন নিরবচ্ছিন্নভাবে স্বদেশ সেবা করে গিয়েছেন। বঙ্গভঙ্গ সময়কে কেন্দ্র করে তাঁর স্বদেশ পর্বের উল্লেখযোগ্য গান নেই সত্য, কিন্তু সমগ্রজীবন জুড়ে স্বদেশের জন্য নিবেদিত এমন কবির সংখ্যাও বিরল। সাহিত্যের জগতে তিনি মূলত সংগীত রচয়িতা এবং গায়ক। যে কয়টি কবিতা লিখেছেন সেগুলোর মধ্যে স্বদেশ মাতার প্রতি রয়েছে প্রণতিভরা নিবেদন। তাঁর 'প্রত্যাবর্তন' কবিতার অংশবিশেষ,

"খোল মা খোল মা দ্বার বহুদিন পরে
আজি ও তামসরাতে উল্কার আলোকে
পথ চিনি পুরাতন মাতৃগৃহে পুনঃ
ফিরিয়া এসেছি; মোরা কোটি পুত্র তোর,
নহি মা অতিথি; স্নেহে ডেকে নে গো ঘরে।"[৪২]

এই কবিতাটির মধ্যে কবি আপন স্বার্থ ত্যাগী সকলকে মিলে জননীর আরাধনা করতে আহ্বান করেছেন। কোটি হাত যখন এক হবে তখন এ মায়ের ঘরে আর কোনো ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকবে না। এমনি

স্বদেশপ্রেমমূলক বাণী উপলব্ধি করা যায় তাঁর বিবিধ পর্বের কতিপয় গানে। আলোচনার এ পর্বে তাই নিরূপণের প্রত্যয় রাখছি,

"প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল!
যখন ছিলি এতটুকু,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক;
সেথাই পেলি সাথির সনে বাল্যখেলার সুখ।"[৪৩]

বিবিধ পর্বের এই গানটিতে কবি বাংলার প্রকৃতির রূপের বর্ণনা করেছেন। অতুলপ্রসাদ সেনকে একটি নতুন পত্রিকার জন্য কবিতা বা গান লিখে দিতে অনুরোধ করলে কবি স্বদেশের প্রকৃতির অপরূপ রূপের বর্ণনা তর্জমা করেন এই গানটির মাধ্যমে। তিনি অন্তরে আঁকা স্বদেশের ছবির মাধ্যমে নিজের চোখের তৃষ্ণাকেই নিবারণ করতে চেয়েছেন। পদ্মা নদীর ধার, খেলার মাঠ, পাখির গান, মায়ের ভালোবাসা, ছেলেদের সাথে প্রাণখোলা খেলা, কত ফুল, পাখি, বাতাস, সব কবির মনে পড়ে যায়। তিনি পঁয়ত্রিশ বছর আগে ফেলে আসা গ্রামটিকে খুব ভালোবাসতেন। এ গানটি লিখতে লিখতে কবির আবার মনে পড়ে যায় গ্রাম বাংলার প্রকৃতির কথা। তিনি এই গানটিতে নিজের ছেলেবেলায় দেখা সেই প্রকৃতির কথাই তুলে ধরেছেন,

> "সেদিন আমার দেশের কয়েকটি ভাই আমাকে তাদের নবজাত পত্রিকার জন্য একটি কবিতা বা গান লিখে পাঠাতে বিশেষ করে অনুরোধ করেছিল। তখন আমার দেশের গ্রামখানির কথা মনে পড়ে গেল। সেই পদ্মা নদীর ধার, সেই খোলা মাঠ, খোলা প্রাণ, পাখির গান, বকুল ফুল, হরির লুটের বাতাসা, মায়েদের ভালবাসা, ছেলেদের সঙ্গে খেলা, খুব মনে পড়ে গেল। আমার সেই মিষ্টি দেশটি আমার চোখের সামনে, আমার প্রাণের সামনে ভাসতে লাগল, ভাল করে মনে হল আমি ভুলিনি, ভুলিনি আমার দেশমাতাকে...যদিও প্রায় পঁয়ত্রিশ বৎসর সে গ্রামখানিতে যাইনি। দূর দেশে থাকলে কি হবে, মা'র টান বড় টান।"[৪৪]

অপূর্ব আরেকটি বিবিধ পর্বের গানে বঙ্গজননীর জয়মালা গেঁথেছেন কবি। মায়ের সপ্তকোটি সন্তান বঙ্গমাতাকেই স্বর্গ মানেন। তাই প্রাণের বিনিময়েও মায়ের চরণে অর্ঘ্য দিতে প্রস্তুত। কবির ভাষায়,

"জননী বঙ্গ, তোমার সঙ্গ লভিয়া যদি গো
অঙ্গ আমার হয় না মা, ক্ষয়;
তথাপি রঙ্গে ভ্রূকুটি-ভঙ্গে তুচ্ছ করিয়া
গাহিব জননী, তোমারি জয়।"[৪৫]

স্বদেশমাতার রূপের বর্ণনা পাই তাঁর আরো একটি বিবিধ পর্যায়ের গানে। তিনি প্রকৃতির বর্ণনা করতে করতে এই প্রকৃতির নিষ্ঠুর দানে নিঃস্ব মানুষের জন্য ভিক্ষা প্রার্থনা করেছেন। মায়ের সন্তানেরা অনাহারে থাকলে সে রূপের কী মূল্য! অতুলপ্রসাদ চিরকাল দুঃখীর পাশে, আর্তের সেবায় নিজেকে সঁপে দিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর একার সেবায় মায়ের শত শত সন্তানের ক্ষুধা নিবারণ সম্ভব ছিলো না। তাই কবি গোমতীর বন্যায় বিধ্বস্ত গরিব পল্লীবাসীদের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করেছেন। কবির ভাষায়,'মা, তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়,/তোর মেঘে-ঢাকা পাখি-ডাকা শ্যামল শাখায়।'[৪৬]

গোমতীর বন্যায় দুর্দিনে বন্যার্তদের সহায়তার উদ্দেশ্যেই লেখা হয়েছিল নিচের গানটি,

"ওহে পুরজন, দাও কিছু ধন
প্লাবনপীড়িত জনে,
তব দেশবাসী করে হাহাকার
অন্ন-গেহ-বিহনে।"[৪৭]

এই গানটি সম্পর্কে সুনীলময় ঘোষের উক্তি তুলে ধরা হলো,

> "১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌতে গোমতীর বন্যায় বিধ্বস্ত গরিবদের পল্লী। অতুলপ্রসাদ গরিবদের অর্থ দিয়ে, স্কুল-মন্দিরে বা অন্য কোন জনসাধারণের আবাসস্থলে তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দুর্দিনেই গানটি লেখা।
> অতুলপ্রসাদ নিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গানটি গেয়ে (কীর্তনের সুরে) অর্থ সংগ্রহ করেছেন। এই গানটির একটি অংশ (শিল্পী ও চাষী) কলকাতার 'নবপত্রিকা' মাসিক পত্রিকার আশ্বিন সংখ্যায় (১৩৬৪) প্রকাশিত হয়।"[৪৮]

"মিলন-সভা মাতাও আনন্দগানে
বাঁধো আজি প্রেমডোর প্রাণে প্রাণে।"[৪৯]
(রাগ : তিলক-কমোদ, পর্যায়-বিবিধ, গান নং-১৫৭)

বিবিধ পর্যায়ের এই গানটির মধ্যেও স্বদেশের তরে সকলের কাছে মিলনের আহ্বান জানিয়েছেন কবি। অতুলপ্রসাদ সকলকে প্রেমডোরে বাঁধতে চেয়েছেন। যুবকজনের এই সম্মিলন দেশের কাজে দশের কাজে যেন পরিপূর্ণ সুবাতাস বয়ে আনে কবি এটি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন। তিনি যেমনি ছিলেন মানব ও দেশের জন্য নিবেদিত প্রেমে ভরা প্রাণ, তেমনি আকুলতা ছিলো তাঁর ঈশ্বরের প্রতি। একা নিবিষ্টচিত্তে তিনি ঈশ্বরের দ্বারে নিজেকে উন্মোচন করতেন যেমনি আমরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পাই তাঁর ব্রহ্ম উপাসনায়। ব্রহ্মের মধ্যদিয়ে তিনি সমগ্র বিশ্বকে অবলোকন করতেন। তাই রবীন্দ্রনাথের সকল ক্ষেত্রে নিজেকে আত্মনিবেদনে প্রস্তুত থাকতেন অতুলপ্রসাদ। যখনই রবীন্দ্রনাথের ডাক আসতো কি শান্তি নিকেতন, কি ঠাকুরবাড়ী তিনি ছুটে যেতেন শত ব্যবস্ততার মাঝেও।

প্রকৃতিপ্রেমী রবীন্দ্রনাথ অভ্যস্ততার অভাবে মানুষের সাথে সহসা কোলাকুলি, গলাগলি, মাখামাখি করতে পারতেন না। কিন্তু প্রকৃতির মতো তিনি মানুষকেও বড় বেশি ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন অতুলপ্রসাদ সেনকে। অতুলপ্রসাদ সেনও মানুষের ভালোবাসার কাঙাল রবীন্দ্রনাথকে হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। এত বিশাল রবীন্দ্রনাথ অথচ তাঁর অন্তরের নিভৃতবাণী তিনি অতুলপ্রসাদ সেনকে প্রকাশ করতেন। বঙ্গভঙ্গকালে রাজনীতির স্বার্থপরতা, রেষারেষি, নেতৃত্বের দলাদলিতে আহত হয়ে রবীন্দ্রনাথ সরাসরি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান। সরে দাঁড়ান অতুলপ্রসাদ সেনও। প্রচ্ছন্নভাবে যেন অতুলপ্রসাদ তাঁর ভাবগুরুর পথই অনুসরণ করে চলছিলেন। জীবনের সকল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি, অভিমান-বঞ্চনাকে অর্ঘ্য করে রবীন্দ্রনাথে সমর্পণ করে তাঁর আরাধ্যের পূজা সাঙ্গ করলেন। অতুলপ্রসাদ সেন রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহশীল দরদী মনটাকে দেখতে পেরেছিলেন–যা দূরে থাকা অনেকের পক্ষে কল্পনা

করাও কঠিন ছিলো। দিলীপ রায়কে এ কথাগুলো বলতে বলতেই একদিন তিনি গেয়ে উঠলেন বঙ্গমাতার দুলাল রবির অমর জয়গাঁথা,

"জয়তু জয়তু জয়তু কবি,
জয়তু পুরব-উজল রবি।
জয় জগতবিজয়ী কবি,
জয় ভারতগৌরব রবি,
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি'–
জয় হে কবি।"[৫০]

এই গানটি রচিত হয়েছিল লক্ষ্ণৌতে রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। নবাব আলীর বাসভবনে উপস্থিত সকল গণ্যমান্যের দ্বারা রবীন্দ্রনাথকে স্বাগতকালে একটি বাঙালি মেয়ে অতুলপ্রসাদ সেন রচিত এই গানটি পরিবেশন করেছিল। রবীন্দ্র সংবর্ধনাকে কেন্দ্র করে পাহাড়ী সান্যাল অতুলপ্রসাদ রচিত আরো একটি গান পরিবেশন করেছিলেন বালক-বালিকাদের সাথে নিয়ে, যখন রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্ণৌতে অতুলপ্রসাদের বাড়ির সামনে গাড়ি থেকে নামলেন। এ এক মন্ত্রমুগ্ধকর দৃশ্য। কবি বরণে বিগলিত সকল প্রাণ, 'এসো হে এসো হে ভারতভূষণ, মোদের প্রবাসভবনে।/আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ পুজিতে বঙ্গরতনে।'[৫১] প্রবাস জীবনে তাঁর লেখা আরো একটি অনন্য সংগীত যেখানে বঙ্গভারতীকে প্রবাসীদের প্রণতি নিবেদন করেছেন কবি, 'এসো প্রবাসমন্দিরে, এসো গো বঙ্গভারতী।/দীন প্রবাসী বঙ্গজনের লহো গো দীন আরতি।'[৫২] জানা যায়, লক্ষ্ণৌতে অনুষ্ঠিত 'প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন'-এর তৃতীয় অধিবেশনের প্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে এই স্বাগত সংগীতটি রচনা করেন অতুলপ্রসাদ সেন।
বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন চলাকালে কংগ্রেসের অধিবেশনে কবি গেয়ে শুনিয়েছিলেন আরো একটি বিচিত্র পর্যায়ের গান যেখানে মূলত দেশের কাজকে আপন কাজ বলে ব্যক্ত করেছেন তিনি। আলোচনায় পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, মহামতি গোখলের সভাপতিত্বে বেনারসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনের মূল প্রতিপাদ্য 'বঙ্গভঙ্গ' হওয়া স্বত্ত্বেও বঙ্গভঙ্গ প্রতিরোধ আন্দোলনের জন্য, এর প্রতিবাদের জন্য কোনো কার্যকরি সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়ায় নিরুপায় নব্য সদস্য অতুলপ্রসাদ সেন গানের মধ্যদিয়ে কংগ্রেসের এই কর্মসূচির প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন, 'আপন কাজে অচল হলে/চলবে নারে চলবে না।'[৫৩] দেশের প্রতি কবির এই সরল ভালোবাসাকে অত্যন্ত সম্মান দেখিয়েছিলেন গোখলে। সহজ সরল অবয়বে এক শান্তিময় অভিব্যক্তির মানুষ ছিলেন অতুলপ্রসাদ সেন। তিনি সমগ্র সময় জুড়ে সরল সমীকরণের মধ্যদিয়ে তাঁর জীবনটি অতিবাহিত করেছিলেন। কোনো অভিযোগে কাউকে কখনো অভিযুক্ত করেননি তিনি। একা সয়েছেন জীবনে কোলাহলশূন্য যন্ত্রণার ভার, আর তা ব্যক্ত করেছেন তাঁর গানের সুরের ভাজে ভাজে। তাঁর গান সম্পর্কে কনক দাশের মূল্যায়ন স্মরণযোগ্য,

> "অতুলপ্রসাদের গান তাই স্বমহিম। তাঁর গানের অলংকার সারল্যময়, অথচ মাধুর্যময় প্রকাশ, আঙ্গিক ও সুর। এর সঙ্গে মিশ্রণ ঘটেছে ভাবের গভীরতা। ওই গভীর ভাব তাঁর গানের মধ্যদিয়ে হৃদয়ের সবচেয়ে শাশ্বত দুঃখকে আমাদের কাছে বারবার ফিরিয়ে দেয়। অতুলপ্রসাদের সুর পরিমণ্ডলে মিলিত সেই দুঃখ, সেই কারুণ্য আঘাত করে ফেরে প্রণয়াস্পদের সন্ধানে কোনও একাকী মানুষে। তাই তাঁর গান দুঃখ-কারুণ্য-বিষাদের পর জাগতিক সবকিছুর ওপরে পরম প্রেমের রাজত্বে অবাধ বিচরণ।"[৫৪]

বাংলাগানের অনবদ্য গীতরূপ স্রষ্টার মধ্যে অন্যতম শিল্পচাষী অতুলপ্রসাদ সেন'র গানে যে স্বদেশচেতনায় যে উপদান লক্ষ্য করা যায় তা বিষয়-বৈচিত্র্যতার দিক থেকে রবীন্দ্রবলয়ে আবদ্ধ থাকলেও স্বমহীমায় ভাস্বর। বিভিন্ন আন্দোলন ও সভায় কবিগুরু সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত থাকার ফলে স্বদেশি আন্দোলকে তিনি সরাসরি প্রত্যক্ষ করেছেন। আর তাই তার গানে অভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যে স্বদেশচেতনার রূপ বির্নিমিত হয়েছে তা সমকালীন সময়ে প্রাসঙ্গিকতার দাবিদার। বিখ্যাত 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বলাবহুল্য তাঁর অল্পসংখ্যক গানে এ স্বদেশ চেতনার আভাষ পাওয়া গেলেও ব্যক্তিজীবন ও দর্শনে যে স্বাধীন হওয়ার আকাঙ্ক্ষায় মগ্ন ছিলেন তা তাঁর জীবনের বিচিত্র ঘটনা থেকে দৃশ্যমান।

তথ্যসূত্র

১.	নারায়ণ চৌধুরী, *সংগীতবিচিত্রা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ. ৩৭
২.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৩.	সুনীলময় ঘোষ, *অতুলন অতুলপ্রসাদ*, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫, পৃ. ২৯
৪.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৮
৫.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
৬.	বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সেন*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্‌স, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ৫১
৭.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৯ ।
৮.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২
৯.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
১০.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭-৭৮
১১.	অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ*, পাতাবাহার, কলকাতা, ১৪২০, পৃ. ৮৪-৮৫
১২.	বিশ্বজিৎ ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২
১৩.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪৪
১৪.	স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ১৪০
১৫.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৬.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭১
১৭.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪০
১৮.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
১৯.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯৮
২০.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭২-৭৩
২১.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৭
২২.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
২৩.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯
২৪.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৫
২৫.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮
২৬.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬
২৭.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
২৮.	পুর্বোক্ত, পৃ. ৮০
২৯.	গীতবিতান, *বিশ্বভারতী*, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৮৩৩
৩০.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮০
৩১.	সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৯
৩২.	পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০
৩৩.	অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮২
৩৪.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩৫.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫
৩৬.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩
৩৭.	পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬-৭৭
৩৮.	মানসী মুখোপাধ্যায়, *অতুলপ্রসাদ সেন*, অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ. ৪৯
৩৯.	গীতবিতান, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫৫

৪০. অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৪১. সুনীলময় ঘোষ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮১
৪৩. অতুলপ্রসাদ সেন, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৩
৪৪. সুনীলময় ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সমগ্র*, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ১৫০
৪৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৬
৪৬. অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৫
৪৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৬
৪৮. সুনীলময় ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সমগ্র*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩১
৪৯. অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪৪
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪২-১৪৩
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪১-১৪২
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪০
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৫৪. কনক দাশ, “অতুলপ্রসাদের গান”, দেশ, বিনোদন সংখ্যা-১৩৯১, কলকাতা, পৃ. ৬০। (উদ্ধৃত : *অতুলপ্রসাদ সেন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৮।)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কাজী নজরুল ইসলামের গানে স্বদেশচেতনা

(১৮৯৯-১৯৭৬)

নজরুলের স্বদেশভাবনা

কবি নজরুলকে আমরা পাই মূলত বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগে। এক ব্যতিক্রমী উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো তিনি জ্বলে উঠেছিলেন সকলকে অবাক করে দিয়ে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, যে মানুষটি ছোটবেলায় মাজারের খাদেম ও মসজিদে ইমামতির কাজ করতেন তিনিই আবার শ্যামা মায়ের জন্য রচনা করেন হিন্দু সম্প্রদায়ের শ্যামাসংগীত। একদিকে ইসলামী গান, অন্যদিকে শ্যামাসংগীত–এই দুইয়ের মিশেল তাঁকে এক অসামান্য সাম্যবাদী কবিতে পরিণত করেছে। মূলত লেটোর দলে কাজ করতে গিয়ে বহু ধরনের গান রচনার মধ্যদিয়ে তাঁর মধ্যে এই অসামান্য গুণটি ফুটে ওঠে। এ ক্ষেত্রে ড. করুণাময় গোস্বামীর উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা যায় :

> "লেটোর দলের জন্য পালা রচনা করতে গিয়ে হিন্দু ও মুসলিম উভয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের পটভূমিতে তিনি কাজ করেছেন। একদিকে যেমন তিনি মুসলিম জীবনধারা থেকে কাহিনী ও গীত রচনার উপাদান সংগ্রহ করেছেন, অপরদিকে তিনি হিন্দু পৌরাণিক উপাখ্যানকেও পালা রচনার বিষয় করে তুলেছেন। তাঁর সে সময়কার রচনায় এই দুই ঐতিহ্যস্রোতের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। নজরুলের পরবর্তীকালের বহু রচনায় মুসলিম ও হিন্দু ঐতিহ্যের যে সহাবস্থিত রূপটি প্রকাশ পেয়েছিল, তার সূচনা ঘটে এই পর্বে।"[১]

লেটোর দল থেকে ফিরে কবি ১৯১১ সালে আবার বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে লেখাপড়া শুরু করেন। কিন্তু অর্থ সংকটের কারণে প্রতিনিয়ত ছেদ পড়তে থাকে তাঁর এই লেখাপড়ায়। অর্থ রোজগারের জন্য আবারো যোগ দিতে হয় লেটোর দলে। এরপরে গার্ডের খানসামার চাকরি, আসানসোলে বেকারিতে কাজ করা। কিন্তু ভাগ্যবিতাড়িত নজরুল কোনো কাজেই স্থায়ী হতে পারেননি। অত্যন্ত গুণী ও বিনয়ী নজরুলের সাথে সখ্যতা গড়ে ওঠে সাব-ইন্সপেক্টর কাজী রফিজউল্লাহর সাথে। লেখাপড়ার প্রতি বালক নজরুলের অসামান্য আগ্রহ দেখে তিনি তাকে নিজ গ্রাম ময়মনসিংহের বর্তমান ত্রিশাল উপজেলার কাজীর শিমলা গ্রামে নিয়ে যান। সেখানকার এক স্কুলে কবিকে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি করে দেন। দরিরামপুরের এই স্কুল থেকে তিনি বার্ষিক পরীক্ষা দিয়ে নিজ গ্রামে চলে যান। ত্রিশালে তাঁর আর ফেরা হয়নি। ১৯১৫ সালে বর্ধমানেই তিনি রাণীগঞ্জ শিয়ারসোল রাজ হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণিতে ভর্তি হন। এই স্কুলেই তিনি টানা দশম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন, ১৯১৭ সালে সেনাবাহিনীতে যোগদানের পূর্ব পর্যন্ত।

সেনাবাহিনীতে যোগদান

বর্ধমানে শিয়ারসোল স্কুলে পড়ার সময় নজরুল তাঁর শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শে আসেন। নিবারণচন্দ্র ঘটক মূলত সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী স্বাধীনতা সংগ্রামের সাথে যুক্ত ছিলেন। নিবারণচন্দ্র ঘটকের সংস্পর্শেই কবি স্বদেশ তথা ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর আত্মিক অনুরাগ উপলব্ধি করতে পারলেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে তাঁর মনে আগ্রহ জন্মাতে থাকে। তখনই তাঁর মনে স্বদেশ নিয়ে বহুবিধ ভাবনা জট বাঁধতে থাকে এবং তাঁর লেখনির মাধ্যমে সেগুলো প্রকাশ করতে থাকেন। স্বদেশের প্রতি প্রেমবোধ কবি এই সময়টাতেই উপলব্ধি করেন। অনেকের মতে শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের অনুপ্রেরণাই তাঁকে স্বাধীনতার জন্য লেখায় উৎসাহিত করে। এমনকি এই উৎসাহ উদ্দীপনাই নজরুলকে ব্রিটিশবাহিনীতে যোগদানে তাড়িত করেছিল। নিবারণচন্দ্র ঘটক ছিলেন গুপ্ত বিপ্লবী সংঘ যুগান্তরের সদস্য। তাই তিনি চাইতেন নজরুল ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে যুক্ত হয়ে বিপ্লবী তরুণদের যুদ্ধবিদ্যা শিখিয়ে দেশমাতাকে রক্ষার জন্য প্রস্তুত করুক।

নজরুল নিবারণচন্দ্র ঘটকের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামে অনুপ্রাণিত হয়ে সেনাবাহিনীতে যোগ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করলেন এবং যুদ্ধে চলে গেলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতীয় সেনাবাহিনীতে বাংলা ছাড়া অন্য সকল প্রদেশের রেজিমেন্ট ছিলো। বাঙালি সেনাদের নিয়ে রেজিমেন্ট গঠনের দাবি উঠলে ইংরেজদের পক্ষে বিশ্বের বিভিন্ন রণাঙ্গনে যুদ্ধ করবার সেনাবাহিনী গঠনের জন্যে ইংরেজ সরকার বাঙালি পল্টন গঠনের দাবি মেনে নিলেন। সর্বত্র শুরু হলো বাঙালি সৈন্য সংগ্রহের অভিযান। পাড়ায় পাড়ায় পোস্টার লাগানো হলো সেনাবাহিনীতে যোগদানের আহ্বানে। শিয়ারসোল স্কুলের শিক্ষক নিবারণচন্দ্র ঘটকের ব্রিটিশবিরোধী সংগ্রামের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন নজরুল। তাই দশম শ্রেণির ছাত্র নজরুল এ সুযোগটিকে হাত ছাড়া হতে দিতে রাজি নন। এই সুযোগ সরাসরি সৈন্যবাহিনীতে যোগ দিয়ে নিজেকে দেশের স্বার্থে যোগ্য করে তুলবার। দশম শ্রেণির প্রি-টেস্ট সন্নিকটে, সবকিছু বাদ দিয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন বাঙালি পল্টনে যোগ দিয়ে যুদ্ধে যাবার জন্যে। মূলত সশস্ত্র ইংরেজবিরোধী সংগ্রামে সমগ্র বাংলাকে মুক্ত করবার সুদূরপ্রসারী ভাবনায় নজরুল শারিরীক শিক্ষা গ্রহণে উৎসাহী হন। স্বদেশপ্রেমী নজরুল জানতেন সেদিন বহু দূরে নয় যেদিন ইংরেজবাহিনী এ বাংলা অর্থাৎ সমগ্র ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত হবে এবং সে লক্ষ্যেই স্বাধীনতার কল্পনার বীজ বপন করতে থাকেন। নজরুলই একমাত্র কবি যে শুধু লেখনিশক্তিতে নয় বরং পেশীশক্তিতেও নিজেকে যোগ্য করে তুলবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছেন। সে লক্ষ্যেই তিনি রাণীগঞ্জ থেকে কলকাতায় এলেন এবং সৈন্যবাহিনীতে যোগদানের সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। জীবনের এক নতুন অধ্যায়ে পদার্পণ হলো অগ্নিদীপ্ত তরুণ নজরুলের। ১৯১৭ সালে তিনি সেনাবাহিনীতে যোগদান করলেন।

সেনাবাহিনীতে নজরুল তিন বছরকাল ছিলেন এবং এই সময়টি তাঁর জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। কলকাতা থেকে নজরুল নওশেরাতে প্রশিক্ষণ শেষে কোম্পানির সাথে করাচি চলে আসেন। করাচি ব্যারাকেই তাঁর অধিকাংশ সময় কাটে। যদিও সরাসরি কোনো যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে যেতে হয়নি। তবে তাঁর কর্তব্যকর্মে প্রশংসনীয় ছিলেন তিনি। তাই খুব দ্রুত তিনি সেনাবাহিনীতে পদোন্নতিও লাভ করেন। অর্থাৎ তিনি খুব অল্প সময়েরই মধ্যে হাবিলদার মাস্টার হন।

সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন জীবনের এই তিনটি বছর নজরুলের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্বদেশপ্রেমী নজরুলের কবিমন এখানেই প্রকৃত অর্থে পাখা মেলতে থাকে। যেহেতু তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে হয়নি, তাই জীবনের এই স্থিরতা তাঁকে অফুরন্ত সময় এনে দেয়। সুযোগ করে দেয় প্রতিভা বিকাশের, কাব্যচর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টির। করাচি ব্যারাকেই তাঁর চলতে থাকে অবিরাম গল্প, কবিতা রচনার উৎসব। কলকাতার পত্রপত্রিকাতেও তখন করাচি থেকে পাঠানো তাঁর গল্প-কবিতা-প্রবন্ধ ইত্যাদি নিয়মিত ছাপা হতে থাকে। উদীয়মান এই কবিকে সকলে সাদরে গ্রহণ করে নেন। জীবনে প্রথম রচিত গানও তাঁর স্বদেশপ্রেমের গান, যেটি করাচি থেকে লেখা। *সওগাত* পত্রিকাতে সেটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বসন্ত সোহিনী রাগে ও দাদরা তালে গ্রথিত এ গানটি *সওগাত*, ২য় বর্ষ, বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। সওগাত সম্পাদক মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন এটিকে নজরুলের প্রথম প্রকাশিত গান হিসেবে উল্লেখ করেছেন। গানটি *বিষের বাঁশী* কাব্যে সংকলিত হয়।

“বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দুর্জয় মহা-আহ্বান তব।
বাজাও! অগ্নি-তুর্য্য কাঁপাক সূর্য্য।”[২]

সামরিক সংগীত রচনায় নজরুল

স্বদেশসংগীত বা দেশাত্মবোধক গান রচনায় নজরুল একটি স্বর্ণখচিত নাম। দেশপ্রেমবোধে যে কিশোর লেখাপড়া বাদ দিয়ে সেনাবাহিনীতে যোগদান করে, কেবল ভবিষ্যতে দেশমাতাকে রক্ষায় রণকৌশল শিখে নিজেকে প্রস্তুত করতে, সাহিত্যে বা সংগীতে এমন উদাহরণ বিরল। তাই কবি নজরুলের স্বদেশভাবনা শুধু গৃহকোণে বসে লেখনির যাদুমন্ত্র নয়, তাঁর কাছে দেশপ্রেম মানে জ্বলে ওঠা। স্বদেশের যেকোনো সংকটে, আহ্বানে স্বশরীরে গর্জে ওঠা। বাংলার প্রতিটি ঘরের টগবগে দামাল ছেলের মতো। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বের পরে স্বদেশি গান রচনায় একটি চরম শূন্যতার সময় চলছিল। কেবল মুকুন্দ দাস তাঁর স্বদেশি গানের তরবারি প্রায় একাই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন-এর অকালপ্রয়াণ, অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশি গান থেকে প্রেমের গান রচনার প্রতি ঝুঁকে পড়া, রবীন্দ্রনাথের নানা কারণে স্বদেশি গান রচনার পথ থেকে সরে দাঁড়ানো–এ সকল কারণেই হয়তো আন্দোলনের ধারা বদলে যাওয়ার লক্ষণ। গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনকে অনেকেই মনেপ্রাণে সমর্থন করতে না পেরে সরাসরি রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়ান।

আত্মজাগরণ আর স্বদেশ বন্দনার গানে ইংরেজ বিতাড়ন সম্ভব নয় জেনে শুরু হয় সশস্ত্র বিপ্লব। সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন বললেও একে ভুল বলা হবে না। গানে অনুনয় আর আবেদনের সুর যখন যথেষ্ট নয় ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজকে হটাতে তখন প্রয়োজন হয়ে পড়ে বিদ্রোহীচিত্তের।

> “১৯০৮ সালে প্রফুল্লচাকী ও ক্ষুদিরাম বসুর আত্মদানের মাধ্যমে সেই বিপ্লব এক রক্তাপ্লুত পর্যায়ে উন্নীত হয়। স্বদেশী আন্দোলনের নির্দয় দমনকারী কলকাতার চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিংস ফোর্ড তখন বিহারের মজফফরপুরে। অতর্কিত আক্রমণে তাকে হত্যা করতে গেলেন প্রফুল্ল ও ক্ষুদিরাম। কিন্তু তাঁদের নিক্ষিপ্ত বোমা ভ্রমক্রমে কিংসফোর্ডকে আঘাত না করে মিসেস ও মিস কেনেডিকে আঘাত করলে তারা মারা যান। কিছুতেই ধরা দিলেন না

প্রফুল্ল চাকী। নিজের গুলিতে নিজেই শহীদ হলেন ১৯০৮ সালের ১লা মে তারিখে। গ্রেফতারকৃত ক্ষুদিরাম ফাঁসির মঞ্চে প্রাণদান করলেন ১১ই আগস্ট। এই ঘটনায় জাতীয় জীবনে সৃষ্ট আবেগের কিয়দংশ প্রতিফলিত হয়েছে বাঁকুড়ার পীতাম্বর দাস রচিত 'একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি' গানটিতে। এমনি আক্রমণ ও আত্মোৎসর্গের ঘটনা ক্রমে বৃদ্ধি পেয়ে সশস্ত্র বিপ্লবকে প্রসারিত করে তোলে।"[৩]

সশস্ত্র বিপ্লবের এই চরম সময়ে গর্জে ওঠে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠ। কারার লৌহ কপাট যে লাথি দিয়ে ভাঙতে চায়, সেই বিদ্রোহী রণক্লান্ত অতীত গৌরব থেকে বর্তমানের সংকট মোকাবেলার ত্যেজে দীপ্ত, শিকল পরার ছলে শিকল বিকল করার মন্ত্রে আত্মহারা কাজী নজরুল ইসলামের আবির্ভাব হয় তেমনি উত্তেজনার একটি অভূতপূর্ব সময়ে। যার সূত্রপাত ঘটে সেনাবাহিনীর ব্যারাকে থাকাকালীন সময়ে। ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার সুগভীর প্রত্যয় নিয়ে কবি কাঠখোট্টা সৈন্যদলে থেকে নিরলসভাবে চালিয়ে গেছেন তাঁর সাহিত্য সাধনা। গীতিকবি জীবনের প্রথম রচিত গানটিও ছিলো তাঁর স্বদেশপ্রেমের এবং করাচির ব্যারাক থেকে পাঠানো।

করাচি থাকাকালীন সময়টিতে কবি নজরুলের কাব্য ও সংগীতচর্চার অভূতপূর্ব সুযোগ ঘটে। চুরুলিয়া ও শিয়ারসোলে শেখা ফারসিকে তিনি আরো মনোযোগের সাথে আয়ত্তে আনেন বাঙালি পল্টনের একজন পাঞ্জাবি মৌলবির কাছ থেকে। ফারসি গজল রচনার ধারা তাঁর থেকেই শুরু হয় এবং পরবর্তীকালে এ বিষয়ে তিনি অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখেন। করাচি সৈন্যদলে থাকাকালীন নজরুল যে একটি অসামান্য সাঙ্গীতিক পরিবেশ পান তার উল্লেখ পাই প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা কবি সহচর ও বন্ধু শম্ভুরায়ের পত্র থেকে। প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের *কাজী নজরুল* গ্রন্থে (পৃ. ২৮৯-৯৯) করাচি ব্যারাকে কবির সংগীতচর্চার চিত্রটি নিপুণভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে :

"করাচিতে গান বাজনার সমস্ত ব্যবস্থাই ছিলো। বেঙ্গল রেজিমেন্টে বেঙ্গলী ভলান্টিয়ার কমিটির দৌলতে আইনসম্মত কোনো জিনিসেরই অভাব ছিলো না। ভাঁজ করা অরগ্যান (এটি কাজীর বড় প্রিয় ছিলো) থেকে আরম্ভ করে ব্যাঞ্জো, ক্ল্যারিওনেট, বেহালা প্রভৃতি সবরকম বাজনাই ছিলো। আর এসব বাজনাই জমা থাকত কোয়ার্টার মাস্টার নজরুলের জিম্মায়। গাইয়ে বাজিয়েদের অভাব ছিলো না রেজিমেন্টে। বেপরোয়া ডানপিটে বাঙালি ছেলেরা জীবন-মরণ তুচ্ছ করে গুলি-বারুদের পিছনে উন্মাদ হয়ে ছুটেছে জীবন-মরণ খেলতে। তাদের মধ্যে প্রতি সন্ধ্যাবেলা নজরুলের ঘরের সামনে কী আনন্দ কী হুল্লোড়ই না হতো। জীবন-মরণ খেলায় আত্মভোলা সাত হাজার তরুণ ছেলে করাচির নৈশ আকাশ-বাতাসকে সুরতরঙ্গে যেমন মাতিয়ে তুলতেন, তার সঙ্গে আনন্দের বেগ সামলাতে না পেরে *'দে গরুর গা ধুইয়ে'*, 'চালাও পানশি বেলঘরিয়া' আরও নানা শব্দ আন্দোলিত করে তুলতেন নজরুল। এই উদ্দামতায় নজরুলের ডানপিটে সাথী ছিলেন মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়।"[৪]

নজরুলের জন্য এ-ছিলো এক বিরাট সুযোগ। গানপাগল নজরুল তাই শুরু থেকেই সৈন্যদলে থেকেও আপন ভুবনে মত্ত থাকতে পেরেছেন। নতুন নতুন গান রচনা ও তাতে সুর বসিয়ে নিজেই গেয়ে শুনিয়ে সকলকে আনন্দে বিভোর করে রাখতেন। লেখাপড়াতেও পিছিয়ে ছিলেন না। সেখানে রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র থেকে শুরু করে মাসিক পত্রিকাসমূহ যেমন সেই সময়ে আলোচিত পত্রিকা *প্রবাসী*, *ভারতী*, *মানসী*, *মর্মবাণী* প্রভৃতি নিয়মিত পড়তেন। এছাড়াও মনের গভীরে যে দেশমুক্তির মন্ত্র লুকানো ছিলো তাকে জাগ্রত রাখতে বিদ্রোহী বাংলার বিপ্লবীদের নিয়মিত খোঁজখবর নেবার জন্য সেডিসাস কমিটির রিপোর্টও পড়তেন।

করাচি ব্যারাক থেকেই তিনি প্রথম দেশাত্মবোধক গান রচনাসহ সামরিক সংগীত রচনা করতে শুরু করেন। সামরিক সংগীত রচনার আবহ সৃষ্টি করতে যে সকল বাদ্যযন্ত্রাদির প্রয়োজন তার সবটাই ছিলো করাচি ব্যারাকে। এখানে অরগ্যান, বার্নেট, ক্ল্যারিওনেট, ব্যান্ড প্রভৃতি যন্ত্র বাজানো শেখেন কবি তাঁর সহকর্মী নিত্যানন্দ দে, গোপী ও মণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কাছে। এখানে সামরিক সংগীত এবং মার্চ সংগীত রচনার সূত্রপাত ঘটে এবং পরবর্তীকালেও এ সংগীত রচনায় বিশেষ আগ্রহী হন ও সুনাম অর্জন করেন। যেমন–

১. ঝড়-ঝঞ্ঝায় ওড়ে নিশান
২. জাগো দুস্তর পথে নবযাত্রী
৩. চলরে চপল তরুণ দল
৪. কলকল্লোলে ত্রিংশ কোটি বাণী উঠেছে গান
৫. দুরন্ত দুর্ম্মত প্রাণ অফুরাণ
৬. বীরদল আগে চল
৭. শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ প্রভৃতি।

নজরুলের সাম্যবাদী চেতনায় স্বদেশ

করাচিতে সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়েই নজরুলের আরেকটি গুণ ফুটে ওঠে, তা হলো সাম্যবাদী মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। তাঁর গান এবং লেখনির মধ্যদিয়েও বঞ্চিত-অসহায় মানুষের অবস্থার পরিবর্তনের ধ্বনি ব্যক্ত করেছেন। শোষণহীন সমাজব্যবস্থার দাবি ধ্বনিত হয়েছে তাঁর সংগীত ও সাহিত্য রচনার মধ্যদিয়ে। একটি শোষণহীন সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা কি আমূল পরিবর্তন আনে একটি দেশের সেই অবস্থার বাণী কবি তুলে ধরেছেন তাঁর রচনার মধ্যদিয়ে। রুশ বিপ্লবের সংবাদ কবিকে আন্দোলিত করতো। করাচি ব্যারাকে থেকেও তিনি গোপনে রুশ বিপ্লবের সংবাদ সংগ্রহ করতেন। বিপ্লবের মধ্যদিয়ে আনা শোষণহীন সমাজব্যবস্থা ও ভারতবর্ষকে ইংরেজদের শোষণমুক্তির স্বপ্নে বিভোর করতো নজরুলকে। ব্যারাকে বসেই নজরুল ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ করতেন, তেমনি সংগ্রহ করতেন রুশ বিপ্লবের সংবাদও এবং এ-সকল কাজই করতে হতো অত্যন্ত গোপনে। কারণ ব্রিটিশের সেনাবাহিনীতে থেকে ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের সংবাদ সংগ্রহ মোটেই সহজসাধ্য ছিলো না। কিন্তু নজরুল এ-সকল সংবাদ পড়বার জন্য মরিয়া হয়ে থাকতেন। এ প্রসঙ্গে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়ের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

> "কাজী নজরুল করাচিতে গিয়ে প্যারেড-এর হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে কোয়ার্টার মাস্টার হয়ে লেখাপড়ায় ডুবে রইলেন। তখনকার দিনে যত রকম মাসিকপত্র প্রবাসী, ভারতবর্ষ, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, সবুজপত্র ইত্যাদি সবই তিনি রাখতেন। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থ সবসময়েই তাঁর সঙ্গে থাকত। সিডিসাস কমিটির রিপোর্ট তাও একখানি তিনি রেখেছিলেন। এই রিপোর্টে বাংলার বিপ্লবীদের বিষয়ে নানাভাবে ইংরেজ সরকার লিখেছিলেন। কাজীর এই গ্রন্থটি বিশেষ প্রিয় ছিলো। আর ছিলো রুশ বিপ্লবের পত্রিকা। সেসব নজরুল নানা কৌশলে হাত সাফাই করে আমদানি করতেন।"[৫]

এ প্রসঙ্গে করুণাময় গোস্বামী লিখিত *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ* গ্রন্থ থেকে অন্য আরেকটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যায়, যেখানে জমাদার শম্ভু রায় এই প্রসঙ্গে প্রাণতোষ চট্টোপাধ্যায়কে চিঠিতে জানান :

> "একদিন সন্ধ্যায় ১৯১৭ সালের শেষের দিকেই হবে, এখন ঠিক স্মরণে আনতে পারছি না, হয়তো সেটা শীতের শেষের দিক। নজরুল তাঁর বন্ধুদের মধ্যে যাঁদের বিশ্বাস করত, তাঁদের এক সন্ধ্যায় খাবার নিমন্ত্রণ করে।
>
> অবশ্য এরকম নিমন্ত্রণ প্রায়ই সে তার বন্ধুদের করত। কিন্তু ঐদিন যখন সন্ধ্যার পর তার ঘরে আমি ও নজরুলের অন্যতম বন্ধু, তার অর্গান মাস্টার হাবিলদার নিত্যানন্দ দে প্রবেশ করলাম, তখন দেখলাম, অন্যান্য দিনের চেয়ে নজরুলের চোখেমুখে একটা অন্যরকম জ্যোতি খেলে বেড়াচ্ছিল। উক্ত নিত্যানন্দ দে মহাশয়ের বাড়ি ছিলো হুগলি শহরের ঘুটিয়াবাজার নামক পল্লীতে। তিনি অর্গানে একটি মার্চিং গৎ বাজানোর পর নজরুল সেই দিন যে সব গান গাইল ও প্রবন্ধ পড়ল তা থেকেই আমরা জানতে পারলাম যে রাশিয়ার জনগণ জারের কবল থেকে মুক্তি পেয়েছে। গান-বাজনা প্রবন্ধ পাঠের পর রুশ বিপ্লব সম্বন্ধে আলোচনা হয় এবং লালফৌজের দেশপ্রেম নিয়ে নজরুল খুব উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। এবং ঠিক মনে নেই, সে গোপনে আমাদের একটি পত্রিকা দেখায়। ঐ পত্রিকাতে আমরাও বিশদভাবে সংবাদটি দেখে উল্লসিত হয়ে উঠি। সেদিন সারা রাতই প্রায় হৈ হুল্লোড়ে আমাদের কেটে গিয়েছিল।"[৬]

রুশ বিপ্লবের প্রেরণাই তাঁকে সাম্যবাদী ভাবনায় অনুপ্রাণিত করে। তাঁর গান ও সাহিত্যের সকল ক্ষেত্রে এই সাম্যবাদী রূপটির বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই আমরা। এ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রতি এর অনেক আগে থেকেই অনেক বিপ্লবী ঝুঁকতে থাকে। বিশেষ করে লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় অভিযুক্ত ভগবৎসিংহসহ অন্যান্য বিপ্লবীদের বিচারের জন্য আদালতে নেয়ার সময় সকলে সমস্বরে বজ্রকণ্ঠে ব্রিটিশসাম্রাজ্যবাদ নিপাত যাক এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জিন্দাবাদ শ্লোগান উচ্চারণ করতে থাকেন।

তখন থেকেই সকল বন্দী, গারদবাসী ও বিপ্লবীদের মধ্যে রুশ বিপ্লবের ছায়া প্রচণ্ডভাবে পড়তে থাকে এবং লেলিনের দেখানো পথে বৈপ্লবিক কৃষক আন্দোলনের মধ্যদিয়ে কৃষকসভার প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরে। এ এক অভূতপূর্ব সময়। এতকাল ধরে চলে আসা অত্যাচারী জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের দাবিসহ রুশ বিপ্লবের প্রভাবে জাতীয় বিপ্লবের ধারায় শ্রমিক, কৃষক আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। লেলিনের অনুপ্রেরণায় ভারতের কমিউনিস্ট শ্রমিক, কৃষক ও নিম্নমধ্যবিত্তদের দাবিগুলো নিয়ে বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করে। তারমধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি অন্যতম। পরিবেশ পরিস্থিতি অনুধাবনের সুবিধার্থে ১৯২২ সালের কংগ্রেসের গয়া অধিবেশনের কর্মসূচির একটি অংশ তুলে ধরা হলো : 'কংগ্রেসকে সুনিশ্চিতভাবে তার লক্ষ্য ঘোষণা করতে হবে। এই লক্ষ্য হবে : পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তিতে গঠিত জাতীয় সরকার, যার ভিত্তি হবে বয়স্কমাত্রেরই ভোট দেওয়ার গণতান্ত্রিক নীতি।'[৭]

নজরুল বেঙ্গল রেজিমেন্টের ব্যারাকে থাকতেই এই সকল বিষয়গুলোতে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে তিনি সরাসরি সম্পৃক্ত হন। করাচি ব্যারাকে থাকাকালীন সময়ে নজরুলের মানসপটে যে দেশাত্মবোধ জাগ্রত হয়, সাম্যবাদী চেতনায় মন যেভাবে উদ্ভাসিত হয় তাই পরবর্তীকালে আরো বিকশিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর ১৯২০ সালের মার্চ মাসে ৪৯নং বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙে দেওয়া হয়। নজরুল তখন করাচির পাঠ চুকিয়ে কলকাতা চলে আসেন। মনের

গভীরে সঞ্চিত দেশপ্রেমের ডানায় এবার সত্যিকারের পালক জড়াতে শুরু করে তাঁর। সাম্যবাদী চেতনার যে অঙ্কুর তিনি ব্যারাক থেকে বয়ে নিয়ে আসেন তার কুড়ি মেলবার সময় হয় এবার। একটি প্রাসঙ্গিক উক্তি যুক্ত করা হলো-

> "একটি চরম অস্থির আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ত সময়ে বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আগমন। গান, কবিতা, প্রবন্ধ সর্বক্ষেত্রে নজরুলের এই বিশুদ্ধ ও সাম্যবাদী মানসিকতার প্রকাশ দেখতে পাই। তাঁর প্রতিভা বিকাশে বাংলা সাময়িকপত্রেরও বিশাল অবদান রয়েছে। এই সকল ক্ষেত্রে কবি সাম্যবাদী ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন বারংবার। মানুষের চেতনাকে জাগাতে আপ্রাণ সংগ্রাম করে চলেছেন। লেখক-কবি পরিচয় ছাড়াও সাময়িকপত্রের সম্পাদক হিসেবেও তিনি কৃতিত্বের পরিচয় রাখেন। নজরুলের অত্যন্ত কাছের মানুষ মুজফ্ফর আহমদের সাথে যুগ্ম-সম্পাদনায় 'নবযুগ' নামে সান্ধ্য দৈনিক পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯২০-এর জুলাই মাসে। নবযুগ প্রকাশের পর কবির সাম্যবাদী আদর্শের বাণী, 'ঐ শোনো শৃঙ্খলিত নিপীড়িত বন্দীদের শৃঙ্খলের ঝংকার। তাহারা শৃঙ্খলমুক্ত হইবে, তাহারা কারাগৃহ ভাঙ্গিবে। রুশিয়া বলিল, মারো অত্যাচারীকে। ওড়াও স্বাধীনতা বিরোধীর শির। ভাঙ্গো দাসত্বের নিগড়। এ বিশ্বে সবাই স্বাধীন।"[৮]

এছাড়াও নবযুগ পত্রিকাতে তাঁর লেখা *ধর্মঘট* প্রবন্ধটিতেও সাম্যবাদী আদর্শের ইঙ্গিত স্পষ্ট। এই প্রবন্ধে কবি কৃষক-শ্রমিকসহ দিন-মজুরদের দুঃখ-দুর্দশার কথা তুলে ধরেছেন এবং সমবেদনা প্রকাশ করেন। অবশ্য এই সকল কারণেই হয়তো নবযুগ পত্রিকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়। পরবর্তীকালে *ধূমকেতু* পত্রিকাতে সরাসরি কবি সাম্যবাদের কথা ব্যক্ত না করলেও অবচেতন মনে এই পত্রিকায় অন্যদের লেখা প্রবন্ধে সেই সাম্যবাদী রূপটিই ফুটে উঠেছে বারবার। যেমন 'শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়ের রচিত 'দাসত্ব', হুমায়ুন জহীরুদ্দিন আমির-ই-কবরীর রচিত 'পল্লীব্যথা', ভবানীপ্রসাদ রায় এর 'পল্লী শিশুর অশ্রু' প্রভৃতি সাম্যবাদী চেতনামূলক প্রবন্ধ উল্লেখ্য।'[৯]

প্রায় সবকটাই সাম্যবাদী প্রবন্ধ। এ সকল সাম্যবাদী ভাবধারা এবং সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের বিদ্রোহ-বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনের উল্লেখ মূলত 'ধূমকেতু' পত্রিকাটির জন্যও কাল হলো। নজরুলের সম্পাদনায় *লাঙল* (১৬ ডিসেম্বর ১৯২৫) পত্রিকারও একই বৈশিষ্ট্য। 'শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ সম্প্রদায়ের' মুখপাত্র কবি সাম্যবাদী চেতনা থেকে নিজেকে কখনো বিচ্ছিন্ন করতে পারেননি। বরং লেলিনের জীবনাদর্শ, রুশ বিপ্লব, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদের বাণী। এ নিয়ে লেখা প্রবন্ধ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে ছাপা হতে থাকে।

> "গাহি সাম্যের গান–
> যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাঁধা-ব্যবধান।
> যেখানে মিশিছে হিন্দু-বৌদ্ধ-মুসলিম-ক্রীশ্চান।"[১০]

এই 'সাম্যবাদী' নামে বিখ্যাত কবিতাটিও কবি প্রকাশ করেন তাঁর লাঙলের ১ম সংখ্যায়। যেখানে রয়েছে মানবতা আর সাম্যবাদের এক অভূতপূর্ব সমন্বয়। কবি ভালোবাসতেন মানুষকে। মানুষের দুঃখ-কষ্টকে একান্ত নিজের করে তা ব্যক্ত করতেন লেখনিতে। 'লাঙলে'র প্রতিটি সংখ্যায় কোনো না কোনো উপমায় সাম্যবাদী দর্শনের ভাবাবেগ প্রকাশ করাই ছিলো কবির লক্ষ্য। 'লাঙলে'র অষ্টম সংখ্যা থেকে 'বঙ্গীয় কৃষক ও শ্রমিক দলের 'মুখপত্র' রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। শ্রমজীবি গণমানুষের দুঃখ-কষ্ট

বিমোচনের এবং মুক্তির কৌশল বর্ণিত হতে থাকে লাঙল পত্রিকাতে। লাঙলে প্রকাশিত হয় 'কৃষাণের গান', 'শ্রমিকের গান', 'জেলেদের গান' এবং সর্বহারা গণমানুষের কথা। মানুষের অন্তরকে জাগিয়ে তুলবার জন্য 'লাঙল' ছিলো একটি সুপ্ত হাতিয়ার স্বরূপ। মনোজগতের পরিবর্তন করে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে গণমানুষকে জাগিয়ে তোলাই ছিলো কবির অভিপ্রায়। তাই কুলি-মজুরকে নিয়ে ব্যথিত কবি হৃদয়ের আকুতি :

"দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সাব তারে ঠেলে দিলে নীচে ফেলে!
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি করে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল ?"[১১]

রাজনৈতিক আন্দোলনে নজরুল

১৯২০ সালে কবি করাচি ব্যারাক থেকে বেরিয়ে কলকাতায় আসেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী আন্দোলনসমূহ নজরুলের কবিমনে বিশেষ প্রভাব ফেলে। কবি নজরুল ইসলাম এমন একটি সময়ে বেড়ে উঠেছেন যখন সর্বত্র মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব, পাওয়া-না-পাওয়ার কোন্দল। এ সকলই তাঁর কবিত্বশক্তি বিকাশের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্যের মূল উপজীব্য। সময়ের চাহিদায় তাঁকে জড়িয়ে পড়তে হয় নানা সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে। কবির নিম্ন বা মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম বলেই তিনি মানুষের অন্তরের সুধাটি প্রাণ দিয়ে উপলব্ধি করতে পারতেন। মুক্তি সংগ্রামের মধ্যদিয়ে তিনি পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে বাঙালির ভাগ্যের পরিবর্তনে বিপ্লববাদ আন্দোলনকে কবিচিত্তে স্থান দেন। সেই সময়ে সূর্য সেন, যতীন দাস, ক্ষুদিরাম বসু, গোপীনাথ সাহা প্রমুখ শহিদদের দেশের জন্যে আত্মত্যাগ ও দুঃসাহসিক কাজে উদ্যোগ কবির মনে নতুন সূর্যোদয়ের আশার সঞ্চার করে। তাঁকে প্রভাবিত করে কমিউনিস্ট আন্দোলনও। এই সকল আন্দোলনের রূপরেখা কবিচিত্তে এক বিদ্রোহের ভাব জাগ্রত করে। পরাধীন ভারতের মানুষের অস্থিরতা, বঞ্চনা কবিমনে প্রতিবাদের আগুন জ্বেলে দেয়। তাঁর প্রতিবাদের ভাষার পরতে পরতে উচ্চারিত হয় বিদ্রোহের ধ্বনি।

নজরুল রাজনীতিকে বিশ্বাস করে নিজের মধ্যে নিজে তা লালন করতেন সুপ্তাকারে এবং তার প্রকাশ করতেন তাঁর লেখনির মধ্যদিয়ে। কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ এমনকি সাংবাদিকতার মধ্য দিয়েও তিনি অন্তরের লালিত রাজনীতিবোধকে দেশের স্বার্থে, দেশের মানুষের স্বার্থে প্রকাশ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকাল থেকে বাংলাদেশের রাজনীতির ধারা পরিবর্তিত হতে থাকে। নজরুলের জন্মের কয়েক বছর আগে থেকেই দেশে বিপ্লববাদের সূচনা হয়। আর সাথে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশের যুবকদের মাঝে বৈপ্লবিক চেতনাকে আরো বিকশিত করে। নজরুল তখন শিশু। এই ছোট্ট সময় থেকে বেড়ে ওঠার সংগ্রামে তাঁকে দেখতে হয়েছে বহু আন্দোলনের বহুবিধ বিবর্তন। সেই বিবর্তনে কিছু অংশের উল্লেখ এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক হবে।

স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬২-১৯০২) দেশাত্মবোধ তাঁর শিষ্যদের মধ্যে প্রতিফলিত হয়। ক্রমে তা বৈপ্লবিক চেতনায় বিকশিত হতে থাকে। স্বামী বিবেকানন্দের স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত ছিলো ব্রাহ্মসমাজভুক্ত প্রতিটি যুবক। স্বামীজীর স্বাধীনতার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপ দিতে এ চেতনার বিকাশে সহায়তা করেছেন, আত্মত্যাগের ব্রতে নিবেদিত ভগিনী নিবেদিতা। ভারতবর্ষকে স্বাধীন করতে এই বিদেশিনী বিপ্লবীদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন স্বামীজীর দেখানো পথে। নারীমুক্তির দ্বার উন্মোচন থেকে ভারতের প্রতিটি মানুষের ভাগ্যে ইংরেজ শোষণমুক্ত স্বাধীনতার সূর্যকে প্রত্যক্ষ অনুধাবন করতে সচেষ্ট ছিলেন তিনি। ১৯০২ সালে স্বামীজীর মৃত্যুর পরেও এই ধারা অব্যাহত ছিলো এবং আমৃত্যু এই সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন এই মহিয়সী নারী। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়- বিপ্লবদের বহুবিধ আন্দোলনের চেষ্টা অব্যাহত থাকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। সে এক আগুনঝরা সময়। বিপ্লবীদের নানা প্রচেষ্টা ব্যর্থ হতে থাকে শক্তিহীন বোমা, গুলি-বন্ধুকের অভাব এবং অদক্ষতার কারণে। ইংরেজ বাহিনীর বার বার হামলায় বহু বিপ্লবীর জেলহাজত হয়, ফাঁসি হয়। তবুও তারা দমে যায়নি। ক্ষুদিরাম বসু, প্রফুল্ল চাকী, অরবিন্দ ঘোষ, বারীন্দ্র ঘোষ প্রমুখের আত্মত্যাগী বিপ্লবী সংগ্রামের কথা আমরা জানি। অন্যদিকে পুলিন বিহারী দাস স্বদেশি আন্দোলনের নতুন ধারায় বিপ্লবীদের শারীরিক অনুশীলনের মাধ্যমে দক্ষ করতে 'অনুশীলন সমিতি' গঠন করেন। নিজে শেখেন লাঠি খেলা। এখানে উল্লেখ্য যে, "১৯০৬ হতে ১৯০৮ সালের মধ্যে ঢাকা-সমিতির অধীনে প্রায় পাঁচশত সমিতি স্থাপিত এবং প্রায় ত্রিশ হাজার সভ্য সংঘবদ্ধ হয়। প্রথমে এ সংগঠনের মূলে ছিলো মুসলমানদের হাত থেকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা; পরে তাদের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায় সরকারের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিপ্লব পরিচালনা।"[১২]

এভাবেই বিপ্লবী আন্দোলন এবং বহু আত্মত্যাগের মধ্যদিয়ে ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রদ ঘোষণা করা হয়। ইংরেজ বাহিনী বার বার বিপ্লবীদের কার্যকলাপকে সমূলে উচ্ছেদের চেষ্টা করতে থাকে। তবে ইংরেজ বাহিনী কল্পনাও করতে পারেনি বাংলার বালক, যুবকদল এমন দুঃসাহসিক কর্মে লিপ্ত হতে পারে। ফলে বিপ্লবীদের উপর চলতে থাকে কঠিন রাজশক্তির প্রয়োগ। আবারো নতুন নতুন পন্থায় চলতে থাকে তাদের দেশমুক্তির শপথ ও দীক্ষা গ্রহণ। ইংরেজ কোষাগার, জমিদার ভাণ্ডার ডাকাতির মধ্যদিয়ে করতে থাকে অস্ত্রকেনার টাকার যোগান। এমন দুঃসাহসিক উদ্যোগের কথা এ যুগে শিক্ষিত যুবকদলের কাছ থেকে আমরা চিন্তাও করতে পারি না। অথচ ভারতমাতাকে মুক্তির লক্ষ্যে আত্মজীবনকে তুচ্ছ জ্ঞান করে নির্ভীকচিত্তে তারা অগ্রসর হয়েছিল একই ব্রতে। প্রসঙ্গক্রমে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা প্রয়োজন, "১৯০৬-১৯০৭ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত ডাকাতিগুলো বিশ্লেষণ করলে তাদের কার্য সহিষ্ণুতা, নিয়মানুবর্তিতা, ক্ষিপ্রকারিতা, নির্ভীকতা, লোভশূন্য মনোবৃত্তি প্রভৃতি সৎ প্রবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।"[১৩]

অনন্ত সিংহ, গণেষ ঘোষ ও লোকেন্দ্র এমনকি পরবর্তীকালে সূর্য সেন (১৮৯৪-১৯৩৪) সশস্ত্র বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে ১৯৩০ সালে চট্টগ্রামে ইংরেজদের অস্ত্রাগারে হামলা চালিয়ে অস্ত্র সংগ্রহ করে। বাঙালিদের

জন্য দুঃসাহসিকতার এক অভূতপূর্ব ঘটনা এটি। চারদিন বিপ্লবীরা চট্টগ্রাম শহর দখল করে রাখে। এই উদাহরণ নজরুল জীবনের অন্তর্নিহিত ভাবনাকে প্রজ্জ্বলিত করতে থাকে। সেই ভাবনার বিকিরণ ঘটতে থাকে তাঁর বিদ্রোহী আগুনঝরা প্রতিটি শব্দের মধ্য দিয়ে। এখানে বিপ্লবীদের দুঃসাহসিক আচরণের কথা ব্যক্ত করতে চাই। অরবিন্দ ঘোষের *কারাকাহিনী* গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতিটি উল্লেখ করা হলো:

> "কোর্টে ইহাদের আচরণ দেখিয়া বুঝিতে পারিয়াছি বঙ্গে নতুন যুগ আসিয়াছে; সেই নির্ভীক সরল চাহনী, সেই ত্যেজপূর্ণ কথা, সেই ভাবনা শূন্য আনন্দময় হাস্য এই ঘোর বিপদের সময়ে সেই অক্ষুণ্ণ তেজস্বিতা, মনের প্রসন্নতা, বিমর্ষতা বা ভাবনা বা সন্তাপের অভাব-সেকালের তমঃক্লিষ্ট ভারতবাসীর নহে, নূতন যুগের নূতন জাতির নূতন কর্মস্রোতের লক্ষণ। তাঁহারা ভবিষ্যতের জন্য বা মোকদ্দমার ফলের জন্য লেশমাত্র চিন্তা না করিয়া কারাবাসের দিন আমোদে, হাস্যে, ক্রীড়ায়, পড়াশুনায়, সমালোচনায় কাটাইয়াছিলেন। তাঁহারা জেলের সকলের সঙ্গে ভাব করিয়া লইয়াছিলো।"[১৪]

বিপ্লবী আন্দোলনের শেষ পরিণতি অব্যাহত থাকে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত। নজরুল তখন তাঁর রচনাকালের টগবগে সময়ের যাত্রী। সন্ত্রাসবাদীদের এই সকল দুঃসাহসিক প্রয়াস কবিচিত্তে শৃঙ্খলমুক্তির আকাঙ্ক্ষাকে আরো তীব্র করে চলছিল। তবে নজরুল ইসলাম নিজেকে প্রকাশ করলেন একটি ভিন্ন ধারায়। বিপ্লবীদের আদর্শকে তিনি সম্মান করতেন, কিন্তু নজরুলও রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সমসাময়িক অন্যান্য কবিদের মতো কেবল ইংরেজদের শোষণ বন্ধের পথের থেকেও শোষিত মানুষের মুক্তি ও খেঁটে খাওয়া মানুষের প্রাপ্য অধিকারের কথা ব্যক্ত করতে থাকেন। তবে তাঁর বলবার ধরন ছিলো ভিন্ন। তাঁর প্রতিটি কথা ছিলো ত্যেজদীপ্ত এবং অধিকার ছিনিয়ে আনবার অঙ্গিকারবদ্ধ।

নজরুলের আগে সত্যিকার অর্থে কোনো কবি-সাহিত্যিকের লেখনিতে দেশের পূর্ণাঙ্গ মুক্তির এমন চিত্র ফুটে ওঠেনি। নজরুল বিপ্লববাদী আদর্শকে অন্তরে রেখে চেয়েছিলেন যে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হোক। নজরুলকে সরাসরি রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতে না দেখা গেলেও তিনি মূলত অন্তকরণে স্বদেশের রাজনীতির বার্তাটিকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে এগিয়ে চলছিলেন। যে কারণে করাচি ব্যারাক থেকে ফিরে মানুষের অধিকার আদায়ের সংকল্পে নিজেকে ব্রতী করেন। অসির থেকে মসির শক্তিকে বড় জ্ঞানে তিনি এবং মুজফ্ফর আহমেদ যৌথভাবে ১৯২০ সালে শুরু করলেন গণজাগরণমূলক পত্রিকা *নবযুগ*। এরপর কোনো শক্তিই আর নজরুলকে পরাহত করতে পারেনি। সাম্যবাদ আর মুক্তিকামী মানুষের স্বাধীনতার তৃষ্ণাকে আরো বলিষ্ঠ করার জন্য চলতে থাকে নানা প্রয়াস। 'ধূমকেতু', 'লাঙল', 'গণবাণী' প্রভৃতি পত্রিকা গণমানুষের অধিকার আদায়ের বীজমন্ত্র দিয়ে চলছিল। একের পর এক পত্রিকা বন্ধ করে দেওয়া হলেও আবারো নতুন উদ্যমে নতুন পন্থায় কবি নতুন ভাবনা নিয়ে এগিয়ে চলেছেন। দেশে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবির প্রত্যাশায় *ধূমকেতু* পত্রিকায় তিনি লেখেন :

> "সর্বপ্রথম 'ধূমকেতু' ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। ... পূর্ণ স্বাধীনতা পেতে হলে সকলের আগে আমাদের বিদ্রোহ করতে হবে, সকল কিছু নিয়ম-কানুন বাঁধন-শৃঙ্খলা মানা নিষেধের বিরুদ্ধে। আর এই বিদ্রোহ করতে হলে সকলের আগে আপনাকে চিনতে হবে। বুক ফুলিয়ে বলতে হবে-আমি আপনাকে ছাড়া করি না কাহারে কুর্নিশ।"[১৫]

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ইংরেজদের অত্যাচার ও একের পর এক প্রতারণার ঘটনা চরম হতে থাকে। ১৯১৯ সালের জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড, ১৯২০ সালের খেলাফত অসহযোগ আন্দোলন নজরুলের মনে একটি রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততার চিত্র এঁকে দেয়। তিনি এ থেকে দেশবাসীকে পরিত্রাণের পথ খুঁজতে থাকেন। তারই ফলশ্রুতিতে তিনি একের পর এক পত্রিকার সাথে জড়িত থেকে গরম এবং ত্যেজোদীপ্ত সব লেখা প্রকাশ করেন। তাঁর সেসব জ্বালাময়ী উচ্চারণের জন্য ঐ পত্রিকাসমূহ ইংরেজ সরকারের রোষানলে পড়ে। তবে নজরুল প্রতিভা বিকাশে এই সকল পত্রিকার বিপুল ভূমিকা রয়েছে। রাজনীতির সাথে নজরুলের সম্পৃক্ততার বিষয়ে বলতে গেলে অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে কমিউনিস্ট পার্টি গঠনের একেবারে শুরুর দিকে যে লেবার স্বরাজ পার্টি গঠন করা হয় তাতে নজরুলের নাম ছিলো। কংগ্রেসের সর্বত্র সাম্যবাদী ভাবধারাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে নজরুল ছাড়াও যে সকল উদ্যোক্তাগণ সম্পৃক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বর্ধমানের কুতুবুদ্দিন আহমেদ, নদীয়ার হেমন্তকুমার সরকার, বীরভূমের সামসুদ্দিন হুসয়ন এবং কলকাতা থেকে আবদুল হালিম প্রমুখ। পরবর্তীকালে বাস্তবিক প্রয়োজনে ‘লেবার স্বরাজ পার্টি’র নাম দুইবার পরিবর্তন করে করা হয় ‘বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দল’ এবং আরো পরে করা হয় ‘ওয়াকার্স এন্ড পেজান্টস পার্টি’। কমিউনিস্ট পার্টি যখন গঠিত হয় কাজী নজরুল ইসলামের নামেই লেবার স্বরাজ পার্টির কর্মসূচিসহ এর আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বলিত খসড়াটি প্রকাশ করা হয়। তৎকালীন সময়ের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে ধারণার জন্য খসড়াটি তুলে ধরা হলো।

"শ্রমিক-প্রজা স্বরাজ-পার্টির গঠন প্রণালি :

১. নাম	:	‘ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টি’ এই দলের নাম হইবে।
২. উদ্দেশ্য	:	নারী-পুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্যের উপর প্রতিষ্ঠিত ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতাসূচক স্বরাজ লাভই এই দলের উদ্দেশ্য।
৩. উপায়	:	নিরস্ত্র গণ-আন্দোলনের সমবেত শক্তি প্রয়োগ উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধনের মূল উপায় হবে।
৪. সভ্যপদ	:	ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতির যে-কোনো সভ্য এই দলের উদ্দেশ্য, গঠন-প্রণালী এবং কার্যপদ্ধতি অনুমোদন করেন তিনিই কেন্দ্রীয় কার্যাবলী সমিতির মত হইলে শ্রমিক-প্রজা-স্বরাজ পার্টির সভ্য হইতে পারিবেন। শ্রমিক এবং চাষীর স্বার্থ সংরক্ষণ ও প্রসারণের কথা যতদিন স্বরাজ্যদলের কার্যপদ্ধতির অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, ততদিন এই দলের সভ্যগণের স্বরাজ্যদলের সভ্য হওয়ায় বাধা নাই।
৫. চাঁদা	:	এই দলের প্রত্যেক সভ্য বার্ষিক এক টাকা চাঁদা দিবেন। শ্রমিক ও কৃষক হইলে বার্ষিক এক আনা চাঁদা লাগিবে। প্রয়োজন স্থলে প্রাদেশিক কেন্দ্রীয় সমিতি চাঁদা না লইতে পারেন।
৬. কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত	:	কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত কমবেশি পনেরজন সভ্য লইয়া গঠিত হইবে। দলের সৃষ্টিকর্তাগণে তাঁহাদের প্রথম সভায় তিন বৎসরের জন্য ইহাদিগকে নির্বাচিত করিবেন। পঞ্চায়েতগণ নিম্নলিখিত বিভাগগুলোর এক বা ততোধিক বিভাগের ভার লইবেন এবং তদ্বিষয়ে চরম ক্ষমতা পাইবেন।

১ম-প্রচার, ২য়-অর্থ, ৩য়-দল গঠন, ৪র্থ-শ্রমিক, ৫ম-চাষী, ৬ষ্ঠ-ব্যবস্থাপক সভ্য। পঞ্চায়েতের প্রত্যেক সভ্যের এক ভোট থাকিবে। সমান সমান স্থলে যে ব্যক্তি সভাপতির কাজ করিবেন, তিনি কাস্টিং ভোট দিতে পারিবেন। তিনজন সভ্য থাকিলেই পঞ্চায়েতের কার্য চলিতে পারিবে।

৭. প্রাদেশিক পঞ্চায়েত : কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েতের দ্বারা নিযুক্ত পাঁচ হইতে নয়জন সভ্য লইয়া ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি নির্দিষ্ট প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক পঞ্চায়েত গঠিত হইবে।

৮. প্রাদেশিক পরিষৎ : প্রাদেশিক পঞ্চায়েতের দ্বারা প্রথম অবস্থায় এক বৎসরের জন্য এক বা একাধিক প্রতিনিধি লইয়া প্রাদেশিক পরিষৎ গঠিত হইবে।

৯. জেলার জন্য নিযুক্ত প্রতিনিধিগণ জেলা, মহকুমা, ইউনিয়ন এবং গ্রাম্য পরিষৎ গঠনের চেষ্টা করিবেন। এই সকল পরিষৎ গঠিত হইলে প্রাদেশিক পরিষৎ, প্রাদেশিক পঞ্চায়েত এবং কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত সভ্য নির্বাচন প্রণালি প্রতিষ্ঠিত হইবে।

১০. উপরিউক্ত নিয়মাবলীর বহির্ভূত কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত করিতে হইলে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত করিবেন এবং সে বিষয়ে তাঁহাদের মতই চরম বলবান হইবে।”[১৬]

এই সকল কিছু সত্ত্বেও নজরুল ইসলাম সরাসরি রাজনীতির সাথে নিজেকে জড়াননি বরং প্রতিটি অধিবেশনের জন্য গান লিখেছেন, প্রবন্ধ লিখেছেন। তাঁর কবি প্রতিভাতে তিনি রাজনীতিকে কাব্য ও সংগীতের মিশ্রণে একটি নতুন ধারা প্রবর্তন করেছিলেন। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত ‘বঙ্গীয় কৃষক শ্রমিক দলে’র দ্বিতীয় অধিবেশনে তিনি উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে রচনা করেন ‘ধীবরদের গান’ এবং নিজেই তা পরিবেশন করেন। এ প্রসঙ্গে ‘কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা’ গ্রন্থে মুজফ্‌ফর আহমদের উদ্ধৃতি তুলে ধরা হলো :

> “১৯২৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কাজী নজরুলের সঙ্গে কুষ্টিয়ায় তাঁর শেষ দেখা। কুষ্টিয়া এক কৃষক সম্মেলনে কাজী নজরুল ইসলাম সপরিবারে গিয়েছিলেন। সে সম্মিলনীতে বঙ্গীয় কৃষক লীগ নামে কৃষকদের স্বতন্ত্র একটা সংগঠন গড়া হয়েছিল। এই সংগঠনকে আজকের কৃষক সমিতির সূচনা বলা যেতে পারে। কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের পরামর্শ অনুসারে এক শ্রেণীভিত্তিক সংগঠন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এই কৃষক লীগ গঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে মুজফ্‌ফর আহমদ, কাজী নজরুল, আব্দুল হালিম, হেমন্ত সরকার প্রমুখ যোগদান করেছিলেন। ১৯২৯ সনের ২০ মার্চ মুজফ্‌ফর আহমদ মিরাট ষড়যন্ত্র মামলায় গ্রেফতার হয়ে দীর্ঘদিন বাংলার বাইরে ছিলেন। মিরাট জেল থেকে তিনি গোপনে নজরুলকে চিঠি লিখেছিলেন কিন্তু চিঠিটি ধরা পড়ায় মুজফ্‌ফর আহমদকে বিপদে পড়তে হয়েছিলো।”[১৭]

নজরুলের জীবনের এ সকল কর্মকাণ্ডের পিছনে ছিলো মূলত অকুণ্ঠ দেশপ্রেম। কোনো দিন কোনো পদমর্যাদার জন্য নয় দেশের মেহনতি মানুষের দুঃখ-কষ্ট লাঘব এবং স্বাধীনতার স্বপ্ন বাস্তবায়নে গণমানুষকে জাগিয়ে তুলবার অভিপ্রায়ে তিনি নিরলস ব্যস্ত থেকেছেন একজন রাজনৈতিক কর্মী হিসেবে। এ যাত্রা শুরু হয় তাঁর ১৯২০ সাল থেকে। বহু প্রতিকূলতায় পথ চলেছেন, কখনো রাজনৈতিক অস্থিরতায় লিখেছেন :

“ঐ দারুণ উপপ্লবের দিনে
আমরা দানিব শির,
মোদের মাঝে মুক্তি কাঁদে
বিংশ শতাব্দীর।”[১৮]

আবার কখনো স্বাধীনতার জন্য দৃপ্ত উচ্চারণ :

> "আমরা জানি সোজা কথা, পূর্ণ স্বাধীন করব দেশ!
> এই দুলালাম বিজয়-নিশান, মরতে আছি–মরব শেষ।"[১৯]

নজরুলের রাজনৈতিক জীবনাদর্শ এবং দেশের মানুষের প্রতি অন্যায়ের প্রতিবাদের একটি উৎকৃষ্ট দলিল তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন তাঁর 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'তে। তার কিছু অংশ তুলে ধরা হলো :

> "আজ ভারত পরাধীন। তার অধিবাসীবৃন্দ দাস। এটা নির্জলা সত্য। কিন্তু দাসকে দাস বললে, অন্যায়কে অন্যায় বললে এ রাজত্বে তা হবে রাজদ্রোহ। এ ন্যায়ের শাসন হতে পারে না।... আমি শুধু রাজার অন্যায়ের বিরুদ্ধেই বিদ্রোহ করি নাই, সমাজের, জাতির, দেশের বিরুদ্ধে আমার সত্য তরবারীর তীব্র আক্রমণ সমান বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে, ...আমি যে কবি, আমার আত্মা যে সত্যদ্রষ্টা ঋষির আত্মা।... আমি অন্ধ বিশ্বাসে, লাভের লোভে, রাজভয় বা লোকভয়ে মিথ্যাকে স্বীকার করতে পারি না। অত্যাচারকে মেনে নিতে পারি না।... আমি তখনও বুঝেছিলাম, আমি সত্য রক্ষার, ন্যায় উদ্ধারের বিশ্ব প্রলয় কাহিনীর লাল সৈনিক। বাংলার শ্যামশ্মশানের মায়া নিদ্রিত ভূমে আমায় তিনি পাঠিয়েছিলেন অগ্রদূত তূর্যবাদক করে। আমি সামান্য সৈনিক, যতটুকু ক্ষমতা ছিলো তা দিয়ে তাঁর আদেশ পালন করেছি।"[২০]

নজরুলের গানে স্বদেশচেতনা

২১ বছরের স্বপ্নদ্রষ্টা যুবক নজরুল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পর ৪৯নং বেঙ্গলি রেজিমেন্ট ভেঙে গেলে করাচি থেকে কলকাতায় ফিরে আসেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ও সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে। এই স্বপ্নই তাঁকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে দেশপ্রেমের এক মূর্ত সৈনিকের বিপ্লবীচেতনায়। রুশ বিপ্লব দেশপ্রেমের এই ভাবনায় আরো পালক জুড়তে থাকে। ইংরেজদের শোষণমুক্তির সাথে অর্থনৈতিক মুক্তির অপরিহার্যতার উপলব্ধিও এর সাথে যুক্ত হয়। কলকাতায় ফিরে নজরুল ইসলাম তাঁর করাচি ব্যারাক থেকে অর্জিত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে সাহিত্য, সংগীত ও সাংবাদিকতাকে অবলম্বন করে এগুতে থাকেন দুর্বার গতিতে। হৃদয়ের কাছের মানুষ মুজফ্ফর আহমেদ নজরুলের সাম্যবাদী ভাবনাকে মানুষের কাছে তুলে ধরবার প্রয়াসে পরিচালনা করেন *ধূমকেতু*, *লাঙল*, *গণবাণী*র মতো পত্রিকা। যেখানে নজরুল প্রকাশ করেন কৃষক, শ্রমিক, জেলে এবং সর্বহারা প্রভৃতি মানব হিতৈষীমূলক গান ও কবিতা। নজরুলের দেশাত্মবোধের গান-কবিতার মূল আকাঙ্ক্ষা মূলত রাজনৈতিক স্বাধীনতা। ইংরেজ শাসন-শোষণ থেকে প্রাথমিকভাবে বাঙালি মনে সৃষ্টি হয় রাজনৈতিক অনুপ্রেরণার এবং ক্রমে এর সাথে যুক্ত হয় সামাজিক মুক্তির নানা উপকরণ। এই সকল আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করবার অবলম্বন হিসেবে দেশাত্মবোধের কবিতা-গান এবং বহুবিধ চিন্তাশীল রচনা মানব-মনে দেশাত্মবোধ জাগ্রতকরণে বিপুল অনুপ্রেরণা দেয় যা মূলত পাশ্চাত্য সাহিত্য ও সংগীত স্রষ্টাদের কর্মকে অনুকরণ করে ধাবিত। যার বহিঃপ্রকাশ আমরা পাই হিন্দুমেলা থেকে ব্যক্ত করে বঙ্গভঙ্গ বিরোধ আন্দোলনের বহুবিধ অনুবাদের মধ্য দিয়ে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় বহু গান ও কবিতা। যে বিপুল সংখ্যক গান বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় তা বাংলা গানের ইতিহাসে একটি বিশেষ ঘটনা। তাই স্বদেশপর্বের গানের কথা এলেই আসে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন পর্বের কথা। যদিও নজরুল ছিলেন সেই

সময় নিতান্তই শিশু। নজরুলকে মূলত পাই বঙ্গভঙ্গ পরবর্তী সময়ে দেশ যখন রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উত্তাল।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সংগীত রচনার প্রাণপুরুষ ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বদেশপর্বের প্রায় সকল গান তাঁর সেই সময়টাকে কেন্দ্র করে রচিত। খ্যাত-অখ্যাত একটি বিশাল তালিকা রয়েছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন সময়কালীন সংগীত রচয়িতাদের। যাঁদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, অতুলপ্রসাদ সেন, রজনীকান্ত সেন, কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ, মুকুন্দ দাস, অমৃতলাল বসু, প্রমথনাথ রায় চৌধুরী, অশ্বিনীকুমার দত্ত, বিজয়চন্দ্র মজুমদার, সরলাদেবী চৌধুরানী, কামিনীকুমার ভট্টাচার্য, মনমোহন চক্রবর্তী প্রমুখের নাম না উল্লেখ করলেই নয়। নজরুল ইসলাম স্বদেশি গানের এ যাত্রার সঙ্গে যুক্ত হন মূলত ১৯১৭ সালের পর করাচিতে অবস্থানকালীন সময় থেকে। ১৯২১ সালে কবি রচনা করেন 'বিদ্রোহী' কবিতাটি এবং এর প্রায় সমসাময়িক কালের রচনা 'ভাঙ্গার গান'। এ থেকেই স্পষ্ট যে নজরুলকে দেশাত্মবোধক বা স্বদেশি গান রচনার ক্ষেত্রে পাই মূলত বঙ্গভঙ্গোত্তর কালে। প্রাক-বঙ্গভঙ্গ যুগ এবং বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগের রচিত স্বদেশপর্বের গানে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। এই বৈশিষ্ট্যগুলো থেকেই স্বদেশি গান রচয়িতাদের স্বদেশভাবনার স্বরূপটির সন্ধান মেলে। লেখক গীতা চট্টোপাধ্যায় সেই সময়ের মোটামুটি একশটি গান এবং তার একুশজন রচয়িতা সম্বলিত একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। এখানে তার উল্লেখের প্রয়োজনীয়তা বোধ করছি। কারণ এই একশটি গানের রচয়িতাদের ভাবনা থেকে ভারতের জাতীয়তাবোধ ও জাতীয় আন্দোলনের সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। গীতা চট্টোপাধ্যায় রচিত *বাংলা স্বদেশি গান* গ্রন্থের ভূমিকা অংশ থেকে নিম্নোক্ত ছকটি উপস্থাপন করা হলো।

বাংলা স্বদেশি গান ও রচয়িতাগণ

বিষয়	প্রাক-বঙ্গভঙ্গ যুগ														বঙ্গভঙ্গ যুগ							বঙ্গ-ভঙ্গোত্তর যুগ	মোট
	সত্যেন্দ্রনাথ	গগনেন্দ্রনাথ	দ্বিজেন্দ্র নাথ	রাজ কৃষ্ণরায়	সরলা দেবী	বঙ্কিমচন্দ্র	মনোমোহন বসু	আনন্দ চন্দ্র ভ	গোবিন্দ দাস	কালী প্রসন্ন ঘোষ	গোবিন্দ রায়	কামিনী রায়	প্রমথরায় চৌধুরী	অজ্ঞাত	রবীন্দ্র নাথ	রজনীকান্ত	অতুল প্রসাদ	কালী প্রসন্ন কাব্য	মুকুন্দ দাস	অশ্বিনী দত্ত	দ্বিজেন্দ্রলাল	কাজী নজরুল ইসলাম	
মাতৃভাষা																	১					--	১
দেশের প্রকৃতি						১							১		৫	৩		১			২	৩	১৬
বর্তমান অর্থনৈতিক																						--	
দুর্দশা দুরবস্থা		১	১	২			১	১	১	১	১				৪			১	২	১		৪	২১
ভবিষৎ আশা					১							১			৩		১					--	৬
অতীত গরিমা	১			১	১			১	১					১		১	১				৩	২	১৩
সাম্প্রদায়িক																						--	--
ঐক্য															৪				১			১	৬
শাসক বিদ্বেষ															১	১			৩			৩	৯
কর্মের উদ্দীপনা										১					৬	৬	১	১	৪	১		২	২২
দেশপ্রীতি (মিশ্র ভাব)										১			১	১	২			১				--	৬
মোট সংখ্যা	১	১	১	৩	২	১	১	২	২	৩	১	১	২	২	২৫	১২	৪	৪	১০	২	৫	১৫	১০০

উৎস : গীতা চট্টোপাধ্যায়, বাংলা স্বদেশি গান, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি-১৯৮৩, (ভূমিকা, পৃ. ২৩)।

একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই সকল গানের মধ্যদিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবোধ মূলত হিন্দু জাতীয়তাবোধের প্রাধান্য প্রতিফলিত হয় এবং যে কারণে অহিন্দুদের কাছে এই আন্দোলন অপ্রিয় হতে থাকে। সেই সময়ের সকল স্বদেশপর্বের গানে যেভাবে হিন্দুদের দেবী, হিন্দু ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের নামের উল্লেখ আছে সেই তুলনায় কোরান, মুহাম্মদ, রহিম–এই সবের নামমাত্র উল্লেখ রয়েছে দু'একটি গানে। গীতা চট্টোপাধ্যায়ের একশটি গানের উদাহরণে মাত্র দুটি স্বদেশি গানে মুসলিম সংস্কৃতি বা ইসলাম ধর্মীয় শব্দের উল্লেখ রয়েছে।

প্রাক-বঙ্গভঙ্গ যুগ, বঙ্গভঙ্গোত্তর যুগে রচিত একশটি গানের তালিকায় দেশমাতা অথবা শাসকবর্গকে নিয়ে রচিত গানের সম্মোধনমূলক শব্দমালা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে কবি মুকুন্দ দাস ও নজরুলের গানে যেভাবে উত্তেজনা ও প্রতিবাদের বিদ্বেষবাণী ব্যক্ত হয়েছে তা অন্যদের গানে তেমন পাওয়া যায় না। মূলত নজরুল ইসলামের গানে ও সাহিত্যে যেভাবে বিপ্লবীচেতনা প্রকাশিত তা অন্যদের সাহিত্যে বিরল।

"কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙ্গে ফেল্ কর্ রে লোপাট রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষাণ! ধ্বংস-নিশান
উঠুক প্রাচী-র প্রাচীর ভেদি ॥"[২১]

বাংলা সাহিত্যে অত্যাচারের বিরুদ্ধে এমন প্রতিবাদের সুর কোনো লেখনিতে প্রকাশ পায়নি। যেন এক দলা আগুন করে ছুঁড়ে দিয়েছেন তিনি স্বদেশপ্রেমী অগণিত মানুষের অন্তর গঠনে। নজরুলের গান মানুষের ভেতর ঘুমিয়ে থাকা সত্তাকে জাগানিয়া সুর। এক একটি প্রতিবাদী অগ্নিশিখা। এমনই এক ব্যতিক্রমী সংগীতের ধারা নিয়ে এলেন নজরুল। গানে যেখানে শক্তি ঝংকৃত হয়, প্রলয়শিখা দৃশ্যত হয়। এমন করে কোনো বাঙালি কবি আগে গান রচনা করেননি।

নজরুলের গানে স্বদেশচেতনার স্ফুরণ ও পর্যালোচনা

যে শিশুর কোমল মন নানাবিধ প্রতিকূলতা, অভাব আর সমাজের বহুবিধ অসংগতি দেখে বেড়ে ওঠে তাকে আলাদা করে জীবন বা প্রেমের সংজ্ঞা শেখানো বাহুল্যতা। প্রকৃতি তার কাছে সবচেয়ে বড় শিক্ষাভাণ্ডার, প্রতিটি মানুষের আচরণ তাঁর গ্রন্থের এক একটি অধ্যায়। শিশুমনে তাই নজরুল বুঝতে পেরেছিলেন এই দেশ, দেশের মানুষ তাঁর বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। শৈশবজীবনের প্রতিদিনের সংগ্রাম তাঁকে বিপথগামী না করে, করেছেন সবার সম্মুখের উজ্জ্বল নক্ষত্র। সেই আলোতে একদিন সমগ্র বাংলা আলোকিত হবে কে জানত। সংগীত, সুর আর অজানাকে জানবার অদম্য আগ্রহই সকল বাঁধাকে অতিক্রমের শক্তির সঞ্চারক হয়েছিল নজরুলের জীবনে। সেই শক্তিই তার স্বদেশপ্রেম বিষয়ক যেকোনো লেখনিতে ঝড় তুলেছিল। নজরুলের রচনার সকল-ক্ষেত্রেই এক চরমতার আভাস পাই সে

হোক স্বদেশ বা প্রেম বা অন্য ধারা। প্রতিদিনের প্রকৃতি যে শিশুকে জীবন শেখায় তার কাছে দুর্বলতার কোনো ঠাঁই নাই। নজরুলের জীবন আমাদের সেই শিক্ষাই দেয়।

মানুষের যেকোনো দুঃখ-কষ্টের মতো পরাধীন ভারতবাসীর অবরুদ্ধতার যন্ত্রণা নজরুলকে মর্মাহত করে দারুণভাবে। তাই এর প্রতিরোধ তিনি প্রকাশ করেন একই তালিকায় অর্থাৎ বলিষ্ঠ চিত্তে। নজরুলপূর্ব কোনো কবি লেখনিতে এমন রক্তঝরা বাণীর ঝঙ্কার আমরা শুনতে পাইনি মূলত সেই একই কারণে। কারণ নজরুল যেভাবে জীবন দেখেছেন অন্য অনেক কবিই সেই জীবন কল্পনাও করতে পারেননি হয়তো। জাতির জীবনের স্তরীভূত পাপ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যে আগুন জ্বলেছিল তারই বহিঃপ্রকাশ নজরুল করেছিলেন তাঁর গানে বিদ্রোহের এক নবধারায়। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতবাসীর অপমান আর ব্যথাবেদনার কথা তিনি নিবিড়ভাবে উপলব্ধি করতেন এবং তা প্রকাশ করতেন বলিষ্ঠ চিত্তে। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই নজরুলের লেখনির মধ্যদিয়ে স্বজাতি ও স্বদেশের প্রতি মমত্ববোধের রূপটি সাধারণের কাছে ধরা পড়ে এবং মানুষের মনে তা স্থায়ী আসন সৃষ্টি করে। ঔপনিবেশিক কোন্দলের অগ্নিশিখায় জ্বলছিল তখন ভারতবাসীর মন। সেই দহন জ্বালায় যেন ঘি ঢেলে দেয় নজরুলের উদ্দীপনা আর আশা জাগানিয়া সুর। সমগ্র ভারত জেগে উঠেছিল তরুণ লেখকের অগ্নিঝরা বাণীতে। প্রতিবাদে কম্পিত হয়েছিল নিপীড়িত অসহায় মানুষের মন। দরিদ্র ও অসহায়ের কবি নজরুল জানতেন সাম্য আর ঐক্যের বাণীই কেবল পারে অসম্ভবের পথকে সুগম করতে। নজরুলের স্বদেশপ্রেমের গানের মধ্যে যত আঙ্গিক পরিলক্ষিত হয় এমন আর কোনো কবির গানে চোখে পড়ে না।

নজরুলগীতি অখণ্ড-এ দেশাত্মবোধক ও উদ্দীপনামূলক নজরুলের যে ১০৯টি গান পেয়েছি তার বিশ্লেষণমূলক আলোচনা এই অধ্যায়ের মূল আলোচনা। প্রাপ্ত ১০৯টি গানকে আমি নিজের ভাবনামতে শ্রেণিভুক্ত করেছি। আলোচনার সুবিধার জন্য সংগীতে নজরুল ইসলামের যে অসামান্য অবদান তা থেকে স্বদেশপর্বের গানসমূহের বৈচিত্র্য ও বিপুলতা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হতে চাই। তিনি গীতিকার ও সুরকার হিসেবে কতটা সফল তার স্বাক্ষর মেলে এই প্রজন্মের কাছে তাঁর গ্রহণযোগ্যতার উপর। 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু' তাঁর এই গানটি যেমন সকল প্রজন্মের প্রাণ জাগানিয়া উদ্দীপনার ডাক তেমনি 'শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ'-এর মতো গান প্রাণকে আন্দোলিত করে স্বদেশমাতৃকার বৈচিত্র্য রূপের মহিমায়। এ প্রসঙ্গে ড. করুণাময় গোস্বামীর উক্তিটি স্মরণীয়,

> "বাংলা দেশাত্মবোধক গানের ধারায় স্বর্ণোজ্জ্বল অবদানের জন্য কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণীয় হয়ে আছেন। তাঁর গান বিপুলতা, বৈচিত্র্য ও গভীরতার জন্য সমসাময়িককালে যেমন অভিনন্দিত হয়েছে, পরবর্তীকালেও তা বাঙালি দেশাত্মবোধক গীতরচয়িতাদের অনুপ্রাণিত করেছে। ভাষায়, সুরে ও ছন্দে কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর দেশাত্মবোধক গীতমালাকে এমন এক পর্যায়ে উন্নীত করেছিলেন যে, তা শুধু সমকালীন আকাঙ্ক্ষাকেই পরিতৃপ্ত করেনি, দেশচেতনার স্থায়ী অনুভবকেও ধারণ করতে সক্ষম হয়েছে। রচিত হবার ষাট বছর পরেও, সেজন্য, এইসব গানের লোকপ্রিয়তা হ্রাস পায়নি। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল বা অতুলপ্রসাদের স্বদেশসংগীতের মতো নজরুলের দেশাত্মবোধক গানও বাঙালির চিরকালীন স্বদেশসংগীতে পরিণত হয়েছে।"[২২]

হারিয়ে ফেলা অতীতের মতো এ যুগেও নজরুলের স্বদেশপ্রেমের গানে ঐক্যের ধ্বনি শোনা যায়। শোষণমুক্ত সমাজ গঠনে তাঁর বিদ্রোহমূলক গানগুলোতে শোনা যায় পরাধীনতার শৃঙ্খল ভাঙার আওয়াজ। তাঁর গানে সাম্যের বাণী ভুলিয়ে দেয় হিন্দু মুসলিম বিভেদ। ঠিক তেমনিভাবে দেশবন্দনার গানগুলোতে ঝিমিয়ে পড়া জাতি সজিব হয়ে ওঠে আপন উদ্দীপনায়। নজরুলের স্বদেশপর্বের যে সকল গান রয়েছে তা নিয়েও খানিকটা মতভেদ রয়েছে। ড. করুণাময় গোস্বামীর *নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ* গ্রন্থে সংখ্যার কোনো উল্লেখ নেই। উক্ত গ্রন্থে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'নজরুলগীতি অখণ্ড, দ্বিতীয় সংস্করণে নজরুলের মোট ১১৫টি দেশাত্মবোধক গান অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'[২৩]

আবার অন্যত্র ড. ব্রহ্মমোহন ঠাকুরের *নজরুলগীতি অখণ্ড* সংস্করণে নজরুলের স্বদেশপর্বের গানের যে তালিকা রয়েছে তাতে ১০৯টি গানের উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং ধরে নেয়া যেতে পারে ১০৯ থেকে ১১৫টির মতো নজরুলের স্বদেশপর্বের গান রয়েছে। যদিও এই সকল গানের মধ্যে স্বদেশের রূপটি ফুটে উঠেছে বহুবিধ বৈচিত্র্যতায়।

আলোচনার সুবিধার্থে নজরুলের গানে স্বদেশচেতনার ভাবার্থ ব্যক্ত করবার প্রয়াসে স্বদেশপর্বের গানগুলোকে কয়েকটি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত করা প্রাসঙ্গিক মনে করি। যেমন–

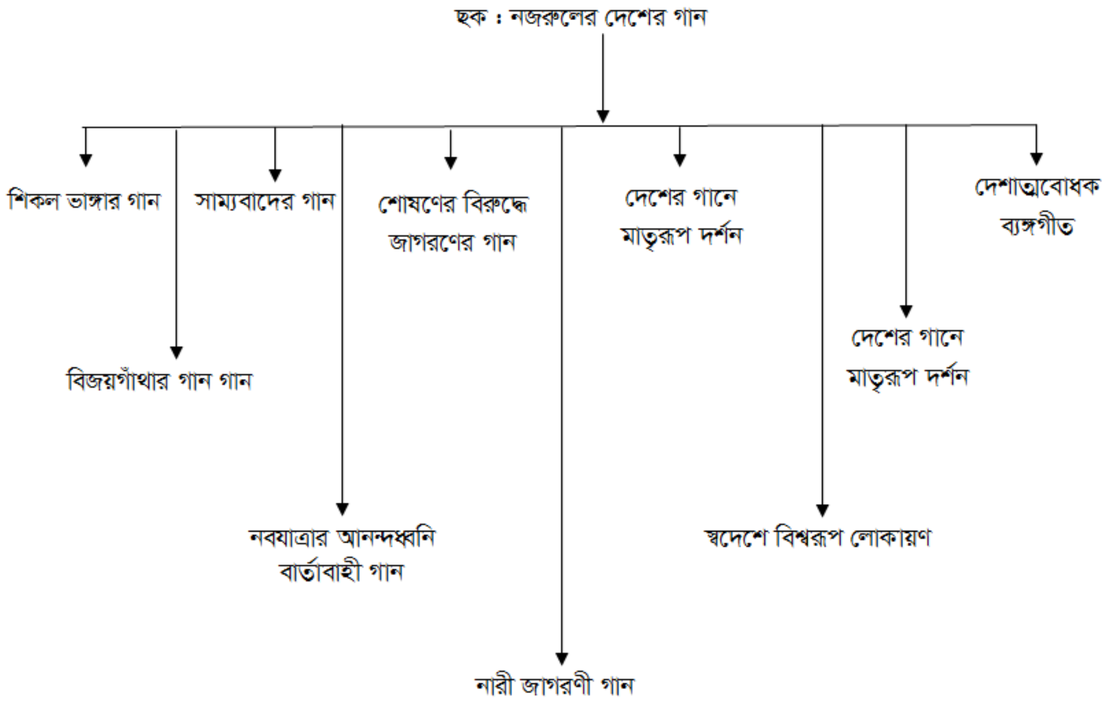

উৎস : গবেষক কর্তৃক প্রণীত।

১. শিকল ভাঙ্গার গান
২. বিজয়গাঁথার গান
৩. সাম্যবাদের গান
৪. নবযাত্রার আনন্দধ্বনি বার্তাবাহী গান

৫. শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণের গান
৬. নারী জাগরণী গান
৭. দেশের গানে মাতৃরূপ দর্শন
৮. স্বদেশে বিশ্বরূপ লোকায়ণ
৯. স্বদেশের গানে প্রকৃতি বন্দনা
১০. দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীত

নজরুল ইসলামের স্বদেশি গান রচনার সময়টা ছিলো ১৯২০ থেকে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত। এই ২২ বছরের রচনায় যে বাণী তিনি সর্বাগ্রে প্রকাশ করেছেন তা হলো সাম্যবাদ। যেখানে নেই কোনো ছোট-বড় ভেদ, নেই হিন্দু-মুসলমানের হানাহানি, নেই ধনী-গরিবের কোন্দল। পূর্বে আলোচিত চার কবি থেকে এই কবি একেবারেই ভিন্ন ধারায় স্বদেশের বাণী ব্যক্ত করেছেন। তাঁর প্রতিটি গানের বাণীতে কোনো করুণধারা নয়, বরং প্রচণ্ড গর্জনে অধিকার ছিনিয়ে আনার ঝঙ্কার শুনতে পাওয়া যায়। কখনো ইতিহাসের গৌরবগাঁথা, কখনো স্বদেশের কোমল রূপ–যাই ব্যক্ত করুন না কেন সম্পূর্ণ আলাদা এক স্বকিয়তা কবির ভাবনা প্রকাশ করার ভঙ্গিটি সকলে আপন করে নিয়েছে।

শিকল ভাঙার গান

নির্যাতিত আর নিপীড়িত মানুষের জন্য নজরুলের আপসহীন ভালোবাসা তাঁকে উদ্বুদ্ধ করে শত ধারায় শিকল ভেঙে মানুষকে আশার আলো দেখার পথ রচনার। গান, কবিতা, প্রবন্ধ, উপন্যাস, খবরের কাগজ বা চিঠিপত্র সর্বত্র তাঁর এই বলিষ্ঠ ও আপসহীন সংগ্রামের আভাস পাই। নজরুল ইসলামের সমস্ত কবিজীবনের সদাজাগ্রত সবচেয়ে দীপ্ত প্রেরণার উৎস হলো শোষণহীন, পীড়নহীন এক সমাজ আর সুস্থ বলিষ্ঠ মানবতা সম্বন্ধে গভীর এক প্রত্যাশা আর তার জন্য ক্লান্তিহীন আপসহীন সংগ্রামের সংকল্প।

নজরুল ইসলাম জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলনের পক্ষে সোচ্চার ছিলেন সারাজীবন। ছাত্র-সৈন্য-কৃষক-শ্রমিক এ সকল পেশায় মানুষের অসন্তোষ নজরুলকে ভাবিত করতো। নজরুল তাদের এই অসন্তোষের বেড়াজাল থেকে স্বাধীনতা, শোষণ থেকে মুক্ত করতে চেয়েছেন। তাদেরকে একত্রিত করার প্রয়াসে রচনা করেছেন বহু কোরাস ধরনের গান বা মার্চ সংগীত। এই সকল সংগীত তখন স্কুল, কলেজ বা যেকোনো মিটিং মিছিলে যুবসমাজ গর্জে উঠতো। গেয়ে উঠতো সমস্বরে–

> "এই শিকল-পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
> এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
> তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হ'তে নয়,
> ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন-ভয়।
> এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে করবো মোরা জয়।"[২৪]

এই গানের সুরে ও ছন্দে অদ্ভুত এক শক্তি সঞ্চারিত হয় মনে। স্বাধীনতার মরণপণ যুদ্ধে আত্মনিবেদনে এ সকল গানের ভূমিকা অসাধারণ। এ যেন এক অর্জিত কণ্ঠস্বর যে সময়ের আহ্বানে যুবসমাজে এক

নবযুগের সূচনা হয় রক্তে লাগে দোলা। পরাধীনতার বন্ধন ছিন্ন করতে এ সকল শিকল ভাঙার গানে নজরুল বন্ধন এবং ত্রাসের অবসান চেয়েছেন বারবার। যেন এক অনাগত দেবতা অগ্রপথিক হয়ে সকল মুক্তি পিপাসুর পথ দেখায়। এই শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী ঝঙ্কার শোনা যায়।

"আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ–বরাভয়
এ যে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয়।
ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খলে ধরি' তা'রে করি উপহাস।"[২৫]
(রাগ : ইমন কাওয়ালী)

কবির ভাষ্যে নিপীড়ন-পীড়নের সময়ের অবসান করতে হবে সকল শৃঙ্খলমুক্ত আনত বন্ধনে। সেই শিকলে এখন বেজে উঠেছে বাঁধনছেড়ার ডাক। শৃঙ্খলে শোনা যায় আগমনীর ঝঙ্কার। কারাগারসম পরাধীন জীবনে কবি এই শৃঙ্খল বন্ধনের অন্তরালে নতুন সূর্যালোক দেখতে পান। শিকলে যেন বেজে উঠেছে বীরের মুক্তি তরবারি। সেই মুক্তি তরবারির পেছনে রয়েছে ত্রিশ কোটি প্রাণের মুক্তি প্রতিষ্ঠা। তাই যে বীর শৃঙ্খলিত হয়ে বাঁধনছেঁড়ার বন্ধনা গীতে উৎসারিত তারজন্যেই গাঁথা হয় বিজয়মালা।

"শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে ॥"[২৬]

কবি তরুণদের বারবার আহ্বান করেছেন শিকল ভাঙার গানে। তরুণ দলের প্রলয়বিষাণে সকল শত্রুদল হবে ভয়ে সংকুচিত। কারাগারের লৌহ-কপাটে অবরুদ্ধ প্রতিজন বীর প্রতিজ্ঞাবদ্ধ স্বদেশমাতার বন্দনাগীতে, স্বদেশমাতার মুক্তি গানে তারা সপিত প্রাণ। তাই যারা শিকলপূজার পাষাণবেদী রচনা করেছেন, সেই রক্ত পিপাসিত নিষ্ঠুরতায় ঘেরা কারাগারের লৌহ-কপাট ভাঙতে তারা প্রস্তুত যেকোনো মূল্যে। যেমন–

"কারার ঐ লৌহ-কপাট,
ভেঙ্গে ফেল, কর্ রে লোপাট
রক্ত-জমাট
শিকল-পূজার পাষাণ-বেদী!
ওরে ও তরুণ ঈশান!
বাজা তোর প্রলয়-বিষণ!
ধ্বংস-নিশান
উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদি।"[২৭]

এই গানে যেমন কবি বজ্রকণ্ঠে কারা ভেঙে মুক্তির আহ্বান করেছেন তেমনি অন্যত্র আকুল নিবেদন জানিয়েছেন কারা-পাষাণ ভেদ করে নারায়ণকে জেগে উঠবার। মৃত্যুক্ষুধাতুর হায়েনাদল হত্যাখুনে কোমল শিশুদের বলিদান দিচ্ছে। শোকে-দুঃখে দিশেহারা মানুষের প্রাণ রক্ষা করতে, সকল শঙ্কা নাশ করতে, সকল লৌহবাঁধন ছিন্ন করে বীরের অন্তরালে লুকায়িত যেই আন্তঃজনগণের নারায়ণকে জেগে উঠতে বলেছেন :

"কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ!

কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ ॥"[২৮]

নজরুলের স্বদেশপর্বের অসংখ্য গান রয়েছে যেখানে শৃঙ্খলিত বন্দী বীরের জয় হুঙ্কারের ডাক শোনা যায়। কারণ বীরকে বন্দী করা যায় কিন্তু বীরের স্বপ্নকে নয়। যেখানেই থাক যত শৃঙ্খলা বেড়ীই থাকুক তারপরেও সে জানে কি করে অগ্রসর হতে হয়। সে অশ্রুসিক্ত হয় স্বদেশমাতার জন্য কিন্তু সে অশ্রুতে ঝরে অগ্নিবারী। সে অশ্রুবারীতে সকল অন্ধকার, অমানিশা আর অত্যাচারীদের জ্বালিয়ে ছারখার করবার প্রতিভা থাকে।

"বন্দী তোমায় ফন্দি-কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীর।
বন্দী তোমার বন্দী-বীর! জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর ॥"[২৯]

কারাবাসে বন্দিরা মুক্তির হাসি হাসে। সে হাসির অন্তরালে থাকে সত্য-জ্যোতি শিখা। বন্দিরা জানে এ শিকল ভাঙবেই। বক্ষে ওর শিলা হস্তে বন্ধন নিয়েও তারা স্বাধীন দেশ বাণীর পবিত্র উচ্চারণের কথা ভোলে না। ভোলে না সম্মুখে অপেক্ষমান জয়টিকার কথা। কারণ বীর কেবল চলতে জানে রুদ্রশিখা জ্বেলে। মরণভয় জয় করে সম্মুকে মুক্তি পতাকার উদ্দেশ্যে কারাযন্ত্রণার অবসানকল্পে সকল বীরের মুক্তিকামী উচ্চারণ :

"আজি রক্ত নিশি-ভোরে,
একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে
মুক্তি-হাসি হাসে ?"[৩০]

সমগ্র বাংলাদেশ জুড়ে তখন চলছিল স্বদেশি আন্দোলনের উত্তেজনা। তৎকালীন জনমানসে নজরুলের এ সকল শিকল ভাঙার গান এক সাড়া জাগানো প্রভাব ফেলে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচেতনার গান যেমন আমাদের ভাবিত করে, নজরুলের গান তেমনি আমাদের চাবুক মেরে জাগ্রত করে। তাঁর গানের আবেগ যেন কোনো বুদ্ধি-বিবেচনাবোধের চিন্তাক্লিষ্ট সৃষ্টি নয়, এ যেন মনের গভীরে লুকায়িত জীবনীশক্তির সুধায় আবৃত। তাই আবেগই তাঁর গানের প্রধান উপজীব্য। এ আবেগ মানে না কোনো বাঁধা-শৃঙ্খল। জানে শুধু যে করেই হোক শৃঙ্খল ভাঙতে হবে, মুক্ত করতে হবে দেশকে। তাই কবি এইরূপ আরো কতিপয় গান রচনা করেছেন। নিচে সেগুলোর উল্লেখ করা হলো :

ক. "ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথার নয়ন ছল-ছল ?"[৩১]

খ. "আজ ভারত-ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার,
আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব, –কে করে মুশকিল্ আসান তার ?"[৩২]

গ. "একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর 'পারে, নিশীথ-অন্ধকারে।
পূরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রু-ধারে, নিশীথ অন্ধকারে।"[৩৩]

ঘ. "এই দেশ কা'র ? তোর নহে আর। রে মূঢ় সন্তান! ভারত মাতার ॥
দেবতার দেশে আজ, দৈত্য ক'রে বিরাজ, মন্দির আজি বন্দীর কারাগার।"[৩৪]

কবির এই গানগুলোতে শৃঙ্খলের এক অন্যরকম অর্থ পাই। কারাগার কেবলই লৌহের বাঁধন হবে তা নয়। যখনই ভারত মায়ের কোনো সন্তান ভীত সংকুচিত হয়ে নিজেকে কেবল বাঁচাবার জন্য আড়ালে থাকে কবি সে জীবনকেও কারাজীবনের সাথে তুলনা করেছেন। দাসত্বের শিকল কবির কাছে লৌহবন্ধনের থেকেও কঠিন। তাই যারা দাসত্বের শিকলকে বরণ করে হাসি মুখে ফেরে কবি তাদের ভারত মায়ের মূঢ়, অযোগ্য সন্তান বলেছেন। মন্দির সমান ঘর আজ বন্দির কারাগার। ঘরের মা যখন দাসি। লজ্জার আর অসম্মানের এ জীবনের অবসানে সকল সন্তানকে কবি জেগে উঠতে বলেছেন। বাঁচার মতো বাঁচতে হলে মনের শিকল ছিন্ন করে দেবতার এ রাজ্যকে শত্রুমুক্ত করতে হবে। পরাধীনতার এ লজ্জা থেকে নিজেদের কলুসমুক্ত করতে হবে। তেমনি বাংলায় মহাত্মার আগমনের আনন্দে সকল প্রাণ দিগ্বিদিক। কংস কারার দ্বার ঠেলে তার আগমন এ বাংলায় মুক্তিপাগল মানুষের কাছে এ দিন বড় আনন্দের, বড় আকাঙ্ক্ষার। এ আগমনে সকল জাত-বিজাতের ব্যবধান ভুলে বামন-মুচি সব এক হয়ে গেল। অর্থাৎ কাউকে না কাউকে এ কারা ভেঙে বের হতে হবে। শিকল ভাঙার উদাহরণই কেবল সৃষ্টি করবে শতসহস্র শিকল ভাঙা পথিকের। যে পথিক পথ দেখাবে মুক্তির পথ দেখাবে নতুন সূর্যালোকিত স্বাধীনতার।

"আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে,
ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে।
আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল ফুটানো-পা ফেলে ॥"[৩৫]

এই গানটিকে আবার বিজয়গাঁথার গানের অংশেও সংযুক্ত করা যেতে পারে। কারণ এতে রয়েছে বিজয়ের আলো। প্রত্যাশিত মহাত্মাকে পেয়ে সকল বাঙালির গর্বের আরতি এ গান।

বিজয়গাঁথার গান

নজরুলের স্বদেশপর্বের অনেক গানেই পাই বিজয়গাঁথার সন্ধান। কারণ বিজয়ী বীরদের ভুলে গেলে, অস্বীকার করলে কোনো বীরের আর জন্ম হবে না। সকল বিজয়ের পেছনে রয়েছে বহু বীরের আত্মত্যাগের গল্প। তাই বীরকে স্বাগত জানাতে হবে, জয়ধ্বনি দিয়ে বরণ করতে হবে সেই নির্ভীক নাবিককে। সকলের অন্তরে ঘুমিয়ে থাকা বন্ধন-জয়ীকে জাগিয়ে তুলতে হবে সকল বিজয়গাঁথার গানে।

"ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা, উড়ুলে আকাশ-পথে।
মাগে, তোমার রথ আনা ঐ, রক্ত-সেনার রথে ॥"[৩৬]

মুক্তির রথ দুয়ারে উপস্থিত, বিজয় পতাকা নিয়ে অপেক্ষমান মুক্তিসেনার দল। নজরুলের এই পর্বের গানসমূহের মধ্যে বিজয়ের আশা দিয়ে, বিজয়ের আনন্দঘোরে, বিজয় ছিনিয়ে আনবার সংকল্প যেন! নিরাশার কথায় অর্জিত জয়ও ফিকে হয়ে না যায়। আর বিজয়গাঁথার গানে লাগে দিবাস্বপ্নের ঘোর। বিজয়ভেরী বাজালেই মনে হয় বিজয় সুনিশ্চিত। তাই বিজয়গাঁথার গান নজরুলের কাছে বিজয়কে ত্বরান্বিত করা, সুনিশ্চিত করা, 'নাই দেরী আর নাই মা দেরী, মুক্ত তোমার হতে'। গানের এ অংশ থেকে এ বিষয়টি সুস্পষ্ট। জয়ধ্বনির একটি প্রচণ্ড শক্তি আছে। সে শক্তিতে সকল জাতি, সকল ধর্মের

মানুষ বিজয়ীর বেশে শামিল হয় মহাযজ্ঞে। এখানে স্বদেশের প্রেমে, মায়ের ভক্তিতে সকল জৈন-পার্শি-বৌদ্ধ-শাক্ত খ্রিষ্টান-বৈষ্ণব একই মাতৃছায়ায় আশ্রিত। তাই কবি সকল আর্যাবৃত্ত তথা ভারতবর্ষের জয়গান গাইছেন মুক্ত কণ্ঠে। যেমন–

"কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান
জয় আর্য্যাবৃর্ত্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥[৩৭]

এমন অনেক বিজয়গাঁথার গান আছে কবি নজরুলের যেখানে সাম্যের কথা ওঠে এসেছে। কারণ বিজয় মানেই সাম্যতা, সকল ভেদাভেদের অবসান হলেই তবে বিজয় ত্বরান্বিত হয়। শ্যামলা বরণা বৃক্ষলতায় শোভিত আমাদের জন্মভূমি, রোদ-বৃষ্টি মেঘবিষাণের আর জলদ-মন্দ্রের এই দেশে যুগে যুগে কত বীরের জন্ম হয়েছে। এমন সুন্দর ভূমিতে শত্রুবেশে আগতজনেরও বন্ধু হতে সময় লাগে না। আর বিজয়ী বীর তোর স্বদেশ মায়ের কোলে আসন নিয়েছে স্বগৌরবে। তাই এ মায়ের কোলে হিন্দু-মুসলমান সকলের সহ-অবস্থান। সকলে সমস্বরে গায় এর মায়ের বিজয়গাঁথার গান।

জনগণই এই মায়ের শক্তি। তাই জয় জয় বলে এই জনগণকে জেগে উঠতে বলেছেন কবি। কবি অনাগত বীরকে আহ্বান করেছেন মায়ের সকল বেদনা, কলঙ্ক বিমোচন করতে। কবি বলেন :

"এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়।
এসো চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।
জয় জয়!
জয় জয়।
এস বীর অনাগত
বজ্র সমদ্যত।
এস অপরাজেয় উদ্ধত নির্দ্দয়।"[৩৮]

অপরাজেয় উদ্ধত যুগঅগ্রনায়ককে কবি জয় জয় বলে আহ্বান করেছেন। সকল মৌন জনগণে সেই জ্যোতির্ময় ঘুমিয়ে আছে। সে জেগে উঠলেই সকল ক্রন্দন দূর হবে। আবার নতুন দিনের শুরু হবে। কবি তাঁর বিজয়গাঁথার সাথে সেই সকল নবআলোকবর্তিকাবাহী বীরদের জয়গান করেছেন। কবির কাছে জনগণই সকল অধিপতি। এই নিঃশঙ্ক, নির্ভরকে কবি দেবতাজ্ঞানে পূর্ণ করতে চান।

"জয় হে জনগণ-অধিপতি জয়।
হে দেবপূজ্য-নিঃশঙ্ক নির্ভয় ॥"[৩৯]

তাঁর রচিত আরো কিছু এ ধারার গান রয়েছে যেখানে বিজয়ীর বিজয়ের বন্দনা করা হয়েছে দেশমাতৃকার জন্য সর্বস্ব উৎসর্গের কারণে–

ক. "চলরে চপল তরুণদল বাঁধন-হারা
চল্ অমর সমরে চল্ ভাঙি' কারা
ঝাগায়ে কানন নব পথের ইশারা ॥"[৪০]

খ. "বল নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!"[৪১]

গ. "শুধু নদীয়ার নহ তুমি,
আজ বাঙলার গৌরব।
দিক দিগন্তে লুটাইয়া পড়ে তব যশঃ-সৌরভ ॥"[৪২]

ঘ. "সালাম সালাম জামালউদ্দীন আফগানী তসলীম।
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য্য–পুরুষ মহামহিম ॥"[৪৩]

ঙ. "চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শত কোটি লোক।
চীন ভারতের জয় হোক !
ঐক্যের জয় হোক ! সাম্যের জয় হোক!"[৪৪]

এই গানটির মধ্যে কবি এই দুই দেশের বীরদের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। '১৯৪২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে চীনের নেতা চিয়াং কাইশেক কলকাতা সফরে এলে গ্রামোফোন কোম্পানির অনুরোধে নজরুল 'চীন ও ভারত মিলেছি আবার' গানটি রচনা করেন। এটিই তাঁর রচিত সর্বশেষ উদ্দীপনাগীতি।'[৪৫]

সাম্যবাদের গান

সাম্যবাদের কবি নজরুলের হৃদয়জুড়ে ছিলো কৃষক-শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা। তাঁর দেশাত্মবোধক গানের এক বিরাট অংশ জুড়ে রয়েছে সাম্যবাদের বাণী নিঃসৃত সুরের ঝঙ্কার। নারী-পুরুষ, ধনী-গরিব, হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান থেকে মানুষের মনুষ্যত্ববোধকে তিনি বড় করে দেখেছেন সবসময়। কবি মানুষের হৃদয়ের পবিত্রতাকে মন্দিরের সাথে তুলনা করেছেন। বলিষ্ঠ কণ্ঠে তাই ব্যক্ত করেছেন সাম্যবাদী কবিতায়–

"মসজিদ এই, মন্দির এই, গির্জা এই হৃদয়,
এইখানে বসে বসে ঈসা মুসা পেল সত্যের পরিচয়।...
মিথ্যা শুনিনি ভাই,
এই হৃদয়ের চেয়ে বড়ো কোনো মন্দির-কাবা নাই।"[৪৬]

মানবতা ও সাম্যের এক অপূর্ব সমন্বয় কবির এই সাম্যবাদ কবিতাটি। মানবদরদী সাম্যবাদী এই কবি সকল শ্রেণির, সকল পেশার মানুষকে ভালোবেসেছিলেন। যেমন–

> "লাঙল'-এর প্রথম সংখ্যাতেই প্রকাশিত হয় নজরুলের বিখ্যাত কবিতা 'সাম্যবাদী'। কবিতাটি কয়েকটি উপ-শিরোনামে বিভক্ত। মানবতাবাদ ও সাম্যবাদের অপূর্ব সমন্বয়ে কবিতাটি ব্যঞ্জিত। মানুষের প্রতি এমন গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন সম্ভবত দুর্লক্ষ্য। জাতি-ধর্ম, ধনী-নির্ধন, কৃষক-শ্রমিক, কুলি-মজুর, চোর-ডাকাত, পাপী-তাপী সকল মানুষের প্রতিই কবির অকুণ্ঠ ভালোবাসা। তত্ত্বগত বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদের এত কাছাকাছি নজরুল ছাড়া সেকালের অন্য কোনো কবি-সাহিত্যিক যেতে পারেননি। এ কারণেই তিনি সাম্যবাদী কবির আখ্যা পেয়েছেন।"[৪৭]

কবি নজরুলের জন্মভূমি চুরুলিয়া বেশ অনুন্নত ছিলো। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ বাস করতো বাড়ির পাশেই। দলিত সম্প্রদায়ের মানুষের বহুবিধ অভাব-অনটন, বঞ্চনা আর দুঃখ-কষ্টকে খুব কাছ থেকেই অবলোকন করেছেন কবি। তাই ছোটবেলা থেকেই সকল স্তরের মানুষের প্রতি একটা মমত্ববোধ নিয়েই কবি বেড়ে উঠেছেন। একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ হয়ে উঠেছেন। কখনোই কোনো একটি নির্দিষ্ট ধর্মকে তিনি বড় করে দেখেননি। ধর্মীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে যে 'মানব ধর্ম' তাই তিনি ঘোষণা করেছেন বারংবার তাঁর সকল সৃষ্টিতে।

মানুষেরই জন্য সকল ধর্ম। তাই নজরুলের সংগীতে মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা-ভালোবাসা সর্বাগ্রে প্রকাশ পায়। গণমানুষের কবি ছিলেন নজরুল। মানুষের প্রতি মমত্ববোধ, সম্মান প্রদর্শন তাঁর কাছে প্রথম ধর্ম। সাম্যবাদের বাণীর মাধ্যমে এই মানুষে মানুষে সকল ভেদাভেদ ঘুচাতে চেয়েছেন কবি। কবির ভাষায় :

"মোরা একই বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥"[৪৮]

যদিও এই গানের বাণী আজ নিভৃতে কাঁদে। কারণ কবি নজরুল দেশমাতাকে মানবদেহের সাথে তুলনা করে মুসলিমকে নয়ন-মণি আর হিন্দুকে তাঁর প্রাণ কল্পনা করে যে সম্প্রীতি আর সৌহার্দের কথা বলে গেছেন স্বাধীনতার ৫০ বছর পরেও সে সাম্যবাদ আজ সহসাই হুমকির মুখে পড়ে কতিপয় উগ্রবাদীর আগ্রাসনের কারণে। অথচ এরই বিরুদ্ধে গিয়ে কবি শত বছর আগে রচিত গানে ধর্ম-বর্ণ জাতের ঊর্ধ্বে রেখেছিলেন মানুষের সত্তাকে। ধর্মের আচারনিষ্ঠতা যেন মানুষকে হেয় প্রতিপন্ন না করে তার প্রকাশ পাই কবির 'মানুষ' কবিতাসহ অসংখ্য গানে। একই দেশের মাটিতে জন্ম, বেড়ে ওঠা। কেবলই মৃত্যুর পরে ঠাঁই কারো শ্মশানে, কারো গোরস্থানে। একই ভাষায় কথা বলা, একই নাড়ির টান। কবি একই বৃন্তের দুটি কুসুম বলে তুলনা করেছেন হিন্দু-মুসলমানকে। এমন করে স্বদেশের গানে সাম্যবাদের কথা বলা নজরুলের গানেই তা কেবল সম্ভব। তাই স্বদেশের মানুষ যখন ধর্ম সংক্রান্ত যেকোনো সংকটে বাংলার মানুষের সম্প্রীতি নষ্ট করবার চক্রান্ত চালাতে থাকে তখন নজরুলের এই সাম্যবাদী গান হাতিয়ার হয়ে ধরা দেয়। প্রতিটি বাঙালির প্রাণে যদি এই গানের বাণী সমস্বরে বাজে তবে কোনো উগ্রপন্থির ঠাঁই এই বাংলায় সম্ভব নয়। এমনই সম্প্রীতিহানিকর পরিবেশের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে কবি রচিত অনেক স্বদেশপর্বের গান রয়েছে যেখানে সাম্যবাদ মূখ্য ভূমিকায় থাকে। কবির ভাষায় :

"সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা-পথে এসো মোরা যাই।
সঙ্ঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই ॥"[৪৯]

যখন সকল ধর্মের মানুষ, বর্ণের মানুষ এক হয়ে পথে নেমে সত্য সন্ধানের উদ্দেশ্যে, মুক্তির প্রত্যাশায় তখন জয় সুনিশ্চিত। কারণ সেখানে কোনো ছোট-বড় ভেদাভেদ থাকে না, থাকে শুধু একটিই সংকল্প সকলের প্রাণে। তাই কবি এই গানের একাংশে বলেছেন, ভারতে তেত্রিশ কোটি মানুষ সত্ত্বেও কেবল ঐক্য না থাকার কারণে, ধর্ম-বর্ণের এত ভেদাভেদের কারণে আজ পরাধীন। ঐক্যের শক্তিতে সকল দুর্জয়কে জয় করা যায়। অজেয়কে জয় করা সহজ হয়ে যায়। তাই সাম্যবাদকে নজরুল তাঁর গানে-কবিতায় তথা সামগ্রিক রচনায় এতটা গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেছেন। নিজেকে প্রকাশ করেছেন এক অনির্বাণ সাম্যবাদী কবি হিসেবে।

হিন্দু-মুসলিমের আত্মিক রেষারেষিকে কবি অনুভব করেছিলেন বাঙালিত্বের এক নিগূঢ় সমস্যা হিসেবে। কারণ দেশের থেকে যখন ধর্ম বড় হয়ে যায় তখন ভ্রাতৃত্ববোধে বিঘ্ন ঘটে, বাধে বিপত্তি। তাই কবি

বারংবার হিন্দু-মুসলিম এই দুই বৃহৎ জনগোষ্ঠীকে ভাই বলে, একই মায়ের সহোদর বলে ব্যক্ত করেছেন :

> "হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
> এক বৃন্তে দু'টি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই ॥"[৫০]

সৃষ্টিকর্তা একজনই। একই আমাদের রক্তের রং। অথচ ধর্ম ধর্ম করে এই রক্ত ঝরাতে কুণ্ঠাবোধ করে না মানুষ। তাই যখন বিধাতা শাস্তি দেন দুই ধর্মই সমান সাজা পায়। কেউ কম কেউ বেশি নয়; দেশে মড়ক লাগলে যেমন দুই জাতির মানুষই মারা যায়, তেমনি বন্যাতে দুই জাতির ঘরই ভেসে যায়। আবার বিধাতার ভালোবাসাও দুই জাতির প্রতি সমান। দুইজনের শস্য ক্ষেতেই তিনি সমান বৃষ্টি দেন এবং মাঠ সোনার ফসলে ভরে ওঠে। চাঁদের আলোয় সকলকে সমানভাবে মোহিত করে। কারো ঘরে বেশি, কারো কম নয়। কবি বারবার এই তফাৎকে ঘুচাতে চেয়েছেন তাঁর লেখনিতে। কারণ তিনি জানতেন বাইরের কোনো শক্তিই আমাদের পরাহত করতে পারবে না যদি আমাদের মাঝে ঐক্য থাকে। তাই কবি হিন্দু ও মুসলিম এই দুই ধর্মের ভ্রাতৃত্ববোধকে সংঘবদ্ধ করতে একই ধারায় কয়েকটি গান রচনা করেছেন। যেমন-

> ক. "ভারতের দুই নয়ন-তারা হিন্দু-মুসলমান।
> দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান হিন্দু-মুসলমান ॥"[৫১]
>
> খ. "ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায় টেনে নে না তারে কোলে।
> মুছিয়ে দে তার নয়নের জল সে যে আপন মায়ের ছেলে ॥"[৫২]
>
> গ. "হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা।
> এক বাগানে দুটী তরু–দেবদারু আর কদমচার ॥"[৫৩]

জাতীয় অধ্যাপক রফিকুল ইসলামের *নজরুল জীবনী* গ্রন্থ থেকে জানা যায়, নজরুলের পিতা কাজী ফকির আহমদ ইন্তেকাল করেন ১৯০৮ খ্রি., নজরুলের বয়স তখন মাত্র ৮ বছর। আমরা জানি কাজী নজরুল ইসলাম জন্মেছিলেন ধর্মভীরু, রক্ষণশীল এক মুসলিম পরিবারে। যৌথ পরিবারে সদস্য সংখ্যা অধিক হওয়ার কারণে সংসারে নানারকম অভাব লেগেই ছিলো পিতা কাজী ফকির আহমেদের। পিতার মৃত্যুর পর ১০ বছর বয়স থেকেই সংসার চালানোর জন্য নজরুলকে মক্তবে শিক্ষকতার কাজ শুরু করতে হয়। মাজার শরীফের খাদেম হিসেবেও কাজ করেন। আবার কখনো করতে হয়েছে মসজিদে ইমামতি। অর্থাৎ নিগূঢ়ভাবে ইসলাম ধর্মকে জানা একজন অন্য ধর্মের প্রতি এমন শ্রদ্ধাশীল হওয়াটাই প্রকৃত ধর্মের উদ্দেশ্য। জীবনের প্রতি বাঁকে বাঁকে নজরুল পেয়েছেন বিচিত্র অভিজ্ঞতা। ধর্মনিষ্ঠ নজরুল দারিদ্র্যের সাথে সংগ্রাম করতে করতে শেখেন সকল ধর্মের মানুষের ক্ষুধাই সমান। কষ্টগুলোও একই রকম। ঘরের চালা ফুটো থাকলে বৃষ্টির পানি যেমনি সকলের ঘর সমানভাবে সিক্ত করে, তেমনি চাঁদের আলো সেই ফুটো দিয়েই সকলের ঘরকে সমানভাবে আলোকিত করে। সেখানে কোনো ছোট-বড়, হিন্দু-মুসলমানের ব্যবধান নেই। কারণ বিধির বিধান সকলের জন্য সমান ও সত্য। তাই কবি বলেছেন–

> "পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর,
> বিধির বিধান সত্য হোক!"[৫৪]

নজরুলের স্বদেশপ্রেমের এই গানটির মধ্যে কবি ব্যক্ত করেছেন জাতের চেয়ে মানুষ সত্য। প্রাণশক্তিই সকল চিন্তার কেন্দ্র। খ্রিষ্ট, বুদ্ধ, কৃষ্ণ, মোহাম্মদ আর রাম–এঁরা সকলেই মানুষ ছিলেন এবং মানুষকেই তাঁরা বুকে টেনে নিয়েছিলেন। জীবদ্দশায় এঁরা প্রত্যেকেই মানুষের সমালোচনার পাত্র হয়েছিলেন। তাঁদের ব্যতিক্রম ভাবনায় মানুষের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা পরিবর্তন করতে চেয়েছিলেন। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথিবীতে এসেছিলেন মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য। প্রত্যেকের বক্তব্যও একই ছিলো মানবের কল্যাণ সাধন। বিধির বিধানও তাই। তাই কবি বিধির বিধানকে সত্য করবার প্রার্থনা রেখে গেছেন বারবার। 'ভাইয়ের দোরে ভাই কেঁদে যায়...' নজরুলের এই গানটির মধ্যেও একই দেশে জন্ম প্রত্যেককে পরম আত্মীয় মনে করেন কবি। কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষের গড়া পুঁথিগত নিয়মের কারণে এতকাল ধরে চলে আসা সুন্দর ভাই ভাই সম্পর্ক সে বাঙালিত্বের অহংকার ছিলো তা যেন নষ্ট হয়ে না যায়। কারণ একজনের বিপদে পাশের প্রতিবেশীই এগিয়ে আসবে সে হিন্দু না মুসলমান সে ভাবনায় বসে থাকলে হয়তো সব শেষ হয়ে যাবে। তাই দেশমাতৃকার সকল সন্তানকে ভ্রাতৃরূপে গণ্য করতে কবির আহ্বান। জাত-পাত ভুলে ধর্মজ্ঞানের পরম সত্য যে মানুষের কল্যাণ সাধন, এই ভাবনায় নিজেকে দীক্ষিত করে সকলকে বুকে টেনে নিতে বলেছেন কবি। কর্ম-ধর্ম হোক সবার সমান। দেশের ঊর্ধ্বে কিছু নয়। সাম্যবাদের মর্মবাণীতে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দেশমাতাকে শ্রদ্ধা করতে হবে, নিজের জন্ম সার্থক করতে হবে। একই লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে দুর্বার গতিতে।

"হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত
হোক সার্থক নাম।
হোক এই জাতি ধর্মে এক, কর্মে এক, মর্মে এক—
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে, পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্য্যাবর্ত্তধাম ॥"[৫৫]

নবযাত্রার আনন্দধ্বনি বার্তাবাহী গান

নজরুলের স্বদেশপর্বের গানের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের উৎস খুঁজতে হলে তাঁর সংগীতে প্রতিফলিত মানসপ্রবণতা ও সংস্কৃতি-সচেতনতার স্বরূপ অনুসন্ধান বাঞ্ছনীয়। কারণ নজরুল ইসলাম তাঁর গানে স্বদেশের ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক ধারাকে এমন নিবিড়ভাবে সমন্বয় করেছেন যে তাঁর কোনো ভাবনাকে বিচ্ছিন্ন মনে হবে না।

স্বদেশের মানুষের প্রাণসত্তা ও মানসপ্রবণতা নজরুলের স্বদেশের গানে মর্মহিত হয়ে ওঠে। কবি নজরুল দেশের এই প্রাণময়তাকে তাঁর গানের অলঙ্কারে রূপ দিতে গিয়ে এর ঐতিহাসিক ভাঙাগড়া ও জাতিগত ধ্যান-ধারণাসহ এর সাংস্কৃতিক বিবর্তন ও বৈশিষ্ট্যের রূপরেখাও প্রকাশ করেছেন যেমন তেমনি বহু স্বদেশের গানে পাই নবযাত্রার আনন্দধ্বনির হুংকার। স্বদেশের সংস্কৃতিকে শক্তিশালী করে, প্রাণসত্তাকে সম্বল করে নবীন আশায় শঙ্কাশূন্য হয়ে বজ্র-আলোকে সকলকে নবযাত্রার পথে নামবার আহ্বান করেছেন কবি। কবির ভাষায় :

"আজ ভারতের নব যাত্রাপথের
বাঁশি বাজলো, বাজলো বাঁশি।

ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এল তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি।"[৫৬]

সে যুগে ভারতীয় জনগণের প্রাণের প্রত্যাশা এবং প্রধান সংগ্রাম ছিলো সাম্রাজ্যবাসীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা। নজরুলের দেশাত্মবোধক এই সকল গান পরাধীন জনগণের মনে তুলেছিল সেই প্রলয়ের দুর্নিবার তুফান। তাঁর আগমনী নবযাত্রার বার্তাবাহী এই সকল গানে প্রভাতের পাখি গায় জাগরণী গান। অটল হিমালয়, সাগরে শঙ্খধ্বনি উঠেছে, বাঁচাতে হবে মৃত মানব প্রাণের হাহাকার রব। নতুন এই যাত্রা পথে আঁধারের শত্রুও আজ পরম আত্মীয়ের প্রত্যাশায়।

"এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র! এসো পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি' পুনঃ বন্ধ-কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ!"[৫৭]

মাদারীপুর শান্তি সেনাবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র দাস মহাশয়ের কারামুক্তি উপলক্ষ্যে রচিত এই গানে কবি সংহতি ও জাতিগত বৈশিষ্ট্যের রূপরেখা তুলে ধরেছেন দেশীয় ঐতিহ্যের রূপায়ণের যথার্থ প্রয়োগ। বাংলাদেশের বুকের মানিক বলে সম্মোধন করে কবি স্বাগত জানিয়েছেন রূপক অর্থে সাবাস শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নবমহাবলীকে যারা নবপথ রচনার আলোকবার্তাবাহী আলোকঝটিকা বয়ে চলেছেন। দেশীয় ঐতিহ্যের দুর্জেয় এই রূপায়ণ প্রকাশ নজরুলের স্বদেশপর্যায়ের গানের এক অনন্য ও ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য। এই রূপভাবনার গানের মধ্যদিয়ে কবি প্রচলিত ধর্মের নামে জাত-পাতের সংঘাতকে যেমন ভ্রূকুটি হেনেছেন তীব্র ভাষায়, তেমনি তিনি বোঝাতে চেয়েছেন ধর্মের বহিরাবরণ আচরণ-আয়োজন যা দিয়ে আমরা মত্ত থাকি তা কখনো মানবহৃদয়কে বড় করে না বরং সংকীর্ণতার নিমজ্জিত করে। প্রকৃত সত্যের আলোর সন্ধান দেয় কেবল মানবহৃদয় যা পারে কেবল নতুন আলোর আনন্দযাত্রার দুয়ার খুলতে। এই আলোর মিছিলে কবি সবসময় তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন আগে। কবি যে সময়টাতে গান রচনা করেছেন সে সময় ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক ভেদ-রাজনীতি প্রকট হতে থাকে। ধর্ম ও সম্পদায়ের ঊর্ধ্বে মানুষ পরিচয়কে কবি মূলমন্ত্র করে সকলকে সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করতে চেয়েছেন আর এই আয়োজনে কবি সর্বদা তরুণদের সম্মুখ নেতা করতে চেয়েছেন। এইরূপ কিছু স্বদেশের গান নিচে উল্লেখ করা হলো :

ক. "চল্ রে চপল তরুণদল বাঁধনহারা।
চল অমর সমরে চল ভাঙি কারা
জাগায়ে কানন নব পথের ইশারা।"[৫৮]

খ. "জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে।
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে
ডাকে উষসী আলো।"[৫৯]

গ. "জাগো রে তরুণ দল।
(স্বতঃ) উৎসারিত ঝর্ণাধারার প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল ॥"[৬০]

ঘ. "নবীন আশা জাগ্ল যে রে আজ!
নূতন রঙে রাঙা তোদের সাজ ॥"[৬১]

ঙ. "জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী।
জাগো জাগো ঐ পোহাল তিমির রাত্রি!"[৬২]

চ. "বীরদল আগে চল্।
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল।"[৬৩]

কবির বিশ্বাস তরুণ ও যৌবনই পারে প্রাণের চাঞ্চল্য অদম্যভাবে প্রকাশ করতে, জগতের সকল গ্লানি ও সংকীর্ণতাকে দূরীভূত করে পৃথিবীকে প্রাণের ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ ও নবীনরূপে জাগ্রত রাখতে। সকল কুসংস্কার, অবসাদ ও জড়তার আবর্ত থেকে তরুণরাই পারে মানুষের মনকে মুক্ত করে নবযাত্রার আনন্দধ্বনির প্রেরণা হতে। নতুনের প্রাণচঞ্চলতা, অদম্য সাহসিকতা, পিছুটান ও সংস্কারমুক্ত মনোভাবই কেবল অসম্ভবের স্বপ্ন পূরণে দুর্নিবার ছুটে চলার পথ রচনা করে। যুগে যুগে বিপ্লব ঘটিয়ে তরুণরাই পৃথিবীকে সজাগ রাখতে পারে। তাই কবি তরুণদের শির উঁচিয়ে জগতের মাঝে দাঁড়াতে বলেছেন। শীর্ণ হয়ে বসে থাকবার দিন শেষ। দুন্দুবী-ডাক বাজিয়ে সকলকে জাগিয়ে তুলবার সময় এটা। কাননে নতুন পথের ইশারা জেগেছে, সে নতুন পথ মুক্তির পথ, স্বাধীনতার পথ। কবি বাঁধনহারা, ঘরছাড়া তরুণ দলকে তাজা প্রাণের মঞ্জরি ফুটিয়ে পথে নামতে বলেছেন।

আঁধার ঘরে যে একলা পড়ে আছে কবি তাদের জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব দিয়েছেন তরুণ দলকে। নব-আলোকে, জ্ঞানদীপ্ত চোখে নিশি পোহাবার আনন্দে যাত্রা শুরুর আহ্বান করেছেন কবি। নববিস্ময়ে তাই কল্পনার মায়া আবরণে কবি সকল কালোকে নাশ করে প্রভাত পাখির গানে বিভোর হতে নতুন যাত্রার পথিক হতে বলেছেন কবি। তবে এ পথ মসৃণ নয়। পুরাতন জঞ্জাল, কুসংস্কারের জগদ্দল শিলা, শাস্ত্রের প্রাচীরে এ পথ রুদ্ধ। কবি নজরুল তাঁর এ পর্যায়ের গানে এই সকল জরাজীর্ণতাকে তরুণের শক্তিবলে ধ্বংস করে নতুন পৃথিবী গড়তে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন।

ব্রিটিশ উপনিবেশে বিশেষ করে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ভারতবর্ষ বহুবিদ সমস্যা-দ্বন্দ্ব-হতাশা ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় নজরুলমানসে গভীর ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। তারই বহিঃপ্রকাশ পাই তাঁর কিছু গানে। ধর্মের বড়াই, নিজ নিজ ধর্মীয় মূল্যবোধকে শ্রেষ্ঠ প্রমাণের এক পৈশাচিক প্রতিযোগিতার রূঢ়তাও কবি তুলে ধরেছেন তাঁর গানে। 'খেলাফত-অসহযোগ-সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের (১৯০২-১৯৩০) মূলমন্ত্র–সম্পৃক্ত মানুষের অন্তর–জিজ্ঞাসায় ও প্রত্যাশায় ভারত উপমহাদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গন ছিলো অস্থির।'[৬৪] এই অস্থিরতা ফুটে উঠেছে নজরুলের গানেও। নবযাত্রার আলোর পথ রচনার জন্য এ সকল বিবাদমান সম্প্রদায়ের বিষয়-বিবেচনাহীন আবেগ ও ঈর্ষায় উদ্ভ্রান্ত মানুষকে শান্ত করতে হবে। স্বদেশপ্রেম, মানবপ্রেম ও সমাজ পরিবর্তনের আশা-আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির লক্ষ্যে কবি মুক্তির গান রচনা করেছেন।

কবি নজরুল শাসন-শোষণমুক্ত, পরাধীনতা ও অত্যাচার মুক্ত একটি পৃথিবী রচনা করতে চেয়েছেন। দেশের দারিদ্র্যপীড়িত, হতাশাক্লিষ্ট এবং পরাধীনতার অভিশাপে অভিশপ্ত জীর্ণ প্রাণকে জাগাতে কবি মুক্তির গান বেঁধেছেন। সামাজিক ও রাজনৈতিক হতাশাসহ টানাপোড়নে ক্ষত-বিক্ষত জাতির মনে নতুন আশা ও উদ্দীপনার স্বপ্ন দিতে আলোর পথ রচনায় নতুন পথের সন্ধানে আনন্দবার্তাবাহী গান রচনায় ব্রতী হন। এহেন কিছু দেশাত্মচেতনানির্ভর গানের উল্লেখ করছি–

ক. "জগতে আজিকে যারা
আগে চলে ভয়-হারা।
ডেকে যায় আজি তারা,
চল্ রে সুমুখে চল।"[৬৫]

খ. "ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে কারা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এল নবীন পাতা পল্লব-হীন শাখে ॥
ক্ষুদ্র আমার শুকনো ডালে
দুঃসাহসের রুদ্র ভালে
কচি পাতার লাগরো নাচন ভীষণ ঘূর্ণিপাকে ॥"[৬৬]

গ. "দুর্গম দূর পথে চল যাত্রী।
ভয় নাহি, নাহি ভয় বলো যাত্রী ॥"[৬৭]

ঘ. "ব্রজ আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়,
জয় জীবনের জয়।
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাবো শক্তির বিস্ময়,
জয় জীবনের জয়।"[৬৮]

ঙ. "বাঁশী বাজাবে কবে আবার বাঁশরীওয়ালা।
তব পথ্ চাহি ভারত-যশোদা কাঁদিছে নিরালা ॥
বাঁশরীওয়ালা ॥"[৬৯]

এই সকল গান রচনার মূল উপলক্ষ্য ছিলো রাজনৈতিক ও সামাজিক বিরাজমান দুরবস্থায় বাংলার বিপ্লবী যুবকেরা, তরুণেরা যেন রাজশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে পারে, আওয়াজ তুলতে পারে। নজরুল জানতেন সমাজে বিপ্লব মানে তরুণরাই অগ্রগামী হয়ে কলঙ্কমুক্ত করবে। জীবনের সকল গ্লানি, কলুষতা, মলিনতা এবং অবসাদ দূর করতে কবি আনন্দযাত্রার পথিক হতে আহ্বান করেছেন।
চলার বেগে নতুন পথের সন্ধান হবে। সে পথ কি বারতা বয়ে আনবে তা নির্ভর করবে স্ব স্ব কর্মের উপর। ভবিষ্যৎ রচনার আশায় অতীতকে ছুঁড়ে ফেলে নয় বরং অতীতের অভিজ্ঞতার সমন্বয় করে সম্মুখে এগুতে হবে। বিশ্বসভাস্থলে সকলের সাথে মিলিত হতে হবে। পল্লবহীন বৃক্ষের নতুন পাতা বেরিয়ে আসায় আনন্দে নতুনের মহোৎসব লাগে। কবি সেই ভয় ভাঙানো অভয়-মহাত্মাকে প্রণাম জানিয়েছেন। দুর্গম দূর পথের যাত্রীকে 'ভয় নাহি ভয় নাহি' বলে সাহস জুগিয়েছেন কবি। দুর্জয় চঞ্চল যাত্রীকে অজানাকে জয়ের লক্ষ্যে মরুপথের যাত্রী হতে বলেছেন।
এই ধারায় রচিত আরো কিছু স্বদেশপ্রেমের গান আমরা এখানে উল্লেখ করতে পারি যেখানে কবি তরুণকে নবপথের আহ্বানে জেগে উঠবার আহ্বান জানিয়েছেন বাঁধা অতিক্রম করে–

ক. "ঘোর–
ঘোর রে ঘোর রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥"[৭০]

খ. "বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নবযুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত-যুগান্তরে রে।
বল জয় সত্যের জয় আসে ভৈরব-বরাভয়
শোন অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে ॥"[৭১]

গ. "শঙ্কাশূন্য লক্ষকণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই ॥"[৭২]

ঘ. "স্বপ্নে দেখেছি ভারত-জননী
তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত! নবীন ভারত!"[৭৩]

ঙ. "বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও
ভীম বজ্র-বিষাণে দূর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও!
অগ্নি-তুর্য্য কাঁপাক সূর্য বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব–।"[৭৪]

উপরের প্রতিটি গানে কবি নবযুগের ডাকের কথা, যুগান্তরের আহ্বানের কথা ব্যক্ত করেছেন। কবি এই সকল গানে এক উন্মত্ত যৌবনের প্রকাশ দেখিয়েছেন। মাভৈঃ বীণার ডঙ্কা মেরে প্রলয়ঙ্কররূপে অন্ধকার রাতের কালোকে নিধন করতে চেয়েছেন। শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে শঙ্খ বেজে উঠেছে। কবি নতুন পথের সেই নির্ভীক যাত্রীকে বাধা ও ভয়কে তুচ্ছ করে নবপথের দিশা রচনায় ব্রতী হতে আহ্বান করেছেন। কারণ শক্তিরূপে দেশমাতার আশীর্বাদ টিকা ললাটে আঁকা আছে। তাই নির্ভীক চিত্তে কেবল সম্মুখে এগিয়ে চলার সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন কবি এই পর্যায়ে আলোচিত গানসমূহে।

শোষণের বিরুদ্ধে জাগরণের গান

"আমি উত্থান, আমি পতন, আমি অচেতন-চিতে চেতন,
আমি বিশ্ব-তোরণে বৈজয়ন্তী, মানব-বিজয়-কেতন ॥"[৭৫]

কবি নজরুল তাঁর সামগ্রিক রচনায় অচেতন জাতির চেতন ফেরাবার সাধনা করে গেছেন তাঁর নিজস্ব পন্থায়। নজরুলের গানে স্বদেশচেতনাকে বুঝতে হলে অবশ্যই তাঁর জাগরণমূলক গানের পর্যালোচনা একান্ত প্রয়োজন। নজরুল মানুষের সর্বোচ্চ মর্যাদার কথা ঘোষণা করেছেন। মানুষের শক্তি অপরিসীম। তাই তিনি প্রকাশ করতে চেয়েছেন নানাভাবে। মানুষের বন্দিদশা, ভিরুতাকে, পরাধীনতাকে কবি ধিক্কার জানিয়েছেন। নিজের পায়ের শেকল ভাঙতে নিজেকেই জেগে উঠতে হবে।

নজরুলের স্বদেশি সংগীতগুলো নিদ্রাচ্ছন্ন জাতির বুকে এক নতুন স্পন্দন এনে দেয়। জাগরণের জোয়ারে স্বদেশচেতনায় দেশ-জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়তে। পূর্বের আলোচনায় আমরা পেয়েছি যে, দেশাত্মবোধক গান রচনায় রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়সহ অন্য দুই কবি রজনী-অতুল প্রসাদেরও যথেষ্ট অবদান আছে। কিন্তু নজরুল ইসলামের স্বদেশপর্বের গানে যে উন্মাদনা তা তাঁদের সুর চেতনায় সেই উন্মাদনার আঘাত হানে না। যেমন–'চল্ চল্ চল্ ঊর্ধ্বে গগনে বাজে মাদল', 'অগ্রপথিক হে সেনা দল', 'জাগো অনশন বন্দী', 'জাগো নারী, জাগো বহ্নিশিখা', 'টলমল টলমল পদভরে, –বীর দল চলে সমরে'। এই সকল গানে এক রকম উত্তেজনা, পৌরুষ ব্যক্ত রয়েছে। কবি এই সকল গানে ব্যান্ডের সুর, মার্চের সুর প্রয়োগ করে গানগুলোকে একপ্রকার অগ্নিশিখাদীপ্ত আগুনঝরা গান করে তুলেছেন। যেখানে জাগরণের বাণী হয়ে ওঠে ভাগ্য পরিবর্তনের সোপান–

ক. "ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা
ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান!"৭৬

খ. "জয় হোক জয় হোক–
শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক ॥"৭৭

গ. "জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাঙলাদেশের কাশী।"৭৮

ঘ. "জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয় !
ভারত চাহে তোমার হে বীর-বরণীয় ॥"৭৯

ঙ. "জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো ভাগ্যহত।
তব গৌরব-কেতন সমুন্নত
ঐ হল আনত ॥"৮০

নজরুলের জীবদ্দশায় দেশের বিভিন্ন জায়গায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়েছিল। এমন কি কলকাতায়ও দাঙ্গা হয়েছিল যা নজরুলকে ভীষণভাবে আঘাত করে। তিনি তাঁর বিভিন্ন গানে এর সরব বিরোধিতা করেছেন এবং এর অবসানে বহু প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে নজরুলের অন্তর্নিহিত আন্দোলনের বহিঃপ্রকাশ তাঁর জাগরণমূলক বা উদ্দীপনামূলক গান। নজরুলের স্বদেশ সংগীত ভাণ্ডারের সমগ্রটা জুড়ে রয়েছে অসাম্প্রদায়িকতার ছাপ। শুনেছি একই বৈঠকে বসে কবি যেমন ইসলামি গজল, হামদ-নাত লিখেছেন, তেমনি কীর্তন ও শ্যামাসংগীতও লিখেছেন। জীবনের শুরু থেকেই তিনি সমন্বয়বাদী ছিলেন। হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মকেই তিনি শ্রদ্ধার চোখে দেখেছেন, তেমনি ধনী-গরিবের ব্যবধান নিরসনে কৃষকদের জেগে উঠতে আহ্বান করেছেন। কবির ভাষায়–

"ওঠরে চাষী, জগদ্বাসী, ধর ক'ষে লাঙল।
আমরা মরতে আছি–ভাল করেই মরব এবার চল্ ॥"৮১

কাজী নজরুল ইসলাম কৃষকদের জাগ্রত করার লক্ষ্যে শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী করতে রচনা করেন 'কৃষাণের গান'। 'সর্বহারা' গ্রন্থে প্রকাশিত এই গানটি বিপুল জনপ্রিয়তা পাওয়ার সাথে সাথে সর্বহারা শব্দটিও প্রথম সকলের কাছে উন্মোচিত হয় এবং তৎকালীন সময়ে খুবই প্রাসঙ্গিক একটি উচ্চারণ হয়ে ওঠে। লাঙল পত্রিকায় ৮ই পৌষ ১৩৩২ সংখ্যায় কৃষাণের গান প্রকাশিত হয়। চাষীদের উজ্জীবিত করতেই মূলত কবির এ গান রচনা। কবি কৃষকের সকল জড়তা কাটিয়ে তার উঠানভরা শস্যের মায়াভরণের কথা স্মরণ করে সাহসী হতে বলেছেন, সকল লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হতে বলেছেন। কারণ কৃষকের লাঙলের শক্তি যেকোনো অস্ত্রের চেয়ে অধিক শক্তিশালী। লাঙলই পারে ক্ষুধাতুর মানুষের ক্ষুধা নিবারণ করতে, তাই কৃষকের গুরুত্ব কৃষককেই উপলব্ধি করে জেগে উঠবার আহ্বান করেছেন কবি।

১৯২৬ সালের ৬ ও ৭ই ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে নিখিল বঙ্গীয় প্রজা সম্মিলনের দ্বিতীয় অধিবেশন বসে। ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনের উদ্বোধনী সংগীতরূপে শ্রমিকের গানরূপে কথিত এই গানটি নজরুল রচনা করেন এবং নিজেই তা সম্মেলনে পরিবেশন করেন। এ

প্রসঙ্গে হেমন্ত সরকার জানিয়েছেন : "কনফারেন্সের জন্য গান লেখার ফরমাস করা গেল নজরুলকে। তাঁকে একটা ঘরের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়ে আদায় করলুম দু'টি গান–'ধ্বংস পথের যাত্রীদল',আর 'ওঠরে চাষী জগৎদ্বাসী ধর কষে লাঙল'। বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের গান ছিলো না এর আগে, নজরুলই তার পথকার।"[৮২]

নজরুলের সংগীত রচনাকর্মে জীবনবোধ ও চিন্তাধারায় যে সময়ের প্রত্যাশা ফুটে উঠেছে সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে–যা সমকালীন অন্য কোনো সংগীত রচয়িতার মধ্যে লক্ষ্য করা যায় না। ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকদল ভারতবর্ষে প্রায় দু'শ বছর রাজত্ব করে। সেই শাসনের বেড়াজাল থেকে বেরিয়ে আসার জন্য নজরুল সংগ্রাম করেছেন তাঁর রচনাকালের শেষ দিন পর্যন্ত। তাই নজরুল তাঁর প্রত্যেক কর্মে স্পষ্ট করে তাঁর স্বদেশপর্যায়ের প্রায় প্রতিটি গানে জাগরণের মন্ত্রকে তুলে ধরেছেন–যা মানুষকে আত্মজাগরণ এবং স্বাধীনতা মন্ত্রে উদ্দীপ্ত করেছে।

> "অগ্নিযুগের অন্যতম পুরুষ ও স্বাধীনতা যজ্ঞের ঋত্বিক বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কাছ থেকে নজরুল শিখেছিলেন বিপ্লববাদের দীক্ষা। মুক্তি-আন্দোলনের নেতা মুজফ্‌ফর আহমদের সাহচর্য ও বন্ধুত্বে নজরুল মুক্তিযুদ্ধের যে মূর্তি উপলব্ধি করেছিলেন তা তাঁর কাব্যে একটি বিশেষ বিদ্রোহ ও বিক্ষোভের রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।"[৮৩]

কবি নজরুল উপলব্ধি করেছিলেন কৃষকের গোলাভরা ধানের যে আনন্দ তা বিলুণ্ঠিত করেছে ইংরেজ শাসক। দস্যুবেশে এসে তারা লাঞ্ছিত করছে। লক্ষ্মীমায়ের কোলে তারা থাবা বসিয়েছে। সেই মায়ের কাঁদনে কৃষকের সকল সুখ শত সাগরের লোনা জলে মিশে গেছে। এই শাসন ও শোষণ থেকে পরাধীন কৃষক, মা ও মাটিকে মুক্ত করতে কবি বিপ্লবী সংগ্রামীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। লাল নিশান উড়িয়ে নববসন্তের সূর্যকে জাগাতে আহ্বান করেছেন কবি। শত বছরের মৃত্যুবাণ প্রতিহত করে চিরবসন্তের যৌবনকে জাগাতে, পুরাতনের দাসত্বকে বিদায় জানাতে আহ্বান করেছেন কবি। সর্ব অকল্যাণ-পীড়ন আর অশান্তির, মিথ্যা ভ্রান্তির ক্ষয় চেয়েছেন কবি শান্তি আর সাম্যের জয়ের প্রত্যাশায়। এই উপমহাদেশের মানুষ নানারকম গোড়ামী, ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার, বর্ণবিদ্বেষ, জাতি-বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, শ্রেণিবিদ্বেষ প্রভৃতি বহুবিধ পাশবিক আবরণে নিজেদেরকে অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখেছিল। তারা নিজের পায়ে নিজেরাই শেকল পরে। কবি সেই শেকল ভাঙতে চেয়েছেন, সকল ক্ষয়ের বিনাশ করে জয়ের নিশান উড়াতে চেয়েছেন।

তন্দ্রামগ্ন ভারতবাসীকে জাগাতে কবি সকল দেশপ্রেমিক বীরকে জেগে উঠবার আহ্বান করেছেন। মন্দিরের বিগ্রহ ধুলায় লুটায়, লক্ষ্মীর চরণের আলপনাও মুছে যায়। কবি বাংলা মায়ের এ রূপ সমুন্নত রাখতে সকল তরুণ দলকে, সকল বীরকে দণ্ড হাতে সকল বঙ্গবাসীকে জেগে উঠতে বলেছেন। কবির ভাষায় :

"জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপ-চণ্ডাল তোদের বাংলাদেশ কাশী–
জাগো বঙ্গবাসী ॥"[৮৪]

অসাধারণ গানের পঙ্‌ক্তিমালায় গাঁথা এই সকল গানে কবি যে সকল উপমা দিয়েছেন তাতে যেমন শাসকগোষ্ঠীর জন্য মনে ঘৃণা জন্মে তেমনি কাতর অবহেলিত মায়ের জন্য বুক কেঁদে ওঠে। তাই জাগরণের বাণীকে কবি তাঁর লেখনির প্রধান হাতিয়ার করেছেন। বঙ্গবাসী জেগে না উঠলে কখনোই তার দাসত্ব থেকে মুক্তি মিলবে না। কবি তা খুব স্পষ্টই বুঝতে পেরেছিলেন। এমন আরো কিছু গান রয়েছে এই পর্বে–

ক. "আয় রণজয়ী পাহাড়ী দল
শক্তি-মাতাল বুনো পাগল।
থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ
নেচে আয়রে দৃপ্ত পায়।"[৮৫]

খ. "আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে
আশা-অরুণ রবি।
মৃত জনগণে বাঁচাতে এল যেন
নূতন প্রাণ-জাহ্নবী ॥"[৮৬]

গ. "এ কোন পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙ্গিনায় ॥
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তার সঙ্গে যায় ॥"[৮৭]

ঘ. "এ দুর্দিন রবে না তোর আসবে শুভদিন।
নতুন আশায় বুক বাঁধ রে অন্ন-বস্ত্র-হীন।
রাত পোহাবে, এই আঁধারে রইবি না তুই ডুবে,
আশায় সূর্য্য উঠবে আবার পুবে।"[৮৮]

ঙ. "এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর !
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলী ঝলক ন্যায়-অসির।"[৮৯]

চ. "আজ ভারতের নব আগমনী।
জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান।
জাগরণী গায় প্রভাতের পাখী,
ফুলে ফুলে হাসে গোরস্থান ॥"[৯০]

কবি শোষণের বিরুদ্ধে যে সকল সংগ্রামী গান রচনা করেছেন তাতে অর্থনৈতিক মুক্তি এবং শোষণমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠার বাসনাই স্পষ্টত প্রকাশ্য। শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামমূলক জাগরণী বার্তাবাহী এই সকল গানে নজরুল সর্বহারা মানুষের উত্থান ও বিকাশের বাসনা করেছেন।

নজরুল শ্রমিকদের নিয়ে গান রচনা করেছেন। শ্রমিকের হাতের হাতুড়ি আর কাঁধের শাবল তার জীবন চালিকার প্রধান হাতিয়ার জীবিকা অর্জনের অবলম্বন। কবির ভাষায় :

"উড়াও উড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান ॥
শীতল শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি' ফোটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়ে ঘুম।"[৯১]

লাল নিশান উড়িয়ে কবি শ্রমিকদের জেগে উঠতে বলেছেন। এই গানটিতে শ্রমিকের হাতের হাতিয়ারকে তার শ্রমকে সর্বোচ্চ সম্মান প্রদর্শন করেছেন কবি। শ্রমিকের শ্রম এবং ত্যাগের ফলেই

দেশ উন্নতির মুখ দেখে। তাই সকল প্রাপ্তি হওয়া উচিত শ্রমিকের-কৃষকের। মুজফ্‌ফর আহমদ সম্পাদিত 'গণবাণী'তে নজরুলের 'সর্বহারা'দের জাগরণ ও বিজয়ের বাণী প্রকাশিত হতে থাকে। তবে শ্রমিকদের জাগরণের জন্য নজরুলের শ্রেষ্ঠ গান হিসেবে প্রতীয়মান হয় তাঁর 'অন্তরন্যাশনাল গান' নামে খ্যাত গানটি। 'ইন্টারন্যাশনাল সঙ' মূল গানটি ফরাসি কবি ইউজিন পাঁতিয়ের রচনা করেছিলেন। এর ইংরেজি ভাষান্তরটি করুণাময় গোস্বামীর *নজরুল গীতি প্রসঙ্গ* গ্রন্থ থেকে সংযোজন করা হলো :

"Arise, ye prisoners of starvation,
Arise, ye wretched of the earth.
For justice thunders condemnation
A better world's in birth.
No more tradition's chains shall bind us,
Arise, ye slaves, no more in thrall
The earth shall rise on new foundations.
We have been nanght, we shall be all."[৯২]

এই ইন্টারন্যাশনাল সঙ-এর ইংরেজি ভাষান্তরের বঙ্গানুবাদ করেন কবি নজরুল :

"জাগো–
জাগো অনশন-বন্দী, ওঠরে যত
জগতের লাঞ্ছিত ভাগ্যাহত ॥
যত অত্যাচারে আজি বজ্র হানি
হাঁকে নিপীড়িত-জন-মন-মথিত বাণী,
নবজনম লভি অভিনব ধরণী
ওরে ওই আগত ॥"[৯৩]

এই গানটি সম্পর্কে মুজফ্‌ফর আহমদ তাঁর কাজী *নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা* গ্রন্থে লিখেছেন,

> "নজরুল ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল সংগীতের নাম দিয়েছে অন্তর ন্যাশনাল সংগীত। হয়তো সকলে জানেন না যে, ইন্টান্যাশনাল সংগীতের একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই গানটির ভিতর দিয়েই মজুরশ্রেণীর আন্তর্জাতিকতা বিশেষভাবে ফুটে উঠে। সারা দুনিয়ার মজুরশ্রেণীর মধ্যে যে একটা সংঘবদ্ধতা আছে তাও প্রকাশ পায় এই গানটির ভিতর দিয়া। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষায় এই গানটি গাওয়া একই সুরে। মজুরশ্রেণীর কোন বিশ্ব সম্মেলনে এই গানটি গাইতে শুনলে আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়। হয়তো চল্লিশটি দেশের লোকেরা চল্লিশটি বিভিন্ন ভাষায় একই সুরে একই সঙ্গে গানটি গেয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে বিভিন্ন ভাষীরা গানটি গাইছেন। প্রথমে একজন ফরাসী মজুর এই গানটি লেখেন। পরে নানান দেশের নানান ভাষায় তর্‌জমা হয়ে গানটি বিশ্বসংগীতে পরিণত হয়।
>
> ১৯২৬ সালে আমি নজরুলকে এই গানটি বাংলায় তরজমা করতে বলি। তার জন্যে গানের একটি ইংরেজী কপি তো তাকে জোগাড় করে দিতে হবে। চেষ্টা করেও আমি এমন একখানা বই জোগাড় করতে পারলাম না যাতে ব্রিটেনের মজুররা যে তরজমাটা গান তা পাওয়া যায়। আমেরিকার তরজমাটি পাওয়া গেল আপ্টন সিংক্লেয়ারের হেল নামক নাটিকায়...।"[৯৪]

জাগরণীপর্বের গানে নজরুলের আরো কিছু গানের সংযুক্তি প্রাসঙ্গিক মনে করছি। যেমন–

ক. "ঝড়-ঝঞ্ঝার ওরে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥"[৯৫]

খ. “দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরাণ
গাহে আজি উদ্ধত গান।
লঙ্ঘি’ গিরি-দরী
ঝঞ্ঝা নূপুর পরি’
ফেরে মন্থন করি’ অসীম বিমান ॥”[৯৬]

গ. “পর হবে তোর আপন জনে
(তুই) ভাবনা তবু করিস্ নে
হয়ত তরী ডুববে জলে
(তবু) তুফান দেখে ডরিস নে ॥”[৯৭]

ঘ. “ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী
সন্তান দ্বারে উপবাসী,
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জগো গো,
জাগো রে! জাগো রে!”[৯৮]

ঙ. “জননী ! জননী ! আবার জাগো শুভ্র শারদ-প্রাতে
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে ॥”[৯৯]

এই পর্বের প্রতিটি গানে আশা জাগানিয়া এক উদাত্ত ভাবের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। কখনো কবি নিজের লক্ষ্যে নীরবে নিভৃতে পথ চলতে অটল থাকতে বলেছেন, কখনো উদ্ধৃত গানে মার্চের সুরে দুরন্ত দুর্ম্মদ প্রাণ অফুরানের আনন্দে মৃত্যুকে নিঙড়ে জীবনকে বরণ করতে বলেছেন। আবার পরক্ষণেই কবির মানবতার ভিক্ষা চাইছেন মুক্তি চাইছেন জাগো জাগো বলে। উপবাসী সন্তানের মুখে অন্নের জন্য পুরোবাসীকে জেগে উঠতে বলেছেন। উপস্থাপনগত দিক, সুরের ঝঙ্কার যেমনই হোক নজরুলের এ সকল গানেই তিনি রূপক শব্দের অদ্ভুত ব্যবহারে ঝিমিয়ে পড়া জাতিকে জাগাবার আমরণ সংগ্রাম করে চলেছেন যেন।

নারী জাগরণী গান

অত্যন্ত আধুনিক ভাবনার কবি সর্বহারাদের কথা, সাম্যবাদের কথা যেমন বলেছেন তেমনি বলেছেন নারী জাগরণের কথা। নজরুলের দেশভাবনার গানে সুনির্দিষ্টভাবেই নারী জাগরণের উদাত্ত আহ্বান প্রকাশ করেছেন কবি। এই সকল গানের সংখ্যা খুব বেশি না হলেও এক এবং অদ্বিতীয় এই গানে ফুটে উঠেছে বাংলার কুসংস্কারের আধারে তলিয়ে যাওয়া নারীদের আশার সূর্য ম্লানে আত্মপরিত্রাণের প্রেরণামূলক বাণী। যে দেশ মাতৃরূপে তুল্য সেই দেশের নারী অবহেলিত থাকতে পারে না। তাই কবি মূলত নারী জাগরণের শক্তির মধ্যদিয়ে দেশাত্মবোধ জাগাতে চেয়েছেন। এ ধারার গানে এই গানটি খুবই সাড়া জাগানিয়া। কবির ভাষায় :

“জাগো নারী জাগো বহ্নি-শিখা।
জাগো স্বাহা সীমন্তে রক্ত-টীকা ॥
দিকে দিকে মেলি’ তব লেলিহান রসনা,
নেবে চল উন্মাদিনী দিক্‌বসনা।”[১০০]

অর্থনৈতিক মুক্তি যে কেবল নারীকে তার সত্যিকারের সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারে নজরুল তা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন এবং গৃহকন্যার কাজের বাইরেও সমাজ পরিবর্তনে নারীর ভূমিকা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করেই নজরুল এই গানটি রচনা করেন। নারী জাগরণ সম্পর্কে প্রবোধকুমার সান্যালের উদ্ধৃতি এখানে প্রাসঙ্গিক যা *নজরুল গীতি প্রসঙ্গে* গ্রন্থ থেকে উপস্থাপিত হলো :

> "আমাদের উদ্দেশ্য সামনের দিকে থাকবে একটি পাঠাগার–সেখানে থাকবে নানা রকমের বই এবং পড়াশোনার সুবিধা। ঘরখানা আলমারি দিয়ে পার্টিশন করা হবে। ভিতরের দিকে থাকবে শুধু একখানা বড় রকমের তক্তপোষ, সেখানে আনন্দমঠের সন্তানরা, অর্থাৎ বিপ্লবীরা গোপনে এসে মিলিত হবে। এই আইডিয়াটা পাওয়া গিয়েছিল 'সিমলা ব্যায়াম সমিতি'র কল্যাণে : সামনের দিকে বাৎসরিক বারোয়ারী দুর্গাপূজো, ভিতরের দিকে সকল দলের বিপ্লবীদের বাৎসরিক সঙ্গোপন সম্মেলন।
>
> পাছে আনন্দমঠের উদ্বোধন অনুষ্ঠান গোয়েন্দা পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি আকর্ষণ করে সেজন্যে আমরা স্থির করলাম এর উদ্বোধন করা হবে হাজরা রোডের বাড়িরই নিচতলায়। এখানে উঠোন ছিলো প্রশস্ত, যেটি সমাবেশের পক্ষে সুবিধাজনক ছিলো। আমি নিজে গিয়ে কাজী নজরুল, নলিনীকান্ত সরকার এবং কাকে কাকে যেন নিমন্ত্রণ করে এলুম। আমাদের মূল উদ্দেশ্য যে পাঠাগার নয়, এটি ইষ্টমন্ত্রের মতো সকলের কাছেই চেপে রাখতে হলো। এটি একটি মহিলা প্রতিষ্ঠান ও সমাজসেবাকেন্দ্র–এটিই প্রচারিত থাকল। নলিনীদা ও নজরুল আমাকে অবিশ্বাস করেন নি।
>
> আনন্দমঠ-এর উদ্বোধনের দিন বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিনিধিদের আনিয়েছিলুম। দক্ষিণ কলকাতার বহু নেতৃস্থানীয়া মহিলা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন। উদ্বোধনসংগীত গাইল নজরুল তার অনবদ্য কণ্ঠে। এই উপলক্ষে সে একটি গান রচনা করেছিল : জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা।"[১০১]

বর্তমানেও সর্বাধিক প্রচলিত এই নারী জাগরণী গানটি প্রবল তেজোময় ও শক্তিদীপ্ত গান হিসেবে নারী দিবসসহ যেকোনো নারী আন্দোলনের স্লোগানে গাওয়া হয়ে থাকে।

"আমি মহাভারতী শক্তিনারী।
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা, স্বাহা-আমি তেজ-তরবারি ॥
আমি আশা-দীপ, জ্যোতি,–আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম, সংহতি।
আমি ভবনে করুণা-কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি ॥"[১০২]

বাংলার নারী মহাভারতী শক্তিরূপিনী। নারী শান্ত, ত্যাজ জ্যোতির্ময়ী তড়িতলতা। কি প্রেম, কি মায়া! করুণা-সংহতি–সকল কিছুর এক আশ্চর্য সম্মিলন একজন নারী। অশান্ত পৃথিবীকে শান্ত করতে যেমন নারী পারে তেমনি পরাজিত বীরকে নিরাশার ভেলা হতে উত্তোলন করে দেখায় আশার পথ। নারী এমনই আলোর বন্যা আধার বিনাশী। নারীকে এমন করে শ্রদ্ধা জানাতে খুব কম লেখনিতেই পাই। স্বদেশচেতনার এই গানে কবি নারীর স্তুতি বন্দনার মধ্যদিয়ে মূলত স্বদেশের মাতৃরূপেরই স্তুতি বন্দনা করেছেন। এমনই আরো গান পাই 'চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা', 'মেলি শত দিকে চাঁদের লেলিহান রসনা'। এই সকল গানে নজরুল চাঁদের আলোর সাথে নারীর কীর্তিকে তুলনা করেছেন। নারী কেবল চুড়ির ঝঙ্কারে মোহিত থাকে না, তারা জানে বিপদে পথ দেখাবে, দেশের মানুষকে রক্ষা করতে তরবারী ধরতেও। নারী চিন্ময়ী, রণ-রঙ্গিনী, নারী লক্ষ্মী ও স্বরসতী–এক সম্মিলিত জ্ঞানের আধার।

"চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কি শক্তিমতি ॥
শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী,
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারী।"[১০৩]

এ প্রবন্ধে স্বদেশচেতনা উদ্বুদ্ধকরণে নারী জাগরণের আরো একটি আহ্বান যুক্ত করতে চাই। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ আছে যে, 'তুরস্কের নারী জাগরণের অগ্রদূতিকা খালিদা এদিব কলকাতায় এলে তাঁকে কারমাইকেল হোস্টেলের ছেলেরা অভ্যর্থনার আয়োজন করেন। এই উপলক্ষ্যে কবি ছেলেদের অনুরোধে গানটি রচনা করেন।

"গুণে গরিমায় আমাদের নারী আদর্শ দুনিয়ায়
রূপে লাবণ্যে মাধুরী ও শ্রীতে হুরী-পরী লাজ পায় ॥
নর নহে, নারী ইসলাম, পরে প্রথম আনে ঈমান
আম্মা খাদিজা জগতে সর্বপ্রথম মুসলমান।"[১০৪]
রাগ : মালকোষ মিশ্র, তাল : দাদরা।

নারী মুক্তির ভাবনার সাথে নজরুলের স্বদেশচেতনামূলক গানে স্বদেশকে মাতৃরূপে দর্শনের কিছু উদাহরণও পাই যেমনটি আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপর্যায়ের গানে। এ বিষয়ে নিচে আলোকপাত করছি।

দেশের গানে মাতৃরূপ দর্শন

শ্যামাসংগীত রচনায় সিদ্ধহস্ত নজরুল বরাবর মাতৃভক্ত। সেই সময়েরই রূপ তিনি দেখতে পান জননী জন্মভূমির কল্পনায়। মাতৃজ্ঞানে তিনি স্বদেশের প্রতি যেমন শ্রদ্ধা নিবেদন করেন তেমনি স্বদেশের মাটির প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার বহিঃপ্রকাশ আমরা দেখতে পাই তাঁর গানে। কবি জন্মভূমির প্রতি তাঁর ঋণ স্বীকার করেন তাঁর রচিত গানের মাধ্যমে। কবির ভাষায়–

"জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥"[১০৫]

কবির কাছে জন্মভূমি দেশ মায়ের মতোই পবিত্র। যে মায়ের চরণে মাথা নোয়ালে স্বর্গসুখ লাভ করা যায়। শিক্ষা-দীক্ষায় সকল প্রাপ্তিতে পূর্ণ করে এই দেশজননী মানুষ হতে শিখায় আমাদের। তাই স্বর্গের ঐশ্বর্য এই মায়ের মাটির গন্ধের কাছে কিছু নয়। কবি মূলত এই গানের প্রতিটি উক্তিতে দেশমাতার প্রতি ঋণ স্বীকার করেছেন। আবার সরল মায়ের মতো এর উদারতায় স্বার্থান্বেষী ইংরেজরা এই মাকেই দাসী করতে দ্বিধা করেনি। দেশমাতা যেন কবির চোখে চিরাচরিত বাংলার মা। কবির ভাষায়–

"ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ আশার সোনার রথে ॥
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধনগীতি।"[১০৬]

এই গানটির মধ্যে কবির চরম উৎকণ্ঠা দেখতে পাই। কবি এই ভারতমাতাকে লক্ষ্মীরূপে ফিরে আসতে বলেছেন শোষকশ্রেণি বাংলার কৃষক, শ্রমিক সকলকে বহুবিধ অত্যাচারে জর্জরিত করে মায়ের সোনার ধানভরা কোল আজ শূন্যপ্রায়। সন্তানের মুখে অন্ন নেই। ত্রিশ কোটি সন্তানের হাহাকারে উত্তপ্ত বাতাস। মায়ের সন্তানদের এ যন্ত্রণা অসহনীয়। তাই কবি আগমনীরূপে নারীবেশে ভারতমাতাকে দেশমাতাকে আবার ভারতে প্রত্যাবর্তন করতে আরাধনা জানিয়েছেন। ত্রিশ কোটি সন্তানের বোধনগীতি এ মাকে

জাগতেই হবে। সন্তানের চোখের জলে মায়ের চরণ ধৌত করে বাংলা মাকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করে আজ উৎসবের বাহন করে আগমনের জয়ধ্বনি ব্যক্ত করেছেন কবি এই গানে।

এছাড়াও কবির এই ধারার মাতৃজ্ঞানে স্বদেশের প্রতি নিজের শ্রদ্ধা নিবেদনের আরো কিছু গান রয়েছে।

ক. "এস মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে।
রাজরানী মা'র ভিখারিনী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে ॥"[১০৭]

খ. "ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে
ভুলে আছিস দেশ জননী কেমন ক'রে ॥"[১০৮]

গ. "স্বদেশ আমার! জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ।
দিনের পরে মা দিন চ'লে যায় এলো না সে শুভদিন ॥"[১০৯]

স্বদেশে বিশ্বরূপ লোকায়ন

দেশপ্রেম জাগ্রত করা স্বদেশের গানের প্রধান লক্ষ্য। এ দিক দিয়ে নজরুল অত্যন্ত সফল একজন গীতিকবি। অপরূপ কথার রূপবার্তায় কবি দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে দেশকে মাতৃজ্ঞানে যেমন পূজা করেছেন, তেমনি আবার এই দেশের মধ্যেই কবি বিশ্বরূপ অবলোকন করতেন। এ দেশ কেবল আমাদের জন্মভূমি জননীই নন দেশে-বিদেশে নন্দিতা বিশ্বের প্রাণ। ভারতমাতার নৈসর্গিক সৌন্দর্য এবং বিজয়গাঁথা গৌরব সমগ্র বিশ্বের কাছে একে বরণীয় করে তুলেছে। কত মণি ধ্বনির জন্ম এ মায়ের কোলে। ধনে-সম্পদে ঐশ্বর্যশালী বলেই বিদেশিদল ঘাটি বাঁধে এ মায়ের বুকে। কবির ভাষায়–

"আমার সোনার হিন্দুস্থান !
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ ॥
ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারে বারে এলো ভগবান ॥"[১১০]

এই গানটি বিশেষত দেশবন্দনার হলেও ভারতমাতাকে পৃথিবীর বড়কন্যা ও আদি মাতারূপে আখ্যায়িত করেছেন কবি। পৃথিবীর আদি সভ্যতা, সৌন্দর্যের প্রকাশ, শিল্প-সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রেই ইতিহাসে ভারতমাতা সর্বাগ্রে গণ্য। এই এক ভারতমাতাতেই বিশ্বরূপ অবলোকন সম্ভব। গিরিশৃঙ্গ, গঙ্গা, বিরান মরুভূমি এমনকি বরফ আচ্ছাদিত পাহাড়-ভূমি সকলের লীলাভূমি এ ভারতমাতা। শুধু তাই নয় পার্সি-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু-খ্রিষ্টান-শিখ-মুসলমান সকল ধর্মের মানুষের আশ্রয়স্থল এই দেশ। এই বিপুলতায় পৃথিবীর সকল দেশকেই জাতি করেছে আপন মহিমায়। এ ধারার আরো কিছু গান পাই নজরুলের স্বদেশপর্বের গানের ভাণ্ডারে যেখানে স্বদেশচেতনাকে সমুন্নত রাখতে, স্বদেশের প্রতি মানুষের মমত্ব বাড়াতে কবি বিশ্ব মায়ের দরবারে বাংলা মায়ের মর্যাদা তুলে ধরেছেন।

ক. "কালোর শঙ্খে বাজিছে আজও তোমারই মহিমা, ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভূবন শিখিছে আজিও তব আদর্শ ॥"[১১১]

খ. "খোলো মা দুয়ার খোলো,
প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো
দুপুরেই ডুবল দিবাকর গো।

সমরে শয়ান ওই, সূত তোর বিশ্বজয়ী,
কাঁদনে উঠছে তুফান-ঝড় গো ॥"[১১২]

গ. "জয় ভারতী শ্বেত শতদল বাসিনী,
বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী!
কণ্ঠ-লীনা বাজিছে বীণা,
বিশ্ব ঘু'রে গাহে সে সুর
জয় জয় বীণাপাণি ॥"[১১৩]

ঘ. "নমঃ নমঃ নমঃ হিম-গিরি-সূতা
দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায়
মর্ত্তে করিলে ধন্যা ॥"[১১৪]

শিক্ষা-সভ্যতা-দীক্ষার সকল ক্ষেত্রেই নিখিল মানবের প্রথম শিক্ষক এ ভারতমাতা। দেবতার উপরে এ ভারতমাতার স্থান। মৃত্যুভয় তুচ্ছ করে এ ভারত মায়ের সন্তানেরা একে স্বর্গজ্ঞান করে। বিশ্বে এর থেকে ঐশ্বর্যশালী আর কে আছে! এ ভারতমাতা যেন দেবমানস কন্যা, হিমগিরি সুতা। চারিদিকে শস্যবন্যা, শ্যাম অঞ্চলে আবৃত্ত এ বাংলাদেশের রূপ পৃথিবীর সকল দেশের থেকেও সেরা।

স্বদেশের গানে প্রকৃতি বন্দনা

স্বদেশ বন্দনার কিছু গানে কবি নজরুল স্বদেশ মাতার অপরূপ রূপেরও বর্ণনা করেছেন। এর প্রকৃতি কতো মনোরম সুশোভিত, সবুজের মায়ায় এর চারিধার এমন করে বেষ্টিত যে এই বন্ধন ছেড়ে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে সুখে থাকা সম্ভব হয় না। প্রকৃতিই বাংলার আসল সম্পদ। এই ঐশ্বর্যে এর রূপ কানায় কানায় পূর্ণ। বাংলা মায়ের অপরূপ রূপের কবি যে সকল দেশবন্দনার গান রচনা করেছেন তা অত্যন্ত সফল এবং সর্বজন সমাদৃত। জন্মভূমির প্রতি গভীর ভালোবাসা সঞ্চার করা হয়েছে–এই ধারার গানের মূল প্রেরণার উৎস–

"নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম
চির-মনোরম চির মধুর
বুকে নিরবধি বহে শত নদী
চরণে জলধির বাজে নূপুর ॥"[১১৫]

১৯৩২ সালে অর্থাৎ ভারতবর্ষ স্বাধীনতার পূর্বে এই গানটি রেকর্ড করা হয়। বাংলাদেশের রূপের মহিমাকে কবি এই গানে প্রণতি জানিয়েছেন বারংবার। বাংলাদেশের রূপ যে কতো মনোরম আর মধুর শোভায় আবৃত এর সবুজাভরণ, তাই ব্যক্ত করেছেন কবি এই গানে। মাথার উপর হিমালয় আশীর্বাদস্বরূপ মেঘবারি পাঠায়। এই বৃষ্টিকণায় সবুজে সবুজে পূর্ণ থাকে এর লীলাভূমি। গ্রীষ্মের কালবৈশাখী রূপ বর্ষায় অন্য রূপ নেয় আবার শরতে শেফালি হেসে মাতাল করে চারিধার। হেমন্তের শিশির আর শীতের পাতাঝরা সবকিছুকে ছাপিয়ে মাথা তুলে দাঁড়ায় ঋতুরাজ বসন্ত। প্রকৃতিতে ঋতুর পরিবর্তন এখানে স্পষ্ট পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না। তাই কবি এই মাটির, এই আকাশের কাছে ঋণী থেকেই স্বপ্ন সুখের বাসা বেঁধে চিরনিদ্রায় শায়িত হতে চান এই বাংলার মাটিতেই।

নজরুলের আরো একটি অসাধারণ স্বদেশের গান যেখানে প্রকৃতি বন্দনায় নিমগ্ন কবি শ্যামলা মায়ের গুণকীর্তন করেছেন নানা মহিমায়। এই গান কালোত্তীর্ণ গৌরব অর্জন করেছে। বাংলার অপূর্বরূপের মহিমাটি কবি অত্যন্ত সফলভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন এই গানে–

"শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের
রূপ দেখে যা, আয়রে আয়।
গিরি-দরী-বনে-মাঠে-প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥"[১১৬]

এই গানটিতে অত্যন্ত সুন্দর ও নিখুঁতভাবে গ্রামবাংলার রূপের বর্ণনা করেছেন। খেতের বাঁকে বাঁকে হেঁটে চলার ছন্দ অত্যন্ত মনোরম। কালো দীঘির পদ্মফুলের শোভা থেকে শুরু করে ঝড়ের রাতে সাপের নাচন, নদীর স্রোতে নুড়ী পাথরের নড়াচড়ার শব্দকেও কবি এড়িয়ে যাননি। এমন নিখুঁত বর্ণনা স্বদেশপর্বের খুব কম গানেই দেখা যায়। সবিশেষ বাংলার ঐতিহ্য লোক গানের সুর ভাটিয়ালি-বাউলের কথা উল্লেখ করে কবি স্বাক্ষর রেখেছেন যে সংস্কৃতির প্রতিটি ধারাতেই আমরা পরিপূর্ণ।

এমনই আরো একটি গানের উদাহরণ পাই 'একি অপরূর রূপে মা তোমায়' গানটিতে। এখানেও ফুল, ফসল, কাদা-মাটি জল সকল কিছুর অপার লাবণ্যকে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গান। বাংলার প্রকৃত সৌন্দর্য এর পল্লী গ্রাম। বৈশাখের প্রখরতায় আম-কাঁঠালের সুঘ্রাণ শেষ না হতেই বর্ষার কেতকী-কদম-যুথিকার গন্ধে হৃদয় আকুল করে। বাংলার প্রকৃতিতে ঋতুগুলো যেন হাত ধরাধরি করে চলে। অঘ্রাণে আমন ধানের গন্ধে কৃষাণ-কৃষাণীর মুখের হাসি ফুটে ওঠে, শরতের আগমনী বার্তার আবেশ শেষ না হতেই। হাসি-আনন্দে যেন এখানে ভাই-বোন, তারা হাত ধরাধরি করে নেচে নেচে বেড়ায় এক ঋতু থেকে অন্য ঋতুতে। সারি-ভাটিয়ালি গানে শীতের রাতে কীর্তনের আসরে বাংলা মায়ের কাছে, ঈশ্বরের কাছে, কৃতজ্ঞতায় চোখের কোণে জল জমে। সেই অশ্রু দু'হাত দিয়ে পৃথিবীকে রঙিন করে তোলে, বসন্তের নানা রঙের ফুলের বাহার।

বাংলার মাটিকে কবি সোনার চেয়েও খাঁটি বলেছেন। কারণ এই মাটিতে ধন্য হতে কতো গুণি জ্ঞানীজন ভিড় জমায়। এই দেশের সংগ্রামের ইতিহাস, এর প্রকৃতির সৌন্দর্যতা রক্ষায় এর সন্তানের অবদান অনন্য স্মরণযোগ্য উদাহরণ। এই দেশের প্রকৃতির, মাটির গন্ধে যে সুখ তা অর্থবৈভব-বিত্তে নেই। কবি তাই দেশবন্দনার গানে স্বদেশের চেতনাকে ত্বরান্বিত করতে রচনা করেছেন এ ধারার কয়েকটি গান–

ক. "আমার দেশের মাটি ও ভাই, খাঁটি সোনার চেয়েও খাঁটি।
এই দেশেরই মাটি জলে, এই দেশেরই ফুলে ফলে,
তৃষ্ণা মিটাই, মিটাই ক্ষুধা, পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥"[১১৭]

খ. "এই ভারতে নাই যাহা তা' ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই ॥"[১১৮]

কবি নজরুল দেশচেতনার এই সকল গানের ভিতর দিয়ে স্বদেশের প্রকৃতির রূপের বর্ণনার সাথে এর মানুষ কি করে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে তাও ব্যক্ত করেছেন। বাংলার মানুষ সহজ সরল হৃদয়ের অধিকারী, ঠিক এক সবুজের গভীরতার মতো এদের স্নেহ-ভালোবাসার রূপটি। মাঠে-ঘাটে লক্ষ্মীর

ভাণ্ডার পূর্ণ করা খুশি এখানে নিত্য শান্তির পরশে সাধারণ মানুষের ঘরে স্বর্গ খেলা করে। এই জাতি যেমন কোমল তেমনি সাহসী। প্রকৃতির সাথে বেড়ে উঠবার কারণে হাঙর, কুমির, শার্দ্দুল, সাপ মানুষের খেলার সাথীস্বরূপ। তাই এই জাতি সরল হতে পারে, কোমল হতে পারে কিন্তু ভীতু নয়। এই বাংলার ছেলেরা বিশ্বকে জয় করতে ডরে না। বীর প্রতাপসহ অসংখ্য উদাহরণ সৃষ্টি করেছে এ বাংলার বুকে জন্ম নেয়া দিগ্বিজয়ী বিজেতা বীরের। তাই কবি বারবার বুক চেতিয়ে উচ্চস্বরে গর্বভরে বলেছেন :

> "এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ
> যে দিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ।"[১১৯]

যে সময়ে ভারতীয় মানুষের প্রধান সংগ্রাম ছিলো সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে দেশকে মুক্ত করা, ঠিক সেই সময়টিতে নজরুলের দেশাত্মবোধক গান পরাধীন জনগণের মনে প্রলয়ের তুফান তুলেছিল। তাঁর অপরিমেয় দেশপ্রেম, দেশাত্মবোধ দেশ জুড়ে এক উদ্দাম গতির সঞ্চার করে। কারাগারে থেকে নজরুল থেমে থাকেননি। দেশের প্রতি তাঁর আবেগ ও ব্যথা তিনি সমগ্র দেশজুড়ে ছড়িয়ে দিয়েছেন কথা আর সুরের সম্মিলনের ফল্গুধারায়। এ সকল গানে কখনো ব্যক্ত হয়েছে শিকল ভাঙার সুর, কখনো সাম্যবাদের উক্তিতে উদ্দীপনার জাগরণী বার্তা। এই সকল গানেই আবার ফুটে উঠেছে দেশমাতার অপরূপ প্রকৃতি ও মমতা যা বিশ্বমায়ের আঁচলে থেকে শ্রেষ্ঠ আশ্রয় বলে কবির কাছে প্রতীয়মান। কখনো আশা জাগানিয়া সুর, মাতৃস্নেহ; আবার কখনো শত্রুদের প্রতি বিদ্রূপের ব্যঙ্গাত্মক তীর্যক বাণী যা নজরুলের স্বদেশপ্রেমের গান রচনার একটি বিশেষ দিক।

দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীত

গানের কথায় ব্যঙ্গ প্রকাশ করে দেশপ্রেমমূলক কিছু গান রচনা করেছেন তিনি–যা মূলত দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গগীতি বলে পরিচিত। অন্তরে বিদ্রূপের ব্যঙ্গ আঘাত করে মনকে দেশহিতে জাগ্রত করাই মূলত এ ধরনের গানের মূল উদ্দেশ্য। কবি ঈশ্বরগুপ্ত মূলত এ ধারার গানের প্রবর্তক। অতিপাশ্চাত্যগীতি, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমির প্রতি অবহেলা, কুসংস্কার, ভণ্ডামিসহ যাবতীয় কুপ্রবৃত্তি এবং ইংরেজ পোষণের ও তোষণের উপর তির্যক আঘাত করাই দেশাত্মবোধক ব্যঙ্গ গানের মূল কাজ।

> "সুপার (জেলের) বন্দনা
> তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে, তুমি ধন্য ধন্য হে!
> আমার এ গান তোমারই ধ্যান, তুমি ধন্য ধন্য হে ॥"[১২০]

হুগলী জেলে বসে মূর্তিমান জুলুমবাজ কর্মকর্তার উদ্দেশ্যে এ ব্যঙ্গ গানটি রচনা করেন কবি। এ গানটির সুর রবীন্দ্রনাথের গান 'তোমারই গেহে পালিছ স্নেহে'-এর অনুকরণে রচিত। আ-কাঁড়া চাউলের ভাত, বুড়ো ডাঁটার সজনী খেয়ে কারাবন্দীদের কষ্টতুর জীবনের গল্প এ গান। 'ভারতে যাহা দেখিলাম' শিরোনামে নজরুল দীর্ঘ দুটি অংশে বিভক্ত একটি ব্যঙ্গ গান রচনা করেন। এ গান প্রসঙ্গ উল্লেখ আছে যে নজরুলের এ গানটির শিরোনামও ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস।

> "একটি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যঙ্গ গান। সাইমন কমিশন বর্জন করার পর কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ভারতের নতুন শাসনতন্ত্র রচনার জন্য ১৯২৮ সালের মে মাসে দিল্লিতে এক

সর্বদলীয় সম্মেলন আহ্বান করে। সম্মেলনে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরুকে প্রধান করে শাসনতন্ত্র রচনা কমিটি গঠিত হয়। নেহেরু কমিটি নামে পরিচিত এই কমিটি ব্রিটিশ রাজমুকুটের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করে ডোমিনিয়ন স্টেটাস পাবার মতো করে শাসনতন্ত্র রচনা করেন।"[১২১]

এছাড়াও নজরুলের আরো কিছু ব্যঙ্গাত্মবোধক দেশপ্রেমের গান রয়েছে–

ক. "ঐ তেত্রিশ কোটি দেবতাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে
আজ নাচ বুঢ়টি নাচায় বাবা উঠতে বসতে শুতে!..."[১২২]

খ. "জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াত খেলছ জুয়া।
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥"[১২৩]

গ. "দোহাই তোদের ! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল।
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঢের মিথ্যা ছল ॥
পেটে এক আর মুখে আরেক–এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম-দামি।"[১২৪]

ঘ. "ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা !
(এরা) লতা নয় পরদেশী অসুর ছানা ॥ (ধূয়া)
এদের সবংশে কর কর নাশ,
এদেরে দগ্ধ করে কর ছাই পাঁশ ॥"[১২৫]

ঙ. "ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান !
(সেদিন) দুয়ার ভেঙে আসবে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥"[১২৬]

চ. "মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভরে মার খেয়েছি আর প্রাণে না সয় ॥"[১২৭]

এই সকল গানের ভিতর দিয়ে কবি স্বজাতিকেই ব্যঙ্গ করেছেন, আঘাত করার অভিপ্রায়ে। কারণ আঘাত করলে টনক নড়বে বিশ্বাসে কবি ভারতের তেত্রিশ কোটি জনগণকে তেত্রিশ কোটি ভূত বলে ব্যঙ্গ করেছেন। জাতের নামে বজ্জাতি চলছে সর্বত্র। 'জাত গেল জাত গেল!'–ভাবনায় ছোঁয়াছুয়ির ছোট্ট ঢিলে সম্প্রীতিবোধ যাবে রসাতলে। তাই কবি এই বজ্জাতিকে জাহান্নামে পাঠাবার বাসনা ব্যক্ত করেন গানে। আবার ইংরেজ শোষকশ্রেণিকে কবি কচুরিপানার সাথে তুলনা করেছেন। এক জীবনের দুশমনে গলার সাথে। তাই কবি এই ভেসে আসা অপ্রত্যাশিত কচুরিপানাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে জঙ্গল সাফ করতে বলেছেন।

কবি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধের ব্যঙ্গগীত রচনা করেন। যেমন আমরা দেখতে পাই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশপর্যায়ের কিছু গানেও। নজরুল আরো একটি বিখ্যাত গান রচনা করেন ১৯৩১ সালে রাজনৈতিক উত্তেজনা প্রশমনের উদ্দেশ্যে ইংরেজ কর্তৃক আহুত গোল টেবিল বৈঠকের বিরুদ্ধে।

"বদ্‌না-গাড়ুতে গলাগলি করে, নব-প্যাক্টের আশনাই।
মুসলমানের হাতে নাই ছুরি, হিন্দুর হাতে বাঁশ নাই ॥"[১২৮]

এ গানটিও একটি রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ব্যঙ্গগীতি।

১৯২৩ সালের দিকে সিরাজগঞ্জের প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। মৌলানা আকরাম খাঁ এতে সভাপতিত্ব করেন। এই অধিবেশনে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস কংগ্রেসের ভেতরে গঠিত স্বরাজ পার্টির পক্ষ থেকে হিন্দু-মুসলমান প্যাক্ট বিষয়ে একটি প্রস্তাব পাস করেন। এই প্যাক্টে সরকারি ও আধা-সরকারি চাকরিতে মুসলমানদের অধিক সংখ্যক চাকরিদানের প্রস্তাব রাখা হয়। এছাড়া মুসলমানদের আরো কিছু সুযোগ দানের প্রস্তাব এতে থাকে। এই প্যাক্ট অবলম্বনে নজরুল উল্লেখিত গানটি রচনা করেন।[১২৯]

সমুদয় আলোচনার মধ্যদিয়ে নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের এক অসামান্য অবদানের দ্বার উন্মোচিত হলো যা তাঁর সৃষ্টি জীবনের একটি অপরিসীম গুরুত্ববাহী অধ্যায়। নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গান আজ বাংলার যে কোনো সংকট উত্তরণের শিল্পীমনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে প্রতিরোধ করে মানুষের বিনাশী ভাবনাকে।

তথ্যসূত্র

১. করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬, পৃ. ৯

২. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), *নজরুলগীতি অখণ্ড*, পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮, পৃ. ৫৯২

৩. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৪

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬

৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬-১৭

৭. পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০, পৃ. ২০

৮. রশীদ হায়দার (সম্পা.), *কবি নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, ত্রিশতম সংকলন*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৪, পৃ. ৬৬

৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৭

১০. কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, ৩য় সংস্করণ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট , ঢাকা, পৃ. ২৬৩

১১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৬

১২. পারভীন আক্তার জেমী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৮

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৫-২৬

১৫. আব্দুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ৬৬

১৬. রশীদ হায়দার (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯-১২০

১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৯

১৮. আব্দুল কাদির (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬

১৯. আব্দুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী ১ম খণ্ড*, প্রথম মদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩, পৃ. ১০০

২০. রশীদ হায়দার (সম্পা.), *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সাতাশতম সংকলন*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২২

২১. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬

২২. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১১৫

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫

২৪. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭

২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০০

২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭

২৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯

৩০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১

৩৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৫

৩৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭

৩৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬১

৩৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

৩৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫

৩৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭১

৩৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০

৪০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫
৪১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯০
৪২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১
৪৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২
৪৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৪৫. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২৫
৪৬. কাজী নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬৩-২৬৪
৪৭. রশীদ হায়দার (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. পৃ. ৬৭
৪৮. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯
৪৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২
৫০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৩
৫১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬
৫২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৫
৫৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৩
৫৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
৫৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০৪
৫৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২
৫৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৮
৫৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৫৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮১
৬০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৬১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৬২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৬৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৮
৬৪. জামরুল হাসান বেগ, *নজরুল ইসলাম এবং অন্যেরা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮, পৃ. ১১
৬৫. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৯
৬৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩।
৬৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৪।
৬৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৯।
৬৯. পূর্বোক্ত, পৃ. -৫৯৩
৭০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৭
৭১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯১
৭২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০০
৭৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০২
৭৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯২
৭৫. কাজী নজরুল ইসলাম, পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
৭৬. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৫
৭৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০
৭৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০
৭৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২
৮০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮২
৮১. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৩

৮২. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০
৮৩. তাহা ইয়াসিন (সং.ও সম্পা.), *নজরুলের বিদ্রোহীর চেতনালোক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২৭
৮৪. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০
৮৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪
৮৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৪
৮৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৬
৮৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৬
৮৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭০
৯০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬২
৯১. রশিদুন্ নবী (সম্পা.), *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, ৩য় সংস্করণ, *কবি নজরুল ইন্সটিটিউট*, ঢাকা, ২০১৮, পৃ. ৬৯৫।
৯২. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩৮
৯৩. *গণ-বাণী*, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, এপ্রিল ১৯২৭, পৃ. ৩, (*লাঙল ও গণবাণী*, মুহম্মদ নূরুল হুদা (সম্পা.), ২য় সংস্করণ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৩, পৃ. ৩০৭।)
৯৪. মুজফ্ফর আহমদ, *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, *মুক্তধারা*, ফরাশগঞ্জ, ঢাকা, ১৯৯৫, পৃ. ১৫৩-১৫৪
৯৫. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩
৯৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৪
৯৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
৯৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৬
৯৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৯
১০০. রশিদুন্ নবী (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ১১২
১০১. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪৭
১০২. রশিদুন্ নবী (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৫
১০৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৭
১০৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ১২
১০৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৯৮
১০৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩০
১০৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩২
১০৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২৮
১০৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯২
১১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৮৫
১১. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬
১১২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭৬
১১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮০
১১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
১১৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৮
১১৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬০১
১১৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩
১১৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭
১১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৭
১২০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৩৫
১২১. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫২

১২২. ব্রহ্মমোহন ঠাকুর (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৭২
১২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৩
১২৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৬
১২৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৮৭
১২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৪
১২৭. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯৯
১২৮. রশিদুন্ নবী (সম্পা.), পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৬৩
১২৯. করুণাময় গোস্বামী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০

সপ্তম অধ্যায়

পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনাবাহী গানের সুর বিশ্লেষণ

উপমহাদেশীয় দর্শনে সংগীত গীত, বাদ্য, নৃত্যের ত্রয়ী বন্ধনে আবদ্ধ হলেও সুর সংগীতের শক্তিশালী ভাবাস্ত্র। উপস্থাপিত ত্রয়ী বন্ধনের ন্যায় সুর ছাড়া সংগীত অলীক কল্পনা মাত্র। বিশেষত পঞ্চগীতিকবি সুরের রাজ্যে যে বৈচিত্র্যতা ও আধিপত্য বিস্তার করেছিলো তা বাংলা গানের কোন যুগেই দেখা যায় না। প্রাচীন চর্যাকার থেকে মধ্যযুগের মঙ্গলাকাব্য ও অন্যান্য গীতধারায় সুরের তেমন বৈচিত্র্যতা পরিলক্ষিত হয় না। কেননাতৎকালীন শিল্প ছিলো মূলত কাব্য ও দর্শনের অনুসারী। সুর ব্যবহার হতো বাণীকে প্রচার ও প্রকাশের জন্যে। গীতিকবিদের সবাই মূলত স্বার্থক গীতিকার, সুরকার, শিল্পী এবং তাঁরা আন্তব্যক্তিক সাংস্কৃতিকবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। ফলে তাঁদের গানের সুরে প্রাচ্যের রাগ-রাগিণী ও দেশজসুরের সাথে পাশ্চাত্য সুরের মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। গভীরতর দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায়, পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গানে সুরবৈচিত্র্যতা নেই বললেই চলে। কেননা গানগুলো সৃষ্টি হয়েছিলো প্রতিবাদের ভাষা হিসেবে। যার নির্দিষ্ট শ্রোতা ছিলো মূলত সাধারণ মানুষ। মানবচৈতন্যে প্রতিবাদের জাগরণ তুলতে তা ব্যবহার করা হতো। পঞ্চকবিদের এই রীতির গানগুলো সৃষ্টি হয়েছিলো কোনো-না-কোনো সভায় বসে অথবা গণজোয়ার সৃষ্টির প্রারম্ভে। এজন্য গানের ভাষাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে সুর হিসেবে সরল সুরকে প্রাধান্য দেওয়া হতো।

রবীন্দ্রনাথের প্রায় দুই হাজার গানের মধ্যে যে সুরবৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায় সেই দিক থেকে তাঁর স্বদেশি গানে তেমন সুরবৈচিত্র্য দেখা যায় না। বেশির ভাগ বাউল সুরের প্রাধান্য দিয়েই সৃষ্টি হয়েছে তাঁর স্বদেশিগান। তবে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারও করেছেন পরিমিতভাবে। সুর ও বাণীর সম্মিলনে গানগুলো হৃদয়াঙ্গম করে তুলবার জন্য যতটুক দরকার ঠিক ততটুকুই তিনি ব্যবহার করেছেন। লোকসুরের মাঝেও তিনি ভারতীয় রাগ-রাগিণীর সুর প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু কখনোই নির্দিষ্ট একটি রাগে পড়ে থাকেননি। দেখা যাচ্ছে একটি নির্দিষ্ট রাগে গান সৃষ্টি করেছেন ঠিকই, হঠাৎ করেই বাণীর সাথে সমঝোতা করে অন্য একটি রাগের স্বর বসিয়ে দিয়ে পূর্বের রাগ থেকে সরে এসেছেন, কিন্তু তাতে সুর শ্রুতিকটু হয়ে ওঠেনি।

ডি. এল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সুরের ক্ষেত্রে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ হয়েছে সুন্দর স্বার্থকভাবে। এঁদের প্রত্যেকে স্বকীয়তা রেখে গেছেন আলংকরিক সুর ব্যঞ্জনার সৃষ্টিকর্মে। বৃহদাকার স্বদেশি গান রচনার একটি ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য দেখা যায় তাদের রচনায় এবং এ সকল গানে সুর প্রয়োগেও তাঁর মুন্সিয়ানা বেশ লক্ষণীয়। অনেকাংশেই সঞ্চারি বর্জিত একিই সুরের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায় গানের প্রতিটি অন্তরাতে। যেখানে বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী ও বিদেশি সুরের চলন বিশেষ লক্ষণীয়।

কাজী নজরুল ইসলামের ক্ষেত্রে একই কথা প্রণিধানযোগ্য নয়। তাঁর সৃষ্ট শতাধিকের উপরে স্বদেশচেতনার গানে এমন কিছু সুর সংযোজন করেছেন যা অন্য ধারার গানে লক্ষ্য করা যায় না। স্বদেশচেতনার গানের সুর প্রয়োগে তাঁর প্রথমজীবনে যুদ্ধের অভিজ্ঞতা বেশি পরিলক্ষিত হয়। তাঁর গানে দ্রুত লয় এবং কুজকাওয়াজের তাল ও সুর বিশেষভাবে লক্ষণীয় হলেও তাতে ম্যালোডিয়াস সুরের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন থাকে। বাণীর ভেদে সুরের বৈচিত্র্যতাও এর যথার্থ প্রয়োগে গানের মর্মবাণী অন্তর্নিহিত করে নজরুল একটি অনবদ্য দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেছেন। রাগ-রাগিণী ও লোক সুরের প্রাধান্যই যেখানে সবচেয়ে বেশি।

> "আত্মপ্রকাশের জন্যে বাঙালি স্বভাবতই গানকে অত্যন্ত করে চেয়েছে। সেই কারণে সর্বসাধারণে হিন্দুস্থানী সংগীতরীতির একান্ত অনুগত হতে পারেনি। সেইজন্যেই কানারা আড়ানা মালকোষ দরবারী তোড়ির বহুমূল্য গীতোপকরণ থাকা সত্ত্বেও বাঙালিকে কীর্তন সৃষ্টি করতে হয়েছে। গানকে ভালবেসেছে বলেই সে গানকে আদর করে আপন হাতে আপন মনের সঙ্গে মিলিয়ে তৈরি করতে চেয়েছে। তাই আজ হোক কাল হোক, বাংলার গান যে উৎকর্ষ লাভ করবে সে তার আপনার রাস্তাতেই করবে, আর কারো পাথর-জমানো বাঁধা রাস্তায় করবে না।"[১]

কতিপয় স্বরলিপির উদাহরণসহ পঞ্চগীতিকবির স্বদেশপর্বের গান রচনায় সুর প্রয়োগের বৈচিত্র্যতা এ পর্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ

বাংলা স্বদেশি গানের সুর বৈশিষ্ট্য সামগ্রিক গানের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা বহন করে চলে। এক একটি গানের আবেদন কবি কিভাবে কি সুরে প্রকাশ করবেন বা তার প্রকাশের উদ্দেশ্যে কি, সর্বদাই সেই গানটির সুর প্রয়োগের প্রাধান্যতার উপর নির্ভর করে। ভারতীয় রাগসংগীত, উচ্চাঙ্গসংগীত ও লোকসংগীত ধারার সংমিশ্রণ করা হয়েছে স্বদেশি গানের সুর রচনাতে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দিকে দেশি সংগীতের প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়ে। এ আগ্রহের প্রকাশ পরিলক্ষিত হয় রবীন্দ্রনাথের হাত ধরেই স্বদেশি গানের সুর রচনাতে।

বহুমাত্রিক সুরের প্রয়োগ দেখা দিলেও রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গানে লোক সুরের প্রয়োগ স্বদেশি গান রচনায় এক ভিন্ন মাত্রার মৌলিকত্ব এনে দেয়। প্রাক বঙ্গভঙ্গ অর্থাৎ ১৯০৫ সালের পূর্বে রবীন্দ্রনাথ ২১টি স্বদেশপর্যায়ের গান রচনা করেন। এরমধ্যে 'এবার তোরা মা বলিয়া ডাক' কীর্তনের সুরে এবং 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' রামপ্রসাদী সুরে রচিত।

রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সংগীত রচনার পর্বে স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ লিখেছেন,

> "ভাব ও ব্যঞ্জনার প্রাধান্য নিয়ে কথা ও সুরের মধ্যে সৃষ্টি হোল মিলনের আবেদন। বাউল, ভাটিয়ালী, জারি ও সারিগানের মন্দাকিনী ধারা হোল উৎসারিত। সারিগান–'এবার তোর মরা গাঙে', বাউল–'যদি তোর ডাক শুনে' ও 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায়' প্রভৃতি। পদ্মা নদীর পাগল-করা ঢেউয়ের উপর দিয়ে নৌকার দাঁড়ের তালে তালে ছল্ ছল্ সুমধুর শব্দছন্দ আজও যেন অনুরণিত হয়ে ওঠে কবির রচিত সারিগানের মধ্যে।"[২]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মোট গানের সংখ্যা নিয়ে মতভেদ থাকলেও মোটামুটি ধারণা করা যায় তিনি ২২২৩টি গান রচনা করেছেন। তার মধ্যে মাত্র ৪৬ টি গান স্বদেশপর্যায়ের। এবং এরমধ্যে মাত্র ১২টি গানের প্রতিটিই একেকটি থেকে অন্যটি আলাদা ও বৈচিত্র্যমণ্ডিত । গানের বিশদ সুরগত বিশ্লেষণটিতে এই পবের আলোচনার্য় অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গানের সুর সৃষ্টিতে এর গণপ্রচার ও গণতাৎপর্যের পরিপ্রেক্ষিতে স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অনুধাবনযোগ্য। যদিও তাঁর প্রায় দুই হাজারের বেশি সংখ্যক গানে এর রস-ব্যঞ্জনা সৃষ্টিতে বাণী, ভাষা ও সুরের সৃষ্টিতে যে বিস্ময়কর শৈলী ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষর রেখেছেন তা তাঁর স্বদেশপর্বের গানে অপ্রতুল। তবে এও সত্য স্বদেশের গানে সুরের এই সংযতবোধ কবির ইচ্ছাকৃত ও বিবেচনালব্ধ প্রয়োগ। স্বদেশপর্বের গানেও প্রাক যৌবনের অভ্যাসবশত রাগ-রাগিণীর ব্যবহার তিনি করেছেন, তবে সে গান তাঁর অন্যান্য স্বদেশি গানের মতো সমাদর পায়নি বরং এই সকল গান কেবল উচ্চ ও ওস্তাদি মহলের জন্য যথার্থ বলে বিবেচ্য। যেমন–কবির ৪১ বছর বয়সে রচিত হাম্বীর রাগে তাল ফেরতায় রচিত বিখ্যাত গান ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ গুণি মহলে একটি বহুল আলোচিত গান। তাছাড়াও হাম্বীর রাগে এক তালের গান ‘জননীর দ্বারে আজি ওই’ গানটিও রাগাশ্রিত স্বদেশি গান এবং ওস্তাদী গান–যা যথেষ্ট মুন্সিয়ানার পরিচয়বাহী। ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ গানটিতে তেওড়া ও এক তালের (১২ মাত্রা) অপূর্ব সমন্বয় গানটিতে একদিকে গম্ভীর আবহ সৃষ্টি করে আবার তাল ফেরতার আবহে দ্বিগুণ লয়ে দুর্বার গতিতে এগিয়ে চলার একটি ছন্দে মনকে মাতিয়ে তুলে স্বদেশবোধের চঞ্চলতায় ও গভীরতায়–

“আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো ‘উঠ উঠ’ সঘনে গভীরনিদ্রামগনে ॥”

‖

II	গা	মা	ধপা	–া	|	গা	মা	ন্ধা	–া	|	ধনঃধঃ	–ননা	র্সাঃ	–নঃ
	আ	নন্	দধ্ব	০		নি	জা	গা	ও		গ০০	০গ	নে	০

I	ধা	না	–া	|	র্সা	–া	|	ধা	–না	I	পা	–ধা	–া	|	মা	-া	|	–পা	–মা
	কে	আ	০		ছ	০		জা	০		গি	০	০		য়া	০		০	০
I	গা	–মাঃ	–গঃ	|	রা	–া	|	গা	–া	I	ধা	–পা	–া	|	রা	–া	|	গা	–া
	পু	০	০		র	০		বে	০		চা	০	০		হি	০		য়া	০
I	পা	পা	–া	|	ধা	–া	|	না	–ধা	I	পা	–ধা	–া	|	র্সা	–া	|	–া	–না
	ব	লো	০		উ	০		ঠ	০		উ	০	০		ঠ	০		০	০

I ধা -না -া | র্রা -া | র্সা -া I গা গা -া | গা -া | গা -মগা

স ০ ০ ঘ ০ নে ০ গ ভী ০ র ০ নি ০০

রগরা -সা -া | ন্া -া | ন্সা -রা I সা -া -া | ধা -া | না -া II

দ্রা০০ ০ ০ ম ০ গ০ ০ নে ০ ০ জা ০ গা ও

৩

এখানে শুরুতেই চতুর্মাত্রিক একতালে 'আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে'র পরের লাইনেই 'কে আছ জাগিয়া' থেকে তেওড়া'র ৭ মাত্রার ছন্দে বেঁধে আবার চতুর্মাত্রিক একতালে প্রবেশ এক অভূতপূর্ব মুন্সিয়ানার পরিচয় রেখেছেন কবি। শুধু তাই নয় গানের শেষাংশে 'ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ' অংশে হঠাৎ সুরে ছন্দের পরিবর্তন স্বদেশচেতনায় এক অন্যরকম ঝঙ্কার তোলে যা সংগীতের আসরে সহসা বিরল। স্বরলিপির উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে–

"...থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে ॥
যায় লাজ ত্রাস, অলস বিলাস কুহক মোহ যায়।
ওই দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ, আরম্ভ করো জীবনের কাজ–
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে ॥"

I সা সা সা | রা রা | রা -া I গা -া মা | পা -া | -া -া

থে কো না অ ল স ০ শ ০ য় নে ০ ০ ০

I গা মা ধপা -া | গা মা ধা -া I

আ নন্ দধ্ব ০ নি জা গা ও

I পা পা পা | ধা ধা | ধা -া I না -ধা না | র্সা -া | -া -া

থে কো না ম গ ন ০ স্ব ০ প নে ০ ০ ০

৪

সুরের বৈচিত্র্যতা আনার জন্য নিচের অংশে দাদ্‌রা তালের দ্রুত ছন্দের ব্যবহার করা হয়েছে।

II {রা -া রা | গাঃ -রঃ গা | মা পা পা | ক্ষা ধা পা I

লা ০ জ ত্রা ০ স আ ল স বি লা স

I মা গা মগা | রগা -মপা মা | গা -া -া | -া পা -া I

কু হ ক০ মো০ ০০ হ যা ০ ০ য় ও ই

I র্সা র্সা না | র্সা নর্সর্রা র্সা | ধা -ণা ধা | পা -া -া I

দু র হ য় শো০০ ক স ঙ্ শ য় ০ ০

I আ -া পা | মা পা মা | গা -া -া | (-রা সা -া) } I -া -া -া I
দু ক্ খ স্ব প ন প্রা ০ ০ য়্ যা য়্ ০ ০ য়্

I পা পা -া | র্সা -া র্সা | নর্সর্রা -র্সা -া | র্সা -া -া I
ফে লো ০ জী র্ ণ চী০০ ০ ০ র ০ ০

I নর্সা ধা -না | র্সা -নর্সা র্রা | না -র্সা -ধা | পা -া -া I
প০ রো ০ ন ০০ ব সা ০ ০ জ ০ ০

I র্সা -া -া | র্গা -া র্রা | র্সা -া -ধা | র্সা -া -া I
আ ০ ০ র ম্ ভ ক ০ ০ রো ০ ০

I র্সা -নর্সা র্রা | র্সা -না র্সা | ধা -া -া | পা -া -া I
জী ০০ ব নে ০ র কা ০ ০ জ ০ ০

I গা সা সা | রা রা রা | গা গা -া | মা মা মা I
স র ল স ব ল আ ন ন্ দ ম নে

I পা পা পা | ধা ধা ধা | না -া না | র্সা -া -া II
অ ম ল অ ট ল জী ০ ব নে ০ ০

[৫]
এখানে ‘থেকো না অলস শয়নে’ তেওড়া থেকে মুখে ফিরে ‘আনন্দধ্বনি জাগাও’ চতুর্মাত্রিক একতালে ফেরা আবার তেওড়া হয়ে ‘লাজ ত্রাস, আলস বিলাস’ থেকে ত্রিমাত্রিক একতালের সাথে হাম্বীরের সুরের প্রয়োগ গানটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে গেছে।

যদিও এ ধারায় স্বদেশপর্বের গান তিনি খুব বেশি রচনা করেননি। তবে রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ করেছেন নিপুণ পরিমিতির সাথে প্রাক যৌবনপর্বে :

তোমারি তরে মা সঁপিনু এ দেহ	জয়জয়ন্তী–চৌতাল	১৬ বছর বয়সে রচিত
অয়ি বিষাদিনী বীণা–কাহার	কাওয়ালি	১৭ বছর বয়সে রচিত
ঢাকরে মুখ চন্দ্রমা,	গৌড় মল্লার	১৭ বছর বয়সে রচিত
ভারত রে তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি	ভৈরবী	১৭ বছর বয়সে রচিত
এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন	খাম্বাজ –এক তালের	১৮ বছর বয়সে রচিত
দেশে দেশে ভ্রমি তব	বাহার–কাওয়ালি	২০ বছর বয়সে রচিত
এ কী অন্ধকার ভারতভূমি	প্রভাতী–একতাল	২৩ বছর বয়সে রচিত
শোনো শোনো আমাদের ব্যথা	খাম্বাজ–ঝাঁপতাল	২৩ বছর বয়সে রচিত
ও গান আর গাস্ নে, গাস নে	বেহাগড়া	২৩ বছর বয়সে রচিত

এই সকল রাগাশ্রিত স্বদেশপর্বের গানই রচিত হয়েছে তাঁর ২৫ বছর বয়সের পূর্বে যখন রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে মনে ও মননে গেঁথে যাওয়া রাগ-রাগিণীর অবগাহনে ডুবে ছিলেন। যদিও এই সকল রাগাশ্রিত স্বদেশপর্বের গান তাঁর অন্যপর্যায়ের রাগাশ্রিত গানের মতো সর্বজন প্রসিদ্ধ না হয়ে কেবল ওস্তাদিমহলে স্বীকার্য থাকে। এ প্রসঙ্গে সুধাংশ শেখর শাসমল যথার্থই বলেছেন :

> "রবীন্দ্ররচিত দেশাত্মবোধক সঙ্গীত তাঁর দ্বিসহস্রাধিক রস-ব্যঞ্জনাঋদ্ধ কাব্যসঙ্গীতের মতো বাণী, ভাষা ও সুরের বিস্ময়কর শৈলী ও সাংগীতিক বৈশিষ্ট্যের নির্মিত পায়নি ঠিকই, কিন্তু গণপ্রচার ও গণতাৎপর্যের প্রেক্ষিতে সে-সব গানের ভাষা ও সুরের স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অনুধাবনযোগ্য। প্রাক্‌যৌবন পর্বে উচ্চাঙ্গ রাগ-রাগিণীর সুরে সমৃদ্ধ বাণীতে ব্রহ্মসঙ্গীত, রাগাঙ্গ ও কাব্যসঙ্গীত সৃষ্টি করার অভ্যাসে স্বদেশি সঙ্গীতেও প্রচলিত রাগ-রাগিণী বসিয়েছেন। জয়জয়ন্তী, বাহার, ভৈরবী, গৌড়মল্লার, দেশ, খাম্বাজ, বেহাগ, সিন্ধু, হাম্বীর, কাফি প্রভৃতি রাগ-রাগিণীর সুনিপুণ প্রযোজনা আছে স্বদেশি গানে।"[৬]

শুধু তাই নয় রাগ-রাগিণীর ব্যবহার ছাড়াও অন্য গানের সুরে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি সংগীত রচনা করেছেন। তাঁর অন্যান্য পর্যায়ের গানের মতো গান বা ভজনের সুর নিয়েও তিনি স্বদেশি গানে সুর প্রয়োগ করেছেন। 'যে বাঁতিয়া মেরে চিত মেরে ঢয়ি নিশিদিন' সুরট রাগে চৌতাল নিবন্ধিত গানটি মহারাজা নওলকিশোর রচিত। এই গানটি ভেঙে কবি রচনা করেন একই সুরে- 'এ ভারত রাখো নিত্য প্রভু'। এছাড়াও ভজনের সুরে রচনা করেন–'এ কী অন্ধকার ভারতভূমি।'

তবে রবীন্দ্রনাথ লোকায়ত সুর অর্থাৎ বাংলার নিজস্ব সুর কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী সুরে তাঁর অধিকাংশ স্বদেশপর্বের গান রচনা করেন। এই সকল সুর যেভাবে সকল শ্রেণির মানুষের মনে গেঁথে যায় রাগ-রাগিণী ভিতর স্বদেশি গান ততটা নয় কখনো। 'একবার তোরা মা বলিয়া ডাক', 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে'–গান দুটি তেমনি বাউল-কীর্তন-রামপ্রসাদী লোকসুরের সরলতার কারণে এবং সহজ ভাষায় উপস্থাপনের কারণে স্বদেশি যুগে কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হতো–যা মূলত সাধারণের গান হয়ে উঠেছিল অবলীলায়। প্রতিটি অন্তরাতে একই সুর হওয়াতে এবং কথার অতি সরল উপস্থাপন রামপ্রসাদী সুরের দুলনিতে এই গানটি অনন্য মাত্রা পায় এবং খুব সহজেই এই গান কণ্ঠে ধারণ করা সম্ভব হয়।

"আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাই ছেড়ে ভাই ক'দিন থাকে ?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে 'আয়' ব'লে ওই ডেকেছে কে,
সেই গভীর স্বরে উদাস করে–আর কে কারে ধরে রাখে ?"

‖

গা গা II { গা গপা –মগা | –রসা সা রা I গা গা –া | মা পা -া }
আম্ রা মি লে ০ ০ ০ ০ ছি আজ্ মা য়ে র্ ডা কে ০

I ধা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সা র্সা –া | র্সা না –র্সনা
ঘ রে র্ হ য়ে ০ প রে র্ ম ত ০ ন্

I ধনা –র্সর্রা র্রা | র্সা না –র্সনা I ধনা পা –ধপা | মধা পা –াম
ভা ০ ০ ই ছে ড়ে ভা ০ ই ক ০ দি ০ ন্ থা ০ কে ০

II {পা ধা –া | ধা ধা –া I র্সা র্সা –া | না ধনা –ধপা
প্রা ণে র্ মা ঝে ০ থে কে ০ থে কে০ ০০

I না –া না | র্সা র্রা –র্গর্রা I র্সা র্সনা –ধনর্সর্রা | (র্সা র্সা –া) } I র্সা র্সা ধা
আ য়্ ব লে ও ০ই ডে কে০ ০০০০ ছে কে ০ ছে কে সেই

I ধা র্সা –া | র্সা র্সা –া I র্সা র্সা –া | র্সা না –র্সনা I
গ ভী র্ স্ব রে ০ উ দা স্ ক রে ০০

I ধা –ধনা র্সর্রা | র্সা না –র্সনা I ধনা পা –ধপা | মধা পা –াম II
আ ০র্ কে০ কা রে ০০ ধ০ রে ০০ রা০ খে ০ [৭]

আমরা জানি রবীন্দ্রনাথ বাউল গানের সুরে ও বাণীর মহিমায় ব্যাকুল ছিলেন এবং তিনি জানতেন এই সুরের মধ্যদিয়ে সাধারণের অন্তরে প্রবেশ সহজ বিধায় স্বদেশি গানের সুরারোপে রবীন্দ্রনাথ বাউলের সহজ-সরল সুরকে বেছে নিলেন। এমন কি কিছু গানে তিনি অবিকল বাউলের সুরটি গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ বাউল ঢঙ্গে গান রচনা করেছেন। আমরা সকলেই বাউল গগন হরকরার কথা শুনেছি। তাঁর গান 'আমি কোথায় পাবো তারে' এর হুবহু সুরে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন সকলের প্রাণের স্বদেশি গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'–যা পরবর্তীকালে আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে সম্মানিত হয়। এই গানের পাঁচটি স্তবকই হুবহু বাউল সুরে রচিত এবং তিনি সুনিপুণভাবে এর একটি লাইন বাউলের আখর ভঙ্গিতে 'মরি হায় হায়রে ও মা' অংশটি ফিকির চাঁদের 'নদীর কোলে...মরি হায় হায়রে ও নদী'র আখরের অপরূপ সুর গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের আরো একটি বিখ্যাত গান যেখানে হুবহু বাউল সুর ব্যবহার করা হয়েছে। নদিয়ার টহল বাউলের 'হরিনাম নিয়ে জগৎ মাতালে' এবং লালন সাঁইয়ের 'কথা কয়রে কাছে দেখা যায় না' বাউল গানের সুরারোপে রচিত 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে' গানটি। দুইটি গানের স্বরলিপির উদাহরণে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে–

"হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে
আমার একলা নিতাই।
আমার একলা নিতাই।
একলা নিতাই একলা নিতাই
একলা নিতাই রে!
আমার নিতাই যদি
ডাকরে নিতাই গৌর বলে,
যদি মনে করে
তবে গৌর নিলেই নিতে পারে।"
(বৈষ্ণব বাউল গান–দাদ্‌রা)

II –া –া না | না না –া I সা সা –া | রা রা –া I
০ ০ হ রি না ম দি য়ে ০ জ গ ত

I পা –া –া | মা –া –া I গা –া –া | রা সা –া I
মা ০ ০ তা ০ ০ লে ০ ০ আ মা র

I রা –া গা | গা রা গা I রসা –া –া | –া –া –া I
এ ক লা নি তা ০ ই০ ০ ০ ০ ০ ০

I –া –া –া | মা মা –া I মা –া পা | পা পা –া I
০ ০ ০ আ মা র এ ক লা নি তা০ ই

I মা –া পা | ণা ধা –া I পা –া মা | গা রসা –া I
এ ক লা নি তা ই এ ক লা নি তা ই০

I রা রা গা | গা রা গা I রসা –া –া | –া –া –া II
এ ক লা নি তা ০ ০ই ০ ০ ০ ০ ০

II –া –া –া | মা মা –া I মা পা –া | পা পণা [ধ]ণা I
০ ০ ০ আ মা র নি তা ই য দি০ ০

I ধপা –া –া | –া –া –া I –া –া –া | –া –া –া I
ই০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

I র্সা –া র্সা | র্সা র্রা –া I র্সা পা –া | ধা পা –া I
ডা ক রে নি তা ই গৌ ০ র ব লি ০

I মা পা –া | পা পণা ধণা I পধা পা –া | মা মা –া I
নি তা ই য দি০ ০০ ০ ০ ০ য দি ০

I পা পা পা | ধা ণা –া I –া –া –া | ধা পা –া I
ম নে ০ ক রে ০ ০ ০ ০ ত বে ০

I মা পা –া | ণা ধা –া I পা মা –া | গা রা –া I
গৌ উ র নি লে ই নি তে ০ পা রে ০ [৮]

মূলগানের সুরারোপে রচিত স্বদেশপর্যায়ের রবীন্দ্রসংগীতটি নিম্নে দেওয়া হলো।

“যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়–
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে ॥”

ন্া | ন্া ন্া –া II { সা –া সা | রা রা –া I রপা –া –া | মা –া –া I
য দি তো র্ ডা ক্ শু নে কে উ না ০ ০ আ ০ ০

I গমা –গা –া | রা সা –া I রা –া গা | গা রা –গরা I
সে০ ০ ০ ত বে ০ এ ক্ লা চ লো ০০

‖

I (সা –া ন্া | ন্া ন্া –া) } I সা –া –া | –া মা মা I
রে ০ য দি তো র্ রে ০ ০ ০ ত বে

I { মা –া পা | পা পা –া I মপা –া পা | পণা ণা –ধা I
এ ক্ লা চ লো ০ এ ক্ লা চ লো ০

I পা –া মা | গা রসা –া I রা –া গা | গা রা –গরা I
এ ক্ লা চ লো ০ এ ক্ লা চ লো ০০

I (সা –রা মা | মা পা –া) } I সা –া ন্া | ন্া ন্া –া II
রে ০ ০ ত বে ০ রে ০ “য দি তো র্”

মা মা II { মা –া পা | পা ধণা –ধা I পা –া –া | (–া সা সা I
য দি কে উ ক থা না০ ০ ক ০ য়্ ০ ও রে

I রা –মা –া | পা –ধা –ণা I ধা –র্সা ণা | ধা পা –ধপা) } I –া পা ধা I
ও ০ ০ রে ০ ০ ও ০ অ ভা গা ০০ ০ য দি

II ধর্সা র্সা –া | র্সা র্সা –র্রা I ণর্সা –া ণা | ধা পা –ধপা I
স বা ই থা কে ০ মু খ ফি রা য়ে ০০

I	মা	পা	–া	|	পা	ধণা	–ধা	I	পা	–া	–া	|	–া	সা	সা	I
	স	বা	ই		ক	রে০	০		ভ	০	০		য়	য	দি	
I	রা	মা	–া	|	পা	ধা	–ণা	I	ধা	–র্সা	ণা	|	ধা	পা	–ধপা	I
	স	বা	ই		থা	কে	০		মু	খ্	ফি		রা	য়ে	০ ০	
I	মা	পা	–া	|	পা	ধণা	–ধা	I	পা	–া	–া	|	–া	মা	মা	I
	স	বা	ই		ক	রে০	০		ভ	০	০		য়	ত	বে	
I	পা	পা	–ণা	|	ধা	ণা	–া	I	–া	–া	–া	|	ধা	পা	–মা	I
	প	রা	ন্		খু	লে	০		০	০	০		ও	তু	ই	
I	{ মা	–া	পা	|	পণা	ণা	–ধা	I	পা	মা	–া	|	গা	রসা	–া	I
	মু	খ্	ফু		টে	তো	র্		ম	নে	র্		ক	থা	০	
I	রা	–া	গা	|	গা	রা	–গরা	I	(সা	–া	–া	|	–া	মা	মা) }	I
	এ	ক্	লা		ব	লো	০ ০		রে	০	০		০	ও	তুই	
I	সা	–া	ন্া	|	ন্া	ন্া	-া	II								
	রে	০	“য		দি	তো	র্” [৯]									

এছাড়াও গগন হরকরার ‘ও মন অসার মায়ায় ভুলে রবি কতকাল’ এমনিভাবে এই বাউল সুরে রচিত ‘যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক’ এবং ‘মন মাঝি সামাল সামাল’ এই বহুল প্রচলিত বাউল সুরের অনুসরণে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেছেন স্বদেশপর্বের বিখ্যাত গান ‘এবার তোর মরা গাঙে বাণ এসেছে’। রবীন্দ্রনাথ বাউল, লোক, কীর্তন, সারি, ভাটিয়ালি প্রভৃতি সুরে কতোটা মজেছিলেন এই সকল গানের আলোচনাতেই বিষয়টি স্পষ্ট হয়। স্বদেশি গানের মতো এত গুরুত্বপূর্ণ প্রেক্ষাপটে এবং সময়ে রচিত অধিকাংশ গান তাঁর বাংলার লোকজ সুরে রচিত।

আবার বিখ্যাত এই সকল স্বদেশপর্বের বাউল-কীর্তন গানের সাথে রাগের মিশ্রণ করেছেন অপূর্ব স্বকীয়তায়। বাউল-কীর্তনের সাথে রাগ মিশ্রণ কবির সুর রচনার প্রগাঢ় দক্ষতার আরো একটি উল্লেখিত দিক। ‘সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে’ গানটিতে বাউল-কীর্তনের সাথে ভৈরবের মিশ্রণ ঘটিয়েছেন কবি। এমনি বহু রাগের মিশ্রণের লক্ষ্য করা যায় তাঁর স্বদেশপর্বের গানে।

১. বিধির বাঁধন কাটবে তুমি–খাম্বাজ মিশ্রণ
২. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে–বিভাস মিশ্রণ

৩. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি–বেহাগ মিশ্রণ

৪. আমি ভয় করবো না ভয়–ভূপালি মিশ্রণ

৫. এবার তোর মরা গাঙ্গে–সারি সুরের মিশ্রণ।

স্বদেশি গানে সুরের বৈচিত্র্যতা আনয়নে এই সকল গানের লোকসুরের সাথে রাগের মিশ্রণ এক অপূর্ব সমন্বয়। যদিও রবীন্দ্রনাথের রাগমিশ্রণ ব্যতিরেকে শুধু বাউল বা কীর্তন সুরে রচিত স্বদেশপর্বের গানে যে আবেদন সৃষ্টি হয় এবং গানকে যেভাবে মর্মস্পর্শী করে তুলে সুরের মিশ্রণ ততটা নয়। সুরগত এই সার্থকতা তাঁর স্বদেশ পর্বের গানে খুব সহজেই পরিলক্ষিত হয়। স্বদেশপর্বের মাত্র ৪৬টি গানের মধ্যে কবি বৈচিত্র্যতার ভাণ্ডার ঢেলে দিয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গের পূর্ব হতে পরবর্তী সময়কাল পর্যন্ত যে কয়টি গান তিনি উপহার দিয়েছেন সেই কয়টি গানকে আশ্রয় করেই আজকের গীতিকবিগণ স্বদেশচেতনার নতুন সৃষ্টিতে অনুপ্রেরণা সঞ্চয় করে চলেছেন। বাউল, কীর্তন, রামপ্রসাদী, সারি, ভাটিয়ালিসহ শাস্ত্রীয় সংগীতের মিশ্রণে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশচেতনার গানে সুর প্রয়োগের যে দক্ষতা ও স্বকীয়তা দেখিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে বিরল। এখনও পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের গানের সুরের মধ্যদিয়ে বাংলার প্রকৃতিকে যেভাবে হৃদয় দিয়ে অবলোকন করা যায়, দেশের প্রতি অন্তরের টান ও মমতা অনুভূত হয়, তা বিরল। ভারতীয় রাগ-রাগিণীসহ বাংলার লোকসুরের যে অমৃত ঐশ্বর্য ও বিস্ময়কর ঐতিহ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর স্বদেশপর্বের গানে তাতে দেশের প্রতি গভীর প্রেম উদ্রেক হয়। এ সুর অবগাহনে দেশের জন্য মমতায় হৃদয় ছেয়ে যায় বলেই বলা বাহুল্য গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি তাঁর দেশাত্মবোধক গানসমূহ।

বঙ্গভঙ্গকালে রবীন্দ্রনাথ মোট ২৪টি স্বদেশপর্যায়ের গান রচনা করেন। এই সকল রচিত গানে মূলত দুইটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। প্রথমটা লৌকিক যেখানে বাউল সুরের প্রাধান্য বেশি। ২৪টি গানের অর্ধেকের বেশি গান মূলত রবীন্দ্রনাথের এই আঙ্গিকে রচিত। আর বাকি গানগুলোতে যে বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় তা হলো সুরের সহজ সরল গমন ও তালের সহজ ছন্দের প্রয়োগ। এরমধ্যে কয়েকটি গান আছে যেখানে লৌকিক সুরের বাইরেও রাগ-রাগিণীর প্রয়োগ ঘটিয়েছেন কবি। যদিও সেই সকল রাগ-রাগিণী বাংলাদেশে প্রচলিত সহজ সুরের রাগ। বাউল সুরে রচিত অন্যতম কিছু গানরে উদাহরণ দেওয়া হল। যেমন–

১. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক, আমি তোমায় ছাড়ব না মা।

২. রইল বলে রাখলে কারে।

এখানে রাগভিত্তিক লোকসুরের স্বদেশি গানের কতিপয় উদাহরণ তুলে ধরা হল। যেমন–

১. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি। (বিভাস, একতালা)

২. আমি ভয় করব না, ভয় করব না। (ইমন ভূপালি)

৩. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই। (বেহালা)

এই গানটিতে বেহাগ রাগের চলনটি হুবহু ব্যবহার করেছেনকবি অর্থাৎ তাঁর বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি গানটিতে প ম গ মগ ম প র স প ম গ ম গ বেহাগের এই সরল সুরটি তিনি ব্যবহার করেছেন নিপুনভাবে–

“বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই।
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই ॥”

গা II {মা পা না | না র্সনা –র্গর্রা | র্সনা ধপা –া | মা –গা গা I

বুক্ বে ধে তুই দা ড়া০ ০ ০ দে০ খি০ ০ ০ ০ বা

I মা পা মা | গা গরা –গা | রা সা –া | (–া –া গা)} I –া –া –া I

রে বা রে হে লি০ স্ নে ভা ০ ০ ই বুক ০ ই শু

I সা গা –া | সা সা –া | গা গা –া | সা গা –া I

ধু তু ই ভে বে ০ ভে বে ই হা তে র্

I মা –া পা | গপা মা –া | গা রসা –া | –া –া গা II

ল ক্ খী ঠে০ লি স্ নে ভা ০ ০ ই “বুক”[১০]

রবীন্দ্রনাথ স্বদেশি গানের সুর রচনায় যে বিশেষ একটি স্তরের মধ্যদিয়ে গেছেন তা হলো রাগরাগিণীর ঢংটিকে প্রাধান্য দিয়ে রচিত গানের ক্ষেত্র। তাঁর রাগনির্ভর স্বদেশ গানের তালিকার মধ্যে ‘জনগণমন অধিনায়ক’ এবং ‘দেশে দেশে নন্দিত করি’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ‘আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে’ এক্ষেত্রে অনন্য স্বদেশপর্বের গান।

একটি প্রসঙ্গ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, লোকসংগীতে সাধারণ সহজ কথার প্রাধান্য বেশি পরিলক্ষিত হয় এবং একই সুর ঘুরেফিরে সেই কথাকে বার বার ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে উপস্থাপন করে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের স্বদেশের গানে তিনি যে লোকসুরের প্রয়োগ করেছেন তাতে চিরাচরিত লোকসুরের কোনো ত্রুটি চোখে পড়ে না। বাউল ভাষার সরলতা, মনের গভীরতা, আত্মার পরম আত্মাকে খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টাসহ জাতীয় সংগীতে সুগভীর সহজ সরল সুরের সাথে মিশ্রণ করে এই গানকে এক নতুন পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন কবি। ‘বাংলার লোকমনকে জয় করবার ক্ষেত্রে তাঁর এই ধারার গানের সুরের ভূমিকা অদ্বিতীয়। অর্থাৎ আমরা বলেতে পারি এ গানের ‘কথায় যেমন কাব্যসংগীত আছে, তেমনি আছে সুরের মাধুর্য্য ও লালিত্য।’[১১]

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ

অভিজাত পরিবারের সাহিত্য ও সংগীত পরিমণ্ডলে গড়ে উঠেছিল দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাহিত্যসত্তা। খেয়াল গায়ক অন্ধ শরৎ ও সুরেন মজুমদারের সান্নিধ্যে প্রাচ্য সংগীত তথা রাগ-রাগিণীর মধ্যদিয়ে তাঁর সাংগীতিক ধ্যানধারণা গড়ে ওঠে যেমন, ঠিক তেমনি বিলেতে পড়তে যাওয়ার সুবাদে সুযোগ পান স্কচ্ আইরিশ ও ইংরেজি গানের সুরধারায় নিজেকে পরিপূর্ণ করতে। দেশীয় লোকসুর কীর্তন-বাউলের প্রতিও তাঁর গভীর অনুরাগ গড়ে ওঠে। তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গানের সুর রচনাতেও এই সকল অভিজ্ঞতার ছাপ পরিলক্ষিত তাঁর গানে। এ প্রসঙ্গে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন–

> "তিনি বুঝেছিলেন যে, গানকে বড় হতে গেলে তার মধ্যে সুরবিহারের (Improvisation) পাখা মেলবার অবকাশ রাখতে হবে। কথার চাপে তার টুটি টিপে ধরলে সে সর্বোত্তম গানের পর্যায়ে পড়বে না। বাংলাগানে সুরকে লীলায়িত করবার অবকাশ দিয়ে তবে সুর রচনা করতে হবে।... সেইখানেই গানের শ্রেষ্ঠ বিকাশ, যেখানে গানের কাব্য সুরকে পাখা মেলতে দিয়েছে।"[১২]

তিনিও তাঁর গানের সুর রচনায় রবীন্দ্রনাথের মতো কাওয়ালি, খেমটা, খেয়ালাঙ্গের রাগরূপে চৌতাল, একতাল, যৎ, আড়া, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি তালের ব্যবহার করেছেন। আবার রাগ-রাগিণী নির্বাচনেও প্রধানত ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, ছায়ানট, বিবিধ খাম্বাজ, মিশ্র সিদ্ধ খাম্বাজ, সুরট খাম্বাজ, মিশ্র ভূপালি, কালাংড়া, গৌড় সারং ইত্যাদি সুরকে বেছে নিয়েছেন। তবে স্বদেশপর্বের গানের বেলায় খাম্বাজ, ঝিঁঝিট ও ভৈরবী–এই তিনটি রাগের বেশি উল্লেখ পাওয়া যায় তাঁর গানে। রাজ্যেশ্বর মিত্রের মতে, 'রাগসংগীতে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত গান রচনা করেছেন, তার অনুশীলন করলে দেখা যায়, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট এবং ভৈরবী তাঁর সবচেয়ে প্রিয় রাগ ছিলো।'[১৩]

আমরা জানি, দ্বিজেন্দ্রলাল রায় রবীন্দ্রনাথের মতোই তাঁর গানে বিদেশি সুরের অতি নিপুণ ও যথার্থ প্রয়োগ করেছেন, যা তৎকালীন সময়ে অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়ে ওঠে। তবে রবীন্দ্রনাথ বিলেত থেকে ফেরার পর যেভাবে বিদেশি সুরের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন পরে তার রেশ পুরোপুরি বদলে যায় অর্থাৎ বিলেত থেকে ফেরার পর কতিপয় গীতিনাট্যে বা নৃত্যনাট্যে বা গানে বিদেশি সুরের প্রয়োগ করেন। পরবর্তী সময়ে তেমনভাবে আর এ সুর তিনি গ্রহণ করেননি। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল এদিক থেকে ব্যতিক্রম। তিনি বিলেত থেকে ফেরার পর বিদেশি সুরের অভিজ্ঞতার ছাপ তাঁর পরবর্তী জীবনের বাকিটা সময় জুড়ে ছিলো। তবে বিদেশি সুরের ঢংটিকে তিনি তাঁর গানে বিশেষত স্বদেশপর্যায়ের গানে ব্যবহার করেন খুবই নিপুণ ও সংযতভঙ্গিতে। বিলেতি সুরের লাফিয়ে চলার ধরনটি দ্বিজেন্দ্রলালের বহু স্বদেশি গানের সুরে পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ কবি বিশ্বাস করতেন, মীড়যুক্ত সুরের থেকে খাড়া খাড়া সুরে স্বদেশি গানের বাণী বেশি স্পষ্টতা পায়। স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে–

> "ইংরাজী গানে স্বরগুলি সব সোজা সোজা, একটা স্বরের উপরে আর একটার নির্ভর নাই। প্রতিস্বর স্পষ্ট এবং স্বাধীন।... ইংরাজী গানের আবার যেরূপ ভাবের বৈচিত্র্য আছে, হিন্দু, সংগীতে তাহা নাই। কি করুণ, কি প্রেম, কি হাস্য, কি বীর, সব রসই ইংরাজী গানে আছে।... ইংরাজী সুর ধুমকেতুর মত কোথা হইতে আসিয়া চলিয়া যায়, তাহার ঠিকানা নাই,

... যেন, হাউয়ের মত একেবারে ঊর্দ্ধে উঠিয়া চলিয়া যায়, ... বাঙালী সঙ্গীতাদি একস্থানে শুইয়া মনে মনে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করে; ইংরাজী সংগীতাদি যেন পাইন বৃক্ষের ন্যায় সোজা সংযত নিয়মিত।... ইংরাজী গানে সংযমের ভাব আছে, যাহা হিন্দুগানে নাই, ... একটি ঊর্দ্ধমীলনোন্মুখ, অপরটি অর্দ্ধনিমীলিত। একটি জাগরণ, অপরটি তন্দ্রা, ... একটি দিবা, অপরটি সন্ধ্যা, ... একটি যেন প্রভাব আকাশে উড্ডীন স্বরসুধাবর্ষী পাপিয়া, অপরটি যেন নিভৃত নিকুঞ্জে কলকণ্ঠ কোকিল; একটি আশাময়ী, উন্মুখী সূর্যমুখী, অপরটি সভয়া, বিনতনয়না অপরাজিতা।"[১৪]

তবে এ ক্ষেত্রে অবশ্যই দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের গানে রাগ-রাগিণীর প্রতি গভীর প্রেমকে আলাদা সম্মান জানাতেই হবে। এবং তাঁর অন্যান্য পর্যায়ের গানে ভারতীর রাগ-রাগিণীর প্রয়োগকালে কবি উপলব্ধি করলেন কিছু রাগ-রাগিণীর ওঠানামার মধ্যেও বিদেশি সুরের ওঠানামার ধরনের সামঞ্জস্যতা দেখা যায়। সরল এবং তুলনামূলকভাবে সহজ ছন্দের তালে আবদ্ধ রাগের মধ্যে কবি এই লক্ষণ খুঁজে পান। যেমন ঝিঁঝিট, খাম্বাজ, সুরট খাম্বাজ প্রভৃতিতে সুরের ওঠানামতে বিদেশি সুরের লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। কবি তখন এই সকল রাগ-রাগিণীর সাথে বিদেশি সুরের সংমিশ্রণে এক প্রকার নিজস্ব স্বতন্ত্র ও অভিনব পন্থা গড়ে তোলেন। যে পন্থায় রাগ-রাগিণী এর নিজস্ব সত্তাটি বজায় রেখে চলে ঠিক তেমনি ইংরেজি গানে সুরের লাফিয়ে চলার সুরগত বৈশিষ্ট্যও একই ধারায় রক্ষা পায়। নিজের একান্ত সৃষ্ট সুরের স্টাইলে কবির রচিত গানগুলো পায় এক ভিন্ন মাত্রা। সকলের কাছে এর বিপুল গ্রহণযোগ্যতাও রয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশি গান আজও ঠিক ততটাই আধুনিক ও হৃদয়গ্রাহী। তাঁর স্বদেশি গানের বাণীর গভীরতা ও সুরের সরলতায় গানগুলো সকলের গান হয়ে উঠেছিল এবং আজও তাই হয়ে আছে। যে যেই গানেই পারদর্শী হোক না কেন দ্বিজেন্দ্রলালের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি শুনলে সকল বাঙালির হৃদয়ে স্বদেশের প্রতি এক অদ্ভুত আকুলতা তৈরি হয়। মিশ্র রাগের সাথে বিদেশি সুরের 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'তে বিদেশি সুরের ওঠানামার চলনটি রক্তে এক উন্মাদনা তৈরি করে। তাঁর স্বদেশের প্রতি নিবেদিত প্রতিটি সরল উক্তিতে দেশমাতার যে ছবি ভেসে ওঠে তাতে বিদেশি সুরের সরল প্রয়োগ গানের প্রতিটি শব্দকে দৃশ্যে পরিণত করে। এই অভিনব সুরভাবনা ও এর প্রয়োগ তাঁকে অনন্য এক কৃতিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। বিষয়টি উদাহরণের মাধ্যমে বুঝানো হলো–

"ধন্যধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা
তাহার মাঝে আছে দেশ এক সকল দেশের সেরা,
ও-সে স্বপ্ন দিয়ে তৈরী সে-দেশ স্মৃতি দিয়ে ঘেরা।
এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রাণী সে যে আমার জন্মভূমি ॥"

II সা সা -া | মা -া মা I মা -া মা | মা মা -া I
ধ ন ০ ধা ০ ন্য পু ষ্ প ভ রা ০

I মা মগা -পা | -া পা পা I পা পা -া | পক্ষা ধপা -া I
আ মা০ ০ ০ দের্ এই ব সু ন্ ধ০ রা০ ০

I মা মা -া | ধা ধা -া I ধর্সা ণা -া | ধা পমা -গা I
তা হা র্ মা ঝে ০ আ০ ছে ০ দেশ্ এ০ ক্

I মা মা -া | ধা পধা -র্সা I ণা ধা -া | -া ধা ধা I
স ক ল্ দে শে০ র্ সে রা ০ ০ ও সে

I ধর্সা -া র্সা | ণা ধা -ণা I পা -ধা পা | মা পা -া I
স্ব প ন দি য়ে ০ তৈ ০ রী সে দে শ

I সা গা -া | মা পা -ধপা I মপা -া মা | -া -া -া I
স্মৃ তি ০ দি য়ে ০ ঘে রা ০ ০ ০ ০

I ধর্সা র্সা -া | র্সা -া র্সা I র্সর্রা র্সা -া | ণা ধা -ণা I
এ ম ন্ দে শ্ টি কো০ থা ও খুঁ জে ০

I পমা পা -া | ধা পধা -ণা I ণা ণা -া | -া -া -া I
পা০ বে ০ না কো০ ০ তু মি ০ ০ ০ ০

I ণর্রা র্সা -া | ণা ধা -ণা I পধা পা -া | মা গা -া I
স০ ক ল্ দে শে র্ রা০ ণী ০ সে যে ০

I সা গা -া | মা -া মর্রা I র্রা র্রা -া | -া র্সা র্সা I
আ মা র জ ন্ ম০ ভূ মি ০ ০ সে যে

I ণা ধা -া | পধা -ণা ণা I রা রা -া | -া রা গা I
আ মা র্ জ০ ন্ ম০ ভূ মি ০ ০ সে যে

I সা গা -া | মা -পা ধপা I মগা মা -া | -া -া -া II
আ মা র্ জ ন্ ম০ ভূ মি ০ ০ ০ ০ ১৫

এই গানটির পাশ্চাত্য সুর, উচ্ছলতা ও গতিবেগ অন্য এক অভিনবত্ব এনে দেয়। এ প্রসঙ্গে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন,

> "প্রাণশক্তির চমক পেতেন বলে... নানা স্বদেশী গানেই তিনি এনেছিলেন এই সুরের টপ্‌কে টপ্‌কে চলা।... 'সকল দেশের রানী সে যে আমার জন্মভূমি'-তে জ-ন্ প্রথমবার মুদারার মা থেকে লাফ দিয়ে পৌঁছল ছটা সুর ডিঙিয়ে তারার রে-তে দ্বিতীয় 'সে যে আমার জন্মভূমি'র জনম্ গাওয়া হ'ল মুদারার কোমল নি-তে কিন্তু তারপরেই তুমি–মাটি নিল রেখাবে ফিরে পাঁচটা পর্দা এক লাফে নেমে...এ বৈদেশিকী গতিলীলা তিনি শুধু যে তাঁর স্বদেশী গানেই প্রবর্তন করেছেন তা নয়–তাঁর অন্য অনেক গানেও এ চাল পরিস্ফুট হয়েছে।"[১৬]

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর স্বদেশের গানে ব্যবহৃত রাগ-রাগিণীর মধ্যে ইমন, ভূপালি ও কেদারকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। হয়তো এই রাগসমূহের একটি স্বর থেকে অন্য স্বরে যাওয়ার রীতিটি বিদেশি সুরের চলার গতির মতো অর্থাৎ সুরের ওঠানামাতে বিদেশি সুরের চলার পদ্ধতিটি পরিলক্ষিত হয়।

ইমন– নি ধা পা ক্ষ্মা গা রে, রে গা মা রে নি রে সা (উভয় মা ব্যবহৃত ও নি প্রবল)।

ভূপালি– সা রে গা পা ধা র্সা ধা পা, গা পা ধা পা, গা রে সা (মা বর্জিত ধা প্রবল)।

কেদার– সা মা, মা গা, পা, ক্ষ্মা পা ধা, মা, গা পা ধা র্সা (উভয় মা ব্যবহৃত ও মা প্রবল)।

তাঁর অধিকাংশ স্বদেশি গানে এই রাগগুলোর ব্যবহার করেছেন। যদিও গানগুলো শুনবার সময় কোনো রাগের লক্ষণ বিশেষত পরিলক্ষিত হবে না, বা উপলব্ধি হওয়া কঠিন। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছে হিন্দুস্থানী গান শিখলেও কবি কখনোই হুবহু অনুকরণের পক্ষে ছিলেন না। যেকোনো রাগই কবি নিজস্ব ছোঁয়ায় তার রূপ পাল্টে এক নতুন রূপে উপস্থাপন করতেন তাঁর গানে।

এক্ষেত্রে স্বরলিপি অনুসারে আলাহিয়া-বিলাবলের সুরের সম্মিলনে সৃষ্ট সুরের অনুপ্রেরণায় রচিত গান 'বঙ্গ আমার জননী আমার' এর উল্লেখ প্রাসঙ্গিক। কারণ এই গানটি কবির অত্যন্ত প্রিয় একটি স্বদেশপ্রেমের গান যা মূলত সম্মেলক গান হিসেবে অধিক প্রচলিত। একতালের ত্রিমাত্রিক ছন্দের এই গানটির স্বরলিপি তুলে দেওয়া হলো,

"বঙ্গ আমার! জননী আমার!
ধাত্রী আমার! আমার দেশ,
কেন গো মা তার শুষ্ক নয়ন,
কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ!"
(আলাহিয়া-বিলাবল–ত্রিমাত্রিক)

সা সা সা	রা গা া I	রগা মা মা	মা মা –া I	পা –া পা	পা পা পমা I	ধা ধা –া	ধা –া –া I
ব - ঙ্গ	আ মা র	জ ন নী	আ মা র	ধা ু ত্রী	আ মা র	আ মা র	দে - শ
ধা ধা র্সা	সা র্সা পা I	পা –া পা	পা পা –া I	মা মা মা	গা গা মা I	রগা গমা মা	মা –া –া I
কে ন গো	মা তো র	শু - ষ্ক	ন য় ন	কে ন গো	মা তো র	রু - ক্ষ	কে - শ
মা মা মা	পা পা –া I	ধা ধা –া	ধা ধা –া I	ণা ণা ণা	ধা ণা ধা I	পা ধা পা	র্সা –া –া I
কে ন গো	মা তো র	ধু লা য়	আ স ন	কে ন গো	মা তো র	ম লি ন	বে - শ

র্সা –া র্সা | র্সা র্রা র্সা I ণা –া ণা | ধা ধা –া I মা –া মা | পা ধা ধা I পণা ণা –া | ণা –া –া I
স - প্ত কো - টি স ন্ তা ন যা র ডা - কে উ - চ্চে আ মা র দে - শ

II {ণা ণা –া | ণা –া পা I ধা ধা –া | ধা –া মা I পা পা –া | পা –া গা I মা মা –া | রা –া –া I
কি সে র দুঃ খ কি সে র দৈ - ন্য কি সে র ল জ্জা কি সে র ক্লে - শ

সা –া সা | রা –া রা I গা গা গা | মা –া মা I পা –া পা | ধা ধা ণা I পণা ণা –া | ণা –া –া I
স - প্ত কো - টি মি লি ত ক - ণ্ঠে ডা - কে য খ ন আ মা র দে - শ

১৭

লক্ষণীয় যে, আলাহিয়া বিলাবলের আরোহন-অবরোহন বক্ররূপে গাওয়ার রীতিই প্রচলিত। এর বিশেষ কিছু স্বরসংগতি রয়েছে। যেমন- ‘ধা ণা ধা পা, সা না ধা ণা পা মা গা মা রা, গা পা মা গা মা রা সা’ প্রভৃতি। উক্ত গানের ’কেন গো মা তোর ’ ও ‘কিসের লজ্জা কিসের ক্লেশ ’ অংশটি লক্ষ্য করলে দেখা যায়, আলাহিয়া বিলাবলের দুটি স্বরসংগতি ‘ধা ণা ধা পা’ ও ’গা পা মা গা মা রা সা’ সম্পূর্ণ রূপে মেনে চলছে।

এই গানটিতে কবি শত কোটি সন্তানের জননী ভারতমাতার স্তুতি বন্দনা করেছেন। এই রকম বহু স্বদেশি গানে বিদেশি সুরের সাথে দেশীয় রাগ-রাগিণী মিশ্রণের অভিনব পদ্ধতিটি পরিলক্ষিত হয় তাঁর গানে। যেমন–

১. ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে–লঘুছন্দ–একতাল।

২. ভারত আমার ভারত আমার–ইমন-ভূপালি–একতাল।

৩. আজি গো মা তোমায় বরণে–ইমন-কল্যাণ–একতাল।

৪. সেথা গিয়েছেন তিনি সমরে–ইমন–একতাল।

বিদেশি সুরের প্রয়োগ করলেও ছন্দের ক্ষেত্রে তিনি দাদরার পরিবর্তে একতালের গম্ভীরতাকে গ্রহণ করেছেন ভারতীয় রাগসংগীত রীতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে। এখানেই কবির অভিনবত্ব। আরও দুটি গানের স্বরলিপির অংশ এখানে যুক্ত করা হলো,

ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র,
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এশিয়ার তুমি তীর্থ ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগৎ-জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম-ভক্তি ধর্ম-শিক্ষা।
কোরাস্ : ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী, ধর্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী ॥

(ইমন-ভূপালী–একতাল)

০ ১ + ৩

সা সা ধ্ া | সা সরা গা I গা গা গা | গা গা গা I রা গা ক্ষা | ক্ষা ক্ষা ক্ষা I

ভা র ত আ মা র ভা র ত আ মা র যে খা নে মা ন ব

ক্ষা পগা গা | পা -া পা I

মে লি ল নে - ত্র

পা পা ধা | ধা ধা ধা I ধা না ধা | পা গা রা I না না না | না না র্সা I ধনা র্রা র্সা | র্সা -া -া I

ম হি মা র তু মি জ ন্ ম ভূ মি মা এ শি য়া র তু মি তী - র্থ ক্ষে - ত্র

পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্রা র্রা | র্রা র্রা র্গা I

দি য়া ছ মা ন বে জ গ - জ্জ ন নী দ - র্শ ন উ প

র্সা র্রা সর্রর্গা | র্গা -া র্গা I

নি ষ দে দী - ক্ষা

র্গা র্পা র্গা | র্রা র্রা র্রর্সা I সা র্সা র্সা | ধা ধা ধা I পা ধা না | না না র্সধা I

দি য়া ছ মা ন বে জ্ঞা ন ও ভ - ক্তি ক - র্ম্ম শি ল্ প

পা ধা র্রা | র্সা -া র্সা I II

ধ - র্ম শি - ক্ষা

II র্সা র্সা -া | র্সা র্সা -া I না না -া | ধা ধা -া I পা ক্ষা পা | না ধা পা I ক্ষা পধা পা | গা -া গা I

ভা র ত আ মা র ভা র ত আ মা র কে ব লে মা তু মি কৃ পা র পা - ত্রী

গা র্গা গা | র্রা র্রা র্সা I র্সা র্সা ধা | র্রা র্সা র্সা I গা -া রা | গা মা মা I

ক - র্ম্ম জ্ঞা নে র তু মি মা জ ন নী

গা গা রগা | ন্া রা সা I

তু মি মা ধা - ত্রী [১৮]

ইমন ও ভূপালী রাগ উভয়ই কল্যাণ ঠাটের অন্তর্গত। তাই ইমন ও ভূপালী উভয় রাগেরই নিজস্ব সংগতি ছাড়াও কল্যাণ অঙ্গের কিছু বিশেষ স্বরসংগতি পরিলক্ষিত হয়। ভারত আমার গানটি লক্ষ্য করলে দেখা

যায় কল্যাণ অঙ্গের ’ পা ধা পা সা’ স্বরসংগতি, ভূপালীর ’গা পা গা রা সা’ এবং ইমনের ’না রা সা’ প্রভৃতি স্বরসংগতি ব্যবহৃত হয়েছে।

“আজি গো তোমার চরণে, জননী! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান;
ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান!
মন্দির রচি মা তোমার লাগি,
পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি,
তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী,
স্নেহের সারিতে করিয়া স্নান!

(কোরাস)
জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান,
যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমলচরণে স্থান!”
(ইমন কল্যাণ–ত্রিমাত্রিক)

\+ ০ + ০

সা রা গা | গা গা –া I গা গা গা | গা মা গা I রা গা ক্ষা | ক্ষা –া পক্ষা I গা ক্ষা ধা | পা –া –া I

আ জি গো তো মা র চ র ণে জ ন নি আ নি য়া অ - র্ঘ্য- ক রি মা দা - ন

পা –া পা | না –া না I ক্ষা ক্ষা ক্ষা | ধা –া ধা I গা গা রা | গা পমা –া I গা রগা রা | সা –া –া I

ভ - ক্তি অ - শ্রু স লি ল সি - ক্ত শ তে ক ভ - ক্ত দী নে র গা - ন

পা ধা পা | র্সা র্সা র্সা I র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা I না না না | ধা পক্ষা ধা I না ধা না | ধা পা পা I

ম ন্ দি র র চি মা তো মা র লা গি প য় সা কু ড়া য়ে প থে প থে মা গি

পা র্গা র্গা | র্রা র্গা র্সা I র্সা র্রা র্সা | না র্সা না I ধা না ধা | পা ধা পা I পা ধা গগা | র্সা –া –া I

তো মা র পূ জি য়ে মি লে ছে জ ন নী স্নে হে র স রি তে ক রি য়া স্না ু ন

II র্সা র্সা র্সা | র্সা –া র্রর্সা I না না না | ধা ধা ধা I পক্ষা পক্ষা পা | না –া ধা I পক্ষা ধা পা | গা –া –া I

জ ন নি ব - ঙ্গ ভা ষা এ জী ব নে চা হি না অ - র্থ চা হি না মা - ন

রা গা রা | গা পমা –া I গা রগা রা | নরা সা সা I সা রা গা | পা ধা ধা I নধা না পা | র্সা –া –া I

য দি তু মি দা ও তো মা র ও দু টি অ ম ল ক ম ল চ র ণে স্থা - ন

১৯

ইমন কল্যাণে উভয় মধ্যমের প্রয়োগ রয়েছে। তীব্র মদ্যমের আধিক্য থাকলেও অবরোহনকালে শুদ্ধ মধ্যমের প্রয়োগ লক্ষণীয়। ’আজি গো তোমার চরণে ’ গানের প্রথম চরণেই ইমন কল্যাণের রাগরূপ স্পষ্ট; শাস্ত্রীয় বিধিমতে উভয় মধ্যমের প্রয়োগের মাধ্যমে।

গান দুটি রাগসংগীতে বিদেশি সুরের প্রয়োগ ছাড়াও কবি তাঁর স্বদেশপর্বের গানের নিজ ভূমির নিজস্ব সুর অর্থাৎ বাউল-কীর্তনের সুরকে গ্রহণ করেছেন আপন মমতায়। স্বদেশের জন্য আন্দোলন অবশ্যই স্বদেশের নিজস্ব সকল সুরের গানেই সম্ভব। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ যেমন সহজ সরল মাটির সুরে স্বদেশপর্যায়ের গান রচনা করেছেন, তেমনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও। কীর্তন, বাউল, সারি ও রামপ্রসাদীর মতো বাঙালির চিরচেনা সুরকেই কবি বেছে নিয়েছেন স্বদেশের মর্মবাণীকে উপস্থাপনের জন্য। কারণ রাগ-রাগিণীর কালোয়াতিতে অনেক সহজ কথাও কঠিন হয়ে যায়। তাই স্বদেশের প্রতি সরল, নিখুঁত ভালোবাসাকে কবি প্রকাশ করেছেন সরল সুরের সহজ ভঙ্গিমায়। যে সুর বুঝতে পারা ও গাইতে পারা উভয়ই সাধারণের জন্য খুব সহজ। কীর্তন-বাউলের নিজ সুর সকল বাঙালির হৃদয়ে গাঁথা। তাই কবির অনেক স্বদেশের গানে কীর্তন-বাউলের সুর পরিলক্ষিত হয়। স্বরলিপির উদাহরণে বিষয়টি বোঝানো সহজ। যেমন–

“একবার	গালভরা মা ডাকে
	মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক্ মা ব'লে ডাক মাকে।
ডাক্	এমনি ক'রে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক্ ভ'রে ;
আর	ভায়ে ভায়ে এক হ'য়ে যাক্ যেখানে যে থাকে ॥
দু'টি	বাহু তুলে নৃত্য ক'রে ডাক্ রে মা মা ব'লে
আর	নেচে নেচে আয় রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে।”

(বাউল–ত্রিমাত্রিক ছন্দ)

‖

II মা মপা I গা মা গমগা | রা সা রা I ন্া সা –া | (মা মপা ধপা) I –া । ।
এক বার গা ল ভ রা মা - ডা কে - এক বা র - - -

মা –া মা | মা মা –া I মপা ধা পা | মা গা –া I মা –া মা | মা মা পমা I গপা মা –া | –া II
মা - ব লে ডা ক্ মা - ব লে ডা ক্ মা - ব লে ডা ক্ মা কে - -

মা া I মা ধা ধা | ধা ধা না I না র্সা –া | র্রা র্সা –া I না –া ধা | না র্সা –া I র্রা র্সা –া | া
ডা ক্ এ ম্ নি ক রে - আ কা শ ভু ব ন সে ই ডা কে যা ক্ ভ রে - -

ধা –া I র্সা র্সা না | র্সা র্সা র্রা I ন্া র্সা না | ধা পা –া I না না র্সনা |
আ র ভা য়ে - ভা য়ে - এ ক হ য়ে যা ক্ যে খা -

ধা পা –া I মপা ধপা মগা | –া II
নে যে - থা - কে

সা সা I মা মা -া | মা মা া I মা -া পধা | পধপা মা গা I গা -া গা | মা পা পা | পক্ষা ধপা -া I া
দু টি বা হু - তু লে - নৃ - ত্য ক রে - ডা ক্ রে মা - মা ব লে - -

মা মা I মা মা -া | মা মা া I ধা পা পা | মা গা -া I গা গা গা | গমা ঃগা পা I মা মা -া|
আ র নে চে - নে চে - আ য় রে মা য়ে র ঝাঁ পি য়ে প ড়ি - কো লে -
[২০]

এই সকল গানের সুর সমস্বরে গাইবার উপযোগী। মানুষের মনে স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্ষেপণে ও স্বদেশের প্রতি গভীর আবেগ প্রকাশে কবি হৃদয়ের চিরচেনা সুরকে বাউল-কীর্তনের সুরে বেছে নিয়েছেন। 'দেশপ্রেমের বা ভক্তিরসের গানের সুরসৃষ্টিতে দ্বিজেন্দ্রলাল কীর্তন ও বাউলের সহজ সুরের উদাত্ত আবেগকে গ্রহণ করেছেন। এই গানগুলি মানুষের অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে মূর্ছিত হবে, এটাই কাম্য।'[২১]

কোরাস বা সমবেত কণ্ঠে গাইবার রীতিটিও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রবর্তন করেন। কোরাস রীতিটি মূলত ছিলো বিলেতি একটি পন্থা। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ই প্রথম বাংলা আধুনিক গানে এ ধারার সন্নিবেশ করেন। স্বদেশপর্বের গানে এই কোরাস রীতি গানের উচ্চতা ও আত্মিক চঞ্চলতা অনেকাংশে বৃদ্ধি করে। স্বদেশের প্রতি নিবেদিত কোনো লাইন যখন সমস্বরে বহুজনে গায় তখন একটি শপথ বাণীর মতোই উচ্চারিত হয়। কোরাস গানের এই রীতির প্রবর্তন দ্বিজেন্দ্রলাল রায়কে স্বদেশপর্বের গানের ক্ষেত্রে চির বরণীয় ও স্মরণীয় করে রেখেছে। তাঁর নবধারার সংগীত প্রতিভার বিষয়ে দিলীপকুমার রায় লিখেছেন,

> "কোরাস্ গানে তাঁর তুল্য শক্তিমত্তা অদ্যাবধি কেউ প্রকাশ করতে পারেনি–কারণ তাঁর সুর রচনার ভঙ্গি, প্রাণের উৎসাহ, আনন্দের পৌরুষ ছিলো আশ্চর্য অদ্বিতীয়! যাঁরা সে সময়ে তাঁর শেখানো দলের ব্যূহাগ্রে "বঙ্গ আমার জননী আমার" গান তাঁর মুখে শুনেছেন (আমরাও প্রায়ই থাকতাম এ কোরাসে) তাঁরা সবাই এক বাক্যে স্বীকার করতেন যে তাঁর গানের কথা ও সুরের সংমিশ্রণে যে আগুন জ্ব'লে উঠত সে আগুন আর কোনো বাংলা গানেই জ্বলে ওঠে নি তখন পর্যন্ত।"[২২]

দিলীপকুমারের বর্ণনায় আরো পাই যে, কোরাস সংগীত মানে একটি আলাদা সাংগেতিক বৈশিষ্ট্যের আবহ সৃষ্টি, যা সকল শ্রেণির শ্রোতার ভাবকে আন্দোলিত করে । যা সমষ্টিগত শুভ প্রত্যাশা পূরণে এর ভূমিকা অনস্বীকার্য।

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ,
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি সে কী মা হর্ষ।।
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি!
বন্দিল সবে "জয় মা জননি জগত্তারিনি জগদ্ধাত্রি!"..
শীর্ষে শুভ্র তুষার-কিরীট সাগর উর্মি ঘেরিয়া জঙ্গা !
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা!
কখনো মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে :
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে ছড়ায়ে পড়িছে নিখিল বিশ্বে।"[২৩]

এ জাতীয় কোরাস বা সমবেত সংগীতকে জাতীয় জীবনে শ্রেষ্ঠ সংস্কৃতি সম্পদ বলা যেতে পারে যা সুরে, ছন্দে, কাব্যে ও চিত্রাঙ্কনে অভূতপূর্ব ভূমিকা রাখে।

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁদের সংগীতভাণ্ডারকে ও সুরের বহুতাকে যেমন অভিনব করে তুলেছিলেন, তেমনভাবে অতুলপ্রসাদের গানে ঠুমরির সূক্ষ্ম কারুকাজ আর নজরুল সম্পূর্ণটাই বৈচিত্র্যের অনুসন্ধানী। সেদিক থেকে সমকালীন এই সকল গীতিকবিদের মধ্যে কান্তকবি ছিলেন একান্ত ঘরোয়া ও তুলনামূলকভাবে বৈচিত্র্যহীন। বহির্জগতের বৈচিত্র্যতা রজনীকান্তকে কখনোই আকৃষ্ট করেনি। এমনি নিরাভরণ বৈশিষ্ট্য রজনীকান্তের স্বদেশপর্বের গানের সুর রচনাতেও পরিলক্ষিত হয়। বাল্যকালে যেহেতু সংগীতশিক্ষার তেমন সুযোগ রজনীকান্ত সেন পাননি তাই সুর নিয়ে বহু গবেষণা তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, গ্রহণ-বর্জনের অবকাশটি তাঁর গানে বিরল।

আত্মপ্রচার বিমুখ রাজশাহীর গ্রাম্য পরিবেশে বেড়ে ওঠা শান্ত স্বভাবের কান্তকবির সকল গানে তাঁর চরিত্রের ছাপটি স্পষ্ট। তাঁর অন্তরের সুর বোধেই তাঁর সংগীতের জগৎ পরিবেষ্টিত। বাল্যকালে বাবা গুরু প্রবাদ সেনের দেওয়া সংগীতের সহপাঠ। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ও কাঙাল হরিনাথের প্রভাব তাঁর গানের সুর রচনায় যতটুকু বিস্তার ফেলে। অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সাথে পরিচয় হলে তাঁর সংগীত দ্বারাও খানিক প্রভাবিত হয়েছিলেন রজনীকান্ত সেন।

অত্যন্ত মেধাবী এবং মজলিসী মানুষ ছিলেন রজনীকান্ত সেন। রাজশাহীর 'উৎসবরাজ' বলেও খ্যাত ছিলেন তিনি। এখানে উল্লেখ্য, 'অনায়াসে গান বাঁধতে পারার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিলো তাঁর। রাজশাহী লাইব্রেরিতে অনুষ্ঠিত কোনো এক সভায় যাবার মাত্র এক ঘণ্টা আগে রজনীকান্ত অসাধারণ সেই দেশপ্রেমের আবেগদীপ্ত , 'তব চরণ নিম্নে উৎসবময়ী' গানটি রচনা করেন। তাছাড়া বিশেষ কোনো ঘটনার গুণে অনুকরণ করেও তিনি তৎক্ষণাৎ গান রচনা করতে পারতেন।'[২৪]

রজনীকান্ত সেনের সাহিত্যকর্ম বিশ্লেষণে যেমন সরলতা পরিলক্ষিত হয়, তেমনি তাঁর গানের সুর সৃষ্টির ভাণ্ডারেও পাই সারল্য ও সহজ সাদামাটা অবয়ব। তাঁর সুর সাধনায় কখনোই বিলেতি সুরের প্রভাব বা একাধিক রাগমিশ্রণের উদাহরণ পাওয়া যায় না। প্রচলিত রাগের বিশুদ্ধ রূপটিই তিনি গ্রহণ করেছেন। তাই ভাঙা-গড়ার খেলা তাঁর গানের সুরের একান্তই বিরল। সুর রচনাতে তিনি সাধারণত ভৈরবী, হাম্বীর, ইমন, বেহাগ, খাম্বাজ, কেদারা, কাফি, মিশ্র কানাড়া, মিশ্র বেহাগ, ঝিঁঝিট, মিশ্র ভূপালি প্রভৃতি রাগের আশ্রয় নিতেন। যদিও সুর রচনাতে তিনি বেহাগ, ভৈরবী, ইমন, ঝিঁঝিট, খাম্বাজ রাগ-রাগিণীকে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। রাগমিশ্রণ তাঁর গানে খুব কম দেখা যায়, যেমন মিশ্র ঝিঁঝিট, মিশ্র ভূপালি, মিশ্র কাফি, সিন্ধু খাম্বাজ, মিশ্র ইমন প্রভৃতি রাগ গ্রহণের কতিপয় উদাহরণ পাওয়া যায়। এখানে কেদারা রাগে একটি উদ্দীপনামূলক গানের সুরের অবকাঠামোটি তুলে ধরা হলো,

"জাগাও পথিকে, ও যে ঘুমে অচেতন।
বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন।
থাকিতে দিনের-আলো,
মিলে সে বসতি, ভালো,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন?"

(তাল : কাহার্‌বা)

II গা সা –মা মা | মা মা মা মা I মা মগা গপা ক্ষা | পা –া –া –া I
জা গা ও প থি কে ও যে ঘু মে০ অ চে ত ০ ০ ন্

I প্টা পা ধা –র্সা | ধা ধা পক্ষা ধপা I –া মাঃ গঃ পমা | রা –া সা –া II
বে লা যা য়্ ব হু দূ০ রে০ ০ পান্ থ নি কে ০ ত ন্

II {–া পপা নধা র্সা | র্সা র্সা র্সনা ধর্সা I –া ধনধনাঃ র্সঃ র্রা | র্সা নর্সা ধা পা} I
০ থাকি তে দি নে র আ০ লো ০ মি০লে০ সে ব স তি০ ভা লো

I –া পর্সা না র্সা | ধা ধা পক্ষা ধপা I –মা মা মা গমা | রা –া সা –া II
০ নতু বা ক রি বে কো০ থা০ ০ যা মি নী যা ০ প ন্

২৫

রাগ কেদারে আরোহে ঋষভ গান্ধার বর্জিত হওয়ায় ষড়জের পর সরাসরি মধ্যমের প্রয়োগ হয়ে থাকে। তাছাড়া আরোহে ' না ধা পা', অবরোহে 'ধা মা বা ধা পা সা' , 'মা রা সা' প্রভৃতি স্বরসংগতি প্রয়োগে রাগরূপ স্পষ্ট হয়। উক্ত গানে সা মা ও ধা পা মা- এর সুনিপুণ প্রয়োগ হতে দেখা যায়।

এই গানটিতে রজনীকান্ত সেনের রচিত গানের আরও একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। তা হলো তাঁর অনেক গানে সঞ্চারীর অনুপস্থিতি। এই গানটি সঞ্চারীবর্জিত দুটি অন্তরাতেই একই রকম সুরে রচিত যা কেদারা রাগে ও চার চার ছন্দে আবদ্ধ। যেকোনো সচেতন সুরকার নিজের মুন্সিয়ানা প্রকাশে অন্তরা ও আভোগ অংশে প্রায় একই ধরনের সুর দিলেও সঞ্চারীর সুরটিকে আলাদা সুর প্রয়োগ করেন গানের ভাবকে ঘনিভূত করবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রজনীকান্ত সেন এক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম। সঞ্চারীর সুর প্রয়োগের ক্ষেত্রেও তিনি সুর পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করেননি, বরং সুরের সারল্যই তাঁর গানের সুরের ভাব প্রকাশে অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে। এমনই তাঁর স্বদেশপর্যায়ের গানের সুর রচনাতেও সঞ্চারী অনুপস্থিতি লাভ করা যায়,

"মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ওই মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ পরের দোরে ভিক্ষে চাই।"

(তাল : দাদ্‌রা)

II {ন্‌া সা -া | গা গা -মা I পা পা -প | (পনা না -া I
মা য়ে র্‌ দেও য়া ০ মো টা ০ কা প ড়্‌

I নর্সা র্সা -া | র্সা র্সা -না I ধা -না ধা | পা -া -া I
মা থা য়্‌ তু লে ০ নে ০ রে ভা ০ ই

I পা -া ধা | ধর্সা ণা -ধা I পা -ধা পা | মা পা -া I
দী ন্‌ দুঃ খি০ নী ০ মা ০ যে তো দে র্‌

। । ॥
I গা -রা গা | গমা -পধাঃ পঃ I গা -া রা | সা -া -া} II
তা র্‌ বে শী০ ০০ আর্‌ সা ০ ধ্য নাই ০ ০

পা -া II {ক্ষা পা -া | না না -র্সা I র্সা -া র্সা | র্সা না -া I
ও ই মো টা ০ সু তো র্‌ স ং গে মা য়ে র্‌

I র্সা র্সা -র্গা | র্রা র্সা -রর্স I না -া না | র্সা (পা -া)} I পা পা I
অ পা র্‌ স্নে হ ০ দে খ্‌ তে পাই ও ই আম্‌ রা

I পা -া ধর্সা | র্সা ণা -ধা I পা -ধা পা | মা গা -া I
এ ম্‌ নি০ দ০ পা ষা ণ্‌ তা ই ফে লে ও ই

I গা গা -মা | গমা -পা মা I গা -া রা | সা -া -া II
প রে র্‌ দো০ ০ রে ভি ০ ক্ষে চা ০ ই

২৬

রজনীকান্ত সেনের গানে বরাবর কথার প্রাধান্য বেশি, সুরের নয়। তাঁর সামগ্রিক রচনাভাণ্ডার থেকে দৃষ্ট যে সুরের বৈচিত্র্য সৃষ্টির দিকে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না। তাঁর স্বদেশপর্বের গানও তাই। রজনীকান্ত সৃষ্টি গানের সুর মূলত রাগভিত্তিক। রাগের আশ্রয়েই রচিত তাঁর স্বদেশপর্বের গানসমূহ। রজনীকান্তের সামগ্রিক গানের সুর সৃষ্টিতে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য উল্লেখ প্রয়োজন যে বিভিন্ন রাগে কয়েকটি সুরের বারবার ব্যবহার। কল্যাণ ও ভূপালী রাগের স্বর (সা ধা সা রা গা) রজনীকান্ত সেনের গানে অধিক ব্যবহৃত সুর। এই স্বরগুলোর ব্যবহারের কারণ হয়তো এরমধ্যে একপ্রকার করুণতা

রয়েছে। সেই কাতরতা পরিলক্ষিত হয় তাঁর স্বদেশপর্ব থেকে প্রায় সকল গানে। রাগ-রাগিণীর বিশুদ্ধতার উপর যে খুব বেশি দৃষ্টিপাত করেছেন কবি তা নয়। মূলত স্বরগুলোর করুণ রস তাঁকে বেশি মোহিত করেছে।

সুরের সরল নিরলঙ্কার চলনকে রজনীকান্ত সেন তাঁর গানের অবয়ব করেছেন। এমনকি বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতির ধারাকে তিনি আশ্রয় করেছেন এর নিরাবরণ অলংকরণে। তাঁর গানে বাউল, রামপ্রসাদী ও কীর্তনের সুরও রয়েছে, যা কেবল শুদ্ধ আবেগের রসবোধে পরিপূর্ণ।

মূলত সরলতা, করুণভাব এবং আত্মনিবেদনের স্বাতন্ত্র্যভঙ্গি রজনীকান্ত সেনের গানের সুর প্রয়োগের মূল বৈশিষ্ট্য। অত্যন্ত সহজ সরল কাঠামোতে রজনীকান্ত সেনের স্বদেশপর্বের গানের সুর বিন্যস্ত। তাঁর গানে যেমন তাল বা লয়ের বৈচিত্র্যতা নেই, তেমনি নেই রাগ-রাগিণী নিয়ে মিশ্রণরীতির প্রকাশ। রাগ-রাগিণীর ব্যবহারেও সর্বত্র একটি করুণ সুরে অবিন্যস্ত রজনীকান্ত সেনের গান। তাঁর বহুল ব্যবহার্য ভৈরবী, ইমন, বেহাগ, খাম্বাজের সহজ সরল উপস্থাপন মূলত তাঁর গানের সুরের মূল বৈশিষ্ট্য। রজনীকান্ত সেনের গানের কোনো নির্দিষ্ট ভঙ্গি বা কাঠামো গড়ে উঠেনি, বা তিনি চাননি গড়তে। সুরের সরল প্রকাশ এবং বাহুল্যবর্জিত সহজ পথের অনুসন্ধানী ছিলেন তিনি। আত্মভাবে পূর্ণ শুদ্ধ সুরের সরল রূপ প্রকাশ কান্তকবির স্বদেশপর্বের গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ

কণ্ঠে মায়াভরা সুর আর অন্তরে সহজ সুরের অতুলনীয় মূর্ছনা নিয়ে জন্মেছিলেন গীতকবি অতুলপ্রসাদ সেন। রবীন্দ্রনাথ বা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো সাংস্কৃতিক আবহে বড় হওয়ার সুযোগ হয়নি অতুলপ্রসাদ সেনের কিন্তু মাতামহ কালী নারায়ণের বাউল গান ও পিতা রামপ্রসাদ সেনের শান্ত মঙ্গলাচরণ শুনে শুনে সংগীতের সাথে হৃদয়ের সংযোগ হয় তাঁর নিজের অজান্তেই। আপন অন্তরের নিভৃতেই গানের জগতে প্রবেশ হয়েছিলো অতুলপ্রসাদ সেনের। কোনো নির্দিষ্ট শিক্ষাগুরুর কাছে নিয়মনীতি মেনে সংগীত শিক্ষার সুযোগ তার কখনো হয়নি। তবে অতুলপ্রসাদ সেন বরাবর ভক্ত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। যে কারণে তিনি খামখেয়ালী স্বভাবের সদস্য হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের সান্নিধ্য লাভ করেন। এই খামখেয়ালী স্বভাবের সদস্য হয়েই তিনি রাধিকাপ্রশান্ত গোস্বামীর সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগ লাভ করেন। রাধিকাপ্রশান্ত গোস্বামীর উচ্চাঙ্গসংগীতে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর মতো উচ্চাঙ্গসংগীত রচনার বাসনা করেন। অতুলপ্রসাদের নিজের কথায় জানা যায়,

> "খামখেয়ালী আসরে বিখ্যাত গায়ক রাধিকাপ্রশান্ত গোস্বামী তাঁহার উচ্চাঙ্গের তাল-লয়মণ্ডিত গান গাহিয়া আমাদের মনোরঞ্জন করিতেন। আমি ভাবিতাম, আমিও তাঁহার মতই সুর রচনা করিব। রবীন্দ্রনাথের সংগীত প্রতিভা এমন সর্বমুখী যে, গোস্বামী মহাশয়ের উপাদেয় সুরে রবীন্দ্রনাথ গান বাঁধিতেন এবং কবির সে নব রচিত গানগুলি রাধিকাপ্রশান্ত খামখেয়ালী আসরে শুনাইতেন। খামখেয়ালী মজলিসে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অধিকারী। আমরা ছিলোম তাহার সাঙ্গপাঙ্গ। তাঁহারই পদতলে আমাদের বিশেষত আমার সুরদীক্ষা।"[২৭]

কর্মসূত্রে অতুলপ্রসাদ সেন লক্ষ্ণৌ শহরে বাসা বাঁধেন। লক্ষ্ণৌর আকাশ বাতাস পরিপূর্ণ ছিলো সুরের মায়াজলে। ঠুংরী ছিলো লক্ষ্ণৌবাসীর অন্তরের সুর। সেই ঠুংরী গানের মধুরস অতুলপ্রসাদের সংগীত জীবনের গতি বদলে দিলো। তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গানও এর ব্যতিক্রম নয়। রাগ-রাগিণীর ব্যবহার থেকে শুরু করে বাউল-কীর্তনের সুরও তিনি প্রয়োগ করেছেন তাঁর স্বদেশপর্বের গানের সুর রচনায়। এছাড়াও ভাটিয়ালি, রামপ্রসাদী সুরের উপস্থিতিও পাওয়া যায় তাঁর স্বদেশপর্বের গান রচনায়। এই ধারার গানের কতিপয় উদাহরণ দেওয়া হলো–

১. কিষাণ ভাই, তুমি কি ফসল ফলাবে–ভাটিয়ালি।
২. দেখ মা এবার দুয়ার খুলে–রামপ্রসাদী মালসী।
৩. মোদের গরব মোদের আশা–বাউল।
৪. প্রবাসী চল রে দেশে চল–বাউল।

অন্যান্য গীতিকবিদের মতো অতুলপ্রসাদ সেনের ক্ষেত্রেও স্বদেশি গানের সুর রচনায় রাগ-রাগিণীর ব্যবহারবর্জিত সাধারণ বাংলার বাউল-কীর্তনের সুরে রচিত গান অধিক গ্রহণযোগ্যতা ও মানুষের ভালোবাসা পেয়েছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অত্যন্ত প্রিয় গান, 'দেখ মা এবার দুয়ার খুলে' গানটি। সমবেত কণ্ঠে গীত এই গান সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনে হতাশার বুকে আশা জাগানিয়া সুর। রামপ্রসাদী সুরের এমন এক বাংলার নিজস্ব ঢং রয়েছে যাতে বাংলার প্রতিটি প্রাণ আন্দোলিত হয়। এ প্রসঙ্গে স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিটি সংযুক্ত করতে চাই,

> "অতুলপ্রসাদের গানের সুর অত্যন্ত সরল। বড়ো তালে, লয়ের বৈচিত্র্যে গানগুলি নিবদ্ধ নয়। কাব্যসংগীতের বাক্রবন্ধে যে সারল্য আছে, সুরেও সেই সরলতা স্পষ্ট। বাউল, কীর্তন, ভাটিয়ালিতে বাঁধা আছে তাঁর অনেকগুলি গান। বাউল বা কীর্তনের সুরে আছে সহজ সুর প্রয়োগ। অতুলপ্রসাদ প্রায় ৪০টির মতো বাউল-কীর্তন অঙ্গের গান রচনা করেছেন, অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে বাউল বা কীর্তনের সুরে যে আবেগমথিত হৃদয়ানুভবে উদাত্ত গভীর আহ্বান ছড়ানো, তা তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তবে, বাউল বা কীর্তনের প্রচলিত আঙ্গিকে তিনি উত্তর ভারতের সুররীতিকে অপূর্ব মিশিয়েছে, এবং তার ফলে গানগুলির সুরে বাউল-কীর্তনের ছাপ স্পষ্ট থাকা সত্ত্বেও অতুলপ্রসাদের ঠুংরী-ভঙ্গিম রীতির সুক্ষ্ম সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়।"[২৮]

অতুলপ্রসাদের বিখ্যাত 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটিও রচিত বাউল সুরে। রবীন্দ্রপ্রেমে উদ্ভাসিত অতুলপ্রসাদ সেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাপ্তিতে অঞ্জলিমাল্যস্বরূপ রচনা করলেন সমগ্র বাঙালির অন্তরের গান। অতুলপ্রসাদ যে মূলত চির স্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে রইল সংগীতের আসরে বাউল সুরে রচিত তাঁর এই সৃষ্টির জন্য,

"মোদের গরব, মোদের আশা, আ-মরি বাংলা ভাষা!
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা ॥
কী যাদু বাংলা গানে–
গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনল দেশে ভক্তিধারা–
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?"
(বাউল সুর)

II {সন্‌া সা –া | গা গা –া I গা গা –মা | মা পা –ধা I
মো০ দে র্ গ র ব্ মো দে র্ আ শা ০

ll
I -মপা –া মা | গা রসা –রা I গা –া মগা | রা সা –া} I
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০

{মগা}
I {মা মা –পা | পা পা –দা I পা পা –দা | পা ণদা –পমা I
তো মা র্ কো লে ০ তো মা র্ বো লে০ ০০

I মা মা –পা | মপা –মা গা I গা গা –মা | মা পা –ধা I
ক ত ই শা০ ন্ তি ভা লো ০ বা সা ০

I পা –া (–া | –া –া –া)} I মা | গা রসা –রা I গা –া মগা | রা সা রসাা II
০ ০ ০ ০ ০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

I –া –া মা | পা না –া I { না –র্সা র্সা | র্সা র্রর্সা –না I
০ ০ কী যা দু ০ বা ঙ্ লা গা নে০ ০

[র্সর্রর্গা]
I র্সা –া র্সর্গা | র্রা র্সা –র্রর্সনা I না না –া | র্সা র্সা র্সা I
গা ন্ গে০ য়ে দাঁ ০০ডু মা ঝি ০ টা নে ০

I (–নর্সা –া মা | পা না –া)} I –নর্সা –া র্সা | র্সনা র্সা –নর্সর্রা I
০০ ০ কী যা দু ০ ০০ ০ গে য়ে০ গা ০০ন্

I (–র্সর্রা র্সা –ণা | ধা পমা –া I পা –পধণা ণা | ণধা পাঃ –ধপঃ I
না০ চে ০ বা উ০ ল্ গা ০০ন্ গে য়ে০ ধা ০ন্

I মপা মগা –া | (মা পা –া I –া –া র্সা | র্সনা র্সা –নর্সর্রা)} I মা গমা –পদা I
কা০ টে০ ০ চা ষা ০ ০ ০ গে য়ে০ গা ০০ন্ চা ষা০ ০০

I -মপা -া মা | গা রসা -রা I গা -া মগা | রা সা -রসা I
০০ ০ আ ম রি০ ০ বা ঙ্ লা০ ভা ষা ০০

I -া -া মা | পা না না I { না র্সা -া | র্সা র্রর্স -না I
০ ০ ঐ ভা ষা তেই নি তা ই গো রা০ ০

I র্সা -া র্সর্গ | র্রা র্সা -র্রর্সনা I না -া না | র্সা র্সা -র্রা I
আ ন্ ল০ দে শে ০০০ ভ ক্ তি ধা রা ০

I (-নর্সা -া মা | পা না না)} I -নর্সা -া র্সা | র্সনা র্সা -নর্সর্রা I
০০ ০ ঐ ভা ষা তেই ০০ ০ আ ছে০ ক ০০ই

I {র্সর্রা র্সা গা | ধা পমা -া I পা পধণা -া | ণধা -পা ধপা I
এ০ ম ন্ ভা ষা০ ০ এ ম০০ ন্ দু০ ক্ খ০

I মপা -মগা গা | (মা পা -া I -া -া র্সা | র্সনা র্সা -র্নর্সর্রা)} I মা গমা -পদা I
শ্রা০ ০ন্ তি না শা ০ ০ ০ আ ছে০ ক ০০ই না শা০ ০০

২৯

অতুলপ্রসাদ সেনের ৯৩টি রাগভিত্তিক গান রয়েছে তাঁর সমগ্র রচনা ২০৮টি গানের মধ্যে। তিনি ভৈরবী, খাম্বাজ, বেহাগ প্রভৃতি রাগ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন। তবে তিনি রাগের প্রথাগত বিষয়ে খুব নিষ্ঠাবান ছিলেন না। কারণ গানের ভাব প্রকাশে সুরের ব্যবহারে তিনি বাণী ও তালের সম্মিলনকেই অধিক প্রাধান্য দিতেন। তাই যথার্থ ভাব প্রকাশে তিনি রাগের অব্যবহৃত স্বরসংগতির স্বরলিপি প্রদত্ত স্বরটিকেও নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করতেন। তাঁর গানে বেহাগ ও জয়জয়ন্তীর এমন উদাহরণ রয়েছে। অতুলপ্রসাদ সেন তাঁর গানের সুর রচনায় তুলনামূলক হালকা রাগ বেশি গ্রহণ করতেন। বেহাগ, খাম্বাজ ও ভৈরবী প্রভৃতি রাগে এক প্রকার গভীর কারুণ্যতা আছে যা মূলত তাঁর হৃদয়ের চেতনাকে স্পর্শ করতে পারতো।

অতুলপ্রসাদ সেনের রাগনির্ভর কতিপয় স্বদেশি গানের তালিকা দেওয়া হলো,

১. কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত–খাম্বাজ।

২. জাগো জাগো জাগো এবে–ভৈরো।

৩. খাঁচার গান গাইব, না আর–ভৈরবী।

৪. এসো প্রবাস মন্দিরে, এসো গো বঙ্গভারতী–কাফি।

৫. এসো হে এসো হে ভারতভূষণ–বেহাগ।

৬. জয়তু জয়তু জয়তু কবি–নটমল্লার।

৭. আপন কাজে অচল হলে (বিচিত্র)–বেহাগ।

এই সকল গানেই কবি স্বদেশমাতার রূপ ঐতিহ্যের যেমন বঞ্চনা করেছেন, তেমনি এই ঐতিহ্য সংরক্ষণের শঙ্কা তাঁকে ঘিরে রাখত। তারও প্রকাশ ব্যক্ত হয়েছে এই সকল গানের সুরে। স্বদেশপর্বের কতিপয় গানে তালের গতি পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা যায় অতুলপ্রসাদ সেনের গানে। যদিও সুর প্রণয়নে লয়ের অভিনবত্ব তিনি গ্রহণ করেননি, কেবল স্বদেশি গানের উদাহরণে কোরাসে বা সমবেত কণ্ঠে দ্বিগুণ লয়ের এবং আবদ্ধিত বাণী যেন ভারতবাসীর স্বদেশের প্রতি আবেগকে আরো ঘনিভূত করে তোলে। এক্ষেত্রে অতুলপ্রসাদ সেনের ভারত বন্দনার বিস্ময়কর 'উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী' গানটির উদাহরণ টানা যেতে পারে, যা শুক্লা বিলাবল রাগের আশ্রয়ে সুরারোপিত। এর 'জননী গো লহো তুলে বক্ষে' অংশটিতে হঠাৎ দ্বিগুণ লয়ের কারণে স্বদেশমাতৃকার প্রতি সমর্পণের আকুলতা আরো তীর্যক ও স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়।

"উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা,
দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা।
ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা
পুনঃকমল-কনক-ধন-ধান্যে!
জননী গো, লহো তুলে বক্ষে,
সান্ত্বনা-বাস দেহো তুলে চক্ষে।"

II	সা	পা	গা	গা	|	গা	পা	পা	পা	I	মা	গা	রা	-া	|	-া	-া	রা	গা	I
	উ	০	ঠ	গো		ভা	০	র	ত		ল	ক্	খী	০		০	০	উ	ঠ	
I	মা	-া	মা	মা	|	গা	গা	রা	সা	I	রা	-া	সা	-া	|	-া	-া	-া	-া	I
	আ	০	দি	জ		গ	ত	জ্	ন		পূ	জ	জা	০		০	০	০	০	
I	পা	-া	পা	পা	|	-া	ধা	পা	ধা	I	পা	মা	মা	মা	|	-া	-া	সা	রা	I
	দু	ক	ক	দৈ		ন	ন	স	ব		না	০	শি	০		০	০	ক	র	
I	গা	-া	গা	গা	|	রা	-া	রা	ন্‌া	I	রা	-া	সা	-	|	-া	-া	-া	-া	I
	দু	০	রি	ত		ভা	০	র	ত		ল	জ্	জা	০		০	০	০	০	
I	গা	-া	গা	গা	|	গা	গা	রা	গা	I	মা	-া	মা	-া	|	-া	-া	গা	মা	I
	ছা	০	ড়ো	গো		ছা	ড়ো	শো	ক		শ	য্	যা	০		০	০	ক	র	
I	পা	-া	পা	-া	|	-া	-া	মা	পা	I	ধা	ধা	পা	পা	|	না	না	ধা	না	I
	স	জ্	জা	০		০	০	পু	ন		ক	ম	ল	ক		ন	ক	ধ	ন	
I	র্সা	-া	র্সা	-া	|	-া	-া	-া	-া	I	-া	-া	-া	-া	|	-া	-া	-া	-া	I
	ধা	ন্	নে	০		০	০	০	০		০	০	০	০		০	০	০	০	

I গা –া গা –া | গা –া –া -রা I সা রা গা মা | গা –া রা –া I
জ ০ ন ০ | নী ০ ০ গো | ল হো তু লে | বো ক্ খে ০

I রা মা মা মা | মা –া –া গা I রা গা মা পা | মা –া গা –া I
সা ন্ ত ন | বা ০ ০ স | দে হো তু লে | চো ক্ খে ০

I গা পা পা –া | পা –া পা পা I ধা পা মা গা | রা –া –া –া I
কাঁ ০ দি ০ | ছে ০ ত ব | চ র ণ ত | লে ০ ০ ০

I রা -গা মা রা | গা সা রা গা I (গ)রা –া –া ন্া | সা –া –া –া II
ত্রি ং শ তি | কো টি ন র | না ০ ০ রী | গো ০ ০ ০

II সা গা গা গা | পা –পা পা পা I মা গা রা –া | –া –া রা গা I
কা ন্ ডা রী | না ০ হি ক | ক ম লা ০ | ০ ০ দু খ

I মা –া মা মা | গা –া রা গা I রা –া সা –া | –া –া –া –া I
লা ন্ ছি ত | ভা ০ র ত | ব র্ ষে ০ | ০ ০ ০ ০

I পা –া পা পা | পা ধা পা আ I পা –মা মা –া | –া –া সা রা I
শ ঙ কি ত | মো রা স উ | যা ০ ত্রী ০ | ০ ০ কা ল

I গা –া গা গা | রা –া রা ন্া I রা –া সা –া | –া –া –া –া I
সা ০ গ র | ক ম্ প ই | দ র্ শে ০ | ০ ০ ০ ০

I গা গা গা গা | গা –া রা গা I মা –া মা –া | –া –া গা মা I
তো মা র অ | ভ য় প দ | স্প র্ শে ০ | ০ ০ ন ব

I পা –া পা –া | –া –া মা পা I ধা ধা –পা ধা | না না ধা না I
হ র্ ষে ০ | ০ ০ পু ই | চ লি বে ত | র ণী শু ভ

I র্সা –া র্সা –া | –া –া –া –া I –া –া –া –া | –া –া –া –া I
লো ক্ খ্যে ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০ | ০ ০ ০ ০

৩০

অতুলপ্রসাদ সেনের সুর রচনাতে রাগ-রাগিণীর মিশ্রণরীতির প্রতি অনুরাগী ছিলেন। গীতি খণ্ডের **১৯৩টি** গানের মধ্যে ৫৭টি গানে রাগিণীর মিশ্রণরীতির উপস্থিত পাওয়া যায়। কতিপয় স্বদেশপর্বের গানেও কবি রাগমিশ্রণের আশ্রয় নিয়েছেন।

১. বল বল বল সবে–মিশ্র খাম্বাজ।

২. ভারত ভাণু কোথায় লুকালো–মিশ্র খাম্বাজ।

৩. পরের শিকল ভাঙিস পরে–মিশ্র বেহাগ।

অতুলপ্রসাদ সেন সুর সৃষ্টিতে বেছে নিয়েছেন হালকা সুর। যেসব সুরে বা রাগে অন্য সুরের মিশ্রণ করা যায় সহজে সাধারণ যেই সকল রাগ-রাগিণীই কবির গ্রহণ করেছেন তার গানে। যেমন–ভৈরবী, খাম্বাজ, বেহাগ তিনি তাঁর গানে সব থেকে বেশি ব্যবহার করেছেন। এর কারণ হয়তো ভৈরবী রাগটি ইচ্ছেমতো ভেঙ্গেচুরে অন্য রাগের সাথে সহজেই মিলিয়ে দেখা যায়, তিনি রাগের নিষিদ্ধ স্বরটিকেও অনায়াসে ব্যবহার করেছেন। তাঁর গানের সুর রচনায় এবং রাগধৃষ্টতা প্রকট হয়নি, বরং কবির মায়াভরা সুরে হয়ে উঠেছে এক অনন্য গান।

"পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই।
আপন কারায় বন্ধ তোরা, পরের কারায় বন্দী তাই ॥"
(রাগ–মিশ্র বেহাগ, তাল–দাদরা)

II	সা	সা	–া	|	গা	গা	–মা	I	পা	পা	–া	|	না	না	–া	I
	প	রে	র্		শি	ক	ল্		ভা	ঙি	স্		প	রে	০	
I	নর্সা	র্সা	–া	|	র্সা	র্সা	–না	I	ধনা	–ধনর্সা	র্সনা	|	ধপা	–া	মপা	I
	নি০	জে	র		নি	গ	ড়ু		ভা০	০০ঙ্	রে০		ভা০	০	০ই	
I	মা	ধা	–া	|	ধণা	পধা	–র্সণধণা	I	পা	–ধা	মপা	|	মা	গা	–া	I
	আ	প	ন্		কা০	রা০	০০০য়্		ব	ন্	ধ০		তো	রা	০	
I	গা	গা	–া	|	মা	ধপা	–ক্ষপা	I	মা	–গা	গরা	|	সন্া	–সা	–া	II
	প	রে	র্		কা	রা০	০য়্		ব	ন্	দী০		তা০	ই	০	

৩১

মিশ্রখাম্বাজ রাগে রচিত অসাধারণ একটি স্বদেশপর্বের গানের উদাহরণে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে,

"বলো বলো বলো সবে, শতবীণা বেণু রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার, পুরাতন এ পুরবে।
আজোও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী,
ঘিরি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী–
এখনও অমৃত বাহিনী।
প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহাবন,
প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন,
কহিছে মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীর বালা বীরেন্দ্র-প্রসূতি–
আমরা তাদেরই সন্ততি।
॥ দ্রুত লয়ে ॥

I র্সা –া র্সা | র্সা র্রা –া I র্সা ণা –া | –া –া –া I
ধ র মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

I ণা –া ণা | ণা র্রা –া I র্সা ধা –া | –া –া –া I
ক র্ মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

I ধা ধা ধা | ধা ণা ধা I পা পা পা | পা ধা –া I
ন ব দি ন ম ণি উ দি বে আ বা র

I র্সা –া র্সা | র্সা র্রা –া I র্সা ণা –া | –া –া –া I
ধ র মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

I র্সা –া র্সা | র্সা র্রা –া I র্সা ণা –া | –া –া –া I
ধ র মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

I ণা –া ণা | ণা র্রা –া I র্সা ধা –া | –া –া –া I
ক র্ মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

I ধা ধা ধা | ধা ণা ধা I পা পা পা | পা ধা –া I
ন ব দি ন ম ণি উ দি বে আ বা র

I র্সা –া র্সা | র্সা র্রা –া I র্সা ণা –া | –া –া –া I
ধ র মে ম হা ন হ বে ০ ০ ০ ০

॥ বিলম্বিত ॥

I মা মা ণা | ধা ধা হা I না না না | না র্সা র্সা II
আজ্ ও গি র রা জ র য়ে ছে প্র হ রী

I না না না | –া র্সা –া I না র্সর্রা র্সা | ণা ধা ধা I
ঘি রি তি ন্ দি ক্ না চি০ ছে ল হ রী

I পা ধা পা | মা গপা মগরগা I মা মা পা | পা পক্ষা ধপা I
যা য় নি শু কা০ য়ে০০০ গং গা গো দা ব০ রী

I গা গা মা | পা ধা আ I পধণর্সা –া ণা | ধা –া –া I
এ খ নো অ মৃ ত ব০০ ০ হি নী ০ ০

I	র্সা	র্সা	র্গা	|	–া	র্গা	র্গা	I	র্গা	র্গণা	র্রা	|	ধর্গর্রা	র্সমা	র্সা	I
	প্র	তি	প্রা		ণ্	ত	ও		প্র	তি০	গু		হা০	ব০	ন	
I	না	না	না	|	র্সা	র্সা	র্সা	I	না	র্সর্সর্রা	র্সা	|	ণা	ধা	ধা	I
	প্র	তি	জ		ন	প	দ		তীর্	থ০০	অ		গ	ণ	ন	
I	পা	পপধা	পা	|	মা	গরা	গা	I	গা	–া	গা	|	মা	–া	–া	II
	ক	হি০০	ছে		গৌ	র০	ব		কা	০	হি		নী	০	০	
II	সা	সা	ণা	|	ধা	ধা	না	I	না	না	না	|	না	র্সা	র্সা	I
	বি	দু	ষী		মৈ	ত্রে	য়ী		খ	না	লী		লা	ব	তী	
I	না	না	না	|	না	র্সা	র্সা	I	না	র্সর্রা	র্সা	|	ণা	ধা	ধা	I
	স	তী	ও		সা	বি	ত্রী		সী	তা০	অ		রুন্	ধ	তী	
I	পা	ধা	পা	|	মা	গপা	মগরগা	I	মা	মপা	পা	|	পা	পক্ষা	পা	I
	ব	হু	বী		র	বা০	লা০০০		বী	রেন্	দ্র		প্র	সূ০	তি	
I	গা	গা	মা	|	পা	ধা	ধা	I	পধণর্সা	–া	ণা	|	ধা	–া	–া	I
	আ	ম	রা		তাঁ	দে	রি		স০০০	ন্	ত		তি	০	০	
I	র্সা	র্সর্গা	র্গা	|	র্গা	র্গা	র্গা	I	র্গা	র্গর্মা	র্রা	|	র্রর্গর্রা	স্না	-র্সা	I
	অ	ন০	লে		দ	হি	য়া		রা	খে০	যা		রা০০	মা	ন্	
I	না	না	না	|	র্সা	র্সা	র্সা	I	না	র্সর্সর্রা	র্সা	|	ণা	ধা	–া	I
	প	তি	পু		ত্র	ত	রে		সু	খে০০	ত্য		জে	প্রা	ণ্	
I	পা	পপধা	পা	|	মা	গরা	গা	I	গা	–া	গা	|	মা	–া	–া	II
	আ	ম০০	রা		তাঁ	দে০	রি		স	ন্	ত		তি	০	০	

৩২

স্বদেশপর্যায়ের গানে অতুলপ্রসাদের সুর প্রণয়নে যে বিষয়টি উল্লেখ যে, অতুলপ্রসাদের গানের বাণী যতটা গুরুত্ব মায়ায় তাঁর গানে সুর স্রষ্টা হিসেবে তাঁর প্রয়াণের তেমন স্বতন্ত্র স্থান গড়ে উঠেনি। বাংলা গানে ঠুংরীর প্রয়োগে তিনি কৃতিত্বের দাবিদার কিন্তু স্বদেশপর্বের গানে সুর রচনাতে তেমন নির্দিষ্ট কোনো বৈশিষ্ট্য তাঁর গড়ে উঠেনি। বাউল-রামপ্রসাদী ও মিশ্র রাগের রাগ বিশেষজ্ঞ খাম্বাজ, বেহাগের প্রয়োগ স্বদেশপর্বের গানের সুরের সমন্বয়ে মূলত অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশপর্যায়ের গানের মূল বৈশিষ্ট্য।

কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশি গানের সুর বিশ্লেষণ

সংগীতের শক্তি অপরিসীম। সংগীত সুর, তাল-লয়মিশ্রিত কতগুলো কথার মালা–যা মনের ক্লান্তি দূর করে, একলা পথের সাথী হয়ে শ্রোতার হাত ধরে পথ চলে। নির্জনতার একান্ত সাথী সংগীত। সংগীত নির্মাণে অসংখ্য গীতকবি বহুধারার গান রচনায় বাংলা গানের ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে পঞ্চগীতিকবি অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন ও কাজী নজরুল ইসলাম গানের রচিত সুর ও বাণীর অপূর্ব সম্মিলনের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাঁদের গান যুগের পর যুগ শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছে এবং আজও মুগ্ধ করে চলেছে নতুন প্রজন্মকে। এই পঞ্চকবির প্রতি জনেই তাঁদের গানের সুর ও বাণী দুই-ই নিজে রচনা করেছেন বলেই তাঁদের গীতিকবি আখ্যা দেওয়া হয়। যদিও সুর বিশ্লেষণই এই পর্যায়ের আলোচ্য। সেক্ষেত্রে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, নজরুল ব্যতীত বাকি অন্য সকল গীতিকবিদের যে সুরের আবর্তে ঘূর্ণায়মান তা মূলত একটি সময়ের এবং প্রায় একই ধারার সুরের প্রকাশ। একটি নির্দিষ্ট সময়কাল জুড়ে প্রচলিত সুর ব্যঞ্জনাতেই তাঁরা আবদ্ধ ছিলেন। বিষয়টি আরো স্পষ্ট করে বললে দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথের সময়কালে রচিত বাণী সকল কবিদের গানের বাণী ও সুরের ধারা প্রায় একই রকম। অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদের সুর রচনাতে অল্পবিস্তর স্বকীয়তা প্রকাশ পেলেও মূলত সুরের একটি নির্দিষ্ট কাঠামোর মধ্যে প্রতিজনেই আবর্তিত। প্রায় একশ বছর অর্থাৎ ১৮৬০ থেকে ১৯৪০ সময়কালটিতে প্রায় একই ধারার সুর গানের বাণীকে প্রকাশ করেছে। সময়ের চাওয়াটি মূলত রবীন্দ্রনাথে আবর্তিত ছিলো এবং রবীন্দ্রনাথের গানের প্রভাব এতটা শক্তিশালী ছিলো যে, তাঁর দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হতো গীতিকবিগণ। কেবল অতুলপ্রসাদ সেনের ব্যতিক্রমধারা অর্থাৎ ঠুমরির সমন্বয়ে বাংলা গানের সুরের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা দান করে, যদিও স্বদেশপর্যায়ের গানের ক্ষেত্রে তা বিশেষ পরিলক্ষিত নয়। এক্ষেত্রে নজরুলের গানে সম্পূর্ণ নতুন ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়–যা পূর্বেকার সকল গীতিকবি বিশেষত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপসাদ সেনের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ আলাদা ও স্বতন্ত্র। নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি' গানটির মধ্যদিয়ে একেবারে নতুন ধারার একটি সংগীত জগতে প্রবেশ করে জাতি।

> "নজরুল যুক্ত হলেন সংগীতে ১৯২৬ সালে। প্রথম রেকর্ড 'জাতির নামে বজ্জাতি' গানটি প্রকাশ পেলে মনে হল সুরের শরীরে, বাণীর শরীরে নতুন পরিধেয় জড়ানো হল। এ ধরনের শব্দ সমাহার সে সময় নতুন আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। একটি অর্থে নয়, একাধিক অর্থে। যেমন সুরকার, বাণীকারের নাম। সুর-বাণী মিলে সঙস্কৃতি পরিবেশকে চঞ্চল করে তুলেছিল। এই সেই 'তুলেছিল'র রেশ অদ্যাবধি বয়ে চলেছে। আর তাই ১৯২৬ সালটিও বাংলা সংগীত জগতের সর্বক্ষেত্রে 'টার্নিং পয়েন্ট' হয়ে শির উঁচু করে আজো অগ্রসরমান। তাই একমাত্র নজরুলের নিকটে বাংলা সুর রাজ্য, বাংলা বাণী রাজ্য এককভাবে ঋণী।"[৩৩]

বাংলা স্বদেশি গানের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতেই নজরুলের দেশাত্মবোধক গান রচনা করেন। শুধু তাই নয় পরাধীনতার যন্ত্রণায় বৈপ্লবিক চেতনা জাগাতে জনমনে স্বদেশের প্রতি উন্মাদনা জাগ্রতকরণও

নজরুলের দেশাত্মবোধক গান রচনার কারণ এবং এক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত সফল তা প্রমাণিত। নজরুল তাঁর গানে মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত প্রভৃতি ছন্দ যেমন নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন, তেমনি তাঁর গানের সুরের বৈচিত্র্যতা কখনো শ্রোতাদের মনে দেয় চমক লাগানো তীক্ষ্ণতা, আবার কখনো ভাসিয়ে দেয় হৃদয় নিংড়ানো গভীরতায়।

নজরুলের দেশাত্মবোধক গানের সুরে বিশেষত মার্চের সংগীতের দ্রুত লয়, আবার লোকসুরের সাদামাটা ঢং বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। জাতীয়তাবাদী মুক্তি সংগ্রামের সময়ে রচিত মার্চ সুরের গান জনমনে উন্মাদনার দোলা জাগায়। তাঁর রচিত কোরাস গান সম্মেলন সংগীতের এক নতুন ধারা। জনমনে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টিতে এই সকল কোরাস গানের ভূমিকা অপরিসীম। নজরুল ইসলাম রচিত কোরাস গান অত্যন্ত শক্তিশালী। কোরাস গানেরই একটি অনবদ্য ধারা মার্চ সংগীত, যার ব্যবহারে নজরুল তাঁর স্বদেশপর্যায়ের গান এক নতুন মাত্রা যোগ করে। নজরুল রচিত মার্চ সংগীতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে সুতীব্র স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা জাগায়।

১. আমরা শক্তি আমরা বল...
২. চল্ চল্ চল্...
৩.অগ্রপথিক হে সেনা দল...
৪. জননী আমার ফিরিয়া দাও...
৫. টলমল পদভারে...
৬. দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান...
৭. চলরে চপল তরুণ দল...
৮. এই শিকল পরা ছল...
৯. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে...
১০. শঙ্কাশূন্য...
১১. ধর্মের পথে শহীদ...
১২. কলকল্লোলে ত্রিংশ কোটি...
১৩. তোরা সব জয়ধ্বনি কর...
১৪. আমার সোনার হিন্দুস্তান...

প্রভৃতি নজরুলের উল্লেখযোগ্য মার্চ সংগীত। মার্চ সংগীতের মধ্যে স্বরের একপ্রকার চঞ্চলতা ও লাফিয়ে চলার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়–যা সৈন্য মনে রক্তকণিকা প্রবাহের গতি বৃদ্ধির মতো অনুভূত হয়। একটি মার্চ সংগীতের উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্ট হবে,

“চল্ চল্ চল্ । চল্ চল্ চল্
ঊর্ধ্ব গগনে বাজে মাদল
নিম্নে উতলা ধরণী-তল
অরুণ প্রাতের তরুণ দল
চল রে চল রে চল ॥”

এইচ.এম.ভি.এন ৭১৫৫ ॥ শিল্পী : ধীরেন্দ্রনাথ দাস ॥ মার্চ-সংগীত ॥ ছায়াছবি : চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন ॥ তাল : দাদ্‌রা
[১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ঢাকায় মুসলিম-সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মেলনে যোগদান করতে এসে কবি এ গানটি রচনা করেন।]

II{ প্া –সা –া | প্া –সা –া I প্া –সা –া | –া –া –া I
চ ০ ল্ চ ০ ল্ চ ০ ০ ০ ০ ল্

I প্া –সা –া | প্া –সা –া I প্া –সা –া | –া –া –া I
চ ০ ল্ চ ০ ল্ চ ০ ০ ০ ০ ল্

I সা –গা গা | সা গা গা I সা গা গা | মা –গরা –া I
ঊ র্ ধ গ গ নে বা জে মা দ ০০ ল্

I রা গা গা | সা গা গা I সা গা রা | গা –রসা –া I
নি ম্ নে উ ত লা ধ র ণী ত ০০ ল্

I সা গা গা | সা গা গা I সা গা মা | পা –গা –মা I
অ রু ণ প্রা তে র ত রু ণ দ ০ ল্

I ধা –পা মা | গা –রা ন্া I সা –া –া | –া –া –া }I
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ল্ ০ ০ ০ ০

॥

I ধা –পা মা | গা –রা ন্া I সা –া –া | –া –া –া I
চ ল্ রে চ ল্ রে চ ল্ ০ ০ ০ ০

৩৪

কবি নিজে সৈনিক ছিলেন বলেই মার্চ সংগীতের সুর বা রিদম ছিলো তাঁর বিশেষ ভালো লাগার বিষয়। মূলত তাঁর রক্তে প্রবাহিত মার্শাল রক্ত কণিকার উদাহরণ এই গানটি। লেফট রাইটের ছন্দ মতন উচ্ছ্বাস পরিলক্ষিত এই গানটির স্বরলিপিতে সব একাকার হয়ে সম্মিলিতরূপে প্রকাশিত। ত্রিমাত্রিক ছন্দে মার্চের সুর ও তাল নির্দেশিত এই গানটি যেকোনো জাতীয় অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে, সৈনিকদের কুচকাওয়াজ অথবা বিশেষ দিবসের গার্ড অব অনারের জন্য এই গানটি অত্যন্ত উপযোগী। নজরুলের অসংখ্য এই ধারার গানের মধ্যে আরেকটি কোরাস সংগীতের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ দুর্গমগীরি কান্তার মরু গানটি। মূলত এই গানটি তাঁর সর্বাধিক পরিচিত কোরাসগীতি যা আমাদের মুক্তিযুদ্ধের সময়ও স্বাধীন বাংলার বেতার কেন্দ্রের শিল্পীরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে নিয়মিত পরিবেশন করতেন। বাংলা সংগীত ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠ জাতীয় সংগীত 'দুর্গমগীরি কান্তার মরু' গানটি। কেদারা রাগের এই গানটি নজরুলের এক অনবদ্য সৃষ্টি। মূলত এই ধারার গান নজরুল পূর্বে আর রচিত হয়নি। জাতীয় সংগীতের ধারাটিই মূলত নজরুলের অবিস্মরণীয় অবদান। দেশাত্মবোধক গান, স্বদেশী গানের রচনা শুরু হয় সেই হিন্দুমেলার আমল থেকে, কিছু জাতীয় সংগীতের উদ্দামতা তুলে ধরেন একমাত্র কাজী নজরুল ইসলাম। জাতিকে জাগিয়ে তোলাই এই সংগীতের মূল উদ্দেশ্য।

"দুর্গম গিরি, কান্তার-মরু, দুস্তর পারাবার
লঙ্ঘিতে হবে রাত্রি-নিশীথে, যাত্রীরা হুশিয়ার!

দুলিতেছে তরি, ফুলিতেছে জল, ভুলিতেছে মাঝি পথ,
ছিঁড়িয়াছে পাল, কে ধরিবে হাল, আছে কার হিম্মৎ?
কে আছ জোয়ান হও আগুয়ান হাঁকিছে ভবিষ্যৎ।
এ তুফান ভারী, দিতে হবে পাড়ি, নিতে হবে তরী পার।”
(বৃহন্নট-কেদারা–একতালা)

II নর্সা নর্সা ধপা | পমা মা মা | মা –া মা | মা মা মা |
দু র্ গ ম গি রি কা ন্ তা র ম রু

র্গা –র্গা র্গা | র্গা র্গা র্গা | র্গর্মা –া র্রা | র্সা –ধা –না |
দু স্ ত র পা রা বা ০ র হে ০ ০

র্সা –র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা | জ্ঞরা –জ্ঞা জ্ঞা | –রা সা –া |
ল ঙ্ ঘি তে হ বে রা ০ ত্রি নি শী থে

র্সা র্গা র্গা | র্রা র্রা র্রা | র্সা –া র্সা | না ধা না |
যা ০ ত্রী রা হু শি য়া ০ ০ ০ ০ র্

সা সমা মা | মা মা মা | মা মগমা পা | পা পা –া |
দু লি তে ছে ত রী ফু লি তে ছে জ ল

মা গমধা ধা | ধা ধা ধা | ধা –া ণা | ণধা পমা –া |
ভু লি তে ছে মা ঝি প ০ থ হে ০ ০

মা ধা ধা | ধা র্সা নর্সা | ধা ধা পা | মা মা –া |
ছি ড়ি য়া ছে পা ল কে ধ রি বে হা ল

মা ধা পা | –া মা গমা | রা –া রা | সা –া –া |
আ ছে কা ব হি ম্ ম ০ ত হে ০ ০

পা ধা পা | পা পা –র্সা | র্সা –র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা |
কে আ ছ জো য়া ন হ ও আ গু য়া ন

র্সা র্সা র্সা | র্সা র্সা র্সা | র্সা –া র্সা | র্সা –া –া |
হাঁ কি ছে ভ বি ০ ষ্য ০ ৎ হে ০ ০

র্সা র্গা র্গা | –র্গা র্গা র্গা | র্গা র্মা র্রা | র্রা র্সা র্সা |
এ তু ফা ন্ ভা রী দি তে হ বে পা ড়ি

র্সা র্গা র্রা | র্রা র্রা র্রা | র্সা –া –া | –া –া –া |
নি তে হ বে ত রী পা ০ ০ ০ ০ র্

৩৫

স্বরলিপিতে পরিলক্ষিত কি করে কথার গোলা ছুঁড়ে মারা হচ্ছে গানের সুরের মধ্য দিয়ে। 'লজ্ঘিতে হবে রাত্রি নিশিতে যাত্রীরা হুশিয়ার'। হুশিয়ার-এর র্ র্ র্ র্, র্স-এর স্বর প্রক্ষেপণ যথার্থ সতর্ক বাণী জানান দিচ্ছে কবি। নজরুলপূর্ব জাতীয় সংগীতের প্রয়োজনীয়তার উপলব্ধিই কারো মধ্যে আসেনি কখনো। আর্মি ব্যান্ডের সুর তাঁর শ্রুতিতে গেঁথে ছিলো। জাতীয় সংগীত রচনার যে স্পষ্ট ও বলিষ্ঠ শব্দ চয়ন প্রয়োজন তেমনি সেখানে বিদ্যমান থাকতে হয় সুর ও ছন্দের মার্শাল গতিময়তা যা নজরুলের কবিমনে গেঁথে গিয়েছিল তিনি সেনাবাহিনীতে থাকাকালীন সময়ে। এ ক্ষেত্রে শফি চাকদারের উদ্ধৃতি উল্লেখ করছি,

> "জাতীয় সংগীতের মধ্যে যে উদ্দীপনা, সাহস, শব্দচয়ন, সুর, ছন্দ প্রয়োজন নজরুলের তা বিদ্যমান আর প্লাস পয়েন্ট, নজরুলের মধ্যে মার্শাল রেস-এর শক্তি তো ছিলোই, সেই সাথে তিনি ছিলেন সৈনিক। আর্মি ব্যান্ড তাঁর শ্রুতি দখল করেছিল। তাই অসংখ্য জাতীয় সংগীতের রচয়িতা তিনি হতে পেরেছিলেন।... আর্মি ব্যান্ডের রিদম ছন্দে লেফ্‌ট রাইট শৌর্য প্রকাশ পায়। কারণ অভিবাদন, রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানাদি এবার তো 'কুচকাওয়াজ'র মাধ্যম হয়ে এই রিদম লক্ষ্য করেই 'জাতীয় সংগীতের সৃষ্টি।"[৩৬]

দেশে অসহযোগ আন্দোলন চলাকালে হাজার হাজার স্বাধীনতাকামী মানুষকে কারাগারে বন্দী করা হলে নজরুল 'ভাঙার গান' শিরোনামে রচনা করেন আরো একটি কালজয়ী গান 'কারার ঐ লৌহ কপাট'। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের পত্রিকা 'বাঙলার কথা'র জন্য কবি জাগরণী এই গানটি রচনা করেন। দ্রুত দাদরা তালে রচিত নজরুলের স্বদেশপর্বের এই গানের সুরে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বাধীনতা স্পৃহা প্রকাশ পায় সুতীব্র বেগে। এই ধারার আরো একটি দেশাত্মবোধক গান 'এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল'। স্বরের কাট কাট লাফিয়ে চলার গতিতে 'কারার ঐ লৌহ কপাট' ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। যেমন–

"কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী
কারার ঐ লৌহকপাট
ভেঙে ফেল কর রে লোপাট
রক্ত-জমাট শিকল পূজার পাষাণ-বেদী।"

II {। । সা | সা সা –মা I মা –া মা | মা মা –া I
কা রার্ ঐ ০ লৌ ০ হ ক পা ট

I –া । মা | পা গা –া I মা –া ধা | ধা ধা –া I
ভে ঙে ফে ল্ ক র্ রে লো পা ট্

I ধর্সা –া র্সা | পা পা –ধা I র্সা র্সা –া | পা পা –ধা I
র ০ ক্ত জ মা ট্ শি ক ল্ পূ জা র্

I ধর্সা র্সা –া | র্সা র্সা –াধ} I {। । র্গা | র্গা র্গা র্রা I
পা ষা ণ্ বে দী ০ ও রে ও ০

I র্রা র্রা –া | র্রা গর্রা –র্সা I –া –া র্সা | র্সা র্সা –ধা I
ত রু ণ ঈ ষা ণ্ ০ ০ বা জা তো র্

I ধা ধা –া | ধা ধা –া I পা –া পা | পা পা –া I
প্র ল য়্ বি ষা ণ্ ধ্ব ং স নি শা ন্

[রা –পা –া সা সা –া]
I মা মা –া | সা সা –রা I রা রা –মা | মা মা –ার} I
উ ঠু ক্ প্রা চী র্ প্রা চী র্ ভে দি ০

৩৭

“নজরুলের স্বদেশপর্বের গানে ছন্দের বহুরাগ ব্যবহার কবি করেছেন। মার্চ সংগীতে সাধারণত দ্রুত ছন্দের প্রয়োগ করেছেন। আবার দেশাত্মবোধক দেশবন্দনাগীতে তালের ব্যবহার ভিন্ন। দাদরা, কাহারবা ও ত্রিতালের নিবন্ধিত গানের সংখ্যা বেশি এবং তাঁর দেশাত্মবোধক গানেও অন্যপর্যায়ের গানের মতো তাল ফেরতার সন্নিবেশন দেখতে পাওয়া যায়।

ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।”
তাল : ফের্‌তা

দাদ্‌রা :

সা রা II জ্ঞা –া জ্ঞা | –া সা রা I জ্ঞা –া জ্ঞা | –া সা রা I
ঝ ড়় ঝ ন্ ঝা য়্ ও ড়ে নি ০ শা ন্ ঘ ন

I জ্ঞাঃ –মঃ পা | ন্সা সা সা I সাঃ –ন্ঃ সা | –া সা ন্া I
ব ০ জ্রে বি ষা ণ বা ০ জে ০ জা গো

I সদা –া দা | দা –া দা I দা পা ক্ষা | পা –া –া I
জা০ ০ গো ত ন্ দ্রা অ ল স রে ০ ০

I পা দা ণা | র্সা মা মা I মা –া মা | প–া –সা –া II
সা জো সা জো র ণ সা ০ জে ০ "ঝ ড়়"

II {সা ণ্া দ্া | প্া গ্া ম্া I ঝা –া –া | –া জ্ঞা মা I
দি কে দি কে ও ঠে গা ০ ০ ন্ অ ভি

I সা –া –া | –া প্া দ্া I সা –া –া | –া –া –া} I
যা ০ ০ ন্ অ ভি যা ০ ০ ০ ০ ন্

I {সা রা জ্ঞা | –া –া –রা I সা রা জ্ঞা | –া –া –া I
আ শু য়া ০ ০ ন্ আ শু য়া ০ ০ ন্

I জ্ঞা –া জ্ঞান | রা মা গা I মা –া –া | –া –া –া} I
হ ও ও রে আ শু য়া ০ ০ ০ ০ ন্

I মা গা মা | পা ক্ষা পা I দা –পা ক্ষা | পা –া –া I
ফু টা য়ে ম রু তে ফু ল্ ফ স ০ ল্

I পা পা –দা | ণা র্সা –পা I পা পা পা | পা –া –া I
জ ড়ে র্ ম ত ন্ বেঁ চে কি ফ ০ ল্

I জ্ঞমা –া পগা | মা –া গা I মা –া গা | পমাঃ –ঃ –সা I
কে ০ র বি ০ প ড়ে ০ লা জে ০ ০

I –া –া –া | –া সা রা II
০ ০ ০ ০ "ঝ ড়়"

বাংলা স্বাদেশিক গানের যে বিশেষ ঐতিহ্য রয়েছে নজরুলের স্বদেশপর্বের গান মূলত তারই ধারাবাহিতার ফসল। সময়ের বিবর্তনে নজরুলের গানে আসে একেবারে আলাদা সত্তা যা পূর্বেকার কোনো গীতিকবির গানে সন্নিবেশিত হয়নি। একদিকে দেশপ্রেমের উন্মাদনা আর বৈপ্লবিক চেতনায় তাঁর গান পরিপূর্ণ আবার অন্যত্র স্বদেশ মায়ের অপরূপ সৌন্দর্যের বর্ণনায় মুখরিত তাঁর দেশাত্মবোধক গান।

নজরুল ইসলাম বাংলার রূপটি ফুটিয়ে তুলেছেন অপার মায়ার আন্তরিকতায়। যেখানে স্বদেশকে তিনিও মাতৃরূপে কল্পনা করেছেন পূর্বেকার গীতিকবিদের মতো। এই সকল গানও নজরুলের স্বকীয়তায় হয়ে উঠেছে তাৎপর্যমণ্ডিত ও বিশেষ।

১. নমঃ নমঃ নমঃ বাংলাদেশ মম...
২. একি অপরূপ রূপে মা...
৩. শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের...
৪. জননী মোর জন্মভূমি...
৫. ও ভাই খাটি সোনার চেয়ে খাটি...

এমন বহু গান আছে যেখানে সহজ সাদামাটা সুরের ব্যবহার সর্বসাধারণের উপযোগী হয়ে উঠেছে স্বদেশ বন্দনার এই সকল গানসমূহে। তেমনি রাগ-রাগিণীর ব্যবহারও দেখা যায় তাঁর কতিপয় স্বদেশপর্বের গানে। যেমন–

১. হে পার্থ সারথী–রাগ : শিব রঞ্জনী

২. জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা–রাগ : শুদ্ধ সারং

৩. আমি পুরব দেশের পুরনারী–রাগ : মালকোষ।

রাগ-রাগিণীর প্রতি কবির বিশেষ অনুরাগের কারণেই তাঁর প্রকৃতিপর্বের দেশাত্মবোধক গানেও কবি রাগ রূপের ব্যবহার করেছেন। যদিও কবি সকল রাগের শুদ্ধরূপটি যে হুবহু ব্যবহার করেছেন তা নয়। তিনি সুরপ্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজের সুবিধা অনুযায়ী খানিক পরিবর্তন করেছেন। তবে তা কখনো রাগভ্রষ্ট হয়েছে বলে মনে হয় না। পর্বের অন্যান্য গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেন যেমন একই গানের দুই বা ততোধিক রাগের মিশ্রণ করেছেন, কবি নজরুলেরও তেমনি রাগ মিশ্রণের অনুরাগ দেখতে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে 'আমি পুরব দেশের পুরনারী' মালকোষ রাগের গানটি সম্পর্কে ড. লীনা তাপসী খানের রাগমিশ্রণের পর্যালোচনা তুলে ধরা হলো,

> "গানটি শুরুতে ম গ ম প মগস ধা সা-খট রাগের রূপ পাওয়া যায়। গাগরী–'প দ গ ম প দ গম এই স্বর সমন্বয়েও খট রাগের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম অন্তরা 'পদ্ম কূলে আমি পদ্মিনী বঁধু' অংশটিতে ধানশ্রী রাগের আভাস পাওয়া যায়। ধানশ্রী দুই প্রকারের। এখানে যে ধানশ্রী স জ্ঞ ম প ণ স, র্স ণ ঠ প ম জ্ঞ ও স–এই স্বর সমন্বয়ে গঠিত তার কাছে মিল পাওয়া যায়। আভোগ অংশের 'এনেছি নবআশা ঊষার সিন্ধু' অংশটিতে 'স দ প য্ ম স ঋ য' স্বরের ব্যবহার আবার গুণকেলি রাগের আভাস পাওয়া যায়। গুণকেলির আরোহন স ঋ ম প দ র্স এবং আরোহন : র্সদ প ম ত্ম স। তাই এক কথায় বলা যায়–এই গানটি কাজী নজরুলের একটি অপূর্ব সৃষ্টি।"[৩৯]

তবে নজরুলের দেশাত্মবোধক গানসূহের সহজ সরল সাদামাটা সুরটিই বেশি আবেগঘন ও সাধারণ কর্তৃক গ্রহণযোগ্য হয়েছে বেশি। এমনই একটি গানের আংশিক স্বরলিপি তুলে ধরা হলো–

“এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ
যে দিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ ॥
চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এ দেশে নিরন্তর
জোছনা সম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর
জীবন হেথায় স্নেহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ ॥”

															॥	
II{	পা	–া	ধা	|	র্সা	–া	ধা	I	র্সা	–া	ধা	|	র্সা	–া	–া	I
	এ	ই	আ		মা	০	দের্		বা	ঙ্	লা		দে	০	শ্	
I	না	–া	ধা	|	পা	–া	ধা	I	পা	–মা	মা	|	গা	–া	–া	}I
	এ	ই	আ		মা	০	দের্		বা	ঙ্	লা		দে	০	শ্	
I	গা	রগা	–মা	|	গা	রা	–া	I	জ্ঞরা	–জ্ঞা	জ্ঞা	|	–রা	সা	–া	I
	যে	দি০	০		কে	চা	ই		স্নি০	গ্	ধ		শ্যা	ম	ল্	
I	সা	–া	রা	|	মা	–া	পা	I	ধা	–র্সা	পধা	|	র্সা	–া	–া	I
	চো	খ্	জু		ড়া	০	নো		রূ	প্	অ০		শে	০	ষ্	
I	না	–া	ধা	|	পা	–া	ধা	I	পা	–মা	মা	|	গা	–া	–া	I
	এ	ই	আ		মা	০	দের্		বা	ঙ্	লা		দে	০	শ্	
I	গা	–া	মা	|	পা	–া	ধা	I	না	–া	পধা	|	র্সা	–া	–া	I
	এ	ই	আ		মা	০	দের্		বা	ঙ্	লা০		দে	০	শ্	
II	পা	–পধা	ণধা	|	পা	মা	–পা	I	পা	পা	–ধা	|	ধা	ধাঃ	–রঃ	I
	চ	০ন্	দ০		নি	ত	০		শী	ত	ল্		বা	তা	স্	
I	সা	–া	রা	|	মা	পা	–া	I	ধা	পা	–ধা	|	পমা	–া	–া	I
	ব	য়্	এ		দে	শে	০		নি	র	ন্		ত০	০	র্	
I	র্সা	–র্রা	র্সর্রর্সা	|	ণা	ণা	–া	I	ধা	ধা	–র্ণা	|	ধা	পা	–া	I
	জ্যো	ৎ	স্না০০		স	ম	০		কো	ম	ল্		হ	য়ে	০	

I	পা	পা	–ধপা	|	মা	মা	–সা	I	রা	রা	–গা	|	রসা	–া	–া	I
	আ	সে	০০		হে	থা	য়্		র	বি	র্		ক০	০	র্	
I	র্রা	র্রা	–র্গা	|	র্রা	র্সা	–া	I	র্সা	র্সনা	–ধা	|	ধনা	নর্রা	–া	I
	জী	ব	ন্		হে	থা	য়্		স্নে	হ০	০		স০	০	স্	
I	ধর্সা	র্সনা	নধা	|	পা	পমা	–া	I	মা	গা	মা	|	পর্সা	–া	–া	I
	স	র	ল		হৃ	দ	য়্		স	হ	জ		বে	০	শ্	

৪০

সামগ্রিক আলোচনায় দেখেছি, কবি নজরুল স্বদেশি গানের সুর প্রয়োগে বহু বিচিত্র ধারার সমন্বয় করেছেন। তাঁর মধ্যে মার্চসংগীত একটি সম্পূর্ণ নতুন ধারা যা নজরুলের পূর্বে কেউ কখনো করেননি। তাঁর জাতীয় সংগীতেও পাই স্বদেশের জন্য বলিষ্ঠ উচ্চারণ। কোনো রকমের করুণা কবির গানের সুরে ঠাঁই পায়নি। তাঁর স্বদেশি গানের সুরে আছে উন্মাদনার মধ্যদিয়ে সত্যকে ছিনিয়ে আনবার শক্তি। এ শক্তি মাথা নোয়াতে নয় বরং চির উন্নত মম শিরের মধ্যদিয়ে দেশমাতার সম্মান রক্ষায় বদ্ধপরিকর।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, ১৪ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ফেব্রুয়ারি ২০১০, পৃ. ৬৭

২. স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০১০, পৃ. ৫১-৫২

৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ* খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ২০-২১

৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ২২-২৩

৫. পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৬. সুধাংশু শেখর শাসমল, *রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশভাবনার ধারা ও রূপান্তর*, *পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা*, রবীন্দ্রসংখ্যা-১৪০৩, কলকাতা, পৃ. ৮৪

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৪-২৫

৮. সুনির্মল ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাঙাগানের উৎস সন্ধানে*, ১ম খণ্ড, বঙ্গীয় সংগীত পরিচয়, হাওয়া-১, কলকাতা, ২০১৩, পৃ. ১১৬

৯. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান ষট্‌চত্বারিংশ খণ্ড*, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, ১৪০২, পৃ. ৫২-৫৪

১০. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

১১. গীতা বন্দোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৮৩, পৃ. ২১৯

১২. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলা গান ও রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২, পৃ. ৮৪

১৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৮

১৪. পূর্বোক্ত, পৃ. ৯০

১৫. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *পঞ্চ-গীতিকবির গান*, পৃ. ১০৪-১০৫

১৬. গীতা চট্টোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ২২২।

১৭. বিশ্বপ্রিয়া রায়, *দ্বিজেন্দ্রগীত স্বরলীপি সংকলন*, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৬, পৃ. ১৮৬-১৮৭

১৮. শ্রীদিলীপকুমার রায়, *দ্বিজেন্দ্রগীতি*, জেনারেল প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা, পৃ. ১০

১৯. পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩-৫৪

২০. ড. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৩

২১. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯।

২২. শ্রীদিলীপকুমার রায়, *উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল*, টাকুরিয়া, প্রভু প্রেস, কলকাতা, পৃ. ২৯-৩০

২৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৩

২৪. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৩০

২৫. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫৭

২৬. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮১

২৭. স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্বোক্ত, পৃ. ১৬৩

২৮. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৭৬

২৯. মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩৯-২৪০

৩০. গৌতম রায় ও বিশ্বপ্রিয়া রায়, *অতুলপ্রসাদের নির্বাচিত গানের স্বরলিপি ও সমগ্র গীতিগুচ্ছ*, নাথ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃ. ১৮৮

৩১. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৯২

৩২. পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮৮

৩৩. শফি চাকলাদার, *সুর ও বাণীর শ্রেষ্ঠত্বে নজরুল সঙ্গীত*, বইপত্র, ঢাকা, ২০১৬, পৃ. ২০৩

৩৪. এস. এম. আহসান মুর্শেদ, নজরুল-সংগীত স্বরলিপি, ৩৫তম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৯, পৃ. ৫০-৫১।

৩৫. নলিনীকান্ত সরকার, নজরুল সংগীত স্বরলিপি, ১ম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৯, পৃ. ১-৪
৩৬. শফি চাকলাদার, *সুর ও বাণীর শ্রেষ্ঠত্বে নজরুল সঙ্গীত*, পূর্বোক্ত, পৃ. ১২০।
৩৭. রশিদুন্ নবী, নজরুল সংগীত স্বরলিপি, ২০তম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০০, পৃ. ৪২-৪৩।)
৩৮. আসাদুল হক, *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*, চতুর্থ খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১০৯-১১১
৩৯. লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০২১ পৃ. ১০৯
৪০. সুধীন দাস, *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*, আটাশতম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১-৩।

অষ্টম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধ ও জাতীয় জীবনে স্বদেশচেতনা বিনির্মাণে পঞ্চগীতিকবির গান

বাংলা শিল্প-সাহিত্য ও বাঙালির জাতীয় জীবনে পঞ্চগীতিকবির অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ এবং কবি নজরুলের গানে অনির্বচনীয় প্রভাব বিদ্যামান। বাঙালির নিম্নবর্গ থেকে উচ্চবর্গের নানান শ্রেণির মানুষের হৃদস্পন্দনে রয়েছে পঞ্চগীতিকবির গান। গোটা ভারতবর্ষে সাহিত্য ও রাজনীতির পরিসরে ব্যবহৃত এঁদের গান ও আর্দশ একইসঙ্গে টগবগ করে ফুটে চলেছে বাঙালির প্রতিবাদী শিল্পসত্তার কণ্ঠস্বর হয়ে। উনবিংশ শতকের মধ্যবর্তী সময় থেকে শুরু করে একবিংশ শতকের নানা জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংকটময় মুহূর্তে তাঁদের কবিতা ও গান যুগপৎ বিস্ফোরণের আকার ধারণ করে পরিবর্তনের জয় গান গেয়ে চলছে। এদের শিল্পশব্দ হাতবোমা হয়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলো ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে, ১৯৪৭ পরবর্তী বাংলাদেশের ভাষা ও স্বাধীনতা আন্দোলনে পাকিস্তানিদের বিপক্ষে। গানগুলোতে বাঙালি খুঁজে পেয়েছিলো তাদের আশার বাণী ও পরিত্রাণের পথ। উপমহাদেশীয় তাবৎ শোষক শ্রেণির প্রতি ক্ষোভ, ধিক্কার, যন্ত্রণা, আর্তনাদ, হতাশা, প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সৃষ্টি-সুখের উল্লাস খুঁজে পেয়েছিলো এ-গানের ভিতর দিয়ে আবিষ্কার ও স্বাধীনতার আনন্দ। তাই আজও বাঙালি জাতীয় জীবনে চলচ্চিত্র, থিয়েটার ও নব্যআন্দোলনে এদের গান বেজে উঠে শ্লোগানের প্রতিধ্বনি হয়ে।

ইতিহাস বলে, বাঙালির মুখের ভাষা কেড়ে নেয়ার চক্রান্তের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিলো আত্মজাগরণ ও আন্দোলন। মূলত সংকটটি ছিলো নিজস্ব সংস্কৃতির অস্তিত্ব রক্ষার। এ-সংগ্রাম থেকেই শুরু হয় বাংলা ও বাঙালির মুক্তির লড়াই। ভাষা-আন্দোলন বাংলা সংস্কৃতির একটি বড় অধ্যায়ের সূচনা এবং মুক্তির স্লোগান বিনির্মাণে প্রথম স্বর।

ষাটের দশকে পাকিস্তানি মৌলবাদী শাসকচক্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে কাজী নজরুল ইসলামকে দাঁড় করানোর অপচেষ্টা চালায়। শুধু তাই নয় রবীন্দ্রসংগীত নিষিদ্ধ ঘোষণার সাথে অসাম্প্রদায়িক নজরুলকে সাম্প্রদায়িকতার বেড়াজালে আবদ্ধ করার জন্য চলে নানা কৌশল। তারা নজরুলের গানে ব্যবহৃত বাংলা শব্দকে হিন্দুয়ানি জ্ঞানে পরিবর্তন করে ইসলামিক শব্দ সংযোজন করেন। বাঙালির মনকে রবীন্দ্র প্রভাবমুক্ত ও তাঁর জনপ্রিয়তাকে খাটো করবার স্বার্থে নজরুলের ইসলামি গান-কবিতা প্রচারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে। কারণ তারা জানতো বাঙালির দুর্বলতা ধর্ম। এ ধর্মকে হাতিয়ার করে রবীন্দ্র-নজরুলের মানবতাবাদী ও অসাম্প্রদায়িক ভাবনা থেকে বাঙালিকে দূরে রেখে তাদের মেধা শূন্য করতে পারলেই সকল প্রকারের আন্দোলনের পথ বন্ধ করা সম্ভব বলে তারা মনে করতো।

বাংলার সবুজ সন্তানদের পক্ষে এ-চক্রান্ত মেনে নেয়া সম্ভব ছিলো না। শক্তিশালী পাকিস্তানি শাসকের কাছ থেকে জয় ছিনিয়ে আনা কত কঠিন ছিলো আজ তা কোনো বাঙালির অজানা নয়। এক শ্রেণির বাঙালি লড়েছে বন্দুক হাতে রক্ত ঝরার ময়দানে। অন্য এক শ্রেণি লড়েছে অন্তরের বাংলা গানে তাদের উদ্বুদ্ধ করবার প্রয়াসে। ১৯৭১-এর ২৫শে মার্চ কালো রাত্রির পূর্ব পর্যন্ত সত্যি বলতে কেউই জানতো না যে, প্রত্যক্ষ সৈনিকের ভূমিকায় বন্দুক হাতে শত্রুকে মোকাবেলা করতে হবে সাধারণ খেটে খাওয়া বাঙালিকেও। একান্ত নিজের গান হয়ে উঠবে সহস্র মুক্তিবাহিনীর প্রাণের খোরাক। একদিকে রক্তাক্ত স্লোগান, অন্যদিকে গানের সুরের আগুন। বাঙালির সংস্কৃতি এবং রাজনীতি সেদিন একসূত্রে বাঁধা পড়েছিলো দেশমাতার মুক্তির প্রতিষ্ঠায়। এ প্রসঙ্গে তিতাশ চৌধুরীর উক্তটি প্রাসঙ্গিক-

> "বাষট্টির আইয়ুব শিক্ষা-নীতি বিরোধী আন্দোলন, ছেষট্টির ৬ দফা আন্দোলন এবং উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান আগুনের ফুলকির মতো মুহূর্তেই পরিণত হলো বাঙালির জাতীয়তাবাদী গণআন্দোলন ও চেতনায়। সত্তরের নির্বাচনে বাঙালির ঐতিহাসিক সংখ্যা-গরিষ্ঠ বিজয় পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুরতার কারণ ঘটালো। ফলে শুরু হলো নির্বিচারে গণহত্যা। এই অনিবার্যতার ফসলই মুক্তিযুদ্ধ। বস্তুত সংস্কৃতির এক একটি সংগ্রামের ভেতর থেকেই বাঙালির আত্মজাগরণ ঘটেছে। অস্তিত্ব রক্ষার অগ্নি-পরীক্ষায় বাঙালি আত্মপ্রত্যয়ী ও দুঃসাহসী হয়েছে। তাই লক্ষ করি এক সময় বাঙালি সংস্কৃতি আর রাজনীতি একাকার হয়ে একদিকে যেমন রক্তাক্ত স্লোগানের জন্ম দিয়েছে, তেমনি অন্যদিকে ছড়িয়ে দিয়েছে সবখানে সুরের আগুন।"[১]

বিশ্লেষণের সুবিধার্থে মুক্তিযুদ্ধে পঞ্চগীতিকবির গান ব্যবহারের প্রেক্ষাপট দুটি ধারায় ভাগ করে আলোচনায় অগ্রসর হতে পারি। যেমন–

১. মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রেক্ষাপট ও
২. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী প্রেক্ষাপট

রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, রজনীকান্ত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের স্বদেশপর্বের গানসহ অন্যান্য দেশজ, দেশাত্মবোধক, উদ্দীপনামূলক এবং গণসংগীতই ছিলো তৎকালীন শিল্পীদের মুক্তি সংগ্রামের হাতিয়ার। সংস্কৃতির মানস সরোবরে এই সকল গান সকলকে আবেগাপ্লুত, অনুপ্রাণিত ও আন্দোলিত করতো স্বদেশমাতার জন্য প্রাণ বিসর্জনে। রূঢ় সত্য হলো জীবনপণ করে বাংলার যে সন্তান স্বদেশমাতার দুঃখ নিবারণ ও মায়ের চোখের জল মুছাতে নিজে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো, নির্মম অত্যাচারের পরেও হাসিমুখে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মৃত্যু প্রত্যাশা করেছে শুধু স্বদেশকে শত্রুমুক্ত করার লক্ষ্যে; সেই স্বদেশ তাদের কাঙ্ক্ষিত স্বদেশমাতৃকার রূপ অর্জনে কতটুকু সফল হয়েছে। ধর্মীয় অজুহাতে জাতিগত ভেদাভেদে দুর্বলের উপর সবলের, সংখ্যালঘিষ্ঠের উপর সংখ্যাগরিষ্ঠের অত্যাচার এক অজানা কারণে বেড়ে চলেছে। তাই স্বাধীনতার সুদীর্ঘ অর্ধশত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরে মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের উপযুক্ত মর্যাদা দিতে প্রয়োজন জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষ এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ।

বাংলা সংস্কৃতির বিকাশে আধুনিক সময় অর্থাৎ ঊনবিংশ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত দেশপ্রেমিক গীতিকবিদের অকৃপণ সৃষ্টি একবিংশ শতাব্দীর সমকালীন বিচিত্র প্রেক্ষাপটেও প্রাসঙ্গিক। স্বদেশি আন্দোলনে সম্পৃক্ত গীতিকবিদের স্বদেশভাবনা বা ভাব-ব্যঞ্জনার বিমূর্ত প্রকাশশৈলী নতুন প্রজন্মের চিন্তাধারা বিনির্মাণে ভীষণভাবে সহায়ক বলে অনুভূত।

আজ শত বছর পরেও সেইকালের উন্মাদনা, স্বদেশের প্রতি ভক্তিবোধ একালের গীতিকবিদের অনুপ্রেরণা জোগায়। দেশে সংকটের প্রেক্ষাপট বদলে গেলেও দেশের প্রতি মমত্বের ধরন এতটুকুও বদলায়নি। আজও দেশ তথা দেশের রাজনীতি, এর মানুষ কোনো জটিলতার মুখোমুখি হলে মানুষ একত্রিত হয়ে সমস্বরে গেয়ে ওঠে নজরুলের 'চল্ চল্ চল্' কিংবা দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গান। সেদিন বাঙালির মূল্যবোধ রক্ষার লড়াইয়ে যে গান অনুপ্রাণিত করেছিলো হিন্দু-মুসলমানসহ সকল স্বদেশানুভূতি সিক্ত হৃদয়কে, আজও তার ব্যতিক্রম নয়। বদলেছে শুধু পন্থা আর প্রেক্ষাপট। এ-ক্ষেত্রে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র একটি বাণী বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক–

> "আমরা হিন্দু বা মুসলমান যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি, এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব সত্য। যা প্রকৃতি নিজে হাতে আমাদের চেহারায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ মেরে দিয়েছে যে, মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।"[২]

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে বাইরের শত্রুকে পরাস্ত করে দেশের মানুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের মাধ্যমে বাঙালি সংস্কৃতি আর জাতিসত্তার পতাকা উড়িয়ে জয়ের হাসিতে আত্মহারা ছিলো সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশ। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের পরেও বাঙালি উপলব্ধি করতে পারেনি নিজেদের মাঝেই নিভৃতে মিশে আছে বিরুদ্ধশক্তি। তবে এ কথা ঠিকই বুঝতে পেরেছিলেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। যার প্রমাণ মেলে ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি পাকিস্তানি কারাগার থেকে মুক্তিলাভের পর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের দিন তাঁর দেওয়া ভাষণে। মুক্তিযুদ্ধের সুফলের কিছুদিনের মধ্যেই নানা আভ্যন্তরীণ জটিল সমস্যায় দেশ ছেয়ে যায়। এক কুটিলচক্র বাঙালির কষ্টার্জিত স্বাধীনতাকে মেনে নিতে পারেনি। ঘরের ভিতরের শত্রুকে চেনা দায়। ধীরে ধীরে সকল শুভ অর্জনকে নষ্ট করবার পায়তারা করে এই অশুভশক্তি। বাঙালির সম্প্রীতির সংস্কৃতিকে ধ্বংস করতে চলে নানা চক্রান্ত। এই অদেখা শক্তিকে পরাহত করা কঠিন হলেও অপশক্তিকে অবদমনের পন্থা বাঙালির অজানা ছিলো না।

বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতিকে রক্ষা করবার প্রয়াসে এর সম্প্রীতির যে চরিত্র তা অক্ষুণ্ন রাখা জরুরি। সাংস্কৃতিক চেতনায় বলীয়ান রাখতে হবে অতীত গাঁথা, উজ্জ্বল রাখতে হবে বাংলা সংস্কৃতির সত্য পরিচয়কে।

এখানে শ্রদ্ধেয় সন্‌জিদা খাতুনের প্রাসঙ্গিক স্মৃতিকথা তুলে ধরতে চাই–

> "২৩শে মার্চেই শুনতে পেলাম, বঙ্গবন্ধু তাঁর অনুগতদের বলেছেন ঢাকা থেকে সরে যেতে। মতিয়া চৌধুরীরা চলে গেছে বা যাচ্ছে শুনলাম। টেলিভিশনে 'আগুন' নিয়ে গান হচ্ছে সব।

আমাদের শান্তশিষ্ট সেলিনা মালেক চৌধুরী একদিন এসে বলে, "আপা, 'ওরে আগুন আমার ভাই' গানটা তুলতে হবে, টেলিভিশনে গাইব"। ইফ্‌ফাত গাইছে 'যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা না' ইকবাল আহমেদ তখন সংস্কৃতি-সংসদ আর ডাকসুর নেতা। সে গাইছে 'উড়িয়ে ধ্বজা অভ্রভেদী রথে/ঐ যে তিনি ঐ যে বাহির পথে'। ২৩ মার্চ রাতে টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে তো অবাক। অনুষ্ঠান আর শেষ হয় না। কি একটা কোরাস গানের শিল্পীদেরকে ক্যামেরার কায়দায় সংখ্যায় অগণ্য করে তোলা হচ্ছিল, সে গানটি খানিক পর পরই হচ্ছে। আর হচ্ছে ফাহ্‌মিদার গাওয়া গান 'আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী'। ফিরে ফিরে একই গান কেন, কিছুই বুঝি না। বুঝেছিলাম পরে। যখন ১২টা বেজে পার হয়ে গেল। অধিবেশনের শেষে পাকিস্তানের পতাকা দেখাবার নিয়ম। ২৩ মার্চ পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবসকে মানা হবে না বলেই অধিবেশন দীর্ঘায়িত করে রাত ১২টার পর ২৪ মার্চে সেই পতাকা দেখানো হলো। পরে আরো শুনেছি, পাক আর্মি সে রাতে টেলিভিশন কেন্দ্রের বাইরে ট্যাংক নিয়ে অপেক্ষা করছিল। পতাকা দেখানো না হলে চুরমার করে দেবার কথা সব। তাই পতাকা দেখানো হয়েছিল ঠিকই, ২৩ তারিখে না দেখাবার জিদ বজায় রেখে।"[৩]

মুক্তিযুদ্ধ সময়কার এই একটি দিনের উদাহরণে বুঝতে পারি বঙ্গভঙ্গের সময়কে কেন্দ্র করে রচিত রবীন্দ্রনাথের গান কেমন করে এতগুলো বছর পরেও মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রেরণার উৎস হয়েছিলো। পূর্বসূরিদের সেই সুরের পথ ধরেই আজ কণ্ঠ মেলায় নতুন প্রজন্ম। সমসাময়িক বাঙালির চিত্তে দেশপ্রেম জাগ্রত করার নিমিত্তে সামনে চলে আসে স্বাধীনতাপ্রেমী গীতিকবিদের ঐতিহ্যবাহী সেই সকল স্বদেশিচেতনার গান। যারা শুধু সংগীতেই নয়, আত্মিক সমস্ত শক্তি দিয়ে দেশকে ভালোবাসার স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তাদের দেশবন্দনা গানের এত ক্ষমতা যে তা কালকে উত্তীর্ণ করতে পেরেছে। '৪৭ পরবর্তী স্বাধিকার আন্দোলনে রচিত গীতিকবিদের গান বাঙালির মহান স্বাধীনতাযুদ্ধে ছিলো শত্রু হননের মারণাস্ত্র। বলা বাহুল্য, ১৯৫২ সালের ভাষা সংগ্রামের দিনে মন্ত্রধ্বনির মতো বেজেছিল অতুলপ্রসাদ সেনের 'মোদের গরব মোদের আশা' গানটি। আজও ২১ ফেব্রুয়ারি যখন বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' পালিত হয়, তখন বাঙালি হৃদয়ে ঐতিহ্যবর্ণিত আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী'র 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী/আমি কি ভুলিতে পারি' গানের সাথে উচ্চারিত হয় অতুলপ্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা'।

তেমনি ব্রিটিশ আমলে কংগ্রেস নেতারা একদিকে যখন স্বাধীনতা সংগ্রামে অসহযোগ আন্দোলনে লিপ্ত, অন্যত্র তারাই আবার সভা-সমিতিতে ইংরেজি ভাষায় বক্তৃতা দিচ্ছেন শুনে ক্ষুণ্নমনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করলেন মাতৃভাষা বাংলার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের গান যা মাতৃভাষা দিবস কেন্দ্রিক যেকোনো অনুষ্ঠানে আজও গীত হয়।

"কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে
কে বৃথা আশাভরে চাহিয়ে মুখ' পানে।
সে যে আমার জননী রে ॥"[৪]

কবির ‘আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি’ এই গানের বাণীতে যে শক্তি নিহিত ছিলো তা অনেক সভা-সমিতির বড়-বড় নেতাদের ঝালালো বক্তৃতায় ছিলো না। পাকিস্তানি এবং তাদের তাবেদাররা বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে পাকিস্তানি আবরণে ঢেকে দেবার যে চক্রান্ত করেছিলো তার সুযোগ্য প্রতিশোধ ছিলো বাংলার গান–

রবীন্দ্রনাথের বাণীকে প্রতিবাদের ভাষা করেছিলো যে সকল গান।

১. সার্থক জনম আমার...
২. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক...
৩. ছি ছি চোখের জলে...
৪. আমি ভয় করব না ভয় করব না...

প্রভৃতি স্বদেশপর্বের গান ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধ সময়কালে এমনকি একালের যেকোনো সংকটে বা জাতীয় দিবসে উচ্চারিত হয় স্বদেশপ্রেমের প্রতীক হিসেবে। নজরুলের ‘ও ভাই খাঁটি সোনা’, ‘ঐ শিকল পরা ছল’, ‘কারার ঐ লৌহ কপাট’ ইত্যাদি গান মুক্তিযুদ্ধের সময়ে দেশপ্রীতিতে অনুপ্রাণিত করতো, মুক্তিকামী, স্বাধীনতার জন্য উন্মুখ জাতিকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতো তেমনি আজ দেশের যেকোনো জাতীয় উৎসবে, ঘূর্ণিঝড়, বন্যা পীড়িতদের পাশে দাঁড়াতে বা ত্রাণ সংগ্রহে এই সকল গান প্রাণে শক্তির সঞ্চার করে।

এ সকল স্বদেশিগানের চর্চা ও বহুল ব্যবহারে স্বাধীনতাযুদ্ধের পরে যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে, তার জন্য কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের নাম অবশ্য স্মরণীয়। যেমন–ছায়ানট, বুলবুল ললিতকলা একাডেমী, উদিচি, রবীন্দ্রসংগীত সম্মিলন পরিষদ প্রভৃতি। তবে ছায়ানটের অবদান এক্ষেত্রে অনিবার্য। মুক্তিযুদ্ধের পূর্ববর্তী সময়ে ওয়াহিদুল হক, সন্‌জিদা খাতুন, ফিরোজা বেগম, ফাহমিদা খাতুন, বারীণ মজুমদার, জাহিদুর রহিম, মালেকা আজিম খান প্রমুখ গুণিজনের অবদানের কথা বিশেষভাবে অবিস্মরণীর। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতা ছিলো মূলত বাঙালির সংস্কৃতির বিজয়। এই সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে সমুন্নত ও বলবৎ রাখা মোটেও সহজসাধ্য ছিলো না।

স্বাধীনতার পরে দেশে হিন্দু-মুসলমান জাতিভেদ প্রকট হয়ে দাঁড়াতে থাকে। ‘বাঙালি সংস্কৃতি’ মানে পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি–এই ধারণা যখন দেশের অনেকাংশ মানুষ পোষণ করে তখন নিজের ভাষা ও সংস্কৃতির জন্য রক্ত ঝরিয়ে যে স্বাধীনতার অর্জন সেটি প্রশ্নবিদ্ধ হয়। কোনো ধর্মের বিজয়ের জন্য সেদিন লড়াই হয়নি। তবে তো পাকিস্তান হয়েই ভালো থাকবার কথা ছিলো। সংগ্রাম করে নিজের পরিচয়ের জন্য যে লড়াই তা ছিলো বাঙালিসত্তার লড়াই। দেশ যখন ধার করা সংস্কৃতির আধারে নিজেকে মেলে ধরতে গর্ববোধ করতে শেখে তখন এর থেকে অপমানের আর কিছু থাকে না। এক্ষেত্রে সন্‌জিদা খাতুনের একটি উদ্ধৃতি স্মরণযোগ্য,

> “স্বার্থান্বেষী মহল আমাদের সংস্কৃতি নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে চায়। এ মাটিতে সংস্কৃতি স্বাভাবিক, তা ভুলিয়ে নিয়ে সাগর পার থেকে ‘স্মার্ট’ সংস্কৃতি আমদানি করে আবার সেই ‘ন্যাশনাল রি-

> কনস্ট্রাকশন' করতে চায়! এই চাওয়া যে নিঃস্বার্থ চাওয়া নয়, বুঝতে না-পারলে আবার দাসত্বশৃঙ্খল পরতে হবে আমাদের। সে-দাসত্ব আরো গূঢ়। সে-পরাধীনতা চিত্তকে দলে শেষ করে ফেলবে। সাংস্কৃতিক পরিচয় পর্যদুস্ত হলে জাতির পরিচয় থাকে কিসে?"[৫]

বিশ্লেষণের এ পর্যায়ে জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমানের লেখা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থের উদাহরণ টেনে বলতে চাই, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলের গান, কবিতা বিশেষ করে তাঁদের চেতনা তিনি ধারণ করতেন হৃদয় থেকে। তিনি সেমিনার, জাতীয় আন্দোলনে নজরুলকে সহযাত্রী হিসেবে প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে প্রত্যাশা করতেন। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে পাই–

> "একটা ঘটনার দিন তারিখ আমার মনে নেই ১৯৪১ সালের মধ্যেই হবে, ফরিদপুরে ছাত্রলীগের জেলা কনফারেন্স, শিক্ষাবিদদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে। তারা হলেন কবি কাজী নজরুল ইসলাম, হুমায়ুন কবির, ইব্রাহিম খাঁ সাহেব, সে সভা আমাদের করতে দিল না। ১১৪ ধারা জারি করল। কনফারেন্স করলাম হুমায়ুন কবির সাহেবের বাড়িতে। কাজী নজরুল ইসলাম সাহেব গান শোনালেন।"[৬]

১৯৭১ সালে বঙ্গবন্ধু ও বাঙালি যে *জয় বাংলা* স্লোগানের মধ্যদিয়ে স্বাধীনতার সংগ্রামের শক্তি জুগিয়েছেন সেই উচ্চারণের সৃষ্টিমূলে নজরুলের সরাসরি প্রভাব বিদ্যমান। উক্তিটি মূলত নজরুলের 'পূর্ণ অভিনন্দন' কবিতা থেকে প্রাপ্ত। এ কবিতায় প্রথম জয় বাংলা শব্দটি উচ্চারিত হয়। যাতে অনুপ্রাণিত হয় সমগ্র বাঙালিসত্তা। কবিতাটির অংশবিশেষ প্রসঙ্গক্রমে তুলে ধরা হলো–

> "জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীন,
> জয় যুগে যুগে আসা-সেনাপতি
> জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন।"[৭]

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশ প্রেক্ষাপটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান

১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ভাষা-আন্দোলনের পর স্বাধীনতা আন্দোলন পর্যন্ত বাংলাদেশ গঠনে এর পরবর্তী রাষ্ট্রীয় অবকাঠামো তৈরিতে বারবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে সাংস্কৃতিক জাগরণের। এই সকল আন্দোলনে গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করতে ব্যবহৃত হয়েছে শাশ্বত বাঙালির গান।

স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের মূল লক্ষ্য ছিলো সংস্কৃতির ভিত্তিতে স্বকীয় একটি রূপ অর্জন। যেখানে সংগীত ছিলো একটি গুরুত্বপূর্ণ ও বৃহত্তর অধ্যায়। শিল্পকলার অন্যতম মাধ্যম হিসেবে সংগীতকে দেশ গড়ার একাধিক আন্দোলনে সাহসের সমাচার হিসেবে অভিহিত করা হয়। ১৯৭৫-এ বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যাকাণ্ডের মতো ঘৃণ্য রাজনীতি শুরু হবার পর থেকে যতবার বিভিন্ন সংকটে পড়েছে দেশ, সেখানে দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করার হাতিয়ার হিসেবে এসেছে সংগীত।

মুক্তিযুদ্ধ পূর্বকালে পঞ্চগীতিকবির গানের প্রয়োগ ও এর চেতনা বিশ্লেষণ এ গবেষণার প্রাণবস্তু। এক্ষেত্রে মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে চলচ্চিত্র, থিয়েটার, জাতীয় জীবনে সংগীতের প্রয়োগ বিশ্লেষণ প্রাসঙ্গিক মনে করি।

চলচ্চিত্রে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান

বাংলাদেশের বিভিন্ন চলচ্চিত্রে পঞ্চগীতিকবির গান ব্যবহার হতে দেখা যায়। তারেক মাসুদ নির্মিত *মুক্তির গান* প্রামাণ্যচিত্রে সংগীতের প্রাতিষ্ঠানিক শক্তি বিরাজমান। এ প্রামাণ্যচিত্রে ব্যবহৃত গানের মধ্যে পঞ্চগীতিকবিদের স্বদেশচেতনার গানও বিশেষ স্থান দখল করে আছে। সমগ্র প্রামাণ্যচিত্রে ব্যবহৃত গান অথবা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিকে পঞ্চগীতিকবির চেতনার আভাস লক্ষণীয়।

নিম্নের সারণিতে কতিপয় চলচ্চিত্রে ব্যবহৃত পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গানের তালিকা দেয়া হলো:

চলচ্চিত্রের নাম	গীতিকবির নাম	ব্যবহৃত স্বদেশ সংগীত
মুক্তির গান	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	আমার সোনার বাংলা দেশে দেশে ভ্রমি তব আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে ও আমার দেশের মাটি
	ডি.এল রায়	ধনধান্য পুষ্পভরা
	কাজী নজরুল ইসলাম	একি অপরূপ রূপে মা তোমার
জীবন থেকে নেয়া	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কাজী নজরুল ইসলাম	আমার সোনার বাংলা কারার ঐ লৌহ কপাট
ওরা এগার জন	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ও আমার দেশের মাটি
প্রিয় কমলা	ডি.এল রায়	ধনধান্য পুষ্পভরা

উৎস: গবেষক কতৃক প্রস্তুতকৃত।

এছাড়া চাষী নজরুল ইসলামের *সংগ্রাম*, *আবার তোরা মানুষ হ* চলচ্চিত্রসহ মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক প্রায় সকল চলচ্চিত্রে সরাসরি অথবা ইনস্ট্রুমেন্টাল মিউজিক হিসেবে স্বদেশসংগীত ব্যবহার হয়ে থাকে। যার ব্যবহারে চলচ্চিত্রের নির্মাণশৈলীকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলে। বাংলাদেশে যে কয়টি টিভি চ্যানেল আছে তাদের বেশির ভাগ চ্যানেলের শুরুতে যে গান বা মিউজিক ফিলার হিসেবে ব্যবহার হয় তাতেও পঞ্চগীতিকবির স্বদেশ গানের প্রভাব বিদ্যমান।

থিয়েটারে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস নিয়ে যে শিল্প ও সাহিত্যের জোয়ার সৃষ্টি হয়েছে তার প্রতিক্ষেত্রেই পঞ্চগীতিকবির গান কার্যকরভাবে ব্যবহার হতে দেখা যায়। বিশেষ করে যাত্রাপালায় বন্দনাগীত অথবা মঙ্গলগীত অংশে যে দেশাত্মবোধের গান ব্যবহার হয় তা মূলতই পঞ্চগীতিকবির কোনো না কোনো স্বদেশচেতনার গান। উদাহরণস্বরূপ–

১. ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা (ডি.এল রায়) প্রযোজনা-*সাজাহান* যাত্রা পালা (২০১৭) থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়।
২. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) প্রযোজনা-*বির্সজন* যাত্রা পালা (২০২২) থিয়েটার অ্যান্ড পারফরমেন্স স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি।

এছাড়াও রজনীকান্ত সেনের ‘তুমি নির্মল করো মঙ্গল করো’, অতুলপ্রসাদ সেনের ‘মোদের গরব মোদের আশা আর মরি বাংলা ভাষা’, কাজী নজরুল ইসলামের ‘দুর্গম গিরি কান্তার মরু দুস্তর পারাবার হে’ এরূপ গানের বহুল ব্যবহার হতে দেখা যায়। সমকালীন এ গানগুলো মুক্তিযুদ্ধকালে রচিত না হলেও মুক্তিযুদ্ধের গান হিসেবে জনমনে স্থান করে নিয়েছে।

জাতীয় সংকটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশি গান

যে কোনো রাষ্ট্রকে সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যে দেশের জনগণ যত বেশি সংঘবদ্ধ সংকট মোকাবেলা তাদের পক্ষে তত সহজ। বাংলাদেশ সংকটে যেকোনো অস্থিরতায় বিচিত্র চিত্রে রবীন্দ্র, নজরুল বিশেষ করে পঞ্চগীতিকবির গান প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ১৯৮৭ সালের ১০ নভেম্বর এরশাদ-বিরোধী আন্দোলনের সোপানেও কাজ করেছে সাংস্কৃতিক ঐক্য। ১৯৯২ সালে স্বাধীনতা বিরোধীশক্তির বিরুদ্ধে সোচ্চার এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের দাবীতে গণ-আদালত প্রতিষ্ঠা পায়। সেই আন্দোলনের মূল স্লোগান, সোচ্চারিত কণ্ঠস্বর হয়ে কাজ করে সংগীত।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে মূলত বেশকয়েকটি ঘটনা স্বাধীনতাবিরোধী সংস্কৃতিকে আঘাত করা হয়েছে। সে সময় বাংলা গান অবদান রেখেছে সুউচ্চারিত স্লোগান হিসেবে যেখানে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশিগানের ভূমিকা ছিলো বিশেষ উল্লেখ্যযোগ্য।

১৯৯১-এ একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটির প্রতিষ্ঠা ও আন্দোলন। একই বছর গণ-আদালত প্রতিষ্ঠা। ১৯৯৬-এ মৌলবাদের উত্থান ও যশোরে উদিচির সম্মেলনে বোমা হামলা। ২০০১-এ রমনা বটমূলে বোমা হামলা, সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস, নিপীড়ন আর সিনেমা হলসহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নাশকতার বিরুদ্ধে সংগীতই ছিলো মূল অনুষঙ্গ।

চলচ্চিত্র, থিয়েটার, জাতীয় আন্দোলন, কথা সংস্কৃতির নানা শাখায় এ সকল সংগীতের প্রয়োগ থাকা সত্ত্বেও বর্তমান প্রজন্মের একটি শ্রেণির কাছে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশপ্রেমের গান এবং এর চেতনার প্রভাব বিস্তারে ব্যর্থ হচ্ছে। কারণ জাতীয় শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রণীত সিলেবাসে এর সকল সংগীতচর্চার ক্ষেত্রের অপ্রতুলতা ও বিকাশ সাধনের পরিকল্পনার অভাব দৃশ্যমান। এসব সংগীতের সাথে প্রাণের সংযোগ স্থাপনে প্রয়োজন পঞ্চগীতিকবির অপ্রচলিত স্বদেশি গান, বিশেষত তিন কবির স্বদেশচেতনাবাহী গানের চর্চা বৃদ্ধি করা। রবীন্দ্রনাথের *সংগীতের মুক্তি* প্রবন্ধের নিম্নোক্ত উক্তিটি গবেষণার দিক-নির্দেশনা দেবে–

> "আমাদের সংগীতও রাজসভার সম্রাট্‌সভায় পোষ্যপুত্রের মতো আদরে বাড়িতেছিল। সে-সব সভা গেছে, সেই প্রচুর অবকাশও নাই, তাই সংগীতের সেই যত্ন আদর সেই হৃষ্টপুষ্টতা গেছে। কিন্তু গ্রাম্যসংগীত, বাউলের গান, এ-সবের মার নাই। কেননা, ইহারা যে রসে লালিত সেই জীবনের ধারা চিরদিনই চলিতেছে। আসল কথা, প্রাণের সঙ্গে যোগ না থাকিলে বড়ো শিল্পও টিকেতে পারে না।"[৮]

অর্থাৎ একবিংশ শতকে প্রাণের যোগ, বাঙালি অস্তিত্বরক্ষার ও দর্শনগত সমঝোতায় পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গান ধারণ করার মধ্যদিয়েই জাতীয় মুক্তির বীজ বপন হবে বলে বিশ্বাস করি।

স্বদেশের জন্য সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল বাণীটি আজও রবীন্দ্র-নজরুল শিল্পীদের অনেকে প্রাণে, সাধনাতে জাগ্রত রেখেছেন। বাংলা সংগীতের গড়ে ওঠা ঐতিহ্যে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশসংগীত আজও শুদ্ধ রাজনীতির মঞ্চ, উৎসব প্রাঙ্গণে ও জাতীয় দিবসে গৌরবের স্থানটি দখল করে আছে, চেতনায় স্বদেশপ্রেম জাগ্রত রাখার মানসে। স্বাধীনতা আন্দোলন চলাকালীন সময়ে মানুষকে স্বাধীনতার পক্ষে উদ্বুদ্ধ করবার জন্য বহু অনুষ্ঠান করেছে এবং সেই সকল অনুষ্ঠানেই রবীন্দ্রসংগীত, ডি.এল রায়, নজরুলের গান শোনাতেন সংস্কৃতিকর্মী ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের শিল্পীবৃন্দ। এক্ষেত্রে কণ্ঠযোদ্ধা সমর দাস, অরুন গোস্বামী, আবদুল জব্বার, আপেল মাহমুদ, তিমির নন্দী, রথীন্দ্রনাথ রায়, সুজয় শ্যাম, শাহিন সামাদ, রফিকুল আলম, প্রবাল চৌধুরী, কল্যাণী ঘোষ, নমিতা ঘোষ, অনুপ ভট্টাচার্য, স্বপ্না রায়, জয়ন্তী লালা, ফকির আলমগীর, কাদেরী কিবরিয়া, ইন্দ্রমোহন রাজবংশী, অজিত রায়, সুবল দাশ, বুলবুল মহলানবীশ, মলয় গাঙ্গুলী প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্রদ্ধেয় সন্‌জীদা খাতুনের *স্বাধীনতার অভিযাত্রা* গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে, ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউটের অনুষ্ঠানগুলোতে অনুষ্ঠান শেষে সকলের হাতে 'আমার সোনার বাংলা' গানটির অনুলিপি দেওয়া হতো সমবেতভাবে গানটি গাইবার জন্য এবং স্বাধীনতার পরে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সিদ্ধান্তে এই রবীন্দ্রসংগীতের প্রথম ১০ লাইন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের সম্মান পায়। ডি. এল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি বাঙালির জাতীয়গীতি হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাই এত বছর পরে এই গানটি স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপনের প্রাণরূপ হয়ে; দূরআলাপনির শুভেচ্ছা সংগীতের (welcome tune) মধ্যদিয়ে ভেসে আসে শ্রদ্ধেয় শিল্পী সৈয়দ আব্দুল হাদির কণ্ঠ। বঙ্গবন্ধুর প্রিয় স্বদেশচেতনাবাহী এ গানটি সৃষ্টির এত বছর পরেও সমানভাবে সমাদৃত।

এ সকল গান আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস, স্বাধীনতা দিবস, বিজয় দিবস, জাতীয় শোক দিবস, পহেলা বৈশাখ প্রভৃতি উৎসব অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে পরিবেশন করা হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ যেকোনো সংকটে সমস্বরে এই গান গেয়ে ওঠে সহস্রপ্রাণ দেশমাতাকে প্রণতি জানায় শ্রদ্ধাভরে। স্বাধীন বাংলাদেশে বাঙালি সংস্কৃতির চেতনা জাগ্রত রাখতেই প্রয়োজন হয় পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গান। যতদিন বাঙালি তাদের নিজ সংস্কৃতিকে ভালোবাসবে, ভালোবাসবে দেশকে ততদিন বাংলার গৌরবগাঁথা এই সকল গানের আশ্রয়ে ফিরতেই হবে বারবার।

তথ্যসূত্র

১. তিতাশ চৌধুরী, *আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নজরুল সংগীতের ভূমিকা*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১, পৃ. ১৩৮-১৩৯

২. রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সেড, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৩

৩. সন্‌জিদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ১৪৯

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ*, কলকাতা, ১৩৯৪, পৃ. ৮২১

৫. সন্‌জিদা খাতুন, *সংস্কৃতির বৃক্ষছায়ায়* (পরিমার্জিত সংস্করণ), নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭, পৃ. ৬৩

৬. শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লি; ঢাকা, ২০১২, পৃ. ১৫-১৬

৭. নজরুল রচনাবলী, চতুর্থ খণ্ড, নতুন সংস্করণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ১৪৫

৮. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র*, ঢাকা, ২০১০ পৃ. ৪৯

উপসংহার

মানুষের সৃজনশীল প্রবৃত্তিকে বিকশিত করতে দেশাত্মবোধ বা স্বদেশচেতনা অতুলনীয় হৃদয়বৃত্তিরূপে প্রমাণিত হয়েছে। বাংলাদেশের অভ্যুদয় থেকে শুরু করে বাঙালিসত্তার ইতিহাস ঘাটলে দেশাত্মবোধই হবে সংস্কৃতিসত্তা প্রতিষ্ঠার প্রধান ও প্রাচীনতম নিয়ামক। সুর প্রলেপিত স্বদেশচেতনা বিনির্মাণে সংগীতের ভূমিকা অপরিসীম। দেশাত্মবোধের মর্মবাণী সুরের জাদুস্পর্শে পরিণত হয় পরিবর্তনের এক মহাশক্তিশালী প্রতিবাদ হয়ে। উনবিংশ শতকে বাংলা সংগীতের ইতিহাসে একটি বিশেষ বিবর্তনের অধ্যায় সূচনা করেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর ১৮১৫ সালে গড়া 'আত্মীয় সভা' ও ১৮২৮ সালে 'ব্রাহ্মসমাজ'-এর প্রতিষ্ঠা মূলত বাংলা সংগীতের ধারা উন্মোচন কল্পে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা পৌত্তলিক ধর্মসংগীতের পরিবর্তে নিরাকার ব্রহ্মের উপাসনা সংগীত রচনাতে মনোযোগী হন। তাঁরা স্বাধীন ও উদার ভাবনা এবং একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী। ফলে নিজস্ব সংস্কৃতি ও উপাসনার ফলশ্রুতিতেই সংগীতকলার সূত্রপাত। এক অর্থে স্বদেশি সংস্কৃতির প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হয় এই সময়ে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে স্বদেশ সংগীতের মধ্যদিয়ে উদ্দীপনা প্রবাহের উন্মেষ ঘটে। এই সময় বাঙালির মনে দেশপ্রেমের উদ্রেক হয় এবং ইংরেজ শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে শত শত গান রচিত হয়।

দীর্ঘদিন ইংরেজ শাসনের অধীনে থেকে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতায় মুগ্ধ বাঙালি নিজের ঐতিহ্যের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এমনকি ইংরেজরা ভারতবাসীর মঙ্গলার্থে ও উন্নতি সাধনে শিক্ষার বিস্তার করেছেন এই ভাবনার দরুন অনেক ভারতবাসীর মনে ইংরেজদের প্রতি বন্ধুবৎসল উদারতা যেমন আশ্রয় করে; তেমনি নিজেদের শক্তি, সংস্কৃতির প্রতি সন্দেহ ও অশ্রদ্ধা জাগতে শুরু করে যা একটি জাতির জন্য হতাশার সবচেয়ে বড় কারণ। এই হতাশা থেকে মুক্তির পথ খুঁজতে সকলকে সম্পৃক্ত করে শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ নৈরাশ্য আর অশ্রদ্ধার বেড়াজাল থেকে ভারতমাতাকে মুক্ত করতে সঙ্ঘবদ্ধ হতে শুরু করে।

স্বজাত্যপ্রীতির তাগিদ ও প্রবণতা দেখা দেয় সর্বত্র। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় চেতনা পুনরুদ্ধারে বাংলা স্বদেশচেতনায় সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার নানাবিধ চর্চা শুরু হয়। তারমধ্যে 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠা একটি রোমাঞ্চকর ঘটনা। এ সময় স্বদেশচেতনা-নির্ভর উদ্দীপনাময় গান-কবিতা রচনা ও চর্চার উন্মেষ ঘটে সর্বত্র। শত শত স্বদেশচেতনাবাহী গান রচিত হতে থাকে হিন্দুমেলার ব্যবহারিক কর্মকাণ্ডকে ঘিরে। ইংরেজ শাসকের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী স্লোগান স্বরূপ সংস্কৃতির ছায়াতলে স্বদেশপ্রেমকে জাগ্রত করতে থাকে নীরবে; তবে তাদের শত্রুজ্ঞানে নয়, বরং স্বদেশমাতার বন্ধুজ্ঞানে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে হিন্দুমেলাকে কেন্দ্র করে কয়েকটি কালপর্যায়ে স্বদেশসংগীতের ধারা বিপুলভাবে

বিকশিত হয়। স্বদেশসংগীত, স্বদেশপ্রেমের গান, স্বদেশি গান, দেশাত্মবোধক গান অথবা মুক্তির গান–এই সকল নামে বহু গীতিকবিদের রচনায় স্বদেশপ্রেমবোধ প্রস্ফুটিত হতে থাকে। এসবের কারণেও মূলত একের পর এক ইংরেজবিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাতে স্বদেশবাসীকে স্বদেশচেতনায় উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনের তাগিদ দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে সিপাহি বিদ্রোহের মধ্যদিয়ে স্বদেশি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। সিপাহি বিপ্লবকালে ভারতবাসীর নিরাপত্তার প্রতি ইংরেজদের উদাসীনতা, ইংরেজদের স্বার্থপরতার রূপটি প্রকট হয়ে প্রকাশিত হলে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এ আন্দোলন আরো তীব্রতা লাভ করে।

এ দেশবাসী বুঝতে পারে তারা নিদারুণভাবে পরাধীন এবং জিম্মি হয়ে পড়েছে ইংরেজদের চতুরতার কাছে। তখন থেকেই দেশীয় শিল্প-সাহিত্য ও সংগীতের প্রকাশ লাভের চেষ্টা চলতে থাকে। কারণ নিজস্ব যা কিছু তার মধ্যেই পরাধীনতা থেকে মুক্তির চেতনা নিহিত থাকে। সিপাহি বিদ্রোহের পরে স্বদেশি আন্দোলনের প্রবল জোয়ার দেখা দেয় ব্রিটিশ শাসক ও শোষণের বিরুদ্ধে। দেশাত্মবোধক গান রচনার মধ্যদিয়ে নবজাগরণের এক যুগান্তকারী অধ্যায়ের সূচনা হলো। স্বদেশকে পরাধীনতার কালিমা থেকে মুক্তির প্রত্যাশায় জনচিত্ত জেগে উঠলো তীব্র আবেগে। ইতিহাস পেল বাঙালির শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অর্জন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে। স্বদেশি যুগের সূচনা মূলত বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশি গান সেই আন্দোলনের মূল সম্পদ ও অনুপ্রেরণার সোপান হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রাখীবন্ধন উৎসব বাঙালির মনে ভ্রাতৃত্ববোধের গভীর ছায়া ফেলে। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠান সারা বাংলায় প্রাণ চাঞ্চল্যের জোয়ার বইয়ে দেয়। কণ্ঠে কণ্ঠে সেদিন গীত হয়, 'বাংলার মাটি বাংলার জল/বাংলার বায়ু বাংলার ফল পূর্ণ হউক।'

এ সময়ের একটি অন্যতম দাবি ছিলো হিন্দু-মুসলমান, ধনী-গরিব অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ঐক্য স্থাপন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রামেন্দ্র সুন্দর ত্রিবেদী প্রমুখ সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এই পটভূমি রচনার উদ্দেশ্যে পালন করলেন রাখী বন্ধন উৎসব। বাংলার এই মিলন সংগীত প্রসঙ্গে আজও একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য, হিন্দুমেলা যুগে যে নবজাগরণের অধ্যায়ের সূচনা হয় তা মূলত হিন্দু ধর্মের আদর্শকে কেন্দ্র করে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের একচ্ছত্র প্রবেশাধিকার গড়ে ওঠেনি চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলায়। বিশেষত ব্রাহ্মসমাজের সভ্যরা এই মেলার সূত্রপাত করেন এবং নামকরণ থেকে শুরু করে সর্বত্র হিন্দু জাতীয়তাবোধের ভাবনাকেই ত্বরান্বিত করেন। স্বাদেশিক ধারণা মূলত হিন্দু আদর্শিক ধারণা দ্বারা পরিচালিত হতো। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাদেশিক জাতীয়তাবোধও মূলত তাই। স্বাধীনতা অর্জনের মতো বিশাল স্বপ্ন কখনো আরেকটি সম্প্রদায়কে বাদ রেখে সম্ভব নয় বলেই কংগ্রেসের আবির্ভাব। কংগ্রেসেই প্রথম হিন্দু-মুসলিমের ঐক্যের বিষয়টিকে গুরুত্বারোপ করা হয়। কংগ্রেসের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে রচিত হয় সম্প্রীতির গান। ১৮৮৬ সালে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ সংগীত 'আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে' মূলত কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশনকে কেন্দ্র করে সম্প্রীতি ও ঐক্যের আহ্বানে গানটি রচিত

হয়। ইংরেজরা জানতো হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের সম্পর্ক বজায় থাকলে তারা কখনো বঙ্গভঙ্গ করতে পারবে না। তাই সুকৌশলে বঙ্গভঙ্গের পক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়কে প্ররোচিত করতে থাকে যে বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ব বাংলার মুসলিমরা প্রাধান্য পাবে। এই যুক্তিতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ককে ভাঙনের চেষ্টা করে ইংরেজরা। ইংরেজরা বিশ্বাস করতো নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি ও ঐক্যের ঘাটতি থাকলে বাঙালির শক্তি কমে যাবে এবং আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়বে। তখন তাদের পক্ষে বঙ্গকে দ্বিখণ্ডিত করা সহজ হবে। ইংরেজদের এই চক্রান্তের বিষয়টি অনুধাবন করে স্বদেশচেতনায় দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করতে ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতি বেশি জোর দিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর স্বদেশ সংগীত রচনায়। ইংরেজরা বুঝে গিয়েছিল বাঙালিকে বিভাজন করতে পারলেই তাঁদের সকল উদ্দেশ্য সহজেই বাস্তবায়ন হবে এবং তা ফলপ্রসূও হবে। এই অভিপ্রায়ে মুসলিমদের একটি শ্রেণিকে প্রলুব্ধ করবার চেষ্টা চালাচ্ছিল তারা। ইংরেজদের এই বিভাজননীতিকে ধুলিসাৎ করবার জন্য শিক্ষিত বাঙালি গীতিকবিদের আরো সচেতন হতে হলো– এই মর্মে যে ঐক্যই বড় শক্তি। তাই জাতি-ধর্ম-বর্ণের বিভাজন কমিয়ে সম্প্রীতির শক্তিকে মজবুত করবার প্রয়াসে রবীন্দ্রনাথসহ বহু গীতিকবি ঐক্য সাধনের লক্ষ্যে দেশাত্মবোধক বহু গান রচনা করেন এবং এই সকল গান বিপুল অনুপ্রেরণাদায়ী ভূমিকা পালন করে।

দ্বিজেন্দ্রলাল রায় তাঁর গানে বৈচিত্র্যতার সমাবেশ ঘটিয়ে নাটকের মধ্যে স্বদেশের গান যুক্ত করলেন। শুধু তাই নয় বিলেত থেকে ফিরে সেই ধাচের খাড়া খাড়া সুরের প্রয়োগে রচনা করলেন স্বদেশপ্রেমের অন্য ধাচের প্রেরণাদায়ক গান। গানের কথা এবং সুরের দোলাতে স্বাধীনতাকামী মানুষের প্রাণ জেগে উঠলো। তাঁর 'বঙ্গ আমার, জননী আমার' গানটি একটি অনন্য আবেদন সৃষ্টিকারী গান ছিলো তখন। নূরজাহান নাটকের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি তো এ সময়ে এসেও স্বদেশি গানের অহংকার হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেকোনো জাতীয় উৎসবের এক তুলনাহীন দেশাত্মবোধক গান। এটি বঙ্গবন্ধুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলো। 'সে দিন সুনীল সাগরে', 'মেবার পতন' প্রভৃতি গান সে সময়ে অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত ও প্রাসঙ্গিক ছিলো। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় কিছু হাসির গান তখন ব্যঙ্গরীতিতেও রচনা করেন। যার অন্তরালে মূলত স্বদেশপ্রেমকে ব্যক্ত করেন কবি। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে তাঁর এই সকল গান মূলত আন্দোলনকে বেগবান করতে প্রেরণা জুগিয়েছে।

'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি সর্বকালের শাশ্বত বাঙালি মায়ের রূপের কল্পনা দেয়। হীন দরিদ্র মায়ের জন্য একপ্রকার অদৃশ্য কল্পনায় আদর ছেয়ে যায়। এই ধারার গান রচনায় সিদ্ধহস্ত রজনীকান্ত সেনও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে কিছু স্বদেশি গান রচনা করেন। তাঁর 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' গানটি বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকালে সকলের মুখে মুখে গীত হতো। ইংরেজি পোশাকে অভ্যস্ত বাঙালি জাতিকে মোটা সুতার কাপড়ে অভ্যস্ত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এই গানে। পণ্য ব্যবহার মানেই ইংরেজদের দাসত্ব মাথা পেতে নেয়া। তাই তাঁর এই গানটি বিলেতি চালে অভ্যস্ত বাঙালিদের

টনক নড়াতে সহায়ক হয়। তাঁর স্বদেশপর্বের গানে আন্দোলনের প্রতিবাদী বাণী নয়, বরং স্বদেশের রূপ বর্ণনা, কখনো স্বদেশমাতার দুঃখ-দুর্দশার কথা এবং তার থেকে পরিত্রাণের পথের দিশা দিয়েছেন রজনীকান্ত সেন। অতি সহজ সরল সুরে অতুলনীয় কথামালার মায়াভরণে রচিত তাঁর স্বদেশপর্বের গানসমূহ। যেমন 'রে তাঁতী ভাই ফুল্লার করে হুকুমজারি', 'তাই ভালো মোদের মায়ের ঘরে শুধু ভাত', 'জয় জয় জন্মভূমি, জননী!' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রেমের গানে সিদ্ধহস্ত অতুলপ্রসাদ সেন স্বদেশ প্রেমের গান যত না রচনা করেছেন তারচেয়ে বেশি করেছেন জনসেবামূলক কাজ। লক্ষ্মৌ-এর সেনবাবু নামে খ্যাত অতুলপ্রসাদ সেন সকলের দুঃখ-দুর্দশার সাথী হয়ে পাশে দাঁড়াতেন। মাতৃভাষার প্রতি প্রেম ও প্রচারকল্পে কাজ করেছেন কবি। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান তৈরির সাথে যুক্ত ছিলেন শিক্ষাকর্মের প্রসারের জন্য। তিনি মাত্র ১৩টি গানের ভিতর দিয়ে অতীতকালকে স্পর্শ করেছেন। অতুলপ্রসাদের গান জুড়ে থাকে গভীর আবেগময়তা, সাম্প্রদায়িক ঐক্য, দেশের ভবিষ্যৎ গড়বার স্বপ্ন এবং তার দিক-নির্দেশনায় কর্মের আহ্বান। তিনি প্রকৃতই একজন দেশপ্রেমিক কবি যার রচিত 'মোদের গরব মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা' গানটি স্বদেশসংগীতের ভাণ্ডারে বাংলা ভাষার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের চির বরণীয় গান হয়ে বেঁচে থাকবে।

হিন্দুমেলার সময় থেকে বঙ্গভঙ্গপর্ব অর্থাৎ স্বদেশি যুগ পর্যন্ত বাঙালির স্বদেশচেতনা বিকাশে অসংখ্য গান রচিত হয়েছে। প্রায় চল্লিশ বছর (১৮৬৭-১৯১১) স্বদেশি গানের জোয়ারে যুক্ত হয়েছেন অসংখ্য গীতিকবি। জনজাগরণে তাঁদের ভূমিকা অবিস্মরণীয়। মুকুন্দ দাস, অশ্বিনীকুমার দত্ত (১৮৫৬-১৯২৩), কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ (১৮৬১-১৯০৭), কামিনী রায় (১৮৬৪-১৯৩৩), সরলাদেবী চৌধুরানী (১৯৭২-১৯৪৫) প্রমুখ বঙ্গভঙ্গ যুগে স্বদেশসংগীত রচনায় বিপুল অবদান রয়েছে। এছাড়াও বিপিনচন্দ্র পাল, শিবনাথ শাস্ত্রী প্রমুখের রচনাও স্বদেশি গানের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরে স্বদেশি গান রচনায় একটা ভাটা পড়ে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অসহযোগ আন্দোলনের সাথে মতানৈক্যের কারণে সরে দাঁড়ান। তাঁর সাথে সমসাময়িক অনেক গীতিকবির নীরবতা লক্ষ্য করা যায়। এরই মধ্যে রজনীকান্ত সেন (১৯১০) ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের (১৯১৩) প্রয়াণ একটা গভীর শূন্যতার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের ফলে ইংরেজবিরোধী আন্দোলন বৈপ্লবিক তথা সশস্ত্র আন্দোলনের রূপ লাভ করে। ইংরেজ সরকার ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ধর-পাকড়, ভয়-ভীতি, অত্যাচার-নির্যাতন শুরু করলে ব্রিটিশ সরকারবিরোধী রক্তাক্ত অধ্যায়ের সৃষ্টি হয়। প্রফুল্লচাকি, ক্ষুদিরাম বসুর আত্মদানে এক অভূতপূর্ব অধ্যায়ের সূচনা হয় যার হাল ধরে গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের পন্থা। স্বদেশসংগীত রচনার এই ভাটাকালে অন্যধারার স্বদেশসংগীতের কলেবর নিয়ে আবির্ভূত হন কাজী নজরুল ইসলাম। নবধারার স্বদেশি উদ্দীপনায় তিনি কেবল শূন্যতাই পূরণ করলেন না, স্বদেশি গানে আন্দোলনের ঝড় তুলে দিলেন। 'জাতের নামে বজ্জাতি' নজরুলের প্রথম রেকর্ডকৃত গান ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, নারী জাগরণ, যুব জাগরণ ও পরাধীনতার

বিরুদ্ধে বারুদের মতো উচ্চারিত হতে লাগলো তাঁর রচিত স্বদেশপর্বের গানে। সাহিত্যমূল্য বিশ্লেষণে এই পঞ্চগীতিকবির স্বদেশপর্বের গান যেমন স্ব স্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র তেমনি সুর প্রয়োগেও স্বাতন্ত্র্যের ছাপ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। তন্মধ্যে রবীন্দ্রনাথ, ডি. এল. রায়, রজনীকান্ত সেন ও অতুলপ্রসাদ সেনের গানের সময়কাল খুব কাছাকাছি এবং গান রচনার প্রেক্ষাপটও একই ছিলো বলে সুর ও বাণীতে রবীন্দ্র-আদর্শিক বলে মনে হতে পারে। কারণ সেই সময়টা ছিলো রবীন্দ্র-বলয়ের ছায়াপাতে ঘেরা। তাই বাণীর গভীরতা ও সুরের সরলতা সেই সময়ে রচিত সকল গানের প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বদেশসংগীত রচনাতে সুরের কালোয়াতি সাধারণের কর্ণগোচর হবে না এই বিশ্বাসটি পরিলক্ষিত হয় রবীন্দ্র-অতুল-রজনী-দ্বিজেন্দ্র রচিত স্বদেশের গানে। তাই প্রত্যেকেই লোকসুরের সাদামাটা বাউলের ঢংটি বেশি গ্রহণ করেছেন। স্বদেশের কথা বলতে গেলে অবশ্য তাই নিজের চিরচেনা সুরের প্রয়োগই প্রাসঙ্গিক। তবেই তা সকলের গান হয়ে উঠবে। বিষয়টি তেমনই হয়েছিল বটে। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি', 'যদি তোর ডাক শুনে' প্রভৃতি গান বাউল ও রামপ্রসাদী অর্থাৎ লোকধারা সুরে রচিত। ডি. এল. রায়ের 'একবার গাল ভরা মা', অতুলপ্রসাদের 'মোদের গরব মোদের আশা', রজনীকান্তের 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়' সবই সহজ সরল লোকসুরের আশ্রয়ে রচিত, বিশেষত সাধারণের হৃদয়ে স্বদেশি গানের বাণীটি প্রতিস্থাপনই ছিলো মূল উদ্দেশ্য, তাই এই পন্থার অবলম্বন।

কাজী নজরুল ইসলামও তাঁর বহু দেশাত্মবোধক গানে লোকসুরের আশ্রয় নিয়েছেন। 'শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের', 'একি অপরূপ রূপে', 'ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে' এমন বহু গানে লোকসুরের আশ্রয় পাই। এছাড়াও নজরুলে মার্চ সুরের ব্যবহার স্বদেশপর্বের গানে একটি নতুন পন্থার প্রয়োগ । তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন বলেই এই সুরটির প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মে এবং উদ্দীপনামূলক গানে মার্চ সুরের ব্যবহারে গানকে অন্যমাত্রায় নিয়ে গেছেন। তাঁর কালজয়ী দেশাত্মবোধক অধিকাংশ গানই মার্চ সুরে রচিত। 'চল্ চল্ চল্', 'দুর্গমগিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট', 'শিকল পরা ছল' প্রভৃতি বিখ্যাত সকল গান মার্চ সুরের দ্রুত ছন্দে রচিত–যা আজও উদ্দীপনায় যৌবনের জয়গান গেয়ে চলে। রবীন্দ্র-ডি. এল. রায়ের আমলেও এই ধারার বিদেশি সুরের চলনের প্রয়োগ দেখা যায়। যেখানে সুরটি লাফিয়ে লাফিয়ে চলে এবং একটি ছান্দিক দোলা জাগায় মনে। যেমন ডি. এল. রায়ের 'বঙ্গ আমার, জননী আমার', 'ধনধান্য পুষ্পভরা' এই বিখ্যাত গানগুলোতে বিদেশি সুরের চলন পরিলক্ষিত। তাছাড়াও রাগ-রাগিণীর মিশ্রণ পঞ্চগীতি কবির প্রত্যেকেরই স্বদেশপর্বের গানে পরিলক্ষিত হয়–যা গানকে ভিন্ন মাত্রা দেয়। তবে উল্লেখ্য যে, পঞ্চগীতিকবি রচিত গানে সুর প্রয়োগে রাগ-রাগিণীর ব্যবহারের থেকে সহজ সরল লোকসুরের প্রয়োগ অধিক গ্রহণযোগ্যতা পেয়েছে জনমনে।

পঞ্চগীতিকবির স্বদেশপর্বের গানে চেতনানির্ভর আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের মোট রচিত গানের প্রায় ২২২৩টির মধ্যে ৪৬টি স্বদেশপর্যায়ের গান, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মোট গানের সংখ্যা ৫১১টির মধ্যে স্বদেশপর্বের গান ১৯টি, রজনীকান্ত সেনের ৩০১টি গানের মধ্যে স্বদেশপর্বের গান ১৬টি, অতুলপ্রসাদ

সেনের ২০৬টি গানের মধ্যে স্বদেশপর্বের গান ১৩টি এবং কাজী নজরুলের প্রায় ৩১৭৪টি গানের মধ্যে স্বদেশপর্বের ১০৯টি গান পাই। অসহযোগ আন্দোলনের পরেও এই সকল স্বদেশপর্বের গানের আবেগ থেমে যায়নি, বরং বহু গুণে বেড়ে আমাদের স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের সোপান রচনায় অনুপ্রেরণা দিয়ে চলেছে। ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন থেকে শুরু করে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ এবং স্বাধীন বাংলাদেশের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সবকয়টি অধ্যায়ে এই সকল গান গণমানুষকে উদ্দীপ্ত করে চলেছে। আশার আলোর মশাল হয়ে পথ দেখাচ্ছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সাংস্কৃতিক বলয়ে ঘেরা সমৃদ্ধ এই সোনার বাংলা গঠনে এই সকল স্বদেশপর্বের সংগীতের ক্ষেত্রে অবদান রয়েছে। যে রবীন্দ্রনাথের গান এই বাংলায় গাওয়া নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছিল পাকিস্তানি সরকার, সেই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপর্বের সংগীত মুক্তিযুদ্ধকালীন সময়ে সর্বাধিক প্রেরণাদায়ী গান 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি'কে তিনি রাষ্ট্রীয় মর্যাদা দিলেন–দিলেন জাতীয় সংগীতের সর্বোচ্চ মর্যাদার আসন।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্টে বাংলাদেশের স্বাধীনতার সূর্যপুরুষ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে বর্বর ও নির্মমভাবে হত্যার মধ্যদিয়ে ইতিহাসের যে ঘৃণ্য অধ্যায়ের সূচনা হয় তখন থেকে আজ পর্যন্ত বাংলার সংস্কৃতির উদীয়মান স্বপ্নে বিভোর মুক্তিযুদ্ধের আদর্শ থেকে চ্যুত হয়নি এদেশের শিল্পী, গীতিকবিরা। ১৯৮৭ সালের এরশাদবিরোধী আন্দোলন, ১৯৯১ সালের ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটির আন্দোলন, ১৯৯৬ সালে মৌলবাদের উত্থানে যশোরে উদিচির সম্মেলন ও রমনার বটমূলে ১লা বৈশাখের বোমা হামলাসহ ২০০১ সালের সাম্প্রদায়িক সন্ত্রাস প্রতিহতকরণে এই সকল গীতিকবিদের গান আশা জাগানিয়া ভূমিকা পালন করেছে। ২০১৩ সালের গণজাগরণ মঞ্চে এই সকল স্বদেশপর্বের গানও অনুপ্রেরণা জুগিয়েছে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়ে। জাতীয় জীবনের যেকোন উৎসব ও সংকটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গান আজও অগ্রণি ভূমিকা রেখে চলেছে। এ বছর (২০২২) জুন মাসে সিলেট, সুনামগঞ্জসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যাকবলিত হলে বাণভাসী অসহায় মানুষের জন্য ত্রাণ সংগ্রহে ঢাকা শ্বিবিদ্যালয়ের টিএসসি প্রান্তর থেকে কানে ভেসে আসে রবীন্দ্রনাথের 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে' গান। একবিংশ শতাব্দীর এই ডিজিটাল সময়ে নতুন প্রজন্ম পরিত্রাণের পথ খুঁজছে এইসকল স্বদেশচেতনার গানের ভিতর দিয়ে। সৃষ্টির শতবছরেরও বেশি সময় পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'ধনধান্য পুষ্পভরা' গানটি কানে বাজলে স্বদেশের জন্য হৃদয় আকুল হয়। যে যেখানেই থাকুক স্বদেশমাতার শ্যামলবরণ ছবি, অঘ্রাণের ভরা খেত চোখের সামনে ভেসে ওঠে। পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনাবাহী এই সকল গানের সার্থকতা এখানেই। চির অমরত্বের সাক্ষ্য বহন করে চলেছে এই সকল হৃদয়-নিংড়ানো স্বদেশপ্রেমের গান। বিশ্বায়নের যুগে দাঁড়িয়ে পৃথিবীব্যাপী চলমান বিচিত্র সংকটে পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনাবাহী গান একত্রিতকরণ, আবিষ্কার ও নবরূপে বিশ্লেষণের মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে উপস্থাপন এই গবেষণার

প্রাণবন্ত। তাছাড়া বক্ষ্যমান এই গবেষণায় বিশ্লেষিত গানসমূহের প্রভাব আলোচনার মাধ্যমে উৎকর্ষ শিল্প মানদণ্ড বিচারে এ সকল গানের সার্থকতা ও সফলতার প্রতিষ্ঠা প্রকাশ পেয়েছে যা নতুন গবেষণার দিগন্ত উন্মোচিত করবে। তাই শতসহস্র বছর পরেও এ সকল গানের এমনি গ্রহনযোগ্যতা থাকবে; শিল্পী, শ্রোতা ও সর্বসাধারণচিত্তে এমনি বলিষ্ঠ অনুপ্রেরণায় প্রাণের দিশা দেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করি।

গ্রন্থপঞ্জি

আহমদ রফিক, *নানা আলোয় রবীন্দ্রনাথ*, ২য় খণ্ড, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১১
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্র সমীক্ষা*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৬১
অতুলপ্রসাদ সেন, *গীতিগুঞ্জ*, পাতাবাহার, কলকাতা, ১৪২০
অরুণকুমার বসু, *বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৪
আহমদ রফিক, *দেশ বিভাগ ফিরে দেখা*, অনিন্দ্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৫
আবুল আহসান চৌধুরী, *রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ যুগলবন্দী প্রেক্ষণ*, শোভা প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৮
আব্দুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, *২য় খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩
আহমদ রফিক, *নির্বাচিত রবীন্দ্রনাথ*, অন্যপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬
আব্দুল কাদির (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, প্রথম মদ্রণ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৩
উৎপলা গোস্বামী, *ধ্রুপদ ও খেয়ালের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ*, ক্লাসিক প্রেস, কলকাতা, ১৯৭১
এস.এম. লুৎফর রহ্মান, *বাউল তত্ত্ব ও বাউল গান*, ধারনী সাহিত্য-সংসদ, ঢাকা, ১৯৯০
ওয়াকিল আহমদ, *বাংলা লোকসঙ্গীত সারি গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
কনক দাশ, *অতুলপ্রসাদের গান*, দেশ, বিনোদন সংখ্যা-১৩৯১, কলকাতা, ১৩৯১
করুণাময় গোস্বামী, *নজরুল-গীতি প্রসঙ্গ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬
কল্যাণী কাজী (সম্পা.), *শত কথায় নজরুল*, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৭
কাজী নজরুল ইসলাম, *নজরুলের কবিতা সমগ্র*, ৩য় সংস্করণ, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা ১২০৯
গণ-বাণী, সাপ্তাহিক পত্রিকা, ১ম খণ্ড, ১১শ সংখ্যা, ১৯২৭
গোপিকা রঞ্জন চক্রবর্তী, *ভবা পাগলার জীবন ও গান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৫
গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী, ১৯৮৩
গোলাম মুরশিদ, *বিদ্রোহী রণ-ক্লান্ত*, *নজরুল জীবনী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৮
জামরুল হাসান বেগ, *নজরুল ইসলাম এবং অন্যেরা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৮
করুণাময় গোস্বামী, *প্রসঙ্গ বাংলা গান*, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৯।
ব্রহ্মমোহন ঠাকুর সম্পাদিত, *নজরুলগীতি অখণ্ড*, পরিমার্জিত ৩য় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১৮
শ্রীমন্তকুমার জানা, *রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা*, সাহিত্যবিহার, কলকাতা, ২০১৯
করুণাময় গোস্বামী, সংগীত কোষ, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৫
মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, ভাষা ও দেশের গান, অনুপম প্রকাশনী, ২০০৫
আনোয়ারুল করীম, রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ, জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০১৮
লীনা তাপসী খান, *নজরুল সংগীতে রাগের ব্যবহার*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০২১
উৎপলা গোস্বামী, *বাংলা গানের বিবর্তন*, দীপায়ন, কলকাতা, ২০০৮
জাহিদুল কবীর, *ভাটিয়ালী গানের উদ্ভব ও বিকাশ*, অন্বেষা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১৭
ডক্টর মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী (সম্পা.), *ভাষা ও দেশের গান*, অনুপম প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, ২০০৫
সীমা বন্দ্যোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রসংগীতে স্বদেশচেতনা*, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা, ২০১১।
মানস মজুমদার, *রবীন্দ্রনাথ নানা প্রসঙ্গ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৪১৮
প্রিয়ব্রত চৌধুরী, *রবীন্দ্র সংগীত লোকগীতি*, *কীর্তন ও উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রভাব*, ২০০১
দেবজ্যোতি দত্ত মজুমদার, *রবীন্দ্রসংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৭
আশরাফ সিদ্দিকী, *রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন*, মুক্তধারা, ১৯৭৪
তাহা ইয়াসিন (সংকলন ও সম্পা.), *নজরুলের বিদ্রোহীর চেতনালোক*, কথাপ্রকাশ, ঢাকা, ২০১৬

তিতাশ চৌধুরী, *আমাদের মুক্তির সংগ্রামে নজরুল সংগীতের ভূমিকা*, আগামী প্রকাশনী, ২০১১
দেবব্রত দত্ত, *সংগীত প্রভাকার, সংগীত তত্ত্ব [শাস্ত্রীয় তথা ভাব সংগীত প্রসঙ্গ]*, প্রথম খণ্ড, ব্রতী প্রকাশনী, ১৯৮৪
দেবকুমার রায়চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল (জীবনী)*, (সম্পা.) ড. জগন্নাথ ঘোষ, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১২
দিব্যজ্যোতি মজুমদার (সম্পা.) *পশ্চিমবঙ্গ*, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, কলকাতা, রবীন্দ্র সংখ্যা, ১৪০৫
সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্রগীতি সমগ্র*, পশ্চিম বাংলা একাডেমি, ২০০৮, কলকাতা।
দেবব্রত দত্ত, *সঙ্গীত সহায়িকা*, ১ম ও ২য় খণ্ড, কলকাতা, ব্রতী প্রকাশনী, ১৯৭৫, ১৯৭৬
দেবকুমার রায় চৌধুরী, *দ্বিজেন্দ্রলাল*, করুণা প্রকাশনী, ২০১২।
দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়, *বাঙ্গালীর রাগ-সঙ্গীত চর্চা*, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
রশিদুন্ নবী, নজরুল সংগীত স্বরলিপি, ২০তম খণ্ড, কবি নজরুল ইন্সটিটিউট, কবিভবন, ঢাকা ২০০০
আসাদুল হক, *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*, চতুর্থ খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, কবিভবন, ঢাকা, ২০১১
সুবীন দাস, *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*, আটাশতম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০০৬
এস. এম. আহসান মুর্শেদ, *নজরুল-সংগীত স্বরলিপি*, ৩৫তম খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ২০০৯
নলিনীকান্ত সরকার, *নজরুল সংগীত স্বরলিপি*, ১নং খণ্ড, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, কবিভবন, ঢাকা, ২০১৯
নূপুর ছন্দা ঘোষ, *দেশাত্মা দ্বিজেন্দ্রলাল একটি জীবন কথা*, সপ্তর্ষি প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৪
নলিনীরঞ্জন পণ্ডিত, *কান্তকবি রজনীকান্ত*, পরম্পরা, ২০১৮
নারায়ণ চৌধুরী, *সংগীতবিচিত্রা*, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ১৯৮৬
পারভীন আক্তার জেমী, *নজরুল সাহিত্যে বিপ্লবী চেতনা*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১০,
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *ভারতে জাতীয় আন্দোলন*, গ্রন্থম প্রকাশ, কলকাতা, ১৯৬০
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, *গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী*, টেগোর রিসার্চ ইন্সটিটিউট, ২০১২
পশ্চিমবঙ্গ রবীন্দ্রসংখ্যা, ১৪০৩, তথ্য অধিকর্তা, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, কলকাতা
ভারতীয় রাগরাগিণীর ক্রমবিবর্তন, আশিস পাবলিকেশনস্, কলকাতা, ১৪০৯ বঙ্গাব্দ
বিশ্বজিৎ ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সেন*, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ, ২০১৯
মোহাম্মদ আমীন, *বাংলা সাহিত্য ও ভাষা আন্দোলন : সংক্ষিপ্ত ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮
মৃদুলকান্তি চক্রবর্তী, *বাংলা গানের ধারা হাজার বছরের বাংলা গান*, প্যাপিরাস, ঢাকা, ২০০৫
মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর*, বিশ্বভারতীয় গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯৫
মুজফ্ফর আহমদ , *কাজী নজরুল ইসলাম : স্মৃতিকথা*, মুক্তধারা, ঢাকা, ১৯৯৫
মানসী মুখোপাধ্যায়, *অতুলপ্রসাদ সেন*, (স্বামী দেবেসানন্দ মহারাজের চিঠি),অরুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭১
গীতা চট্টোপাধ্যায়, *বাংলা স্বদেশী গান*, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, জানুয়ারি, ১৯৮৩
বিশ্বপ্রিয়া রায়, *দ্বিজেন্দ্রগীত স্বরলীপি সংকলন*, আদি নাথ ব্রাদার্স, কলকাতা, ২০০৬
রশিদুন্ নবী (সম্পা.), *নজরুল-সংগীত সংগ্রহ*, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১৮
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, ত্রিশতম সংকলন, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১০
রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, দ্বিতীয় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪১৯
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *নজরুল ইনস্টিটিউট পত্রিকা*, সাতাশতম সংকলন, কবি নজরুল ইনস্টিটিউট, ঢাকা, ২০১০
রফিকুল ইসলাম, (সম্পা.), *নজরুল রচনাবলী*, বাংলা একাডেমি, দ্বিতীয় খণ্ড, ঢাকা, ২০০৭
রামমোহন রায়, *রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গীতাবলী* , আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্র , কলকাতা, ১৮৮৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীত বিতান*, বিশ্বভারতী , কলকাতা, ১৩৯৪
রবীন্দ্র রচনাবলী (প্রথম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বিতীয় খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (তৃতীয় খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্থ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬

রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (ষষ্ঠ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (সপ্তম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (নবম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (দশম খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (একাদশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (দ্বাদশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (পঞ্চদশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (ষোড়শ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্র রচনাবলী (অষ্টাদশ খণ্ড), ঐতিহ্য প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, মার্চ ২০০৬
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশী সমাজ*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৯৬২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, ২০১০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *জন্মদিনে*, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৬৭
অমল মুখোপাধ্যায়, *রবীন্দ্রগানের অন্তরভুবন*, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ১৪১৮
রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিমচন্দ্র বঙ্কিমভবন গবেষণা কেন্দ্র, সরকার বিজলি (সম্পা.), নৈহাটি ২০০৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : (প্রবন্ধ : হিন্দু-বিশ্ববিদ্যালয়), হিন্দু-মুসলমান সম্পর্ক (রবীন্দ্রসংগ্রহ), মৃত্তিকা, কলকাতা, ১৪১৩
রথীন্দ্রনাথ রায়, *দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার*, দ্বিতীয় সংস্করণ,প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৪১৯
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান সপ্তচত্বারিংশ* খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, কলকাতা, আষাঢ় ১৪০২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বরবিতান*, ৪৬ খণ্ড, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩৬২
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *সংগীতচিন্তা*, *বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র*, ঢাকা, ২০১০
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, *বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ*, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *স্বদেশ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ, কলকাতা, ১৩১৫
রফিকুল ইসলাম, *বাংলা ভাষা*, *সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*, সেড, ঢাকা, ২০০৬।
শ্রী হরিহর শেঠ, *রাজনারায়ণ বসুর আত্ম-চরিত*, (লিখিত হস্তলিপি হইতে মুদ্রিত), কলকাতা, ১৩১৫
শফি চাকলাদার, *সুর ও বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব নজরুল সঙ্গীত*, জুলাই, ২০১৬, বইপত্র, ঢাকা
শ্রীদিলীপকুমার রায়, *দ্বিজেন্দ্রগীতি*, জেনারেল প্রিন্টার্স র‍্যান্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা
সুনীলময় ঘোষ, *বঙ্গ-নন্দিত রজনীকান্ত সেন জীবন ও সংগীত*, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৭
সুধীর চক্রবর্তী, *বাংলা গানের চার দিগন্ত*, প্রতিভাস, কলকাতা, ২০১৩
সুনীলময় ঘোষ ও নিশীথ সাধু, *রজনীকান্ত সঙ্গীতসমগ্র*, সাহিত্যম্, কলকাতা, ২০০৬
সাইম রানা, *বাংলাদেশের গণসংগীত : বিষয় ও সুর বৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০৯
সুনীলময় ঘোষ, *অতুলন অতুলপ্রসাদ*, আনন্দ প্রকাশন, কলকাতা, ২০১৫
সুনীলময় ঘোষ, *অতুলপ্রসাদ সমগ্র*, সাহিত্যম, কলকাতা, ২০০৭
সমীর সেনগুপ্ত, *গানের পিছনে রবীন্দ্রনাথ*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০১০।
সৌমেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য*, বসুধারা প্রকাশনী , কলকাতা, ১৩৬৭
সংবর্তক পত্রিকা, *নবম বর্ষ*, *প্রথম সংখ্যা*, সম্পাদক : প্রসূন ধর, কলকাতা, ২০১৩
সন্‌জীদা খাতুন, *রবীন্দ্রবিশ্বাসে মানব-অভ্যুদয়*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৬
স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালের বাংলাগান ও রবীন্দ্রসংগীত*, প্যাপিরাস প্রকাশনা, কলকাতা, ১৯৯২

সুধীর চক্রবর্তী, *দ্বিজেন্দ্র গীতিসমগ্র*, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড), কলকাতা, ২০০৮

স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ, *সংগীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান*, শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ, ২০১০

সুধাংশু শেখর শাসমল, *রবীন্দ্র সংগীতে স্বদেশভাবনার ধারা ও রূপান্তর*, পশ্চিমবঙ্গ পত্রিকা, রবীন্দ্রসংখ্যা-১৪০৩

সুনির্মল ভট্টাচার্য, *রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভাঙাগানের উৎস সন্ধানে*, (১ম খণ্ড), বঙ্গীয় সংগীত পরিচয়, হাওয়া-১, ১৫ এপ্রিল ২০১৩

শুভ গুহঠাকুরতা, রবীন্দ্রসংগীতের ধারা, দক্ষিণী প্রকাশন বিভাগ, কলকাতা, ১৯৭৬

শেখ মুজিবুর রহমান, *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*, দি ইউনিভার্সিটি প্রেস, ঢাকা, ২০১২

শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্রসংগীত*, বিশ্বভারতী, কলকাতা ১৩৮৬

শান্তিদেব ঘোষ, *রবীন্দ্র সংগীত বিচিত্রা*, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৯৭২

শান্তনু বসু, *রবীন্দ্রনাথ জীবন ও কর্মকাণ্ড*, অভিযান পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৮

শ্রী অমলেন্দু বিকাশ কর চৌধুরী, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লি., কলকাতা, ১৯৮৪

শ্রী প্রফুল্লকুমার দাস, *রবীন্দ্রসংগীত - প্রসঙ্গ*, জিজ্ঞাসা পাব্‌লিকেশন্‌স্ (প্রা.) লি., ১৩৬৭

সন্‌জিদা খাতুন, *স্বাধীনতার অভিযাত্রা*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৫

সন্‌জীদা খাতুন (সম্পাদিত), *গীতবিতান তথ্য ও ভাবসন্ধান*, প্রথম খণ্ড, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৮

সন্‌জিদা খাতুন (পরিমার্জিত সংস্করণ), *সংস্কৃতির বৃক্ষছায়ায়*, নবযুগ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১৭

সানজীদা খাতুন, *রবীন্দ্রসংগীতের ভাবসম্পদ*, অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ১৯৯৯

স্বপ্না বন্দ্যোপাধ্যায়, *সমকালে বাংলা গান ও রবীন্দ্র সঙ্গীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ১৯৯২

সুধীর চন্দ, *বহুরূপী রবীন্দ্র সংগীত*, প্যাপিরাস, কলকাতা, ২০০৫

সিতাংশু রায়, *সংগীত চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ*, চয়নিকা, কলকাতা, বইমেলা ১৯৯৭

পণ্ডিত বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে, *হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি* (প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ খণ্ড), কলকাতা, ২০১৪

পবিত্র দাশগুপ্ত, *রাগের ক্রিয়াত্মক রূপায়ণ*, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৮

হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায়, *স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ*, দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, ২০১৭

পরিশিষ্ট

পঞ্চগীতিকবির স্বদেশচেতনার গানের তালিকা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশচেতনার গান

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্বদেশ পর্যায়ের গানের তালিকা: ৪৬টি গান

ক্রমিক	গান	তথ্য
১.	আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি। চিরদিন তোমার আকাশ, তোমার বাতাস, আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি॥ ও মা, ফাগুনে তোর আমের বনে ঘ্রাণে পাগল করে, মরি হায়, হায় রে ও মা, অঘ্রানে তোর ভরা ক্ষেতে আমি কী দেখেছি মধুর হাসি॥ কী শোভা, কী ছায়া গো, কী স্নেহ, কী মায়া গো কী আঁচল বিছায়েছ বটের মূলে, নদীর কূলে কূলে। মা, তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো মরি হায়, হায় রে মা, তোর বদনখানি মলিন হলে, ও মা, আমি নয়নজলে ভাসি॥ তোমার এই খেলাঘরে শিশুকাল কাটিল রে, তোমারি ধুলামাটি অঙ্গে মাখি ধন্য জীবন মানি। তুই দিন ফুরালে সন্ধ্যাকালে কী দীপ জ্বালিস ঘরে, মরি হায়, হায় রে তখন খেলাধুলা সকল ফেলে, ও মা, তোমার কোলে ছুটে আসি॥ ধেনু-চরা তোমার মাঠে, পারে যাবার খেয়াঘাটে, সারা দিন পাখি-ডাকা ছায়ায়-ঢাকা তোমার পল্লীবাটে তোমার ধানে-ভরা আঙিনাতে জীবনের দিন কাটে, মরি হায়, হায় রে ও মা, আমার যে ভাই তারা সবাই, ও মা, তোমার রাখাল তোমার চাষি॥ ও মা, তোর চরণেতে দিলেম এই মাথা পেতে দে গো তোর পায়ের ধূলা, সে যে আমার মাথার মানিক হবে। ও মা, গরিবের ধন যা আছে তাই দিব চরণতলে, মরি হায়, হায় রে আমি পরের ঘরে কিনব না আর, মা, তোর ভূষণ ব'লে গলার ফাঁসি॥	সুর: বাউল তাল: দাদরা স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী প্রকাশ সাল: ৭ আগস্ট ১৯০৫ মূল গান: আমি কোথায় পাবো তারে/ আমার মনের মানুষ যে রে।

২. ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা
তোমাতে বিশ্বময়ীর,তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা
ও আমার দেশের মাটি, তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা॥
তুমি মিশেছ মোর দেহের সনে
তুমি মিলেছ মোর প্রাণে মনে
তোমার ওই শ্যামলবরণ কোমল মূর্তি মর্মে গাঁথা ॥
ওগো মা, তোমার কোলে জনম আমার,
মরণ তোমার বুকে
তোমার 'পরে খেলা আমার দুঃখে সুখে
তুমি অন্ন মুখে তুলে দিলে
তুমি শীতল জলে জুড়াইলে
তুমি যে সকল-সহা, সকল-বহা, মাতার মাতা ॥
অনেক তোমার খেয়েছি গো, অনেক নিয়েছি মা
ও মা, অনেক তোমার খেয়েছি গো,
অনেক নিয়েছি মা
তবু জানিনে যে কী বা তোমায় দিয়েছি মা
আমার জনম গেল বৃথা কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
জনম গেল বৃথা কাজে
আমি কাটানু দিন ঘরের মাঝে
তুমি বৃথা আমায় শক্তি দিলে, শক্তিদাতা ॥

সুর: বাউল (রাগ পিলু)
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার : ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: আমার সোনার গৌর কেনে

৩. যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে
তবে একলা চলো রে।
একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো,
একলা চলো রে ॥
যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়--
তবে পরান খুলে
ও তুই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলোরে ॥
যদি সবাই ফিরে যায়, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়--
তবে পথের কাঁটা
ও তুই রক্তমাখা চরণতলে একলা দলো রে ॥
যদি আলো না ধরে, ওরে ওরে ও অভাগা,
যদি ঝড়-বাদলে আঁধার রাতে দুয়ার দেয় ঘরে--
তবে বজ্রানলে
আপন বুকের পাঁজর জ্বালিয়ে নিয়ে একলা জ্বলো রে॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: হরিনাম দিয়ে জগৎ মাতালে,
আমার একলা নিতাই।

৪. তোর আপন জনে ছাড়বে তোরে,
তা বলে ভাবনা করা চলবে না।
ও তোর আশালতা পড়বে ছিঁড়ে,
হয়তো রে ফল ফলবে না॥
আসবে পথে আঁধার নেমে তাই বলে কি রইবি থেমে
তুই বারে বারে জ্বালবি বাতি হয়তো বাতি জ্বলবে না॥
শুনে তোমার মুখের বাণী আসবে ঘিরে বনের প্রাণী
হয়তো তোমার আপন ঘরে পাষাণ হিয়া গলবে না।
বদ্ধ দুয়ার দেখলি বলে অমনি কি তুই আসবি চলে
তোরে বারেবারে ঠেলতে হবে হয়তো দুয়ার টলবেনা॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৫. এবার তোর মরা গাঙে বান এসেছে,
জয় মা বলে ভাসা তরী॥
ওরে রে ওরে মাঝি, কোথায় মাঝি, প্রাণপণে ভাই,
ডাক দে আজি
তোরা সবাই মিলে বৈঠা নে রে,
খুলে ফেল সব দড়াদড়ি॥
দিনে দিনে বাড়ল দেনা,
ও ভাই, করলি নে কেউ বেচা কেনা
হাতে নাই রে কড়া কড়ি।
ঘাটে বাঁধা দিন গেল রে, মুখ দেখাবি কেমন করে
ওরে, দে খুলে দে পাল তুলে দে
যা হয় হবে বাঁচিমরি॥

সুর: সারি
তাল: কাহারবা
স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: মন মাঝি সামাল সামাল, ডুবলো তরী, ভব নদীর তুফান ভারি

৬. নিশিদিন ভরসা রাখিস, ওরে মন, হবেই হবে।
যদি পণ করে থাকিস সে পণ তোমার রবেই রবে।
ওরে মন, হবেই হবে ॥
পাষাণসমান আছে পড়ে, প্রাণ পেয়ে সে উঠবে ওরে,
আছে যারা বোবার মতন তারাও কথা কবেই কবে ॥
সময় হল, সময় হল যে যার আপন বোঝা তোলো রে
দুঃখ যদি মাথায় ধরিস সে দুঃখ তোর সবেই সবে।
ঘণ্টা যখন উঠবে বেজে দেখবি সবাই আসবে সেজে
এক সাথে সব যাত্রী যত একই রাস্তা লবেই লবে ॥

সুর: বাউল (রাগ বিভাস)
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৭. আমি ভয় করব না ভয় করব না।
দু বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না॥
তরীখানা বাইতে গেলে মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে ধরব না,
কান্নাকাটি ধরব না॥
শক্ত যা তাই সাধতে হবে, মাথা তুলে রইব ভবে
সহজ পথে চলব ভেবে পড়ব না,
পাঁকের পরে পড়ব না॥
ধর্ম আমার মাথায় রেখে চলব সিধে রাস্তা দেখে
বিপদ যদি এসে পড়ে সরব না,
ঘরের কোণে সরব না॥

সুর: বাউল (রাগ বিভাস)
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৮. আপনি অবশ হলি, তবে বল দিবি তুই কারে?
উঠে দাঁড়া, উঠে দাঁড়া, ভেঙে পড়িস না রে॥
করিস নে লাজ, করিস নে ভয়,
আপনাকে তুই করে নে জয়
সবাই তখন সাড়া দেবে ডাক দিবি তুই যারে॥
বাহির যদি হলি পথে ফিরিস নে আর কোনোমতে,
থেকে থেকে পিছন-পানে চাস নে বারে বারে।
নেই যে রে ভয় ত্রিভুবনে, ভয় শুধু তোর নিজের মনে
অভয়চরণ শরণ করে বাহির হয়ে যা রে॥

সুর: মিশ্র রামকেলি
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৯. আমরা মিলেছি আজ মায়ের ডাকে।
ঘরের হয়ে পরের মতন ভাইছেড়ে ভাই কদিন থাকে?
প্রাণের মাঝে থেকে থেকে আয় বলে ঐ ডেকেছে কে,
সেই গভীরস্বরে উদাস করে আরকে কারে ধরে রাখে?
যেথায় থাকি যে যেখানে বাঁধন আছে প্রাণে প্রাণে,
সেই প্রাণের টানে টেনে আনে
সেই প্রাণের বেদন জানে না কে?
মান অপমান গেছে ঘুচে, নয়নের জল গেছে মুছে
সেই নবীন আশে হৃদয় ভাসে
ভাইয়ের পাশে ভাইকে দেখে॥
কত দিনের সাধন ফলে মিলেছি আজ দলে দলে
আজ ঘরের ছেলে সবাই মিলে দেখা দিয়ে আয়রে মাকে॥

সুর: রামপ্রসাদী
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: কাঙালীচরণ সেন
প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর ১৮৮৬
মূল গান: নেই

১০. আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
আমরা যা খুশি তাই করি, তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।
রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান,
মোদের খাটো ক'রে রাখে নি কেউ কোনো অসত্যে--
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?
আমরা চলব আপন মতে, শেষে মিলব তাঁরি পথে,
মোরা মরব না কেউ বিফলতার বিষম আবর্তে
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে?।

সুর: ইমন-ভূপালী (মিশ্র সুর)
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: অনাদি কুমার দস্তিদার
প্রকাশ সাল: অরূপ রতন নাটকের গান (১৩২৬ বাংলা)
মূল গান: নেই

১১. সঙ্কোচের বিহ্বলতা নিজেরে অপমান,
সঙ্কটের কল্পনাতে হোয়ো না ম্রিয়মাণ।
মুক্ত করো ভয়, আপনা মাঝে শক্তি ধরো,
নিজেরে করো জয়।
দুর্বলেরে রক্ষা করো, দুর্জনেরে হানো,
নিজেরে দীন নিঃসহায় যেন কভু না জানো।
মুক্ত করো ভয়,
নিজের পরে করিতে ভর না রেখো সংশয়।
ধর্ম যবে শঙ্খরবে করিবে আহ্বান
নীরব হয়ে, নম্র হয়ে, পণ করিয়ো প্রাণ।
মুক্ত করো ভয়,
দুরূহ কাজে নিজেরই দিয়ো কঠিন পরিচয়॥

সুর: ইমন কাল্যাণ
তাল : দাদারা
স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর-জানুয়ারি ১৯২৯-১৯৩০
মূল গান: নেই

১২. নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, খুলে যাবে এই দ্বার
জানি জানি তোর বন্ধনডোর ছিঁড়ে যাবে বারে বার॥
খনেখনে তুই হারায়ে আপনা সুপ্তিনিশীথ করিসযাপনা
বারে বারে তোরে ফিরে পেতে হবে বিশ্বের অধিকার॥
স্থলে জলে তোর আছে আহ্বান, আহ্বান লোকালয়ে
চিরদিন তুই গাহিবি যে গান সুখে দুখে লাজে ভয়ে।
ফুলপল্লব নদীনির্ঝর সুরে সুরে তোর মিলাইবে স্বর
ছন্দে যে তোর স্পন্দিত হবে আলোক অন্ধকার॥

সুর: ভৈরবী
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ সাল: ১৮ সেপ্টেম্বর ১৯২৬
মূল গান: নেই

১৩. আমাদের যাত্রা হল শুরু এখন, ওগো কর্ণধার।
তোমারে করি নমস্কার।
এখন বাতাস ছুটুক, তুফান উঠুক, ফিরব না গো আর
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা দিয়ে তোমার জয়ধ্বনি বিপদ বাধা নাহি গণি
ওগো কর্ণধার।
এখন মাভৈঃ বলি ভাসাই তরী, দাও গো করি পার
তোমারে করি নমস্কার॥
এখন রইল যারা আপন ঘরে চাব না পথ তাদের তরে
ওগো কর্ণধার।
যখন তোমার সময় এল কাছে তখন কে বা কার
তোমারে করি নমস্কার।
মোদের কেবা আপন, কে বা অপর,
কোথায় বাহির, কোথা বা ঘর ওগো কর্ণধার।
চেয়ে তোমার মুখে মনের সুখে নেব সকল ভার
তোমারে করি নমস্কার॥
আমরা নিয়েছি দাঁড়, তুলেছি পাল,
তুমি এখন ধরো গো হাল ওগো কর্ণধার।
মোদের মরণ বাঁচন ঢেউয়ের নাচন, ভাবনা কীবা তার
তোমারে করি নমস্কার।
আমরা সহায় খুঁজে পরেরদ্বারে ফিরবনা আর বারেবার
ওগো কর্ণধার।
কেবল তুমিই আছ আমরা আছি এই জেনেছি সার
তোমারে করি নমস্কার॥

সুরঃ ভৈরবী
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান:নেই

১৪. জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মরাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছলজলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥
অহরহ তব আহ্বান প্রচারিত, শুনি তব উদার বাণী
হিন্দু বৌদ্ধ শিখ জৈন পারসিক মুসলমান খৃস্টানী
পূরব পশ্চিম আসে তব সিংহাসন-পাশে
প্রেমহার হয় গাঁথা।
জনগণ-ঐক্য-বিধায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥
পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা, যুগ যুগ ধাবিত যাত্রী।
হে চিরসারথি, তব রথচক্রে মুখরিত পথ দিনরাত্রি।
দারুণ বিপ্লব-মাঝে তব শঙ্খধ্বনি বাজে
সঙ্কটদুঃখত্রাতা।
জনগণপথপরিচায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

সুরঃ ইমন
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ সাল: ২৮ ডিসেম্বর ১৯১১
মূল গান: নেই

ঘোরতিমিরঘন নিবিড় নিশীথে পীড়িত মূর্ছিত দেশে
জাগ্রত ছিল তব অবিচল মঙ্গল নতনয়নে অনিমেষে।
দুঃস্বপ্নে আতঙ্কে রক্ষা করিলে অঙ্কে
স্নেহময়ী তুমি মাতা।
জনগণদুঃখত্রায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥
রাত্রি প্রভাতিল, উদিল রবিচ্ছবি পূর্ব-উদয়গিরিভালে
গাহে বিহঙ্গম, পূণ্য সমীরণ নবজীবনরস ঢালে।
তব করুণারুণরাগে নিদ্রিত ভারত জাগে
তব চরণে নত মাথা।
জয় জয় জয় হে জয় রাজেশ্বর ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয় জয় হে॥

১৫. হে মোর চিত্ত, পুণ্য তীর্থে জাগো রে ধীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে।
হেথায় দাঁড়ায়ে দু বাহু বাড়ায়ে নমি নরদেবতারে
উদার ছন্দে, পরমানন্দে বন্দন করি তাঁরে।
ধ্যানগম্ভীর এই-যে ভূধর, নদী-জপমালা-ধৃত প্রান্তর,
হেথায় নিত্য হেরো পবিত্র ধরিত্রীরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এল কোথা হতে, সমুদ্রে হল হারা।
হেথায় আর্য, হেথা অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন
শক-হুন-দল পাঠান-মোগল এক দেহে হল লীন।
পশ্চিমে আজি খুলিয়াছে দ্বার,
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥
এসো হে আর্য, এসো অনার্য, হিন্দু-মুসলমান।
এসো এসো আজ তুমি ইংরাজ, এসো এসো খৃস্টান।
এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার।
এসো হে পতিত, হোক অপনীত সব অপমানভার।
মার অভিষেকে এসো এসো ত্বরা
মঙ্গলঘট হয়নি যে ভরা
সবার-পরশে-পবিত্র-করা তীর্থনীরে
আজি ভারতের মহামানবের সাগরতীরে॥

সুর: শঙ্করা
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ভীমরাও শাস্ত্রী
প্রকাশ সাল: ২রা জুলাই ১৯১০
মূল গান: নেই

১৬. দেশ দেশ নন্দিত করি মন্দ্রিত তব ভেরী
আসিল যত বীরবৃন্দ আসন তব ঘেরি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
সে কি রহিল লুপ্ত আজি সব-জন পশ্চাতে?
লউক বিশ্বকর্মভার মিলি সবার সাথে।
প্রেরণ কর ভৈরব তব দুর্জয় আহ্বান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

সুর: মিশ্র কেদারা
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ সাল: আগস্ট-সেপ্টেম্বর ১৯১৭
মূল গান: নেই

বিঘ্নবিপদ দুঃখদহন তুচ্ছ করিল যারা
মৃত্যুগহন পার হইল, টুটিল মোহকারা।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
নিশ্চল নিবীর্যবাহু কর্মকীর্তিহীনে
ব্যর্থশক্তি নিরানন্দ জীবনধনদীনে
প্রাণ দাও, প্রাণ দাও, দাও দাও প্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
নূতনযুগসূর্য উঠিল, ছুটিল তিমিররাত্রি,
তব মন্দির-অঙ্গন ভরি মিলিল সকল যাত্রী।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
গতগৌরব, হৃত-আসন, নতমস্তক লাজে
গ্লানি তার মোচন করনরসমাজমাঝে।
স্থান দাও, স্থান দাও, দাও দাও স্থান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
জনগণপথ তব জয়রথচক্রমুখর আজি,
স্পন্দিত করি দিগ্‌দিগন্ত উঠিল শঙ্খ বাজি।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
দৈন্যজীর্ণ কক্ষ তার, মলিন শীর্ণ আশা,
ত্রাসারুদ্ধ চিত্ত তার, নাহি নাহি ভাষা।
কোটিমৌনকণ্ঠপূর্ণ বাণী কর দান হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥
যারা তব শক্তি লভিল নিজ অন্তরমাঝে
বর্জিল ভয়, অর্জিল জয়, সার্থক হল কাজে।
দিন আগত ওই, ভারত তবু কই?
আত্ম-অবিশ্বাস তার নাশ কঠিন ঘাতে,
পুঞ্জিত অবসাদভার হান অশনিপাতে।
ছায়াভয়চকিতমূঢ় করহ পরিত্রাণ হে,
জাগ্রত ভগবান হে॥

১৭. মাতৃমন্দির-পুণ্য-অঙ্গণ কর মহোজ্জ্বল আজ হে
বর -পুত্রসঙ্ঘ বিরাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
ঘন তিমিররাত্রির চির প্রতীক্ষা
পূর্ণ কর, লহ জ্যোতিদীক্ষা,
যাত্রীদল সব সাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
বল জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে।
এস বজ্রমহাসনে মাতৃ-আশীর্ভাষণে,
সকল সাধক এস হে, ধন্য কর এ দেশ হে।
সকল যোগী, সকল ত্যাগী, এস দুঃসহদুঃখভাগী
এস দুর্জয়শক্তিসম্পদ মুক্তবন্ধ সমাজ হে।
এস জ্ঞানী, এস কর্মী নাশ ভারতলাজ হে।

সুর: ইমন কল্যাণ
তাল : তেওড়া
স্বরলিপিকার: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
প্রকাশ সাল: ৩০ নভেম্বর ১৯১৭
মূল গান: নেই

এস মঙ্গল, এস গৌরব,
এস অক্ষয়পুণ্যসৌরভ,
এস তেজঃসূর্য উজ্জ্বল কীর্তি-অম্বর মাঝ হে
বীরধর্মে পুণ্যকর্মে বিশ্বহৃদয় রাজ হে।
শুভ শঙ্খ বাজহ বাজ হে।
জয় জয় নরোত্তম, পুরুষসত্তম,
জয় তপস্বিরাজ হে।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় হে॥

১৮. আগে চল্, আগে চল ভাই!
পড়ে থাকা পিছে, মরে থাকা মিছে,
বেঁচে মরে কিবা ফল ভাই আগে চল্, আগে চল ভাই॥
প্রতি নিমেষেই যেতেছে সময়,
দিন ক্ষণ চেয়ে থাকা কিছু নয়
সময় সময় করে পাঁজি পুঁথি ধরে
সময় কোথা পাবি বল ভাই!
আগে চল্, আগে চল ভাই॥
পিছায়ে যে আছে তারে ডেকে নাও
নিয়ে যাও সাথে করে
কেহ নাহি আসে, একা চলে যাও মহত্ত্বের পথ ধরে।
পিছু হতে ডাকে মায়ার কাঁদন,
ছিঁড়ে চলে যাও মোহের বাঁধন
সাধিতে হইবে প্রাণের সাধন, মিছে নয়নের জল ভাই!
আগে চল্, আগে চল ভাই॥
চিরদিন আছি ভিখারির বেশে জগতের পথপাশে
যারা চলে যায় কৃপাচোখে চায়, পদধুলা উড়ে আসে।
ধুলিশয্যা ছেড়ে ওঠো ওঠো সবে
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে
তা যদি না পারো চেয়ে দেখো তবে
ঐ আছে রসাতল ভাই!
আগে চল্, আগে চল ভাই॥

সুরঃ বেহাগ
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: এপ্রিল-মে ১৮৮৭
মূল গান: নেই

১৯. আনন্দধ্বনি জাগাও গগনে।
কে আছ জাগিয়া পুরবে চাহিয়া,
বলো উঠ উঠ সঘনে গভীরনিদ্রাগমনে॥
হেরো তিমিররজনী যায় ঐ,
হাসে উষা নব জ্যোতির্ময়ী
নব আনন্দে, নব জীবনে,
ফুল- কুসুমে, মধুর পবনে, বিহগকলকূজনে॥
হেরো আশার আলোকে জাগে
শুকতারা উদয়-অচল-পথে,
কিরণকিরীটে তরুণ তপন উঠিছে অরুণরথে
চলো যাই কাজে মানবসমাজে,
চলো বাহিরিয়া জগতের মাঝে

সুরঃ হাম্বির
তাল : তেওড়া,দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৮৯৩
মূল গান: নেই

থেকো না অলস শয়নে, থেকো না মগন স্বপনে॥
যায় লাজ ত্রাস, আলস বিলাস কুহক মোহ যায়।
ঐ দূর হয় শোক সংশয় দুঃখ স্বপনপ্রায়।
ফেলো জীর্ণ চীর, পরো নব সাজ,
আরম্ভ করো জীবনের কাজ
সরল সবল আনন্দমনে, অমল অটল জীবনে॥

২০. বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল
পুণ্য হউক, পুণ্য হউক, পুণ্য হউক হে ভগবান॥
বাংলার ঘর, বাংলার হাট, বাংলার বন, বাংলার মাঠ
পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান॥
বাঙালির পণ, বাঙালির আশা,
বাঙালির কাজ, বাঙালির ভাষা
সত্য হউক, সত্য হউক, সত্য হউক হে ভগবান॥
বাঙালির প্রাণ, বাঙালির মন,
বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন
এক হউক, এক হউক, এক হউক হে ভগবান॥

সুর: কীর্তন
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: নেই

২১. আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি
তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ,
দুই নয়নে স্নেহের হাসি, ললাটনেত্র আগুনবরণ।
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
তোমার মুক্তকেশের পুঞ্জ মেঘে লুকায় অশনি,
তোমার আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
যখন অনাদরে চাই নি মুখে ভেবেছিলেম দুঃখিনী মা
আছে ভাঙা ঘরে একলা পড়ে,
দুখের বুঝি নাইকো সীমা।
কোথা সে তোর দরিদ্র বেশ,
কোথা সে তোর মলিন হাসি
আকাশে আজ ছড়িয়ে গেল ঐ চরণের দীপ্তিরাশি!
ওগো মা, তোমার কী মুরতি আজি দেখি রে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥
আজি দুখের রাতে সুখের স্রোতে ভাসাও ধরণী
তোমার অভয় বাজে হৃদয়মাঝে হৃদয়হরণী!
ওগো মা, তোমায় দেখে দেখে আঁখি না ফিরে!
তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে॥

সুর: বাউল (বিভাস)
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

২২. আমায় বোলো না গাহিতে বোলো না।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এ যে নয়নের জল, হতাশের শ্বাস,
কলঙ্কের কথা, দরিদ্রের আশ,
এ যে বুক-ফাটা দুখে গুমরিছে
বুকে গভীর মরমবেদনা।
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছেকথা ছলনা?।
এসেছি কি হেথা যশের কাঙালি
কথা গেঁথে গেঁথে নিতে করতালি
মিছে কথা কয়ে, মিছে যশ লয়ে,
মিছে কাজে নিশিযাপনা!
কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ,
কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ
কাতরে কাঁদিবে, মায়ের পায়ে
দিবে সকল প্রাণের কামনা?
এ কি শুধু হাসি খেলা, প্রমোদের মেলা,
শুধু মিছেকথা ছলনা?।

সুরঃ কাফি
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ১৭ নভেম্বর ১৮৮৬
মূল গান: নেই

২৩. অয়ি ভুবনমনোমোহিনী, মা,
অয়ি নির্মলসূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী জনকজননিজননী॥
নীলসিন্ধুজলধৌতচরণতল,
অনিলবিকম্পিত-শ্যামল-অঞ্চল,
অম্বরচুম্বিতভালহিমাচল, শুভ্রতুষারকিরীটিনী॥
প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
প্রথম সামরব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে জ্ঞানধর্ম কত
কাব্যকাহিনী।
চিরকল্যাণময়ী তুমি ধন্য, দেশবিদেশে বিতরিছ অন্ন
জাহ্নবীযমুনা বিগলিত করুণা পুণ্যপীযূষস্তন্যবাহিনী॥

সুরঃ ভৈরবী
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: সরলাদেবী
প্রকাশ সাল: ডিসেম্বর ১৮৯৬
মূল গান: নেই

২৪. সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে।
সার্থক জনম, মা গো, তোমায় ভালোবেসে॥
জানি নে তোর ধনরতন আছে কি না রানীর মতন,
শুধু জানি আমার অঙ্গ জুড়ায় তোমার ছায়ায় এসে॥
কোন বনেতে জানি নে ফুল গন্ধে এমন করে আকুল,
কোন গগনে ওঠে রে চাঁদ এমন হাসি হেসে।
আঁখি মেলে তোমার আলো
প্রথম আমার চোখ জুড়ালো
ওই আলোতেই নয়ন রেখে মুদব নয়ন শেষে॥

সুরঃ ভৈরবী (টপ্পা অঙ্গের গান)
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান:নেই

২৫. যে তোমায় ছাড়ে ছাড়ুক,
আমি তোমায় ছাড়ব না মা!
আমি তোমার চরণ
মা গো, আমি তোমার চরণ করব শরণ,
আর কারো ধার ধারব না মা॥
কে বলে তোর দরিদ্র ঘর,
হৃদয়ে তোর রতনরাশি
আমি জানি গো তার মূল্য জানি,
পরের আদর কাড়ব না মা॥
মানের আশে দেশবিদেশে
যে মরে সে মরুক ঘুরে
তোমার ছেঁড়া কাঁথা আছে পাতা,
ভুলতে সে যে পারব না মা!।
ধনে মানে লোকের টানে
ভুলিয়ে নিতে চায় যে আমায়
ও মা, ভয় যে জাগে শিয়র-বাগে,
কারো কাছেই হারব না মা॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: চিরদিন এমনি ভাবে (ও মন)
অসার মায়ায় ভুলে রবে।

২৬. যে তোরে পাগল বলে
তারে তুই বলিস নে কিছু ॥
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
আজকে তোরে কেমন ভেবে
অঙ্গে যে তোর ধুলো দেবে
কাল সে প্রাতে মালা হাতে
আসবে রে তোর পিছু-পিছু॥
আজকে আপন মানের ভরে
থাক সে বসে গদির পরে
কালকে প্রেমে আসবে নেমে,
করবে সে তার মাথা নিচু॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: আমার এই দেহ তরী।

২৭. ওরে, তোরা নেই বা কথা বললি,
দাঁড়িয়ে হাটের মধ্যিখানে নেই জাগালি পল্লী॥
মরিস মিথ্যে বকে ঝকে, দেখে কেবল হাসে লোকে,
নাহয় নিয়ে আপন মনের আগুন মনে মনেই জ্বললি॥
অন্তরে তোর আছে কী যে নেই রটালি নিজে নিজে,
নাহয় বাদ্যগুলো বন্ধ রেখে চুপেচাপেই চললি॥
কাজ থাকে তো করগে না কাজ, লাজ থাকে তো
ঘুচা গে লাজ,
ওরে, কে যে তোরে কী বলেছে নেই বা তাতে টললি॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

২৮. যদি তোর ভাবনা থাকে ফিরে যা-না। তবে তুই ফিরে যা-না।
যদি তোর ভয় থাকে তো করি মানা॥
যদি তোর ঘুম জড়িয়ে থাকে গায়ে ভুলবি যে পথ পায়ে পায়ে,
যদি তোর হাত কাঁপে তো নিবিয়ে আলো সবারে করবি কানা॥
যদি তোর ছাড়তে কিছু না চাহে মন করিস ভারী বোঝা আপন
তবে তুই সইতে কভু পারবি নে রে এ বিষম পথের টানা॥
যদি তোর আপনা হতে অকারণে সুখ সদা না জাগে মনে
তবে তুই তর্ক করে সকল কথা করিবি নানাখানা॥

সুরঃ বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

২৯. মা কি তুই পরের দ্বারে পাঠাবি তোর ঘরের ছেলে?
তারা যে করে হেলা, মারে ঢেলা, ভিক্ষাঝুলি দেখতে পেলে॥
করেছি মাথা নিচু, চলেছি যাহার পিছু
যদি বা দেয় সে কিছু অবহেলে
তবু কি এমনি করে ফিরব ওরে আপন মায়ের প্রসাদ ফেলে?।
কিছু মোর নেই ক্ষমতা সে যে ঘোর মিথ্যে কথা,
এখনো হয় নি মরণ শক্তিশেলে
আমাদের আপন শক্তি আপন ভক্তি চরণে তোর দেব মেলে॥
নেব গো মেগে-পেতে যা আছে তোর ঘরেতে,
দে গো তোর আঁচল পেতে চিরকেলে
আমাদের সেইখেনে মান, সেইখেনে প্রাণ,
সেইখেনে দিই হৃদয় ঢেলে॥

সুরঃ বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূলগান- নেই

৩০. ছি ছি, চোখের জলে ভেজাস নে আর মাটি।
এবার কঠিন হয়ে থাক্-না ওরে, বক্ষোদুয়ার আঁটি জোরে বক্ষোদুয়ার আঁটি॥
পরানটাকে গলিয়ে ফেলে দিস নে, রে ভাই, পথে ঢেলে মিথ্যে অকাজে
ওরে নিয়ে তারে চলবি পারে কতই বাধা কাটি,
পথের কতই বাধা কাটি॥
দেখলে ও তোর জলের ধারা ঘরে পরে হাসবে যারা তারা চার দিকে
তাদের দ্বারেই গিয়ে কান্না জুড়িস, যায় না কি বুক ফাটি,
লাজে যায় না কি বুক ফাটি?।
দিনের বেলা জগত-মাঝে সবাই যখন চলছে কাজে আপন গরবে
তোরা পথের ধারে ব্যথা নিয়ে করিস ঘাঁটাঘাঁটি
কেবল করিস ঘাঁটাঘাঁটি॥

সুরঃ বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ২২ সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৩১. ঘরে মুখ মলিন দেখে গলিস নে ওরে ভাই,
বাইরে মুখ আঁধার দেখে টলিস নে ওরে ভাই॥
যা তোমার আছে মনে সাধো তাই পরানপণে,
শুধু তাই দশজনারে বলিস নে ওরে ভাই॥
একই পথ আছে ওরে, চলো সেই রাস্তা ধরে,
যে আসে তারই পিছে চলিস নে ওরে ভাই!
থাক্‌-না আপন কাজে, যা খুশি বলুক-না যে,
তা নিয়ে গায়ের জ্বালায় জ্বলিস নে ওরে ভাই॥

সুর: বাউল (স্বরলিপি নাই)
তাল :
স্বরলিপিকার:
প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৩২. এখন আর দেরি নয়, ধর্‌ গো তোরা হাতে হাতে ধর্‌গো।
আজ আপন পথে ফিরতে হবে সামনে মিলন-স্বর্গ॥
ওরে ঐ উঠেছে শঙ্খ বেজে, খুলল দুয়ার মন্দিরে যে
লগ্ন বয়ে যায় পাছে, ভাই, কোথায় পূজার অর্ঘ্য?।
এখন যার যা-কিছু আছে ঘরে সাজা পূজার থালারপরে,
আত্মদানের উতসধারায় মঙ্গলঘট ভর্‌গো।
আজ নিতেও হবে, আজ দিতেও হবে, দেরি কেন
করিস তবে
বাঁচতে যদি হয় বেঁচে নে, মর্‌তে হয় তো মর্‌গো॥

সুর: ইমন
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার
প্রকাশ সাল: অক্টোবর-নভেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৩৩. বুক বেঁধে তুই দাঁড়া দেখি, বারে বারে হেলিস নে ভাই!
শুধু তুই ভেবে ভেবেই হাতের লক্ষ্মী ঠেলিস নে ভাই॥
একটা কিছু করে নে ঠিক, ভেসে ফেরা মরার অধিক
বারেক এ দিক বারেক ও দিক, এ খেলা আর
খেলিস নে ভাই॥
মেলে কিনা মেলে রতন করতে তবু হবে যতন
না যদি হয় মনের মতন চোখের জলটা ফেলিস নে ভাই!
ভাসাতে হয় ভাসা ভেলা, করিস নে আর হেলাফেলা
পেরিয়ে যখন যাবে বেলা তখন আঁখি মেলিস নে ভাই॥

সুর: বেহাগ
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: সেপ্টেম্বর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৩৪. আমরা পথে পথে যাব সারে সারে,
তোমার নাম গেয়ে ফিরিব দ্বারে দ্বারে॥
বলব জননীকে কে দিবি দান,

কে দিবি ধন তোরা কে দিবি প্রাণ

তোদের মা ডেকেছে কব বারে বারে॥
তোমার নামে প্রাণের সকল সুর

আপনি উঠবে বেজে সুধামধুর

মোদের হৃদয়যন্ত্রেরই তারে তারে।
বেলা গেলে শেষে তোমারই পায়ে

এনে দেব সবার পূজা কুড়ায়ে

তোমার সন্তানেরই দান ভারে ভারে॥

সুর: ভৈরবী/কালাংড়া
তাল : একতাল
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৩৫. এ ভারতে রাখো নিত্য, প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ
তোমার অভয়, তোমার অজিত অমৃত বাণী,
তোমার স্থির অমর আশা॥
অনির্বাণ ধর্ম আলো সবার ঊর্ধ্বে জ্বালো জ্বালো,
সঙ্কটে দুর্দিনে হে,
রাখো তারে অরণ্যে তোমারই পথে॥
বক্ষে বাঁধি দাও তার বর্ম তব নির্বিদার,
নিঃশঙ্কে যেন সঞ্চরে নির্ভীক।
পাপের নিরখি জয় নিষ্ঠা তবুও রয়
থাকে তব চরণে অটল বিশ্বাসে॥

সুর: সুরট দেশ
তাল : চৌতাল
স্বরলিপিকার: কাঙ্গালী চরণ সেন
প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০৩
মূল গান: য়ে বতিঁয়া মেরে চিত।

৩৬. রইল বলে রাখলে কারে, হুকুম তোমার ফলবে কবে?
তোমার টানাটানি টিঁকবে না ভাই, রবার যেটা
সেটাই রবে॥
যা খুশি তাই করতে পারো গায়ের জোরে রাখ মারো;
যাঁর গায়ে সব ব্যথা বাজে তিনি যা সন সেটাই সবে।
অনেক তোমার টাকাকড়ি, অনেক দড়া অনেক দড়ি,
অনেক অশ্ব অনেক করী অনেক তোমার আছে ভবে।
ভাবছ হবে তুমিই যা চাও, জগতটাকে তুমিই নাচাও,
দেখবে হঠাৎ নয়ন খুলে হয় না যেটা সেটাও হবে।

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রকাশ সাল: ২৬ মার্চ ১৯০৯
মূল গান: নেই

৩৭. জননীর দ্বারে আজি ঐ শুন গো শঙ্খ বাজে।
থেকো না থেকো না, ওরে ভাই, মগন মিথ্যা কাজে॥
অর্ঘ্য ভরিয়া আনি ধরো গো পূজার থালি,
রতনপ্রদীপখানি যতনে আনো গো জ্বালি,
ভরি লয়ে দুই পাণি বহি আনো ফুলডালি,
মার আহ্বানবাণী রটাও ভুবনমাঝে॥
আজি প্রসন্ন পবনে নবীন জীবন ছুটিছে।
আজি প্রফুল্ল- কুসুমে নব সুগন্ধ উঠিছে।
আজি উজ্জ্বল ভালে তোলো উন্নত মাথা,
নবসঙ্গীততালে গাও গম্ভীর গাথা,
পরো মাল্য কপালে নবপল্লব-গাঁথা,
শুভ সুন্দর কালে সাজো সাজো নব সাজে॥

সুর: হামবির
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ১৯০৩-১৯০৪
মূল গান: নেই

৩৮. আজি এ ভারত লজ্জিত হে, হীনতাপঙ্কে মজ্জিত হে॥
নাহি পৌরুষ, নাহি বিচারণা, কঠিন তপস্যা, সত্যসাধনা
অন্তরে বাহিরে ধর্মে কর্মে সকলই ব্রহ্মবিবর্জিত হে॥
ধিক্কৃত লাঞ্ছিত পৃথ্বীপরে, ধূলিবিলুণ্ঠিত সুপ্তিভরে
রুদ্র, তোমার নিদারুণ বজ্রে করো তারে সহসা
তর্জিত হে॥
পর্বতে প্রান্তরে নগরে গ্রামে জাগ্রত ভারত ব্রহ্মের নামে,
পুণ্যে বীর্যে অভয়ে অমৃতে হইবে পলকে সজ্জিত হে॥

সুর: ভূপালী
তাল : ত্রিতাল
স্বরলিপিকার:
প্রকাশ সাল: ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯০০
মূল গান: নেই

৩৯. চলো যাই, চলো, যাই চলো, যাই
চলো পদে পদে সত্যের ছন্দে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে!
চলো মুক্তিপথে, চলো বিঘ্নবিপদজয়ী মনোরথে
করো ছিন্ন, করো ছিন্ন, করো ছিন্ন
স্বপ্নকুহক করো ছিন্ন।
থেকো না জড়িত অবরুদ্ধ জড়তার জর্জর বন্ধে।
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
মুক্তির জয় বলো ভাই॥
চলো দুর্গমদূরপথযাত্রী চলো দিবারাত্রি,
করো জয়যাত্রা, চলো বহি নির্ভয় বীর্যের বার্তা,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
সত্যের জয় বলো ভাই॥
দুর করো সংশয়শঙ্কার ভার,
যাও চলি তিমিরদিগন্তের পার।
কেন যায় দিন হায় দুশ্চিন্তার দ্বন্দ্বে
চলো দুর্জয় প্রাণের আনন্দে।
চলো জ্যোতির্লোকে জাগ্রত চোখে
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
বলো নির্মল জ্যোতির জয় বলো ভাই॥
হও মৃত্যুতোরণ উত্তীর্ণ,
যাক, যাক ভেঙে যাক যাহা জীর্ণ।
চলো অভয় অমৃতময় লোকে, অজর অশোকে,
বলো জয় বলো, জয় বলো, জয়
অমৃতের জয় বলো ভাই॥

সুর: খাম্বাজ
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: শৈলজারঞ্জন মজুমদার
প্রকাশ সাল: ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭
মূল গান: নেই

৪০. শুভ কর্মপথে ধর নির্ভয় গান।
সব দুর্বল সংশয় হোক অবসান।
চির- শক্তির নির্ঝর নিত্য ঝরে
লহ সে অভিষেক ললাট পরে।
তব জাগ্রত নির্মল নূতন প্রাণ
ত্যাগব্রতে নিক দীক্ষা, বিঘ্ন হতে নিক শিক্ষা
নিষ্ঠুর সঙ্কট দিক সম্মান।
দুঃখই হোক তব বিত্ত মহান।
চল যাত্রী, চল দিনরাত্রি
কর অমৃতলোকপথ অনুসন্ধান।
জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ, ক্লান্তিজাল কর দীর্ণ বিদীর্ণ
দিন-অন্তে অপরাজিত চিত্তে
মৃত্যুতরণ তীর্থে কর স্নান ॥

সুর: মিশ্রমল্লার
তাল : কাহারবা
স্বরলিপিকার: শান্তিদেব ঘোষ
প্রকাশ সাল: ২৪ জানুয়ারি ১৯৩৭
মূল গান: নেই

৪১. ওরে, নূতন যুগের ভোরে
দিস নে সময় কাটিয়ে বৃথা সময় বিচার করে॥
কী রবে আর কী রবে না, কী হবে আর কী হবে না
ওরে হিসাবি,
এ সংশয়ের মাঝে কি তোর ভাবনা মিশাবি? ।
যেমন করে ঝর্না নামে দুর্গম পর্বতে
নির্ভাবনায় ঝাঁপ দিয়ে পড় অজানিতের পথে।
জাগবে ততই শক্তি যতই হানবে তোরে মানা,
অজানাকে বশ করে তুই করবি আপন জানা।
চলায় চলায় বাজবে জয়ের ভেরী
পায়ের বেগেই পথ কেটে যায়, করিস নে আর দেরি॥

সুর: ভৈরবী
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: শৈলাজারঞ্জন মজুমদার
প্রকাশ সাল: ২৪ এপ্রিল ১৯৩৭
মূল গান: নেই

৪২. ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।
একলা রাতের অন্ধকারে আমি চাই পথের আলো॥
দুন্দুভিতে হল রে কার আঘাত শুরু,
বুকের মধ্যে উঠল বেজে গুরু গুরু
পালায় ছুটে সুপ্তিরাতের স্বপ্নে-দেখা মন্দ ভালো॥
নিরুদ্দেশের পথিক আমায় ডাক দিলে কি
দেখতে তোমায় না যদি পাই নাই-বা দেখি।
ভিতর থেকে ঘুচিয়ে দিলে চাওয়া পাওয়া,
ভাব্‌নাতে মোর লাগিয়ে দিলে ঝড়ের হাওয়া
বজ্রশিখায় এক পলকে মিলিয়ে দিলে সাদা কালো॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: অনাদিকুমার দস্তিদার
প্রকাশ সাল: অক্টোবর-নভেম্বর ১৯৩৩
মূল গান:নেই

৪৩. ওদের বাঁধন যতই শক্ত হবে ততই বাঁধন টুটবে,
মোদের ততই বাঁধন টুটবে।
ওদের যতই আঁখি রক্ত হবে মোদের আঁখি ফুটবে,
ততই মোদের আঁখি ফুটবে॥
আজকে যে তোর কাজ করা চাই, স্বপ্ন দেখার সময়
তো নাই
এখন ওরা যতই গর্জাবে, ভাই তন্দ্রা ততই ছুটবে,
মোদের তন্দ্রা ততই ছুটবে॥
ওরা ভাঙতে যতই চাবে জোরে গড়বে ততই দ্বিগুণ করে,
ওরা যতই রাগে মারবে রে ঘা ততই যে ঢেউ উঠবে।
তোরা ভরসা না ছাড়িস কভু, জেগে আছেন জগৎ-প্রভু
ওরা ধর্ম যতই দলবে ততই ধুলায় ধ্বজা লুটবে,
ওদের ধুলায় ধ্বজা লুটবে॥

সুর: বেহাগ খাম্বাজ
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ০৮ অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৪৪. বিধির বাঁধন কাটবে তুমি এমন শক্তিমান
তুমি কি এমন শক্তিমান!
আমাদের ভাঙাগড়া তোমার হাতে এমন অভিমান
তোমাদের এমনি অভিমান॥
চিরদিন টানবে পিছে, চিরদিন রাখবে নীচে
এত বল নাই রে তোমার, সবে না সেই টান॥
শাসনে যতই ঘেরো আছে বল দুর্বলেরও,
হও-না যতই বড়ো আছেন ভগবান।
আমাদের শক্তি মেরে তোরাও বাঁচবি নে রে,
বোঝা তোর ভারী হলেই ডুববে তরীখান।

সুর: খাম্বাজ
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী
প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৯০৫
মূল গান: নেই

৪৫. খ্যাপা তুই আছিস আপন খেয়াল ধরে।
যে আসে তোরই পাশে, সবাই হাসে দেখে তোরে॥
জগতে যে যার আছে আপন কাজে দিবানিশি।
তারা পায় না বুঝে তুই কী খুঁজে ক্ষেপে-বেড়াস
জনম ভরে॥
তোর নাই অবসর, নাইকো দোসর ভবের মাঝে।
তোরে চিনতে যে চাই, সময় না পাই নানান কাজে।
ওরে, তুই কী শুনাতে এত প্রাতে মরিস ডেকে?
এ যে বিষম জ্বালা ঝালাপালা, দিবি সবায় পাগল করে।
ওরে, তুই কী এনেছিস, কী টেনেছিস ভাবের জালে?
তার কি মূল্য আছে কারো কাছে কোনো কালে?।
আমরা লাভের কাজে হাটের মাঝে ডাকি তোরে!
তুই কি সৃষ্টিছাড়া, নাইকো সাড়া, রয়েছিস কোন
নেশায় ঘোরে?
এ জগত আপন মতে আপন পথে চলে যাবে
বসে তুই আর-এক কোণে নিজের মনে নিজের ভাবে॥
ওরে ভাই, ভাবের সাথে ভবের মিলন হবে কবে
মিছে তুই তারি লাগি আছিস জাগি না জানি কোন
আশার জোরে॥

সুর: বাউল
তাল : দাদরা
স্বরলিপিকার: সরলা দেবী
প্রকাশ সাল: ০৭ অক্টোবর ১৮৯২
মূল গান:নেই

৪৬. সাধন কি মোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে?
খাঁটি জিনিস হয় রে মাটি নেশার পরমাদে॥
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড়
মেলে না
গোলেমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে?।
কে বলো তো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়?
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে জাদুকরের ঝোলায়?
মস্ত-বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত-আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশার ফাঁদে॥

প্রকাশ সাল: ১৭ জানুয়ারি ১৯২২
মূল গান: নেই

জাতীয় সংগীত পর্যায়ের গান-১৬টি

৪৭. ভারত রে, তোর কলঙ্কিত পরমাণুরাশি
যত দিন সিন্ধু না ফেলিবে গ্রাসি
তত দিন তুই কাঁদ্ রে ॥
এই হিমগিরি স্পর্শিয়া আকাশ
প্রাচীন হিন্দুর কীর্তি-ইতিহাস
যত দিন তোর শিয়রে দাঁড়ায়ে অশ্রুজলে তোর বক্ষ
ভাসাইবে তত দিন তুই কাঁদ্ রে ॥
যে দিন তোমার গিয়াছে চলিয়া সে দিন তো আর
আসিবে না।
যে রবি পশ্চিমে পড়েছে ঢলিয়া
সে আর পুরবে উঠিবে না।

জাতীয় সংগীত ১২৮৫ ভাদ্র, সংস্করণ ২।
ভৈরবী। নরেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দ)
সম্পাদিত 'সঙ্গীত কল্পতরু' তে উদ্ধৃত আছে।

এমনি সকল নীচ হীনপ্রাণ
জনমেছে তোর কলঙ্কী সন্তান
একটি বিন্দু অশ্রুও কেহ তোমার তরে দেয় না ঢালি।
যে দিন তোমার তরে শোণিত ঢালিত সে দিন যখন
গিয়াছে চলি তখন, ভারত, কাঁদ্ রে ॥
তবে কেন বিধি এত অলঙ্কারে
রেখেছ সাজায়ে ভারতকায়।
ভারতের বনে পাখি গায় গান,
স্বর্ণমেঘ-মাখা ভারতবিমান
হেথাকার লতা ফুলে ফুলে ভরা,
স্বর্ণশস্যময়ী হেথাকার ধরা
প্রফুল্ল তটিনী বহিয়ে যায়।
কেন লজ্জাহীনা অলঙ্কার পরি
রোগশুষ্কমুখে হাসিরাশি ভরি
রূপের গরব করিস হায়।
যে দিন গিয়াছে সে তো ফিরিবে না,
তবে, রে ভারত, কাঁদ্ রে ॥
ভারত, তোর এ কলঙ্ক দেখিয়া
শরমে মলিন মুখ লুকাইয়া
আমরা যে কবি বিজনে কাঁদিব,
বিজনে বিষাদে বীণা ঝঙ্কারিব,
তাতেও যখন স্বাধীনতা নাইতখন, ভারত, কাঁদ্ রে ॥

৪৮. অয়ি বিষাদিনী বীণা, আয় সখী,
গা লো সেই-সব পুরানো গান
বহুদিনকার লুকানো স্বপনে
ভরিয়া দে-না লো আঁধার প্রাণ ॥
হা রে হতবিধি, মনে পড়ে তোর সেই একদিন ছিল
আমি আর্যলক্ষ্মী এই হিমালয়ে
এই বিনোদিনী বীণা করে লয়ে
যে গান গেয়েছি সে গান
শুনিয়া জগত চমকি উঠিয়াছিল ॥
আমি অর্জুনের আমি যুধিষ্ঠিরে
করিয়াছি স্তন্যদান।
এই কোলে বসি বাল্মীকি করেছে পুণ্য রামায়ণ গান।
আজ অভাগিনী আজ অনাথিনী
ভয়ে ভয়ে ভয়ে লুকায়ে লুকায়ে নীরবে নীরবে কাঁদি,
পাছে জননীর রোদন শুনিয়া একটি সন্তান
ওঠে রে জাগিয়া!
কাঁদিতেও কেহ দেয় না বিধি ॥
হায় রে বিধাতা, জানে না তাহারা সে দিন গিয়াছে চলি
যে দিন মুছিতে বিন্দু-অশ্রুধার কত-না করিত
সন্তান আমার
কত-না শোণিত দিত রে ঢালি ॥

জাতীয় সংগীত ১২৮৫ ভাদ্র, সংস্করণ ২।
বাহার-কাওয়ালি। 'সঙ্গীত কল্পতরু' ধৃত।

০৪৯ শোনো শোনো আমাদের ব্যথা দেবদেব, — মিশ্র দেশ খাম্বাজ- ঝাঁপতাল।
প্রভ-দয়াময় — স্বর ৪৭।
আমাদের ঝরিছে নয়ন, আমাদের ফাটিছে হৃদয় ॥
চিরদিন আঁধার না রয় রবি উঠে, নিশি দূর হয়
এ দেশের মাথার উপরে এ নিশীথ হবে না কি ক্ষয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন ? চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ?
মরমে লুকানো কত দুখ, ঢাকিয়া রয়েছি ম্লান মুখ
কাঁদিবার নাই অবসর কথা নাই, শুধু ফাটে বুক।
সঙ্কোচে ম্রিয়মাণ প্রাণ, দশ দিশি বিভীষিকাময়
হেন হীন দীনহীন দেশে বুঝি তব হবে না আলয়।
চিরদিন ঝরিবে নয়ন, চিরদিন ফাটিবে হৃদয় ॥
কোনো কালে তুলিব কি মাথা।
জাগিবে কি অচেতন প্রাণ।
ভারতের প্রভাতগগনে উঠিবে কি তব জয়গান।
আশ্বাসবচন কোনো ঠাঁই কোনোদিন শুনিতে না পাই
শুনিতে তোমার বাণী তাই মোরা সবে রয়েছি চাহিয়া॥
বলো, প্রভু, মুছিবে এ আঁখি,চিরদিন ফাটিবে না হিয়া॥

৫০. এ কী অন্ধকার এ ভারতভূমি! — রাগিণী প্রভাতী
বুঝি, পিতা, তারে ছেড়ে গেছ তুমি। — তাল একতালা
প্রতি পলে পলে ডুবে রসাতলে — — রবি গুজরাটী ভজনের সুরে রচিত
কে তারে উদ্ধার করিবে ॥ — স্বর ৪৭
চারি দিকে চাই, নাহি হেরি গতি।
নাহি যে আশ্রয়, অসহায় অতি।
আজি এ আঁধারে বিপদপাথারে
কাহার চরণ ধরিবে।
তুমি চাও পিতা, ঘুচাও এ দুখ।
অভাগা দেশেরে হোয়ো না বিমুখ
নহিলে আঁধারে বিপদপাথারে কাহার চরণ ধরিবে।
দেখো চেয়ে তব সহস্র সন্তান লাজে নতশির,
ভয়ে কম্পমান,
কাঁদিছে সহিছে শত অপমান —
লাজে মান আর থাকে না।
হীনতা লয়েছে মাথায় তুলিয়া, তোমারেও তাই
গিয়াছে ভুলিয়া,
দয়াময় ব'লে আকুলহৃদয়ে
তোমারেও তারা ডাকে না।
তুমি চাও পিতা, তুমি চাও চাও।
এ হীনতা-পাপ এ দুঃখ ঘুচাও।
ললাটের কলঙ্ক মুছাও মুছাও —
নহিলে এ দেশ থাকে না।
তুমি যবে ছিল এ পুণ্যভবনে
কী সৌরভসুধা বহিত পবনে,

কী আনন্দগান উঠিত গগনে,
কী প্রতিভাজ্যোতি ঝলিত।
ভারত-অরণ্যে ঋষিদের গান
অনন্তসদনে করিত প্রয়াণ
তোমারে চাহিয়া পুণ্যপথ দিয়া সকলে মিলিয়া চলিত।
আজি কী হয়েছে! চাও পিতা, চাও!
এ তাপ এ পাপ এ দুখ ঘুচাও।
মোরা তো রয়েছি তোমারি সন্তান
যদিও হয়েছি পতিত ॥

৫১. ঢাকো রে মুখ, চন্দ্রমা, জলদে। রাগিণী গৌড় মল্লার
বিহগেরা থামো থামো। স্বর ৪৭
আঁধারে কাঁদো গো তুমি ধরা ॥
পাবে যদি গাও রে সবে গাও রে শত অশনি-মহানিনাদে
ভীষণ প্রলয়সঙ্গীতে জাগাও জাগাও, জাগাও রে এ ভারতে ॥
বনবিহঙ্গ, তুমি ও সুখগীতি গেয়ো না।
প্রমোদমদিরা ঢালি প্রাণে প্রাণে
আনন্দরাগিণী আজি কেন বাজিছে এত হরষে
ছিঁড়ে ফেল্ বীণা আজি বিষাদের দিনে ॥

৫২. দেশে দেশে ভ্রমি তব দুখগান গাহিয়ে বাহার কাওয়ালি
নগরে প্রান্তরে বনে বনে। অশ্রু ঝরে দু নয়নে, স্বর ৪৭
পাষাণ হৃদয় কাঁদে সে কাহিনী শুনিয়ে।
জ্বলিয়া উঠে অযুত প্রাণ,
এক সাথে মিলি এক গান গায়
নয়নে অনল ভায় শূন্য কাঁপে অভ্রভেদী বজ্রনির্ঘোষে!
ভয়ে সবে নীরবে চাহিয়ে ॥
ভাই বন্ধু তোমা বিনা আর মোর কেহ নাই।
তুমি পিতা, তুমি মাতা, তুমি মোর সকলই।
তোমারি দুঃখে কাঁদিব মাতা, তোমারি দুঃখে কাঁদাব।
তোমারি তরে রেখেছি প্রাণ, তোমারি তরে ত্যজিব।
সকল দুঃখ সহিব সুখে তোমারি মুখ চাহিয়ে ॥

৫৩. এক সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্রটি মন, খাম্বাজ একতালা। স্বর ৪৭।
এক কার্যে সঁপিয়াছি সহস্র জীবন
বন্দে মাতরম্ ॥
আসুক সহস্র বাধা, বাধুক প্রলয়,
আমরা সহস্র প্রাণ রহিব নির্ভয়
বন্দে মাতরম্ ॥
আমরা ডরাইব না ঝটিকা-ঝঞ্ঝায়,
অযুত তরঙ্গ বক্ষে সহিব হেলায়।
টুটে তো টুটুক এই নশ্বর জীবন,
তবু না ছিঁড়িবে কভু এ দৃঢ় বন্ধন
বন্দে মাতরম্ ॥

[বাল্মীকিপ্রতিভা গীতিনাট্যে এক ডোরে বাধা আছি মোরা সকলে, গানটির প্রথম ছত্রেই ইহার ভাবের ও ভাষার আশ্চর্য প্রতিধ্বনি আছে, দুটি গানের সুরও প্রায় অভিন্ন]

৫৪. তোমারি তরে, মা, সঁপিনু এ দেহ।
তোমারি তরে, মা, সঁপিনু প্রাণ ৷৷
তোমারি শোকে এ আঁখি বরষিবে,
এ বীণা তোমারি গাহিবে গান ৷৷
যদিও এ বাহু অমূল দুর্বল তোমারি কার্য সাধিবে।
যদিও এ অসি কলঙ্কে মলিন তোমারি পাশ নাশিবে ৷৷
যদিও, হে দেবী,
শোণিতে আমার কিছুই তোমার হবে না
তবু, ওগো মাতা পারি তা ঢালিতে একতিল তব
কলঙ্ক ক্ষালিতে–
নিভাতে তোমার যাতনা।
যদিও, জননী, যদিও আমার
এ বীণায় কিছু নাহিক বল
কী জানি যদি, মা, একটি সন্তান,
জাগি ওঠে শুনি এ বীণাতান ৷৷

জয়জয়ন্তী-তাল চৌতাল। রবীন্দ্রনাথের ৪টি জাতীয় সংগীতের অন্যতম। গানটি 'সঞ্জীবনী সভা'র প্রেরণায় রচিত। স্বর ৪৭

৫৫. তবু পারিনে সঁপিতে প্রাণ।
পলে পলে মরি সেও ভালো, সহি পদে পদে অপমান৷৷
কথার বাঁধুনি,
কাঁদুনির পালা–চোখে নাহি কারো নীর।
আবেদন আর নিবেদনের থালা বহে বহে নতশির।
কাঁদিয়ে সোহাগ, ছি ছি একি লাজ!
জগতের মাঝে ভিখারির সাজ–
আপনি করি নে আপনার কাজ,
পরের প'রে অভিমান৷৷
আপনি নামাও কলঙ্কপশরা, যেয়োনা পরের দ্বার–
পরের পায়ে ধরে মান ভিক্ষা করা সকল ভিক্ষার ছার।
দাও দাও বলে পরের পিছু পিছু কাঁদিয়া বেড়ালে মেলে না
তো কিছু–
মান পেতে চাও, প্রাণ পেতে চাও,
প্রাণ আগে করো দান৷৷

মিশ্র সিন্ধু–একতালা
স্বর ৪৭

৫৬. কেন চেয়ে আছ, গো মা, মুখপানে।
এরা চাহে না তোমারে চাহে না যে,
আপন মায়েরে নাহি জানে।
এরা তোমায় কিছু দেবে না, দেবে না–
মিথ্যা কহে শুধু কত কী ভাণে।
তুমি তো দিতেছ, মা, যা আছে তোমারি– স্বর্ণশস্য তব,
জাহ্নবীবারি, জ্ঞান ধর্ম কত পুণ্যকাহিনী।
এরা কী দেবে তোরে! কিছু না,
কিছু না! মিথ্যা কবে শুধু হীনপরাণে।
মনের বেদনা রাখো, মা মনে।
নয়নবারি নিবারো নয়নে৷৷
মুখ লুকাও, মা, ধুলিশয়নে–
ভুলে থাকো যত হীন সন্তানে।
শূন্য-পানে চেয়ে প্রহর গণি গণি দেখো কাটে কিনা দীর্ঘ রজনী।
দুঃখ জানায়ে কী হবে, জননী, নির্মম চেতনাহীন পাষাণে৷৷

কাফি-কাওয়ালি
স্বর ৪৭

৫৭. একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, ঝিঁঝিট–একতালা
জগতজনের শ্রবণ জুড়াক, গানটি স্বদেশী আন্দোলনের সময় গীত হইত
হিমাদ্রিপাষাণ কেঁদে গলে যাক স্বর ৪৭
মুখ তুলে আজি চাহো রে ॥
দাঁড়া দেখি তোরা আত্মপর ভুলি,
হৃদয়ে হৃদয়ে ছুটুক বিজুলি
প্রভাতগগনে কোটি শির তুলি
নির্ভয়ে আজি গাহো রে॥
বিশ কোটি কণ্ঠে মা বলে ডাকিলে
রোমাঞ্চ উঠিবে অনন্ত নিখিলে,
বিশ কোটি ছেলে মায়েরে ঘেরিলে
দশ দিক সুখে হাসিবে।
সেদিন প্রভাতে নূতন তপন
নূতন জীবন করিবে বপন
এ নহে কাহিনী,
এ নহে স্বপন আসিবে সে দিন আসিবে ॥
আপনার মায়ে মা ব'লে ডাকিলে,
আপনার ভায়ে হৃদয়ে রাখিলে,
সব পাপ তাপ দূরে যায় চলে পূণ্য প্রেমের বাতাসে।
সেথায় বিরাজে দেব-আশীর্বাদ না থাকে কলহ,
না থাকে বিষাদ ঘুচে অপমান,
জেগে ওঠে প্রাণ বিমল প্রতিভা বিকাশে ॥

৫৮. কে এসে যায় ফিরে ফিরে আকুল নয়ননীরে। স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী
কে বৃথা আশাভরে চাহিছে মুখ'পরে। ভৈরবী রুপক
সে যে আমার জননী রে॥
কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়।
সে যে আমার জননী রে॥
ক্ষণেক স্নেহ-কোল ছাড়ি চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান করিছে অপমান–
সে যে আমার জননী রে॥
পুণ্য কুটিরে বিষন্ন কে বসি সাজাইয়া অন্ন।
সে স্নেহ উপহার রুচে না মুখে আর।
সে যে আমার জননী রে॥

৫৯. হে ভারত আজি তোমারি সভায় শুন এ কবির গান। নববর্ষের গান
তোমার চরণে নবীন হরষে এনেছি পূজার দান। স্বর ৪৭
এনেছি মোদের দেহের শকতি,
এনেছি মোদের মনের ভকতি,
এনেছি মোদের ধর্মের মতি, এনেছি মোদের প্রাণ–
এনেছি মোদের শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য তোমারে করিতে দান॥
কাঞ্চনথালি নাহি আমাদের, অন্ন নাহিকো জুটে।
যা আছে মোদের এনেছি সাজায়ে নবীন পর্ণপুটে।

সমারোহে আজ নাই প্রয়োজন–দীনের এ পূজা,
দীন আয়োজন–
চিরদারিদ্র্য করিব মোচন চরণের ধুলা লুটে।
সুরদুর্লভ তোমার প্রসাদ লইব পর্ণপুটে॥
রাজা তুমি নহ, হে মহাতাপস, তুমিই প্রাণের প্রিয়।
ভিক্ষাভূষণ ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দৈন্যের মাঝে আছে তব ধন,
মৌনের মাঝে রয়েছে গোপন
তোমার মন্ত্র অগ্নিবচন– তাই আমাদের দিয়ো।
পরের সজ্জা ফেলিয়া পরিব তোমারি উত্তরীয়।
দাও আমাদের অভয়মন্ত্র, অশোকমন্ত্র তব।
দাও আমাদের অমৃতমন্ত্র, দাও গো জীবন নব।
যে জীবন ছিল তব তপোবনে,
যে জীবন ছিল তব রাজাসনে,
মুক্ত দীপ্ত সে মহাজীবনে চিত্ত ভরিয়া লব।
মৃত্যুতরণ শঙ্কাহরণ দাও সে মন্ত্র তব॥

৬০. নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা– মিশ্র ঝিঁঝিট
তব আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত লব শিক্ষা। একতালা
পরের ভূষণ, পরের বসন,
তেয়াগিব আজ পরের অশন–
যদি হই দীন না হইব হীন, ছাড়িব পরের ভিক্ষা।
নব বৎসরে করিলাম পণ লব স্বদেশের দীক্ষা॥
না থাকে প্রাসাদ আছে তো কুটির কল্যাণে সুপবিত্র।
না থাকে নগর আছে তব বন ফলে ফুলে সুবিচিত্র।
তোমা হতে যত দূরে গেছি স'রে তোমারে দেখেছি তত
ছোটো ক'রে।
হে তাপস তব পর্ণকুটির কল্যাণে সুপবিত্র।
পরের বাক্যে তব পর হয়ে দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা।
তোমারে ভুলিতে ফিরায়েছি মুখ,
পরেছি পরের সজ্জা।
কিছু নাহি গণি' কিছু নাহি কহি'
জপিছ মন্ত্র অন্তরে রহি–
তব সনাতন ধ্যানের আসন মোদের অস্থিমজ্জা।
পরের বুলিতে তোমারে ভুলিতে
দিয়েছি পেয়েছি লজ্জা॥
সে-সকল লাজ তেয়াগিব আজ, লইব তোমার দীক্ষা।
তব পদতলে বসিয়া বিরলে শিখিব তোমার শিক্ষা।
তোমার ধর্ম, তোমার কর্ম, তব মন্ত্রের গভীর মর্ম
লইব তুলিয়া সকল ভুলিয়া ছাড়িয়া পরের ভিক্ষা।
তব গৌরবে গরব মানিব, লইব তোমার দীক্ষা॥

৬১. ওরে ভাই, মিথ্যা ভেবো না। স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী
হবার নয় যা কোনোমতেই হবেই না সে, স্বর ৪৬
হতে দেব না॥
পড়ব না রে ধুলায় লুটে,
যাবে না রে বাঁধন টুটে– যেতে দেব না।
মাথা যাতে নত হবে এমন বোঝা মাথায় নেবো না॥
দুঃখ আছে দুঃখ পেতেই হবে–
যত দূরে যাবার আছে সে তো যেতেই হবে।
উপর পানে চেয়ে ওরে ব্যথা নে রে
বক্ষে ধ'রে নে রে সকলে।
নিঃসহায়ের সহায় যিনি বাজবে তাঁরে
তোদের বেদনা॥

৬২. আজ সবাই জুটে আসুক ছুটে যে যেখানে থাকে– রচনা ২৪শে আশ্বিন ১৩১২
এবার যার খুশি সে বাঁধন কাটুক, কলিকাতা
আমরা বাঁধব মাকে।
আমরা পরাণ দিয়ে আপন করে
বাঁধব তাঁরে সত্য ডোরে,
সন্তানেরই বাহুপাশে বাঁধব লক্ষ পাকে।
আজ ধনী গরিব সবাই সমান।
আয় রে হিন্দু, আয় মুসলমান–
আজকে সকল কাজ পড়ে থাক, আয় রে লাখে লাখে।
আজ দাও গো সবার দুয়ার খুলে,
যাও গো সকল ভাবনা ভুলে–
সকল ডাকের উপরে আজ মা আমাদের ডাকে॥

পূজা ও প্রার্থনা পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

৬৩. যেথায় সবার অধম দীনের হতে দীন ভৈরবী, দাদরা, পর্যায়-পূজা
সেইখানে যে চরণ তোমার রাজে Gitanjali No. 10. স্বর ৩৮
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥
যখন তোমায় প্রণাম করি আমি প্রণাম আমার
কোন্‌খানে যায় থামি।
তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥
অহঙ্কার তো পায় না নাগাল যেথায় তুমি ফের
রিক্তভূষণ দীন দরিদ্র সাজে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥
ধনে মানে যেথায় আছে ভরি
সেথায় তোমার সঙ্গ আশা করি,
সঙ্গী হয়ে আছ যেথায় সঙ্গীহীনের ঘরে
সেথায় আমার হৃদয় নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে ॥

৬৪. আর নহে, আর নয়, আমি করি নে আর ভয়।
আমার ঘুচল কাঁদন, ফলল সাধন, হল বাঁধন ক্ষয় ॥
ওই আকাশে ওই ডাকে। আমার আর কে ধ'রে রাখে–
আমি সকল দুয়ার খুলেছি, আজ যাব সকলময় ॥
ওরা ব'সে ব'সে মিছে শুধু মায়াজাল গাঁথিছে–
ওরা কী-যে গোনে ঘরের কোণে আমায় ডাকে পিছে।
আমার অস্ত্র হল গড়া, আমার বর্ম হল পরা–
এবার ছুটবে ঘোড়া পবনবেগে, করবে ভুবন জয় ॥

গানটি অচলায়তন নাটকের অন্তর্ভুক্ত
পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: সুধীরচন্দ্র কর
স্বর ৫২

৬৫. বাঁধা দিলে বাঁধবে লড়াই, মরতে হবে।
পথ জুড়ে কি করবি বড়াই, সরতে হবে ॥
লুঠ-করা ধন ক'রে জড়ো কে হতে চাস সবার বড়ো–
এক নিমেষে পথের ধুলায় পড়তে হবে।
নাড়া দিতে গিয়ে তোমায় নড়তে হবে ॥
নীচে বসে আছিস কে রে, কাঁদিস কেন?
লজ্জাডোরে আপনাকে রে বাঁধিস কেন?
ধনী যে তুই দুঃখধনে সেই কথাটি রাখিস মনে–
ধুলার 'পরে স্বর্গ তোমায় গড়তে হবে–
বিনা অস্ত্র, বিনা সহায়, লড়তে হবে ॥

পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর ৪২

৬৬. এই কথাটা ধরে রাখিস–মুক্তি তোর পেতেই হবে।
যে পথ গেছে পারের পানে
সে পথে তোর যেতেই হবে ॥
অভয় মনে কণ্ঠ ছাড়ি গান গেয়ে তুই দিবি পাড়ি,
খুশি হয়ে ঝড়ের হাওয়ায় ঢেউযে তোরে খেতেই হবে
পাকের ঘোরে ঘোরায় যদি, ছুটি তোরে পেতেই হবে
চলার পথে কাঁটা থাকে, দ'লে তোমায় যেতেই হবে।
সুখের আশা আঁকড়ে লয়ে মরিস নে তুই ভয়ে ভয়ে,
জীবনকে তোর ভ'রে নিতে
মরণ-আঘাত খেতেই হবে ॥

স্বরলিপি: সুধীর চন্দ্র কর
স্বর ৪৪

৬৭. আপন হতে বাহির হয়ে বাইরে দাঁড়া,
বুকের মাঝে বিশ্বলোকের পাবি সাড়া ॥
এই-যে বিপুল ঢেউ লেগেছে
তোর মাঝেতে উঠুক নেচে,
সকল পরান দিক-না নাড়া ॥
বোস্-না, ভ্রমর, এই নীলিমার আসন লয়ে
অরুণ-আলোর স্বর্ণরেণু-মাখা হয়ে।
যেখানেতে অগাধ ছুটি মেলে সেথা তোর ডানাদুটি,
সবার মাঝে পাবি ছাড়া ॥

পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: সমরেশ চৌধুরী
স্বর ৪৩

৬৮. হবে জয়, হবে জয়, হবে জয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয় ॥
জয়ী প্রাণ, চিরপ্রাণ, জয়ী রে আনন্দগান,
জয়ী প্রেম, জয়ী ক্ষেম, জয়ী জ্যোতির্ময় রে ॥
এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয় রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, মেলো চোখ, অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক হোক অভ্যুদয় রে ॥

পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী
স্বর ৭

৬৯. আমি মারের সাগর পাড়ি দেব বিশ ঝড়ের বায়ে
আমার ভয়ভাঙা এই নায়ে ॥
মাভৈঃ বাণীর ভরসা নিয়ে ছেঁড়া পালে বুক ফুলিয়ে
তোমার ওই পারেতেই যাবে তরী ছায়াবটের ছায়ে ॥
পথ আমারে সেই দেখাবে যে আমারে চায়–
আমি অভয় মনে ছাড়ব তরী, এই শুধু মোর দায়।
দিন ফুরালে, জানি জানি, পৌঁছে ঘাটে দেব আনি
আমার দুঃখদিনের রক্তকমল তোমার করুণ পায়ে ॥

পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: অনাদিকুমার দস্তিদার
স্বর ৫২

৭০. জয় হোক, জয় হোক নব অরুণোদয়।
পূর্বদিগঞ্চল হোক জ্যোতির্ময় ॥
এসো অপরাজিত বাণী, অসত্য হানি–
অপহত শঙ্কা, অপগত সংশয় ॥
এসো নবজাগ্রত প্রাণ, চিরযৌবনজয়গান।
এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা জড়ত্বনাশা–
ক্রন্দন দূর হোক, বন্ধন হোক ক্ষয় ॥

পর্যায়-পূজা
স্বরলিপি: নবগীতিকা ২

৭১. সর্ব খর্বতারে দহে তব ক্রোধদাহ–
হে ভৈরব, শক্তি দাও, ভক্ত-পানে চাহো ॥
দূর করো মহারুদ্র যাহা মুগ্ধ, যাহা ক্ষুদ্র–
মৃত্যুরে করিবে তুচ্ছ প্রাণের উৎসাহ ॥
দুঃখের মন্থনবেগে উঠিবে অমৃত,
শঙ্কা হতে রক্ষা পাবে যারা মৃত্যুভীত।
তব দীপ্ত রৌদ্র তেজে নির্ঝরিয়া গলিবে যে
প্রস্তর শৃঙ্খলোন্মুক্ত ত্যাগের প্রবাহ ॥

পর্যায়-পূজা(দু:খ)
১৩ সেপ্টেম্বর ১৯২৯ লাহোর জেলে শহীদ যতীন দাসের মৃত্যু হয়। শান্তিনিকেতনে খবরটি পৌছালে রবীন্দ্রনাথ এই গানটি রচনা করেন। স্বর ৫৭।

৭২. বড়ো আশা ক'রে এসেছি গো, কাছে ডেকে লও,
ফিরায়ো না জননী ॥
দীনহীনে কেহ চাহে না, তুমি তারে রাখিবে জানিগো।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, চরণতলে বসে থাকিব।
আর আমি যে কিছু চাহি নে, জননী ব'লে শুধু ডাকিব
তুমি না রাখিলে, গৃহ পাইব কোথা,
কেঁদে কেঁদে কোথা বেড়াব–
ওই যে হেরি তমসঘনঘোরা গহন রজনী ॥

পূজা ও প্রার্থনা
রাগিণী কর্ণাটী ঝিঁঝিট- তাল কাওয়ালি
মূল কানাড়ী ভাষায় 'সখি বা বা'র ভাঙা গান
স্বর ৮

৭৩. পিতার দুয়ারে দাঁড়াইয়া সবে ভুলে যাও অভিমান।
এসো, ভাই, এসো প্রাণে প্রাণে আজি রেখো না রে ব্যবধান ॥
সংসারের ধুলাধুয়েফেলে এসো মুখে লয়ে এসো হাসি
হৃদয়ের থালে লয়ে এসো ভাই, প্রেমফুল রাশি রাশি ॥
নীরস হৃদয়ে আপনা লইয়ে রহিলে তাঁহারে ভুলে–
অনাথ জনের মুখপানে, আহা, চাহিলে না মুখ তুলে !
কঠোর আঘাতে ব্যথা পেলে কত, ব্যথিলে পরের প্রাণ
তুচ্ছ কথা নিয়ে বিবাদে মাতিয়ে দিবা হল অবসান ॥
তাঁর কাছে এসে তবুও কি আজি আপনারে ভুলিবে না
হৃদয় মাঝারে ডেকে নিতে তাঁরে হৃদয় কি খুলিবে না
লইব বাঁটিয়া সকলে মিলিয়া প্রেমের অমৃত তাঁরি–
পিতার অসীম ধন রতনের সকলেই অধিকারী ॥

পূজা ও প্রার্থনা
রাগিণী বাহার- তাল একতালা
স্বর ২৪

৭৪. সুখহীন নিশিদিন পরাধীন হয়ে ভ্রমিছ দীনপ্রাণে।
সতত হায় ভাবনা শত শত, নিয়ত ভীত পীড়িত
শির নত কত অপমানে ॥
জানো না রে অধ-উর্ধ্বে বাহির-অন্তরে
ঘেরি তোরে নিত্য রাজে সেই অভয়-আশ্রয়।
তোলো আনত শির, ত্যজো রে ভয়ভার,
সতত সরলচিতে চাহো তাঁরি প্রেমমুখপানে ॥

পর্যায়: পূজা
রাগিণী গৌড়মল্লার- তাল কাওয়ালী
স্বর ৮

বিচিত্র পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

৭৫. ও জোনাকি, কী সুখে ওই ডানা দুটি মেলেছ।
এই আঁধার সাঁঝে উল্লাসে প্রাণ ঢেলেছ ॥
তুমি নও তো সূর্য, নও তো চন্দ্র,
তাই ব'লে কি কম আনন্দ।
তুমি আপন জীবন পূর্ণ ক'রে আপন আলো জ্বেলেছ ॥
তোমার যা আছে তা তোমার আছে,
তুমি নও গো ঋণী কারো কাছে,
তোমার অন্তরে যে শক্তি আছে তারি আদেশ পেলেছ।
তুমি আঁধার-বাঁধন ছাড়িয়ে ওঠ,
তুমি ছোটো হয়ে নও গো ছোটো,
জগতে যেথায় যত আলো
সবায় আপন করে ফেলেছ॥

বাউল (৬)
স্বরলিপি: অনাদিকুমার দস্তিদার
স্বর ৫১

৭৬. মোরা সত্যের 'পরে মন আজি করিব সমর্পণ।
জয় জয় সত্যের জয়।
মোরা বুঝিব সত্য, পূজিব সত্য,
খুঁজিব সত্যধন।
জয় জয় সত্যের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু মিথ্যাচিন্তা নয়
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু মিথ্যাকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু মিথ্যাবাক্য নয়।

পর্যায় বিচিত্র
১৩০৮ সালের ৭ই পৌষ ব্রহ্মচর্যাশ্রম
বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকালে রচিত ও গীত
ভূপনারায়ণ-একতালা
স্বরলিপি: ইন্দিরা দেবী
স্বর ৫৫

জয় জয় সত্যের জয় ॥
মোরা মঙ্গলকাজে প্রাণ আজি করিব সকলে দান।
জয় জয় মঙ্গলময়।
যদি লভিব পুণ্য, শোভিব পুণ্যে, গাহিব পুণ্যগান।
জয় জয় মঙ্গলময় ॥
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু অশুভচিন্তা নয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু অশুভকর্ম নয়।
যদি দণ্ড সহিতে হয় তবু অশুভবাক্য নয়।
জয় জয় মঙ্গলময় ॥
সেই অভয় ব্রহ্মনাম আজি মোরা সবে লইলাম–
যিনি সকল ভয়ের ভয়।
মোরা করিব না শোক যা হবার হোক, চলিব ব্রহ্মধাম।
জয় জয় ব্রহ্মের জয়।
যদি দুঃখে দহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি দৈন্য বহিতে হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
যদি মৃত্যু নিকট হয় তবু নাহি ভয়, নাহি ভয়।
জয় জয় ব্রহ্মের জয় ॥
মোরা আনন্দ-মাঝে মন আজি করিব বিসর্জন।
জয় জয় আনন্দময়।
সকল দৃশ্যে সকল বিশ্বে আনন্দনিকেতন।
জয় জয় আনন্দময়।
আনন্দ চিত্ত-মাঝে আনন্দ সর্বকাজে,
আনন্দ সর্বকালে দুঃখে বিপদজালে,
আনন্দ সর্বলোকে মৃত্যুবিরহে শোকে–
জয় জয় আনন্দময় ॥

৭৭. খরবায়ু বয় বেগে, চারি দিক ছায় মেঘে,
ওগো নেয়ে, নাওখানি বাইয়ো।
তুমি কষে ধরো হাল, আমি তুলে বাঁধি পাল–
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
শৃঙ্খলে বারবার ঝন্‌ঝন্‌ ঝঙ্কার
নয় এ তো তরণীর ক্রন্দন শঙ্কার–
বন্ধন দুর্বার সহ্য না হয় আর,
টলোমলো করে আজ তাই ও।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥
গণি গণি দিন খন চঞ্চল করি মন
বোলো না 'যাই কি নাই যাই রে'।
সংশয় পারাবার অন্তরে হবে পার,
উদ্‌বেগে তাকায়ো না বাইরে।
যদি মাতে মহাকাল,
উদ্দাম জটাজাল ঝড়ে হয় লুণ্ঠিত, ঢেউ উত্তাল,
হয়ো নাকো কুণ্ঠিত,
তালে তার দিয়ো তাল–জয়-জয় জয়গান গাইয়ো।
হাঁই মারো, মারো টান হাঁইয়ো ॥

পর্যায় বিচিত্র
স্বরলিপি: দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর
স্বর ৩

৭৮. ভাঙো বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, — পর্যায় বিচিত্র
বাঁধ ভেঙে দাও। — স্বরলিপি: শান্তিদেব ঘোষ
বন্দী প্রাণ মন হোক উধাও ॥ — স্বর ১২
শুকনো গাঙে আসুক
জীবনের বন্যার উদ্দাম কৌতুক–
ভাঙনের জয়গান গাও।
জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক,
যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক।
আমরা শুনেছি ওই মাভৈঃ মাভৈঃ মাভৈঃ
কোন্ নূতনেরই ডাক।
রুদ্ধ তাহারি দ্বারে দুর্বার বেগে ধাও ॥

৭৯. আমি তোমারি মাটির কন্যা, জননী বসুন্ধরা– — স্বরলিপি: শৈলজারঞ্জন মজুমদার
তবে আমার মানবজন্ম কেন বঞ্চিত করা ॥ — স্বর ৫৯
পবিত্র জানি যে তুমি পবিত্র জন্মভূমি,
মানবকন্যা আমি যে ধন্যা প্রাণের পুণ্যে ভরা ॥
কোন স্বর্গের তরে ওরা তোমায় তুচ্ছ করে
রহি তোমার বক্ষোপরে।
আমি যে তোমারি আছি নিতান্ত কাছাকাছি,
তোমার মোহিনীশক্তি দাও আমারে হৃদয়প্রাণহারা ॥

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশচেতনার গান

ক্রমিক	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের স্বদেশপর্যায়ের গানের তালিকা ১৯টি গান	তথ্য
১.	আজি গো তোমার চরণে, জননী! আনিয়া অর্ঘ্য করি মা দান; ভক্তি-অশ্রু-সলিল-সিক্ত শতেক ভক্ত দীনের গান! মন্দির রচি মা তোমার লাগি, পয়সা কুড়ায়ে পথে পথে মাগি, তোমারে পূজিতে মিলেছি জননী, স্নেহের সারিতে করিয়া স্নান! (কোরাস) জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমলচরণে স্থান! জ্ঞান কী জননী জ্ঞান কী কত যে আমাদের এই কঠোর ব্রত! হায় মা! যাহারা তোমার ভক্ত, নিঃস্ব কী গো মা তারাই যাত! তবু সে-লজ্জা তবু সে-দৈন্য, সহেছি মা সুখে তোমারি জন্য, তাই দু-হস্তে তুলিয়া মস্তে ধরেছি যেন সে-মহৎ মান! (কোরাস) জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমলচরণে স্থান! নয়নে বহেছে নয়নের ধারা জ্বলেছে জঠরে যখন ক্ষুধা, মিটায়েছি সেই জঠরজ্বালায় পিইয়া তোমার বচনসুধা, মরুভূমে সম যখন তৃষায়, আমাদের মাগো ছাতি ফেটে যায়, মিটায়েছি মাগো সকল পিপাসা তোমার হাসিটি করিয়া পান। (কোরাস)– জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমল চরণে স্থান! পেয়েছি যা-কিছু কুড়ায়ে তাহাই তোমার কাছে মা এসেছি ছুটি, বাসনা, তাহাই গুছায়ে যতনে সাজাব তোমার চরণ দুটি। চাহি নাকো কিছু, তুমি মা আমার,– এই জানি শুধু নাহি জানি আর, তুমি গো জননী হৃদয় আমার, তুমি গো জননী আমার প্রাণ! (কোরাস)– জননী বঙ্গভাষা, এ জীবনে চাহি না অর্থ চাহি না মান, যদি তুমি দাও তোমার ও-দুটি অমল-কমল চরণে স্থান।	পর্যায়: স্বদেশ রাগ: ইমন কল্যাণ তাল: একতালা
২.	একবার গালভরা মা ডাকে। মা বলে ডাক মা বলে ডাক মা বলে ডাক মাকে। ডাক এমনি করে আকাশ ভুবন সেই ডাকে যাক ভরে আর ভায়ে ভায়ে এক হয়ে যাক যেখানে যে থাকে। দুটি বাহু তুলে নৃত্য করে ডাকরে মা মা বলে, আর নেচে নেচে আয়রে মায়ের ঝাঁপিয়ে পড়ি কোলে মায়ের চরণ দুটি জড়িয়ে ধরে আন রে মায়ে লুটে ছেলের শুনলে সে ডাক দেখব সে মা কেমন করে থাকে। দিয়ে করতালি মা মা বলি ডাক রে এমনিভাবে, উঠে প্রবল বন্যা ভাবে ভুবন ভাসিয়ে দিয়ে যাবে, মায়ের বুকের উপর আছড়ে পড়ে চক্ষু দুটি মুদে, আমার গান ভেসে যাক প্রাণ ভেসে যাক দেখি শুধুই মাকে।	

৩. ওরে আমার সাধের বীণা, ওরে আমার সাধের গান, নাটক: সিংহল বিজয়
(তোর ওই) কোমল সুরে ব্যথা ঝরে,আকুল করে আমার প্রাণ! রাগ: বাগেশ্রী
(ও তোর) শত তানে একই কথা, শত লয়ে একই ব্যথা,– তাল: যৎ (৭ মাত্রা)
(শুধু) নিরাশার কাতরতা, হতাশার অপমান।
(কোরাস) পার যদি জাগো বীণা, ধরো আরও উচ্চতান,
গাইব আমি নূতন গানে– নূতন প্রাণে কম্পমান।
(যখন) বীণার সুরে গলা সেধে, গাইতে যাই রে ফেলি কেঁদে,
(শুধু) মিশে যায় সে মনের খেদে– আঁখির জলে অবসান;
(কোথায়) আনন্দেতে উঠব নেচে, মরা মানুষ উঠবে বেঁচে,
(আমি) পাই না সুধাসাগর ছেঁয়ে ভাগ্যে শুধুই বিষপান!
(কোরাস) পার যদি জাগো বীণা, ধরো আরও উচ্চতান,
গাইব আমি নূতন গানে– নূতন প্রাণে কম্পমান।
(বীণা) পার যদি জাগো তবে, বেজে ওঠো উচ্চরবে,
(আজ) নূতন সুরে গাইতে হবে, আমি সঙ্গে ধরি তান; (ছেড়ে)
লোকসজ্জা, সমাজ-ভয়,যাতে,
সবাই আবার মানুষ হয়, কর এই বরদান।
(কোরাস) পার যদি জাগো বীণা, ধরো আরও উচ্চতান,
গাইব আমি নূতন গানে – নূতন প্রাণে কম্পমান।

৪. কী মাধুর্য জন্মভূমি জননী তোমার! হাস্য পরিহাস ব্যাঙ্গানুকৃতি
হেরিব কী তোমারে মা নয়নে আবার।
কত দিন আছি ছাড়ি, তবু কী ভুলিতে পারি,
তবুও জাগিছ মাতৃ হৃদয়ে আমার।
লালিত শৈশব যথা যাপিত যৌবন,
ভুলিতে সে-প্রিয় দৃশ্য চাহে কী গো মন,
প্রতি তরুলতা সনে মিশ্রিত জড়িত মনে,
স্মৃতিচোখে প্রিয় ছবি হেরি বারবার।
তোমা বিনা অন্য কারে মা বলে ডাকিতে,
কখনো বাসনা মাতৃ নাহি হয় চিতে;
অভূষণ শোভারাশি, মাঃ তব ভালোবাসি;
চাই না সুরম্য স্থান নানা অলঙ্কার।
স্বর্গীয় মাধুর্যময় স্বদেশ আমার!

৫. কীসের শোক করিস ভাই- আবার তোরা মানুষ হ। পর্যায়: দেশ
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই- আবার তোরা মানুষ হ॥
পরের পরে কেন এ রোষ, নিজেরাই যদি শত্রু হস?
তোদের এযে নিজেরই দোষ-আবার তোরা মানুষ হ।
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।
ভুলিয়ে যা রে আত্মপর, পরকে নিয়ে আপন কর
বিশ্ব তোর নিজের ঘর- আবার তোরা মানুষ হ।
শত্রু হয় হোক না যদি সেথায় পাস মহৎ প্রাণ
তাহারে ভালো বাসিতে শেখ, তাহারে কর হৃদয়দান।
মিত্র হোক ভণ্ড যে- তাহারে দূর করিয়া দে

সবার বাড়া শত্রু সে- আবার তোরা মানুষ হ।
জগৎ জুড়ে দুইটি সেনা পরস্পরে রাঙায় চোখ
পুণ্য সেনা নিজের কর, পাপের সেনা শত্রুর হোক
ধর্ম যথা সেদিকে থাক ঈশ্বরেরে মাথায় রাখ
স্বজন দেশ ডুবিয়ে যাক- আবার তোরা মানুষ হ॥

৬. কেন আর ভাঙাঘরে মারিস তোরা সিঁধকাটি? পর্যায়: স্বদেশ
ছিন্ন তরুর মূল হতে কেন তুলে দিস মাটি?
বিষে জর্জর প্রাণে, কেন হানিস বিষবাণে?
পাপের বন্যাভরা দেশে, আনিস নরক খাল কাটি?
কেন শীর্ণ মলিন মুখে, মারিস্ কুঠার মায়ের বুকে?–
দু-দিন গেলে দিস রে ফেলে–পুরাস প্রাণের আকাঙ্ক্ষাটি।

৭. কেন ভাগীরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে
নাচিয়ে নাচিয়ে চলিয়ে যাও গো। পর্যায়: স্বদেশ
ঢলিয়ে ঢলিয়ে সৈকত পুলিনে,
বহি এ ভারতে কী সুখ পাও গো ॥
নিরখি মা আজ ভারতের দশা,
এ দুখে আনন্দে কী গান গাও গো।
কী সুখে বলো মা নীলাম্বর পরি
হরষিত মনে সাগরে ধাও গো ॥
অধীন ভারতে বহিয়ো না আর,
এ কলঙ্করেখা মুছায়ে দেও গো।
উথলি তটনী গভীর গরজে,
সপুত ভারতহৃদয় ছাড়ো গো ॥
"কেন ভাগীরথী, হাসিয়ে হাসিয়ে
সপুত ভারতহৃদয় ছাড়ো গো ॥"

৮. চলো চলো যাই আমরা সবাই পর্যায়: স্বদেশ
ইরানের বীর নারীগণ।
নাচি রঙ্গে রণতরঙ্গে, এইখানে শেষ নহে রণ।
একটি যুদ্ধে নয় এর শেষ,
এক পরাজয়ে যায় নাকো দেশ,
হয়েছি বিফল একবার যদি, করিব নবীন আয়োজন;
বর্মে সাজাব এই বরতনু
এ কোমল করে লব শরধনু;
বিজলির মতো যাব ঝলসিয়া জ্বলিয়া ধাঁধিয়া দু-নয়ন;
করিব দুর্গ পুন অবরোধ,
লব প্রতিশোধ লব প্রতিশোধ, শুনো হে তুরান শুনো হে ইরান,
রমণীর এই দৃঢ় পণ; উড়াও নিশান, বাজাও বিষাণ
গাও তবে আজ গাও এই গান;
যতদিন মান ততদিন প্রাণ– নহিলে কী ছাত্র এ জীবন।

৯. জাগো জাগো পুরনারী। পর্যায়: স্বদেশ
জিনিয়া সমর আসিছে অমর বীরকুল তোমারি।
যদি, এসেছিল তারা করিতে ধ্বংস মেবারচন্দ্র সূর্য্যবংশ
গেছে তারা শুধু রঞ্জিত করি মেবারের তরবারী।
তারা যবনদর্প করিয়া খর্ব, দীপ্ত করিয়া মেবার গর্ব
এসেছে মেবার ললাট হইতে ঘন মেঘ অপসারি।
আজি মেবারের মহামহিম অঙ্ক, করো বিঘোষিত বাজাও শঙ্খ
বরিষ পুষ্প সৌধমঞ্চে- দাঁড়াইয়া সারি সারি।
আরো যারা পড়ে আছে সমরক্ষেত্রে
তাদের জন্য ভিজাও নেত্রে- তাদের জন্য দাওগো দুইটি
বিন্দু অশ্রুবারি।

১০. প্রাণে প্রাণে আছ মিশি প্রেমময়ী যার, পর্যায়: দেশ
পারে পাসরিতে সে কী ও মুরতি আর!
যখনি তোমায় স্মরি,
বিয়োগের অশ্রুবারি
ভিজায়ে কপোল ঝরে নয়নে আমার!
আসিলাম যেই দিন তাজিয়ে তোমায়,
আলোড়িত চিত্ত মন আসিতে কী চায়;
যেন বিপরীত বায়
তটিনী বহিয়ে যায়
প্রতিকূল উর্মিমালা খেলে বারবার!

১১. বঙ্গ আমার! জননী আমার! ধাত্রী আমার! আমার দেশ, পর্যায়: স্বদেশ
কেন গো মা তার শুষ্ক নয়ন, কেন গো মা তোর রুক্ষ কেশ! রাগ: আলাহিয়া বিলাবল
কেন গো মা তোর ধুলায় আসন, তাল: একতালা
কেন গো মা তোর মলিন বেশ!
সপ্ত কোটি সন্তান যার ডাকে উচ্চে 'আমার দেশ'-
(কোরাস)- কীসের দুঃখে, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ!
সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে ডাকে যখন 'আমার দেশ'-
উদিল যেখানে বুদ্ধ-আত্মা মুক্ত করিতে মোক্ষদ্বার,
আজিও জুড়িয়া অর্ধ-জগৎ ভক্তিপ্রণত চরণে যাঁর;
অশোক যাঁহার কীর্তি ছাইল গান্ধার হতে জলধি-শেষ,
তুই কীনা মা গো তাঁদের জননী!
(কোরাস)- কীসের দুঃখে, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ! সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন 'আমার দেশ'! একদা যাহার বিজয় সেনানী
হেলায় লঙ্কা করিল জয়, একদা যাহার অর্ণবপোত
ভ্রমিল ভারত সাগরময়; সন্তান যার তিব্বত-চীন-
জাপানে গঠিল উপনিবেশ, তার কীনা এই ধূলায় আসন,
তার কীনা এই ছিন্ন বেশ!
(কোরাস)- কীসের দুঃখে, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ! সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে

ডাকে যখন 'আমার দেশ'! উদিত যেখানে মুরজমন্দ্রে
নিমাই-কণ্ঠে মধুর তান, ন্যায়ের বিধান দিল রঘুমণি
চণ্ডীদাসও গাইল গান; যুদ্ধ করিল প্রতাপাদিত্য
তুই তো না সেই ধন্য দেশ! ধন্য আমরা, যদিও এ শিরায়
থাকে তাঁদের রক্তলেশ।
(কোরাস)– কীসের দুঃখে, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ! সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন 'আমার দেশ'! যদিও মা তোর দিব্য-আলোকে
ঘেরে আছে আজ নবীন গরিমা ভাতিবে আবার ললাটে তোর;
আমরা ঘুচাব মো তোর দৈন্য! মানুষ আমরা নহি তো মেষ!
দেবী আমার! সাধনা আমার! স্বর্গ আমার! আমার দেশ!
(কোরাস)– কীসের দুঃখে, কীসের দৈন্য,
কীসের লজ্জা, কীসের ক্লেশ! সপ্ত কোটি মিলিত কণ্ঠে
ডাকে যখন 'আমার দেশ'!

১২. বাজ ভেরি আজ উচ্চ নিনাদে, উড়ুক পতাকা মৃত্যু আঁকা — পর্যায়: স্বদেশ
নাচুক তাথিয়া থিয়া থিয়া থিয়া বিজয় নরের রক্ত মাখা
যাক ঘুরে যাক বিধির নিয়ম আজ আছে নারী কাল আছে যম
বাজিস যে ভেরি ঝম ঝম ঝম শুধু সে রোদন ঢাকিয়ে রাখা
বাজ ভেরী বাজ ঝনন ঝনন সনন সনন ঘুরুক চাকা
না উঠিলে সনে কারো হাহাকার সুখটি পূর্ণ হয় নাকো আর
বলিহারি বিধি বিধাতা তোমার-এখন সে কথা থাকুক ঢাকা
জীবন মরিবে মরণ বাঁচিবে নৃত্য কাঁদিবে রোদন নাচিবে
আকাশের তারা খসিবে, উড়িবে ধরণীর ধূলি মেলিয়া পাখা
বাজ ভেরি বাজ ঝনন ঝনন সনন সনন ঘুরুক চাকা।

১৩. ভেঙে গেছে মোর স্বপ্নের ঘোর ছিড়ে গেছে মোর বীণার তার।
এ মহাশ্মশানে ভগ্ন পরাণে আজি মা কি গান গাহিব আর।
মেবার পাহাড় হইতে তাহার নেমে গেছে এক গরিমা হায়
ঘন মেঘরাশ ঘেরিয়া আকাশ হানিয়া তড়িৎ চলিয়া যায়।
(কোরাস) মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্তনিশান ওড়েনা আর এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার।
গাহে নাকো আর কুঞ্জে তাহার পিকবর আজ হরষগান
ফোটে নাকো ফুল, আসে না আকুল
ভ্রমর করিতে সে মধু পান আর নাহি বয় শিহরি মলয়
আর নাহি হাসে আকাশে চাঁদ
মেবার নদীর ম্লান দুটি তীর করে নাকো আর সে কলনাদ।
(কোরাস) মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়েনা আর এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার। মেবারের বন বিষাদ মগন
আঁধার বিজন নগর গ্রাম পুরবাসী সব মলিন নিরব
বিষাদ মগন সকল ধাম নাহি করে আর খর তরবার

আস্ফালন সে মেবার বীর নাহি আর হাসি,
ম্লান রুপরাশি ত্রস্ত মেবার সুন্দরীর।
(কোরাস) মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়েনা আর এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার। এ ঘন আঁধার! কিবা আছে তার
সান্তনা আর কে করে দান চারণকবির বিনা সে গভীর
অতীত মেবার মহিমা গান গেছে যদি সব সুখ কলরব
অতীতের বাণী বাঁচিয়া থাক। চারণের মুখে সান্তনা সুখে
শূন্য মেবারের ধ্বনিয়া যাক।
(কোরাস) মেবার পাহাড় শিখরে তাহার
রক্তনিশান উড়ে না আর এ হীন সজ্জা, এ ঘোর লজ্জা
ঢেকে দে গভীর অন্ধকার। মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়
যুঝেছিল যেথা প্রতাপ বীর বিরাট দৈন্য দুঃখে তাহার
শৃঙ্গের সম অটল স্থির। জ্বালিল সেখানে সেই দাবাগ্নি
সে রূপবহ্নি পদ্মিনীর, ঝাপিয়া পড়িল সে মহা আহবে
যবনসৈন্য ক্ষত্রবীর।
(কোরাস) মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির- তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর। মেবার পাহাড় মেবার পাহাড়-
রঞ্জিত করি কাগার তীর দেশের জন্য ঢালিল রক্ত
অযুত যাহার ভক্তবীর। চিতোর দুর্গ হইতে খেদায়ে
ম্লেচ্ছ রাজায় গর্জনীর হরিয়া আনিল কন্যা তাহার
বিজয়গর্বে বাপ্পা বীর!
(কোরাস) মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির- তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় গলিয়া পড়িছে হইয়া ক্ষীর
সবার সবার হইতে মধুর যাহার শস্য যাহার নীর।
যাহার কুঞ্জে বিহগ গাইছে গুঞ্জরি স্তব যাহার শ্রীর
যাহার কাননে বহিয়া যাইছে সুরভিস্নিগ্ধ পবন ধীর।
(কোরাস) মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির- তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প
দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।
মেবার পাহাড় মেবার পাহাড় ধুম্র যাহার তুঙ্গ শির
স্বর্গ হইতে জ্যোৎস্না নামিয়া ভাসায় যাহার কাননতীর।
এাধুরী বন্য কুসুমে জাগিয়া ঘুমায় অঙ্গে রমণী শ্রীর
শৌর্যে স্নেহে ও শুভ্রচরিতে কে সম মেবার সুন্দরীর।
(কোরাস) মেবার পাহাড় উড়িছে যাহার
রক্তপতাকা উচ্চশির-
তুচ্ছ করিয়া ম্লেচ্ছদর্প দীর্ঘ সপ্ত শতাব্দীর।

১৪. তুমি তো মা সেই তুমি তো মা সেই
চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা
আমরা শুধুই হয়েছি মা হীন
হারায়েছি সব বিভব গরিমা
তুমি তো মা আছ তেমনি উচ্চ
আমরা শুধুই হয়েছি তুচ্ছ
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম
জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা
এখনো তোমার গগন সুনীল
উজল তপন তারকা চন্দ্রে
এখনো তোমার চরণে ফেনিল
জলধি গরজে জলদ মন্ত্রে
এখনো ভেদি হিমাদ্রি-জঙ্ঘা
উছলি পড়িছে যমুনা গঙ্গা
ঢালিয়া শতধা পীযুষ-পুণ্য
তোমার ক্ষেত্রে যাইছে বহি মা
তুমি তো মা সেই সুজলা সুফলা
এখনও হরষে ভাসায় নেত্রে
পুষ্প তোমার নিবিড় কুঞ্জে
শস্য তোমার শ্যামল ক্ষেত্রে
তোমার বিভবপূর্ণ বিশ্ব
আমরা দুঃখি আমরা নিঃস্ব
তুমি কি করিবে তুমি তো মা সেই
মহিমা গরিমা পুণ্যময়ী মা

১৫. ধনধান্য পুষ্পভরা আমাদের এই বসুন্ধরা

পর্যায়: দেশ
রাগ: কেদারা মিশ্র
তাল: দাদরা

তাহার মাঝে আছে দেশ এক–সকল দেশে সেরা,–
ও সে, স্বপ্ন দিয়ে তৈরি সে-দেশ, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা;
(কোরাস)– এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে–আমার জন্মভূমি।
চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা, কোথায় উজল এমন ধারা।
কোথায় এমন খেলে তড়িৎ এমন কালো মেঘে!
তার পাখির ডাকে ঘুমিয়ে উঠি, পাখির ডাকে জেগে;
(কোরাস)– এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে–আমার জন্মভূমি।
এত স্নিগ্ধ নদী কাহার, কোথায় এমন ধূম্র পাহাড়!
কোথায় এমন হরিৎক্ষেত্র আকাশতলে মিশে!
এমন ধানের উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!
(কোরাস)– এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে–আমার জন্মভূমি।
পুষ্পে পুষ্পে ভরা শাখী; কুঞ্জে কুঞ্জে গাছে পাখি;
গুঞ্জরিয়া আসে অলি পুঞ্জে পুঞ্জে ধেয়ে–
তারা, ফুলের উপর ঘুমিয়ে পড়ে ফুলের মধু খেয়ে;
(কোরাস)– এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,

সকল দেশের রানি সে যে–আমার জন্মভূমি।
ভায়ের মায়ের এত স্নেহ কোথায় গেলে পাবে কেহ!
ও মা তোমার চরণ দুটি বক্ষে আমার ধরি,
আমার এই দেশেতে জন্ম–যেন এই দেশেতে মরি–
(কোরাস)– এমন দেশটি কোথায় খুঁজে পাবে নাকো তুমি,
সকল দেশের রানি সে যে–আমার জন্মভূমি।

১৬. ভারত আমার ভারত আমার যেখানে মানব মেলিল নেত্র — পর্যায়: স্বদেশ
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা এশিয়ার তুমি তীর্থক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননী, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প কর্ম ভক্তি ধর্ম শিক্ষা।
(কোরাস) ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী,
ভগবদগীতা গায়িল স্বয়ং ভগবান সেই জাতির সঙ্গে
ভগবৎপ্রেমে নাচিল গৌর যে দেশের ধুলি মাখিয়া অঙ্গে।
সন্ন্যাসী সেই রাজার পুত্র প্রচার করিল নীতির মর্ম
যাদের মধ্যে তরুণ তাপস প্রচার করিল সোহহং ধর্ম।
(কোরাস) ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
আর্য ঋষির অনাদি গভীর, উঠিল যেখানে বেদের স্তোত্র
নহ কী মা তুমি সে ভারতভূমি নহি কি আমরা তাদের গোত্র!
তোমার গরিমা স্মৃতির বর্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ
যাদের গরিমাময় এ অতীত, তারা কখনোই নহে মা তুচ্ছ।
(কোরাস) ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
ভারত আমার ভারত আমার সকল মহিমা হউক খর্ব
দুঃখ কি যদি পাই মা তোমার পুত্র বলিয়া করিতে গর্ব
যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ লুপ্ত হয় এ মানববংশ।
যাদের মহিমাময় এ অতীত তাদের কখন হবে না ধ্বংস।
(কোরাস) ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।
চোখের সামনে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেবভূমির প্রতি তৃণ পরে, আছে বিধাতার করুণাদৃষ্টি
এ মহাজাতির মাথার উপর করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।
(কোরাস) ভারত আমার ভারত আমার
কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম জ্ঞানের তুমি মা জননী ধর্ম ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।

১৭. যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননী ভারতবর্ষ! — পর্যায়: স্বদেশ
উঠিল বিশ্বে সে কী কলরব, সে কী মা ভক্তি, সে কী মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে জয় মা জননী, জগত্তারিণী জগদ্ধাত্রী!
(কোরাস) ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণকমল করিয়া স্পর্শ
গাইল 'জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী ভারতবর্ষ!
সদ্যঃ স্নান সিক্ত বসনা চিকুর সিন্ধু শীকর লিপ্ত
ললাটে গরিমা, বিমল হাস্যে, অমল কমল আনন দীপ্ত
উপরে গগন ঘেরিয়া নৃত্য করিছে তপন তারকা চন্দ্র
মন্দ্র মুগ্ধ চরণে ফেনিল জলধি গরজে জলদ মন্ত্র।
ধন্য হইল ধরনী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী ভারতবর্ষ।
শীর্ষে শুভ্র তুষার কিরীট সাগর ঊর্মি ঘেরিয়া জঙ্ঘা
বক্ষে দুলিছে মুক্তার হার–পঞ্চসিন্ধু যমুনা গঙ্গা।
কখন মা তুমি ভীষণ দীপ্ত তপ্ত মরুর উষর দৃশ্যে;
হাসিয়া কখন শ্যামল শস্যে, ছড়ায়ে পড়িছ নিখিল বিশ্বে।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।
উপরে, পবন প্রবল স্বননে শূন্যে গরজি অবিশ্রান্ত,
লুটায়ে পড়িছে পিক কলরবে চুম্বি তোমার চরণ প্রান্ত,
উপরে, জলদ হানিয়া বজ্র। করিয়া প্রলয় সলিল বৃষ্টি–
কুসুমগন্ধ করিছে সৃষ্টি।
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।
জননী তোমার বক্ষে শান্তি কণ্ঠে তোমার অভয় উক্তি,
হস্তে তোমার বিতর অন্ন, চরণে তোমার বিতর মুক্তি,
জননী! তোমার সন্তান তরে কত-না বেদনা কত-না হর্ষ;
জগৎপালিনী! জগত্তারিণী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ!
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ;
গাইল জয় মা জগন্মোহিনী! জগজ্জননী! ভারতবর্ষ।

১৮. সুখের স্রোতে ভাসিয়ে দেব — পর্যায়: স্বদেশ
আমরা আজি বীরের প্রাণে। — নাটক: সোরাব রুস্তম
সুনীল আকাশ শ্যামল ভুবন
ছেয়ে দেব গানে গানে।
আকাশ থেকে শুনবে তারা,
মানুষ হবে মাতোয়ারা,
হয়ে যাবে আপনহারা
বিশ্বে আছে যে যেখানে।
কানন পাহাড় উঠবে নেচে,
আপনি মরণ উঠবে বেঁচে,
সকল দুঃখ ডুবে গেছে
সুখের গীতিসুধাপানে।

১৯. সেথা গিয়াছেন তিনি সমরে, আনিতে জয়গৌরব জিনি
সেথা গিয়াছেন তিনি মহা আহবানে
মানের চরণে প্রাণ বলিদানে
মথিতে অমর মরণসিন্ধু, আজি গিয়াছেন তিনি।
(কোরাস) সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠো বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছো এ অশ্রুনীর
সেথা গিয়াছেন তিনি করিতে রক্ষা শত্রুর নিমন্ত্রণে
সেথা বর্মে বর্মে কোলাকুলি হয়
খড়গে খড়গে ভীম পরিচয়
ভ্রুকুটির সহ গর্জন মিশে রক্ত রক্ত সনে।
(কোরাস) সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠো বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছো এ অশ্রুনীর।
সেথা নাহি অনুনয় নাহি পলায়ন, সে ভীম সমর মাঝে
সেথা রুধির রক্ত অসিত অঙ্গে, মৃত্যু নৃত্য করিছে রঙ্গে
গভীর আর্তনাদের সঙ্গে বিজয়বাদ্য বাজে।
(কোরাস) সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠো বীরজায়া বাঁধো কুন্তল মুছো এ অশ্রুনীর।
সেথা গিয়াছেন তিনি সে মহা আহবে জুড়াইতে সব জ্বালা
হেথা হয়তো ফিরিতে জিনিয়া সমর
হয়তো মরিয়া হইতে অমর
সে মহিমা ক্রোড়ে ধরিয়া হাসিয়া তুমিও মরিবে বালা।
(কোরাস) সধবা অথবা বিধবা তোমার রহিবে উচ্চশির
উঠো বীরজায়া, বাঁধো কুন্তল, মুছো এ অশ্রুনীর।

দ্বিজেন্দ্রলালের হাস্যপরিহাস ও ব্যাঙ্গানুকৃতি পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

২০. আজি এই শুভদিনে শুভক্ষণে উড়ায়ে দিই জয়ধ্বজায় — পর্যায়: হাস্য পরিহাস
উপাধি পেয়েছি যা, রাখতে তা তো হবে বজায় — ব্যঙ্গানুকৃতি
আমাদের ভক্তি যা এ- এ যে গো মানের দায়ে
এখন তো উচিত কার্য এদিক ওদিক বুঝে চলাই
সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়।
আজি এই শুভরাতি, জ্বালাব বাতি ঘরে ঘরে ভক্তিভাবে
নৈলে যে চাকরী যাবে, নৈলে যে চাকরী যাবে।
আমাদের ভক্তি যা এ- এ যে গো পেটের দায়ে
নিয়ে আয় চেরাগবাতি, নিয়ে আয় দিয়েশলাই
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।
জয় জয় মোঘল ব্যাঘ্র মোঘল ব্যাঘ্র
ব'লে জোরে ডঙ্কা বাজাই
পাহারা ফিরছে দ্বারে সেটা যেন ভুলে না যাই
আমাদের ভক্তি যা এ- এ যে গো প্রাণের দায়ে
কী জানি পিছন থেকে কখন ফাঁসি পড়ে গলায়
সাধে কি বাবা বলি গুতোর চোটে বাবা বলায়।
আমরা সব রাজভক্ত রাজভক্ত বলে চ্যাচাই উচ্চরবে

কারণ সেটার যতই অভাব ততই সেটা বলতে হবে।
আমাদের ভক্তি যা এ মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে
দেখে সে রক্ত আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পালায়
সাধে কি বাবা বলায়, গুতোর চোটে বাবা বলায়।
ভোলানাথ শুয়ে আছেন, ঈশ্বর তারে সুখে রাখুন
কালী জিব মেলিয়ে আছেন, তা তিনি মেলিয়ে থাকুন
শ্রীকৃষ্ণ হয়ে বাঁকা, থাকুন তিনি পটেই আঁকা
আমরা সব নিয়ে শরণ মোগলদেবের চরণতলায়
সাধে কি বাবা বলি, গুতোর চোটে বাবা বলায়।

২১. আমরা বিলাত ফেরত ক-ভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই — পর্যায়: হাস্য পরিহাস ব্যাঙ্গানুকৃতি
তাই কি করি নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি, আমরা শিখেছি বিলেতি বুলি
আমরা চাকরকে ডাকি বেয়ারা আর মুটেদের ডাকি কুলি।
রাম কালীপদ হরিচরণ, নাম এসব সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের সব 'ডে' 'রে' ও 'মিটার' করিয়াছি নামকরণ
আমরা সাহেব সঙ্গে পটি, আমরা মিস্টার নামে রটি,
যদি সাহেব না বলে বাবু কেহ বলে মনে মনে ভারী চটি।
আমরা ছেড়েছি টিকির আদর, আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যান্ট কোট পরে সেজেছি বিলেতি বাদর
আমরা বিলেতি ধরণে হাসি, আমরা ফরাসি ধরণে কাশি
আমরা পা ফাক করিয়া সিগারেট খেতে বড্ডই ভালবাসি।
আমরা হাতে খেতে বড় ডরাই আমরা স্ত্রীকে ছুরি কাটা ধরাই
আমরা মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে জ্যাকেট পরাই।
আমাদের সাহেবিয়ানার বাঁধা এই যে রংটা হয়না সাদা,
তবু চেষ্টার ত্রুটি নেই, ভিনোলিয়া মাখি রোজ গাদা গাদা।
আমরা বিলেত ফেরত কটায়, দেশে কংগ্রেস আদি ঘটাই
আমাদের সাহেব যদিও দেবতা, তবু ওই সাহেবগুলোই চটাই
আমরা সাহেবিরকমে হাটি, স্পিচ দেই ইংরেজি খাঁটি
কিন্তু বিপদেতে দেই বাঙালিরই মত চম্পট পরিপাটি।

২২. চম্পটি চম্পটি চম্পটি, — হাস্য পরিহাস ব্যাঙ্গানুকৃতি
চম্পটির দল আমরা সবে।
একটু মেশালরকমভাবে।
আমরা কজনই এইটি ভবে।
যা কিছু দেশি রং রেখেছি সায়েবি ঢং;
একটু তবু নেটিভ গন্ধ, কী কর্ব তা রবেই রবে।
ইংরেজিতে কহি কথা, সেটা পাপার উপদেশ'
হ্যাট্টা কোট্টা পরি কেন– কারণ সেটা সভ্য বেশ'
চক্ষে কেন চশমা সাজ?– কারণ সেটা ফ্যাশন আজ;–
চশমা শূন্য ছাত্রমহল, কোথায় কে দেখেছে কবে।
বঙ্গভাষা কইতে শিখছি, বছর দুতিন লাগবে আরো;
তবে এখন কইছি যে, সে তোমরা যাতে বুঝতে পার'
টেবিলে খাচ্ছি খানা করণ সে সাহেবিয়ানা;
খাই-বা যদি শাক-চচ্চড়ি টেবিলেতে খেতেই হবে।
ইউরেশিয়ান ছেলেমেয়ে তৈরি মোরা হচ্ছি ক্রমে,
এদিকেও সংখ্যায় বাড়ছি বিনা কোনো পরিশ্রমে;
জানি না কী হবে শেষে, কোথায়-বা চলছি ভেসে;
মাঝিশূন্য নৌকার উপর ভেসে যাচ্ছি ভবাণ্যবে।

২৩. নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো। — হাস্য পরিহাস ব্যঙ্গানুকৃতি
নাকগুলো সব কাটো, কানগুলো সব ছাঁটো;
পাগুলো সব উঁচু করে, মাথা দিয়ে হাঁটো;
হামাগুড়ি দাও, লাফাও, ডিগবাজি খাও, ওড়ো;
কিংবা চিতপাত হয়ে–পাগুলো সব ছোড়ো;
ঘোড়াগুলো ছেড়ে এখন বাইসিকেলে চড়ো,
–নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
ডালভাতের দফা করো সবাই রফা
করো শীগগির ধুতিচাদরনিবারিণী সভা
প্যান্ট পরো কোট পরো নইলে নিভে গেলে
ধুতিচাদর হয়েছে যে নিতান্ত সেকেলে
কাঁচকলা ছাড়ো এবং রোষ্ট চপ করো
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
কিংবা সবাই ওঠো, টাউন হলে জোটো
হিন্দুধর্ম প্রচার করতে আমেরিকায় ছোট
আমরা যেন নেহাতই খাটো হয়ে না যাই দেখো
খুব খানিক চ্যাচাও কিংবা খুব খানিক লেখো
বেন, মিল ছাড়ো, আবার ভাগবত পড়ো।
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।
আর কিছু না পারো, স্ত্রীদের ধরে মারো
কিংবা তাদের মাথায় তুলে নাচো ভালো আরো!
একেবারে নিভে যাচ্ছে দেশের স্ত্রীলোক
বিএ, এমএ, ঘোড়সওয়ার, যা একটা কিছু হোক।
যা হয় একটা করো কিছু রকম নতুনতর
নতুন কিছু করো, একটা নতুন কিছু করো।
হয়েছি অধীর যত বঙ্গবীর
এখন তবে কাটো সবাই নিজের নিজের শির
পাহাড় থেকে পড়ো, সমুদ্রে দাও ডুব
মরবে না হয় মরবে একটা নতুন হবে খুব।
নতুনরকম বাঁচো কিংবা নতুনরকম মরো
নতুন কিছু করো একটা নতুন কিছু করো।

২৪. তোমরা দেশোদ্ধারটা করতে চাও কী — হাস্য পরিহাস ব্যঙ্গানুকৃতি
করে মুখে বড়াই?
তা সে হবে কেন!
তোমরা বাক্যবাণে শুধু ফতে করতে
চাও কী লড়াই?
তা সে হবে কেন!
তোমরা ইংরেজদের-গৌরবের ক্ষুব্ধ বলে
চাও কী যে, সে
তোমাদের ও করপদ্মে দেশটা সঁপে, শেষে
তল্পিতল্পা বেঁধে, নিজের চলে যাবে দেশে?
তা' সে হবে কেন!

২৫. রেখে দেও রেখে দেও প্রেমগীতি স্বরে রে।
কেন ও কুহক আর ভারত ভিতরে রে।
যাও চলি পরভূত, চাই না ও মৃদুগীত,
গাও রে পাপিয়া তবে ভাসায়ে অম্বরে রে।
শুনিয়া মুরলী-গান জাগিবে না আর্যপ্রাণ,
ঢালিবে সে স্বপ্ন তার শ্রবণ-কুহরে রে।
উঠ তবে পার যদি, রে তুরী গগনভেদী,
উঠ কাঁপি দূরাকাশে লহরে লহরে রে।

২৬. "কি দুঃখ কহ গো মাতৃ লহ এত অপমান
দেখিতে তোমার দুখ, কাঁদে যে আমার প্রাণ।"
"জ্বালাও ভারত হাসে উৎসাহ অনল
ফেলিব না শোকে আর নয়নের জল।"
"জানি না জননী কেন এত ভালোবাসি
দুঃখের পীড়নে মোর হৃদয় ব্যথিত হলে
জানি না তোমারি কাছে কেন ধেয়ে আসি।"
"আয় ভারতসন্তান হয়ে একপ্রাণ
কত আর দুখে একা গাবি তাই দুষগান।"
"গিয়াছে সেদিন গিয়াছে সেদিন
কাঁদ আজ তবে ভারতবাসী।"
কাঁদ রে কাঁদ রে আর্য, কাঁদ অবিরল।
শুকাবে জীবননদী, শুকাবে না আঁখিজল।"

২৭. ধাও ধাও সমর ক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয়গাথা। পর্যায়: স্বদেশ
রক্ষা করিতে পীড়িত ধর্মে শুণ ঐ ডাকে ভারতমাতা; ছন্দ: লঘুগুরু ছন্দ
কে বল করিবে প্রাণে মায়া
যখন বিপন্ন জননী জায়া?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে–শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি–জয় মা ভারত! জয় মা কালী!
সাজে শয়ন কি হীন বিলাসে–শত্রুবিদগ্ধ যখন পুরপল্লী?
অরাতি-চরণ-বিচিহ্নিত বক্ষে সাজে প্রেয়সীর ভুজবল্লী?
কোষ নিবদ্ধ রবে তরবারি যখন বিলাঞ্ছিত ভারত-নারী?
সাজ সাজ সকলে রণসাজে–শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি–জয় মা ভারত! জয় মা কালী!
সমরে নাহি ফিরাইব পৃষ্ঠ–শত্রুকরে কভু হব না বন্দী
ডরি না থাকে যাই অদৃষ্টে–অধর্ম সঙ্গে করি না সন্ধি।
রব না হব মা শত্রুর ভৃত্য সম্মুখ সমরে জয় বা মৃত্যু–
সাজ সাজ সকলে রণসাজে–শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি–জয় মা ভারত! জয় মা কালী!
ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে শত্রুসৈন্যদল করিব বিভিন্ন
পুণ্য সনাতন আর্যাবর্তে রাখিব না রিপুদল পদচিহ্ন।
অরাতি-রক্তে করিব স্নান করিব বিরঞ্জিত হিন্দুস্থান।
সাজ সাজ সকলে রণসাজে–শুন ঘন ঘন রণভেরী বাজে!
চল সমরে দিব জীবন ঢালি–জয় মা ভারত! জয় মা কালী!

রজনীকান্ত সেনের স্বদেশচেতনার গান

ক্রমিক	রজনীকান্ত সেনের স্বদেশপর্যায়ের গানের তালিকা ১৬টি গান	তথ্য
১.	তাই ভালো, মোদের মায়ের ঘরের শুধু ভাত, মায়ের ঘরের ঘি-সৈন্ধব, মার বাগানের কলার পাত। ভিক্ষার চালে কাজ নাই, সে বড় অপমান; মোটা হোক্, সে সোনা মোদের মায়ের ক্ষেতের ধান! সে যে মায়ের ক্ষেতের ধান! মিহি কাপড় প'র্‌ম না আর যেচে পরের কাছে; মায়ের ঘরের মোটা কাপড় প'র্‌লে কেমন সাজে; দেখ্‌তো প'র্‌লে কেমন সাজে! ও ভাই চাষী, ও ভাই তাঁতী আজকে সুপ্রভাত; ক'সে লাঙ্গল ধর ভাই রে, ক'সে চালাও তাঁত। ক'সে চালাও ঘরের তাঁত!	জংলা-কাহারবা
২.	জয় জয় জনমভূমি, জননী! যাঁর, স্তন্যসুধাময় শোণিত ধমনী; কীর্ত্তি-গীতিজিত, স্তম্ভিত, অবনত, মুগ্ধ, লুব্ধ, এই সুবিপুল ধরণী। উজ্জ্বল-কানন-হীরক-মুক্ত- মণিময়-হার বিভূষণ-যুক্তা; শ্যামল-শস্য পুষ্প-ফল পূরিত, সকল-দেশ জয়-মুকুটমণি! সর্ব্ব-শৈল-জিত, হিমগিরি-শৃঙ্গে, মধুর-গীতি চির-মুখরিত ভৃঙ্গে, সাহস-বিক্রম বীর্য্য-বিমণ্ডিত, সঞ্চিত-পরিণত জ্ঞান-খনি! জননী-তুল্য তব কে মর-জগতে? কোটি কণ্ঠে কহ, "জয় মা! বরদে!" দীর্ণ বক্ষ হ'তে, তপ্ত রক্ত তুলি, দেহ পদে তবে ধন্য গণি!	মিশ্র পরোজ-কাওয়ালী
৩.	ভারতকাব্যনিকুঞ্জে– জাগ সুমঙ্গলময়ী মা! মুঞ্জরি তরু, পিক গাহি', করুক প্রচারিত মহিমা। তুলে লহ নীরবে বীণা, গীত-হীনা; অতি দীনা;– হে ভারত, চির-দুখ-শয়ন-বিলীনা; নীতি-ধর্ম-ময় দীপক মন্দ্রে, জীবিত কর সঞ্জীবনমন্ত্রে, জাগিবে রাতুল-চরণ-তলে, যত, লুপ্ত পুরাতন গরিমা।	ভৈরবী, কাওয়ালী

৪. তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম-ধরণী সরসা, ভৈরবী-জলদ একতালা
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত-মণি-রঞ্জিত-নভো-নীলাঞ্চলা
সৌম্য-মধুর-দিব্যাঙ্গনা, শান্ত-কুশল-দরশা।
দূরে হের চন্দ্র-কিরণ-উদ্ভাসিত গঙ্গা,
নৃত্য-পুলক-গীতি-মুখর-কলুষহর-তরঙ্গা;
ধায় মত্ত-হরষে সাগরপদ-পরশে,
কুলে কুলে করি' পরিবেশন মঙ্গলময় বরষা।
ফিরে দিশি দিশি মলয় মন্দ, কুসুম-গন্ধ বহিয়া,
হাসিছে দিগ্‌বালিকা, কণ্ঠে বিজয়মালিকা,
নবজীবন-পুষ্পবৃষ্টি করিছে পুণ্য-হরষা।
ওই হের, স্নিগ্ধ সবিতা উদিছে পূর্ব্ব-গগনে
কন্তোজ্বল কিরণ বিতরি', ডাকিছে সুপ্তি-মগনে।
নিদ্রালস-নয়নে, এখনও রবে কি শয়নে ?
জাগাও, বিশ্ব-পুলক-পরশে, বক্ষে তরুণ ভরসা।
জাগন্ত বিশ্ব পুলক পরশে ব্যস্ত তরুণ ওরসা ॥

৫. তবু ভাঙ্গে না ঘুমের ঘোর,
দ্যাখ্ হয়েছে যামিনী ভোর।
ওই নবীন তপন মহাজাগরণ
আনে না নয়নে তোর!
শিয়রে গগনচুম্বী-শির,
(ও সে) অচল সৌম্য ধীর –
কোটি নিঝর ঝর ঝর ঝরে –
কোটি নয়ন-লোর;
(সে যে) দেখায় নীরবে ইন্দ্রপ্রস্থ পানিপথ চিতোর।
ওই নীল সিন্ধুজল,
চির-গর্ব্বিত-চঞ্চল–
তীব্র আবেগে করিছে প্রহত
বধির দুয়ার তোর;
বলে 'জাগ জাগ' নতুবা ডুবে না
অতল গর্ভে মোর!

৬. একই মায়ের দুটি সন্তান
হিন্দু আর মুসলমান
একটি কুলে জন্ম মোদের
একই বুকে দুগ্ধপান।
দেখে আর ভাই হিন্দু-মুসলিম
মদিনা আর মাসুরায়
দুই রাখাল যুক্তি করে
গরু আর বকরি চড়ায়।

৭. মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মুলতান–গড় খেম্‌টা
মাথায় তুলে নে রে ভাই;
দীনদুঃখিনী মা যে তোদের
তার বেশি আর সাধ্য নাই।
ঐ মোটা সুতোর সঙ্গে, মায়ের
অপার স্নেহ দেখ্‌তে পাই;
আমরা, এমনি পাষাণ, তাই ফেলে ঐ
পরের দোরে ভিক্ষে চাই।
ঐ দুঃখী মায়ের ঘরে, তোদের
সবার প্রচুর অন্ন নাই,
তবু, তাই বেচে কাঁচ, সাবান মোজা,
কিনে কল্লি ঘর বোঝাই।
আয় রে আমরা মায়ের নামে
এই প্রতিজ্ঞা ক'রব ভাই;
পরের জিনিস কিন্‌বো না, যদি
মায়ের ঘরের জিনিস পাই।

৮. আমরা, নেহাৎ গরিব, আমরা নেহাৎ ছোটো;
তবু, আজি সাত কোটি ভাই, জেগে ওঠ!
জুড়ে দে ঘরের তাঁত, সাজা দোকান;
বিদেশে না যায় ভাই, গোলারি ধান;
আমরা, মোটা খাব, ভাই রে প'রব মোটা,
মাখ্‌ব না ল্যাভেন্ডার চাইনে 'অটো'।
নিয়ে যায় মায়ের দুধ পরে দুয়ে,
আমরা র'ব কি উপোসী ঘরে শুয়ে ?
হারাস্‌নে ভাই রে আর এমনি সুদিন;
মায়ের পায়ের কাছে এসে জোটে।

৯. রে তাঁতী ভাই, একটা কথা মনে লাগিয়ে শুনিস্;
ঘরে তাঁত যে ক'টা আছে রে,
তোরা স্ত্রী-পুরুষে বুনিস্ ॥
এবার যে ভাই তোদের পালা,
ঘরে ব'সে ক'সে মাকু চালা;
কলের কাপড় বিশ হবে রে,
না হয় তোদের হবে উনিশ!
তোদের সেই পোরানো তাঁতে,
কাপড় বুনে দিবি নিজের হাতে,
আমরা মাথায় ক'রে নিয়ে যাবে রে,
টাকা ঘরে ব'সে গুনিস্!
তোমারি গৃহে বসতি করি,
খেয়েছি তোমারি অন্ন,
তোমারি বায়ু দিতেছ আয়ু,
বেঁচে আছি তোমারি জন্য;
ক্ষুধা হ'রেছে তব ফলে,

পিপাসা গেছে তব জলে;
সে কি ভুল, যে ভুলে ভুলে'
প্রভু, তোমারি নাম করি না!
তোমারি মেঘে শস্য আনে,
ঢালি; পীযুষ-জল-ধারা,
অবিরত দিতেছে আলো,
তোমারি রবি-শশি-তারা,
শীতল তব বৃক্ষছায়া,
সেবে নিয়ত, ক্লান্ত কায়া,
(তবু) তোমারি দেওয়া মন র'য়েছে
ভুলে তোমারি গুণ-গরিমা।

১০. আয় ছুটে ভাই, হিন্দু-মুসলমান! — সংকীর্তন-গড়ু খেমটা
ঐ দেখ ঝর্‌ছে মায়ের দু-নয়ান।
আজ, এক ক'রে নে সন্ধ্যা-নমাজ,
মিশিয়ে দে আজ, বেদ-কোরাণ!
(জাতিধর্ম ভুলে গিয়ে রে)
(হিংসাবিদ্বেষ ভুলে গিয়ে রে)
থাকি একই মায়ের কোলে, করি
একই মায়ের স্তন্যপান।
(এক মায়ের কোল জুড়ে আছি রে)
(এক মায়ের দুধ খেয়ে বাঁচি রে)
আমরা পাশাপাশি, প্রতিবাসী,
দুই গোলারি একই ধান।
(একই ক্ষেতে সে ধান ফলে রে),
(একই ভাতে একই রক্ত ব'য়ে যায়)
এক ভাই না খেতে পেলে,
কাঁদে না কোন্ ভায়ের প্রাণ?
(এমন পাষাণ কেবা আছে রে)
(এমন কঠিন কেবা আছে রে)
বিলেতে ভারত দু'টো বটে, দুয়েরি এক ভগবান্
(দুই চ'খে যে দু'দেশ দেখে না)
(তার কাছে তা সবাই সমান রে)

১১. আর কি ভাবিস্ মাঝি ব'সে ? — বাউলের সুর, খেম্‌টা
এই বাতাসে পাল তুলে দিয়ে,
হাল ধরে থাক্ ক'সে।
এই হাওয়া প'ড়ে গেলে, স্রোতে যে ভাই নেবে ঠেলে,
কূল পাবিনে, ভেসে যাবি,
মর্‌বি যে মনের আপসোসে
মিছে বকিস্ আনাড়ি, এই বেলা ধর্‌বে পাড়ি,
'পাঁচপীর বদর' ব'লে, পুরো মনের খোশে;
এখন বাতাস আর র'বে না, পারে যাওয়া আর হবে না,
মরণ-সিন্দু মাঝে গিয়া, পড়বি রে নিজ কর্ম্মদোষে।

১২. নিষ্প্রভ কেন চন্দ্র তপন, স্তম্ভিত মৃদু গন্ধবহন, ঝিঝিট-ঝাঁপতাল
ধীর তটিনী মন্দ গমন, স্তব্ধ সকল পাখী।
সজল করুণা যত নয়ান, শুষ্ক মলিন নত বয়ান,
লক্ষ শোক নিহিত বক্ষে দুঃখ উঠিছে জাগি' ॥
ত্যক্ত সকল সুখ-বিলাস, উষ্ণ বিফল দুখ-নিশাস,
"হা বান্ধব" উঠিছ ভাষ, অন্তর তল থাকি'।
বৃদ্ধ যুবক অর্থী নিঃস্ব, হা হা রবে পূরিল বিশ্ব,
শোক-মুগ্ধ নিখিল বঙ্গ, সৌম্য হে তব লাগি'।

১৩. মা বলে ভাই ডাকলে মাকে, ধরবে টিপে গলা
তবে কি ভাই বাংলা হতে উঠবে রে 'মা' বলা?
মাল্লে কি আর 'মা' ডাক ছাড়াতে পারি?
হাজার মারো, 'মা' বলা ভাই কেমন করে ছাড়ি?

১৪. সেথা আমি কি গাহিব গান ? গৌরী একতাল
যেথা, গভীর ওঙ্কারে, সাম ঝঙ্কারে,
কাঁপিত দূর বিমান।
যেথা, সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা, বাণী শুভ্রকমলাসীনা,
রোধি' তটিনী-জল-প্রবাহ, তুলিত মোহন তান।
যেথা, আলোড়ি' চন্দ্রালোক শারদ,
করি' হরিগুণগান নারদ,
মন্ত্রমুগ্ধ করিত ভুবন, টলাইত ভগবান।
যেথা, যোগীশ্বর-পুণ্যপরশে মূর্ত্ত রাগ উদল হরষে;
মুগ্ধ কমলাকন্ত চরণে জাহ্নবী জনম পান।
যেথা, বৃন্দাবন-কেলিকুঞ্জে, মুরলী-রবে পুঞ্জে পুঞ্জে,
পুলকে শিহরি' ফুটিত কুসুম, যমুনা যেত উজান।
আর কি ভারতে আছে সে যন্ত্র,
আর কি আছে সে মোহন মন্ত্র,
আর কি আছে সে মধুর কণ্ঠ, আর কি আছে সে প্রাণ?

১৫. নীল সিন্ধু ওই গর্জ্জে গভীর; মিশ্র গৌরী–কাওয়ালী
ভৈরব রাগ-মুখর করি' তীর।
অতল-উচ্চ-চল-উর্ম্মি-মালশত–
শুভ্র ফেন-যুত, রঙ্গ অধীর;
ভীতি-বিবর্দ্ধন, তাণ্ডব নর্ত্তন,
ভীম রোলে করি শ্রবণ বধির।
সিন্দু কহে, "তব ভূমিখণ্ড কত
ক্ষুদ্র, হের মম বিপুল শরীর;
তীব্র হরষে মম অঙ্গ পরশে,
কি তরঙ্গ তুলিয়া, চির-সঙ্গী-সমীর
রত্ন-রাজি কত, যত্ন-সুরক্ষিত,
সঞ্চিত কোষ লুব্ধ ধরণীর;
সার্থকতা লভে মুগ্ধ, তরঙ্গিণী,
আসি, 'পদে মিলি', পতি জলধির!
(আনি) ইন্দ্রচাপ-নিভ-স্নিগ্ধ মনোহর

বর্ণে সুরঞ্জিত, কিরণে রবির;
পারিজাত তরু, অমৃত সুধাকর
মন্থনে তুলিল সুরাসুর বীর।
(কত) অর্ণবপোত পণ্য ভরি', ধাইছে,
কর্ণে সুপরিচিত নাবিক ধীর;
ভগ্ন-শেষ কত, করিছে প্রমাণিত
ধ্রুব-পরিহাস নিঠুর নিয়তির।
(যবে–অমৃত-ধারে ভরি' পিতৃবক্ষ, হয়
উদয় মনোরম পূর্ণ শশীর;
আনি' আলো করি হৃদয়-কুটীর
চন্দ্র-বিরহে পুনঃউদ্বেলিত চিত,
আবৃত করে ঘন-দুঃখ-তিমির;
করি, সজ্জিত, সুন্দর, প্রচুর পুষ্প-ফল
শস্য-রাশি দিয়ে দেহ মহীর।
লক্ষ-পুরাতন-সন্ধি-সমর ইতি–
হাস বিমিশ্রিত এ বিপুল নীর;
দীনে দান কত করিনু অকাতরে,
সম্পদ লয়ে গর্ব্বিত নৃপতির।
(তব) শক্তিপুঞ্জ মম মূর্ত্তি হেরি'
হয় স্তম্ভিত, ভীত, পদানত শির;
সর্ব্ব গর্ব্ব মম যাঁর কৃপাবলে,
নমি সে সুমঙ্গল-পদে প্রভুজীর।"

১৬. ভেদ-বুদ্ধি, ছাড়, 'দুর্গা', 'হরি', দুই তো নয়,
একেরি দুই পরিচয়।
কালী, দুর্গা, হরি, কৃষ্ণ,
একই ব্রহ্মশাস্ত্রে কয়;
শাক্ত হ'লে হরি-দ্বেষী
তার যে ভজন বিফল হয়।
আবার, হরি-ভক্ত, শাক্তে হিংসা
ক'র্‌লে অনন্ত নিরয়,
শাক্ত, দে ভাই 'হরি-ধ্বনি',
বৈষ্ণব, বল 'কালীর জয়'।

রজনীকান্ত সেনের আরাধনার গানে স্বদেশচেতনা

১৭. তিমিরনাশিনী, মা আমার। 'নিপট কপট তুঁহু শ্যাম'–সুর
হৃদয়-কমলোপরি, চরণ কমল ধরি'
চিন্ময়ী মূরতি অখিল-আঁধার!
নিন্দি' তুষার-কুমুদ-শশি-শঙ্খ,
শুভ্র-বিবেক-বরণ অকলঙ্ক,
মুক্ত-শূন্য-ময়, শ্বেত, রশ্মি-চয়,
দূর করে তমঃ-তর্ক-বিচার।
ওই করিল করুণাময়ী দৃষ্টি,
সম্ভব হইল জ্ঞানময়ী সৃষ্টি।

১৮. নমো নমো নমো জননী বঙ্গ! — সুরট মল্লার-একতাল
উত্তরে ঐ অভ্রভেদী,
অতুল, বিপুল, গিরি, অলঙ্ঘ্য।
দক্ষিণে সুবিশাল জলধি,
চুম্বে চরণ-তল নিরবধি,
মধ্যে পূত-জাহ্নবী-জল–
ধৌত শ্যাম-ক্ষেত্র-সঙ্ঘ।
বনে বনে ছুটে ফুল-পরিমল,
প্রতি সরোবরে লক্ষ কমল,
অমৃতবারি সিঞ্চে, কোটি
তটিনী, মত্ত, খর-তরঙ্গ;
কোটি কুঞ্জে মধুপ গুঞ্জে,
নব কিশলয় পুঞ্জে পুঞ্জে,
ফল-ভার-নত শাখি-বৃন্দে
নিত্য শোভিত অমল অঙ্গ!

১৯. জাগাও পথিকে, ও সে ঘুমে অচেতন। — কেদারা-মধ্যমান
বেলা যায়, বহু দূরে পান্থ-নিকেতন।
থাকিতে দিনের-আলো,
মিলে সে বসতি, ভালো,
নতুবা করিবে কোথা যামিনী যাপন ?
কঠিন বন্ধুর পথ,
বিভীষিকা শত শত;
(তবু) দিবাভাগে, নিদ্রাগত, একি আচরণ ?

২০. জাগ রে দাসদাসি! জাগ রে প্রতিবাসি!
দেখ্ রে কাছে আসি' ফেটে যে গেল বুক।
আয় রে আয় কাছে, আর কি রাতি আছে!
রাজমহিষী হয়ে দেখে যা কত সুখ!
যাহারে পাব ব'লে বছরে ঘুম নাই,
যাহারে বুকে পেলে, নিখিল ভুলে যাই,
যে চ'লে যাবে ভয়ে মরণ আগে চাই!
বিধাতা নেবে তারে, চাবে না মার মুখ
সয়েছি কত বার নূতন এই নয়
আমার এ সহা-দুখ, তথাপি নাহি সয়;
প্রতি শরতে যেন ক্ষত নূতন হয়,
মায়ের প্রাণ ল'য়ে বিধির এ কৌতুক।
জাগ রে শুক, সারি হংসি, শিখি, ধেনু!
মাথায় নে রে তোরা, মায়ের পদ-রেণু;
বরষ প'ড়ে আছে, কে মরে, কেবা বাঁচে,
বিদায় নিয়ে রাখ্ চেপে মনের দুখ।
কান্ত বলে, উমা উজল রাকা-শশী,
হাসিছে হিমগিরি– ভবনাকাশে বসি;
চকিতে দশমীতে নয়ন পালটিতে,
পূর্ণগ্রাস করে সে রাহু পঞ্চমুখ।

২১. জাগো, জাগো, ঘুমায়ো না আর! গৌরী-একতাল

নব রবি জাগে, নব অনুরাগে, ল'য়ে নব সমাচার।
সুরভি-স্নিগ্ধ গন্ধ-বহন হরষ অলস মন্দ গমন
সুপ্ত চক্ষে আনি' জাগরণ
(কহে) "ত্যাজ আলস্য-ভার।"
মৌন বিহগ প্রভাত-সঙ্গে জাগি; বিলাইছে সুর তরঙ্গে,
নব মঙ্গল শুভ বারতা– আশিস দেবতার।
এস ছুটে এস কর্ম্মক্ষেত্রে, চেয়ো না মুগ্ধ অলস নেত্রে,
এত দিন পরে, শুষ্ক অধরে হেসেছেন মা আমার।
ফুল্ল-কুশল-কমলাসনা, শুভ্র-পুণ্য-ক্ষৌম-বসনা,
এসেছেন ফিরে, এস নতশিরে চরণ-যুগলে নমি তাঁর।

২২. আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করেছে
গর্ব্ব করিতে চুর, যশঃ ও অর্থ, মান ও স্বাস্থ্য
সকলি করেছে দূর।
ওইগুলো সব মায়াময় রূপে
ফেলেছিল মোরে অহমিকা-কূপে,
তাই সব বাধা সরায়ে দয়াল করেছে দীন আতুর;
আমায়, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর।
যায়নি এখনো দেহাত্মিক মতি,
এখনো কি মায়া দেহটার প্রতি,
এই, দেহটা যে আমি, সেই ধারণার হয়ে আছি ভরপুর;
তাই, সকল রকমে কাঙ্গাল করিয়া গর্ব্ব করিছে চুর।
ভাবিতাম, "আমি লিখি বুঝি বেশ,
আমার সঙ্গীত ভালোবাসে দেশ,"
তাই, বুঝিয়া দয়াল ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা, কত না যতনে শিক্ষা দিতেছে গর্ব্ব করিতে চুর!

২৩. মোহ-রজনী ভোর হইলে, জাগ নগরবাসী
পূর্ব্ব গগনে সূর্য্য-কিরণ, দুঃখ-তিমির-নাশী।
আর্য্যকীর্ত্তি-মধুর গান,
বিহগ ঢালিছে অমিয়-প্রাণ,
যশ-পরিমল-পূর্ণ-পবনে কুসুম উঠিছে হাসি'।
পাশরি 'সকল দুঃখ দ্বন্দ্ব,
প্রাণে প্রাণে মিলনানন্দ,
জাগ জাগ, হের জগৎ উৎসব অভিলাষী।
কত মরকত কাঞ্চনমণি,
জ্ঞান ধরম নীতির খনি,
কুণ্ঠিত নহ লুণ্ঠিত হেরি অতুল বিভব-রাশি।
অলসে ঘুমায়ে রহিও না আর,
উৎসবে ঢালো প্রাণ তোমার,
হাসিছে বিশ্ব হেরি', তোমারে ক্ষণিক সুখ বিলাসী।

২৪. জেগে ওঠ্ দেখি মা সকল!
হের নব প্রভাতের নব তপন উজল,
শুন জন-কোলাহল ভরা আজি ধরাতল।
এত কলরবে যদি না ভাঙ্গিবে ঘুম,
(যদি) এ ঊষায় না ফুটিবে শকতি-কুসুম,
তবে জননী গো বল্, (আর) কোথা পাব বল?
সীতা, সতী, চিন্তা, দময়ন্তী, লীলা, খনা,
সাবিত্রী, অহল্যাবাঈ, দ্রৌপদী, জনা,
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল্, হেন মণি নিরমল?
কেশ কেটে দিস্‌নি কি ধনুকের ছিলা ক'রে?
'মেরা ঝান্সি নেহি দেগা'—মনে কি পড়ে?
মা গো, কোন্ দেশে আছে বল্ সতী প্রবেশে অনল?
শক্তিরূপিণী তোরা আত্ম-বিস্মৃতা হায়;
এই নব ব্রত ধর, বর মাগো দেব-পায়;
ঐ শকতি সম্বল ল'য়ে হইব সফল।

২৫. জেগে রাখ, ভায়া নারী এল ভবে কি কাজ সাধিতে; বেহাগ-একতাল
ওরা জমা বেঁধে নেয় সংসার জমি,
চষে নাক' কভু আধিতে।
সৃজিতে নয়ন-সলিল বন্যা, প্রসব করিতে পুত্র-কন্যা,
(আর) শত বন্ধনে পুরুষ গরুকে মায়ার খুঁটোয় বাঁধিতে।
পরিতে পার্সি শাড়ী, সিমলাই বোম্বাই, বারাণসী গো,
পরিতে সোনা ও হীরে গহনা গাঁথা যাহে তারা শশী গো;
মোদের খরচে এ সব কার্য্য
সাধিতে হইবে, তা অনিবার্য্য;
'জবাকুসুম' ও 'কুন্তলীনে' চিকুর, কলাপ বাঁধিতে।
বিগ্রহে, কাক-ময়ূর-কণ্ঠা সন্ধিতে, পিক পাপিয়া,
সন্ধি-সমরে, খেতে ছোলাভাজা মোদের স্কন্ধে চাপিয়া।
না হয় আমরা ভাল বাসিব না,
করিতে আসেনি, ছি ছি দাসীপনা;
খাইতে আসেনি মোদের বকুনি
কিংবা হেঁসেলে রাঁধিতে।
কষ্ট করিয়া কোমল শরীরে, কি হেতু কোমল শরীরে,
কি হেতু শিখিবে বিদ্যা ? নিত্য মুখরা বাক্যবাদিনী
ওদের সহজ-সিদ্ধা যামিনী-শয়নে হ'লে বিলম্ব,
শয্যাপার্শ্বে বিষম লম্ব হয়ে নিরুপায়, ও হতভম্ব,
পায়ে ধ'রে হয় সাধিতে। না করিতে এক পয়সা উপায়
অনটন হোক্ হাজারি; না ধরিতে নিজ পুত্র কন্যা,
মেয়ে যেন কোনও রাজারি।
হাসিয়া করিতে মোদের ধন্য,
রাগিয়া মলিতে মোদের কর্ণ,
(আর) ছুতোনাতা নিয়ে, অভিমান ক'রে,
মোদের মর্ম্মে 'ঘা' দিতে।

২৬. তোর ঘরের পানে তাকা; বাউলের সুর–গড় খেম্‌টা
এটা কফ্‌ভরা রুমালের মত,
বাইরে একটু আতর-মাখা।
বহুশাস্ত্র বারিধি, কালচাঁদ বিদ্যোনিধি
নিবারণ মাইতির সঙ্গে কচ্ছেন তর্কফাঁকা,
মাইতি বলে, 'মুরগী ভাল', শাস্ত্রী বলে 'ধর্ম্ম গেল',
(আবার) আঁধার হ'লে দুজন মিলে,
হোটেলে হ'লেন গা' ঢাকা!
অথর্ব্ব বুড়োর সনে, সাত বছরের ক'নে,
বিয়ে দেয় নিঠুর বাপে, হাতিয়ে কিছু টাকা;
(আবার) এমনি কিছু মোহ তঙ্কার,
যে দু'শ শাস্ত্রী, বিদ্যালঙ্কার,
সেই বিয়ের মন্ত্র পড়ায়
উড়িয়ে টিকি জয়-পতাকা!
না যেতে বাসিবিয়ে, মেয়ের যায় সব ফুরিয়ে,
মোছে কপালের সিঁদুর, ভাঙ্গে হাতের শাঁখা;
(তখন) মিলে সব শাস্ত্রীবর্গ, হেসে করান বৃষোৎসর্গ,
মেয়েটির একাদশীর সুব্যবস্থা করেন পাকা।
সে একাদশীর রেতেম মরে জল-পিপাসাতে,
বোকা বাপ্‌ দাঁড়িয়ে দেখে, মাতায় হাঁকায় পাখা;
(আবার ব'সে সেই মেয়ের পাশে,
অন্ন গেলে গ্রাসে গ্রাসে,
সমাজের নাই চেতনা, অন্ধ, বধির, মিথ্যে ডাকা।
পাড়াগাঁয় দলাদলি, শুধু কানমলামলি,
'ভাইপো'কে রাগের চোটে, শালা বলেন কাকা;
(আবার পেলে একটু দোষের গন্ধ,
অম্‌নি ধোপা নাপিত বন্ধ,
এঁরাই আবার সভায় বলেন, 'উচিত মিলে মিশে থাকা!'
পুরোহিত পুজোয় ব'সে মন্ত্র আওড়াচ্ছে ক'সে
গায়েতে নামাবলী, প্রাণে লুচির ঝাঁকা;
(আবার) বাইরে ব'সে নব্য হিন্দু গণ্ডুষ কচ্ছেন মদ্যসিন্ধু,
ধর্ম্মে বিশ্বাস নাই একবিন্দু, শুধু কৌলিক বজায় রাখায়।
কান্ত কয় কইব কত, এরাই দেশহিতে রত,
এটা যে গাড়ীর মতো, কাদায় ডুব্‌স চাকা,
এরা, ঘুমিয়েছিল উঠ্‌এলা জেগে,
চাকা টান্‌তে গেল লেগে,
মরণের জন্যে যেমন কুম্ভকর্ণের হঠাৎ জাগা!

২৭. তোর ব'দ্‌লে গেল দেহের আকর, ব'দ্‌লে গেল মন, বাউলের সুর
তবু নয়ন মু'দে অচেতন।
যাদের খুসী ক'র্‌বি ব'লে ক'রলি জীবনপণ,
তারাই বলে, 'বুড়ো, আর ঘুমুবি কতক্ষণ ?'
যার কথা তুই নিস্‌নি কানে, সারাটা জীবন,
সেই, নিলাজ বিবেক আবার বলে, "শিয়রে শমন"।
যে মাকে তুই হেলা ক'রে ব'লতিস্‌ কুবচন,
সেই ক্ষমার ছবি ব'লছে কানে, "জাগ্‌রে যাদুধন!"
তোর একই কাতে রাত্‌ পোহালো ভাঙ্‌লো না স্বপন,
তোর জীবন-রাত্রি পোহায়, এখন উষার আগমন।
তোর বাল্য গেল ধুলো খেলায়, বিলাসে যৌবন,
কেমন ধীরে ধীরে ধ'র্‌লো জরা, এর পরে মরণ।
কান্ত বলে হায়রে! আমার অরণ্য রোদন;
ডেকে ডুকে, মেরে ধুরে, দেখ্‌লাম বিলক্ষণ।

অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশচেতনার গান

ক্রমিক	অতুলপ্রসাদ সেনের স্বদেশপর্যায়ের গানের তালিকা ১৩টি গান	তথ্য
১.	উঠ গো ভারত-লক্ষ্মী, উঠ আদি-জগত-জন-পূজ্যা, দুঃখ দৈন্য সব নাশি করো দূরিত ভারত-লজ্জা। ছাড়ো গো ছাড়ো শোকশয্যা, কর সজ্জা পুনঃকমল-কনক-ধন-ধান্যে! জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহো তুলে চক্ষে; কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। কাণ্ডারী নাহিক কমলা, দুখলাঞ্ছিত ভারতবর্ষে; শঙ্কিত মোরা সব যাত্রী কাল-সাগর-কম্পন-দর্শে। তোমার অভয়-পদ-স্পর্শে, নব হর্ষে, পুনঃচলিবে তরণী শুভ লক্ষ্যে। জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহো তুলে চক্ষে; কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। ভারত-শ্মশান করো পূর্ণ পুনঃ কোকিল-কূজিত কুঞ্জে, দ্বেষ-হিংসা করি চূর্ণ করো পূরিত প্রেম-অলি-গুঞ্জে দূরিত করি পাপ-পুঞ্জে তপঃপুঞ্জে, পুনঃবিমল করো ভারত পুণ্যে। জননী গো, লহো তুলে বক্ষে, সান্ত্বনা-বাস দেহো তুলে চক্ষে; কাঁদিছে তব চরণতলে ত্রিংশতি কোটি নরনারী গো। অথবা, জননী, দেহো তব পদে ভক্তি, দেহো নব আশা, দেহো নব শক্তি; এক সূত্রে করো বন্ধন আজ ত্রিংশতি কোটি দেশবাসী জনে।	পর্যায়: স্বদেশ গীতিগুঞ্জ ৭২ রাগ: মিশ্র
২.	বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে, ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে; ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে, নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে। আজও গিরিরাজ রয়েছে প্রহরী, ঘিরি তিন দিক নাচিছে লহরী; যায়নি শুকায়ে গঙ্গা গোদাবরী– প্রতি প্রান্তর, প্রতি গুহা বন,	পর্যায়: স্বদেশ গীতিগুঞ্জ ৭৩ রাগ: মিশ্র খাম্বাজ

প্রতি জনপদ, তীর্থ অগণন, কহিছে গৌরবকাহিনী।
বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।
বিদুষী মৈত্রেয়ী খনা লীলাবতী
সতী সাবিত্রী সীতা অরুন্ধতী,
বহু বীরবালা বীরেন্দ্র প্রসূতি আমরা তাঁদেরই সন্ততি।
বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।
ভোলেনি ভারত, ভোলেনি সে কথা–
অহিংসার বাণী উঠেছিল হেথা;
নানক নিমাই করেছিল ভাই
ত্রিশ কোটি দেহ হবে এক-প্রাণ
এক-জাতি-প্রেম-বন্ধনে।
বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।
মোদের এ দেশ নাহি রবে পিছে,
ঋষি-রাজ-কুল জন্মেনি মিছে;
দুদিনের তরে হীনতা সহিছে,
জাগিবে আবার জাগিবে।
আসিবে শিল্প ধন বাণিজ্য, আসিবে বিদ্যা বিনয় বীর্য,
আসিবে আবার আসিবে।
বলো বলো বলো সবে, শত-বাণী-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে;
ধর্মে মহান হবে, কর্মে মহান হবে,
নব দিনমণি উদিবে আবার পুরাতন এ পুরবে।
এসো হে কৃষক কুটিরনিবাসী,
এসো অনার্য গিরিবনবাসী,
এসো হে সংসারী, এসো হে সন্ন্যাসী,
মিল’ হে মায়ের চরণে।
এসো অবনত, এসো হে শিক্ষিত
মিল’ হে মায়ের চরণে।
এসো হে হিন্দু, এসো মুসলমান,
এসো হে পারসী, বৌদ্ধ, খ্রীস্টিয়ান,
মিল’ হে মায়ের চরণে।

৩. মোরে কে ডাকে–'আয় রে বাছা, আয় আয়'! — পর্যায়: স্বদেশ
বহুদিন পরে যেন মায়ের কথা শোনা যায়। — গীতিগুঞ্জ ৭৪
ওগো, তোমার করুণ স্বরে — রাগ: পিলু বারোয়া
আপন জনে মনে পড়ে–
যাদেরে ফেলি' ধূলি-'পরে
আছি রত নিজ-সেবায়।
ও সুধাবাণী মরমে পশি
পড়িছে মরে স্নেহরাশি;
আজি আপন দেশে পরবাসী
থাকিতে মন নাহি চায়।
মা, তোমার করি' অপমান
লভেছি বহু যশ মান;
আজ লাজে অতি ম্রিয়মান
এ মুখ দেখাতে তোমায়।
মা, ডাকিলে যদি স্নেহ-ভাষে
রাখিবো সদা তব পাশে;
তুচ্ছ-ধন-পদ-আশে
আর না যেন দিন যায়।

৪. হও ধরমেতে ধীর, হও করমেতে বীর, — পর্যায়: স্বদেশ
হও উন্নতশির–নাহি ভয়। — গীতিগুঞ্জ ৭৫
ভুলি' ভেদাভেদ-জ্ঞান হও সবে আগুয়ান, — রাগ: মিশ্র
সাথে আছে ভগবান–হবে জয়।
নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধান,
বিবিধের মাঝে দেখো মিলন মহান;
দেখিয়া ভারতে মহাজাতির উত্থান
জগজন মানিবে বিস্ময়,
জগজন মানিবে বিস্ময়!
তেত্রিশ কোটি মোরা নহি কভু ক্ষীণ,
হতে পারি দীন, তবু নহি মোরা হীন;
ভারতে জনম, পুনঃআসিবে সুদিন–
ওই দেখো প্রভাত-উদয়,
ওই দেখো প্রভাত-উদয়!
ন্যায় বিরাজিত যাদের করে
বিঘ্ন পরাজিত তাদের শরে;
সাম্য কভু নাহি স্বার্থে ডরে–
সত্যের নাহি পরাজয়,
সত্যের নাহি পরায়!

৫. দেখ্ মা, এবার দুয়ার খুলে। — পর্যায়: স্বদেশ
গলে গলে এনু মা, তোর — গীতিগুঞ্জ ৭৬
হিন্দু-মুসলমান দুই ছেলে। — রাগ: রামপ্রসাদী মালসী
এসেছি মা, শপথ করে,
ঘরের বিবাদ মিটবে ঘরে;

যাব না আর পরের কাছে
ভাইয়ে ভাইয়ে বিরোধ হলে।
অনুগ্রহে নাই মুকতি
মিলন বিনা নাই শকতি,
এ কথা বুঝেছি দোঁহে–
থাকব না আর স্বার্থে ভুলে
থাকবে না আর রেষারেষি–
কাহার অল্প, কাহার বেশি;
দু ভাইয়ের যা আছে জমা
সঁপিব তোর চরণতলে।
দু-জনেই বুঝেছি এবার–
তোর মতো কেউ নেই আপনার
তোরই কোলে জন্ম মোদের,
মুদব আঁখি তোরই কোলে।

৬. কত কাল রবে নিজ যশ-বিভব-অন্বেষণে? পর্যায়: স্বদেশ
দু-দিনের ধনের লাগি ভুলিলে পরম ধনে! গীতিগুঞ্জ ৭৭
ঘরেতে ধন কর পুঁজি, সঙ্গে নেবে ভাব বুঝি? কীর্তন
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, দীনের অভাব নাই এ দেশে!
দীনের ধনেই ধনী তোমরা– দীনবন্ধু হবেন সুখী।
দীনের দুঃখ করো হে মোচন, পুণ্য হবে ধন-অরজনে।
দুটি ঘরে জ্ঞানের আলো, কোটি ঘরে আঁধার কালো;
এ আঁধার ঘুচাতে হবে–নইলে এ দেশ এমনি রবে।
দানেই এ জ্ঞান দ্বিগুণ হবে–এরাও তোমার মায়ের ছেলে।
এ আঁধার ঘুচাতে হবে যতনে, অতি যতনে।
পুরানো সে ত্যাগের কথা হৃদয়ে কি দেয় না ব্যথা?
সেই দেশের মানুষ তোমরা–
যেথা রাজার ছেলে হত ফকির, যেথা পরের তরে ঝরত আঁখি
যেথা ধন হতে প্রেম ছিল বড়ো, যেথা ধনী ছিল দীনের অধীন
সেই দেশের মানুষ তোমরা– সে কথা কি আছে মনে?
কেন এলে তবে মানবের ভবে রবে যদি নিজ কাজে?
সবাকার মান হোক তব মান, অপমান পর-লাজে।–
সে দিন কবে বা হবে ?
জাতিকুল-অভিমান, দ্বেষ-নিন্দা ভেদ-জ্ঞান
ভারতে আনিল মরণ–ভাই হে।
কবে হবে এ সুমতি, সবার উন্নতি হইবে সবারই সাধন–
হেন সাধন আর নাই হে।
এ-হেন সাধনে জীবনে মরণে পূজিব হে প্রেমসিন্ধু।
মোরা পুজিব তোমায়
সেবার কুসুম কুড়াইয়া, নিজের পূজা ঘুচাইয়া,
পরের দুঃখ ঘুচাইয়া, ভারতের আশা পুরাইয়া।
তব পদে ঠাঁই যেন সবে পাই–দয়া করো দীনবন্ধু।
ওহে দীনবন্ধু, তুমি দীনজনের লও প্রণতি, নমো দীনবন্ধু।

৭.	কঠিন শাসনে করো মা, শাসিত।	পর্যায়: স্বদেশ
আমরা দয়ার তব নহি অধিকারী	গীতিগুঞ্জ ৭৮
ছিলে মা, অতুল-বিভব-শালিনী,	রাগ: খাম্বাজ
মোদের লাগিয়ে হলে কাঙালিনী;
দীনবেশ তব হেরিয়া জননী,
নয়নে নাহি অনুতাপ-বারি।
স্বার্থ-মোহে মোরা সদাই হতজ্ঞান,
আপন দোষে মোরা হারাই নিজ মান।
ভায়েরে ঘৃণা করি, করিয়া অপমান,
পরের কাছে মোরা কৃপা-ভিখারি।
আপন ধন পদ যশের আশায়
মিথ্যা প্রীতি-পূজা জানাই তোমায়;
প্রাণের অঞ্জলি দিতে নারি পায়
যে পদ ধৌত করে করে জাহ্নবী-বারি।

৮.	জাগো জাগো জাগো এবে।	পর্যায়: স্বদেশ
হেরো পুরব-প্রান্তে ভানু-রেখা হে ভারতবাসী।	গীতিগুঞ্জ ৭৯
মঙ্গল-সংগীত শোনো বিহগ-কণ্ঠে।	রাগ: ভৈরো
পুষ্পে নব সৌরভ, গগনে নব হাসি।
দূর অতীত শোনো ডাকে–বৎস, জাগো–
মোদের সম্মান গৌরব রাখো।
ভবিষ্যতে শোনো ডাকে কর্মভেরী,
সুপ্তি পরিহারো, মুক্তি-অভিলাষী।
দক্ষিণে বামে দেখো জাগে কত জাতি–
নবীন উৎসাহে, নয়নে নব ভাতি।
জাগো, জাগাও সবে নব দেশপ্রেমে;
শঙ্কা কোরো না হেরি' বিপদ দুঃখরাশি।

৯.	মোদের গরব, মোদের আশা, আ মরি বাংলা ভাষা!	পর্যায়: স্বদেশ
তোমার কোলে তোমার বোলে কতই শান্তি ভালোবাসা।	গীতিগুঞ্জ ৮০
কী জাদু বাংলা গানে– গান গেয়ে দাঁড় মাঝি টানে।	রাগ: বাউল
এমন কোথা আর আছে গো।
গেয়ে গান নাচে বাউল, গান গেয়ে ধান কাটে চাষা।
ওই ভাষাতেই নিতাই গোরা আনল দেশে ভক্তিধারা–
মরি হায় হায় রে!
আছে কই এমন ভাষা, এমন দুঃখ-শ্রান্তি-নাশা?
বিদ্যাপতি চণ্ডী গোবিন হেম মধু বঙ্কিম নবীন–
আরও কত মধুপ গো!–
ওই ফুলেরি মধুর রসে বাঁধল সুখে মধুর বাসা।
বাজিয়ে রবি তোমার বীনে আনল মালা জগৎ জিনে!–
গরব কোথায় রাখি গো!–
তোমার চরণ-তীর্থে আজি জগৎ করে যাওয়া-আসা।
ওই ভাষাতেই প্রথম বোলে ডাকনু মায়ে 'মা' 'মা' ব'লে;
ওই ভাষাতেই বলব 'হরি' সাঙ্গ হলে কাঁদা হাসা।

১০. ভারত-ভানু কোথা লুকালে? পুনঃউদিবে কবে পুরব-ভালে? পর্যায়: স্বদেশ
হা রে বিধাতা, সে দেবকান্তি কালের গর্ভে কেন ডুবালে? গীতিগুঞ্জ ৮১
আছে অযোধ্যা, কোথা সে রাঘব? রাগ: মিশ্র খাম্বাজ
আছে কুরুক্ষেত্র, কোথা সে পাণ্ডব?
আছে নৈরঞ্জনা, কোথা সে মুক্তি?
আছে নবদ্বীপ, কোথা সে ভক্তি?
আছে তপোবন, কোথা সে তপোধন
কোথা সে কালা কালিন্দী-কূলে?
পুরুষ অবরুদ্ধ আপন দেশে;
নারী অবরুদ্ধ নিজ নিবাসে।
কোথা সে বীরেন্দ্র সুর দানবারি?
কোথা সে বিদুষী তাপসী নারী?
সিংহের দেশে বিচরিছে শিরা,
বীর্য বিড়ম্বিত খল কোলাহলে।
নানক গৌরাঙ্গ শাক্যের জাতি–
নাহিক সাম্য, ভেদে আত্মঘাতী।
কোথা সে ত্যাগী, প্রেমী ও কর্মী?
কোথা সে জাতি যাহারে বিশ্ব
পূজিত কালের প্রভাতকালে?

১১. খাঁচার গান গাইব না আর খাঁচায় ব'সে। পর্যায়: স্বদেশ
কণ্ঠ আমার রবে না আর পরের বশে। গীতিগুঞ্জ ৮২
সোনার শিকল দে রে খুলি, দুয়ারখানি দে রে তুলি। রাগ: ভৈরবী
বুকের জ্বালা যাব ভুলি মেঘ-পরশে–শীতল মেঘের পরশে।
থাকবে নীচে ধরার ধূলি; ভুলব পরের বচনগুলি।
বলব আবার আপন বুলি মন-হরফে–আপন মনের হরষে।

১২. নূতন বরষ নূতন বরষ, তব অঞ্চলে ও কী ঢাকা? পর্যায়: স্বদেশ
মিলে নাই যাহা, হারিয়েছে যাহা, তাই কি গোপনে রাখা? গীতিগুঞ্জ ৮৩
দীনের লাগিয়া এনেছ কি দান? ধনীর লাগিয়া এনেছ কি প্রাণ? রাগ: মিশ্র দেশ
অলসের লাগি এনেছ কি শ্রম? সুপ্তের লাগি জাগা?
আশায় বসিয়া আছেন জননী–তাঁর লাগি তুমি কী এনেছ ধনী?
খুচাবে কি তাঁর অতীতের পানে সজল চাহিয়া থাকা?
আসিবে কি হেথা প্রেমের শাসন? তুচ্ছের লাগি উচ্চ আসন?
শিখাবে কি দ্বেষ গর্ব পাসরি ভাই ব'লে ভাইয়ে ডাকা?

১৩. পরের শিকল ভাঙিস পরে, নিজের নিগড় ভাঙ রে ভাই। পর্যায়: স্বদেশ
আপন কারায় বন্ধ তোরা, পরের কারায় বন্দী তাই। গীতিগুঞ্জ ৮৪
হা রে মূর্খ, হা রে অন্ধ, ভাইয়ে ভাইয়ে করিস দ্বন্দ্ব! রাগ: মিশ্র বেহাগ
দেশের শক্তি করিস মন্দ– তোদের তুচ্ছ করে তাই সবাই;
সার ত্যজিয়ে খোসার বড়াই! তাই মন্দির মসজিদে লড়াই
প্রবেশ ক'রে দেখ রে দু ভাই– অন্দরে যে একজনাই।
দেশমাতার আর বিশ্বমাতার ম্লেচ্ছ কাফের এক পরিবার।
নয় তুরস্ক, নয়কো তাতার– জন্ম-মৃত্যু এই যে ঠাঁই।
ভিন্ন জাত আর ভিন্ন বংশ– এক জাত তাই এক শো অংশ।
হিন্দু রে, তুই হবি ধ্বংস না ঘুচালে এই বালাই।

ভাইকে ছুঁলে পদতলে শুদ্ধ হোস তুই গঙ্গাজলে;
ওরে সেই অছুত ছেলেই তুলে কোলে তুষ্ট হন যে গঙ্গা-মাঈ।
খাবি নে জল ভাইয়ের দেওয়া? খাস নে অন্ন তাদের ছোঁওয়া?
ওরে শবরীর আধ-খাওয়া মেওয়া রঘুনাথ তো খেলেন তাই।
তোরাই আবার সভাস্থলে হাঁকিস সাম্য উচ্চরোলে,
সম-তন্ত্র চাস সকলে– বিশ্বপ্রেমের দিস দোহাই!
জাতির গলায় জাতের ফাঁস, ধর্ম করছে ধর্মনাশ,
নিজের পায়ে পরলি পাশ, দাসত্ব ঘোচে না তাই।
ছাড় দেখি রে রেষারেষি কর্ প্রাণে প্রাণে মেশামেশি।
তখন তোদের সব বিদেশী, দাস না ব'লে বলবে ভাই।

অতুলপ্রসাদ সেনের বিবিধ পর্যায়ের গানে স্বদেশচেতনা

১৪. আপন কাজে অচল হলে চলবে না রে চলবে না। পর্যায়: বিবিধ
আলস স্তুতি-গানে তাঁর আসন টলবে না রে টলবে না। গীতিগুঞ্জ ১৩৭
হল যদি তোর না হয় সচল, বিফল হবে জলদ-জল; রাগ: বেহাগ
ঊষর ভূমে সোনার ফসল ফলবে না রে ফলবে না।
সবাই আগে যায় যে চলে; বসে আছিস তুই কী বলে ?
নোঙর বেঁধে স্রোতের জলে
তরী তোর চলবে না রে চলবে না।
তীরের বাঁধন দে রে খুলি, চলে যা তুই পালটি তুলি;
দিক যদি তুই না যাস ভুলি
তরী তোর তলবে না রে তলবে না।
বিধি তোরে ছলবে না রে ছলবে না।

১৫. এসো প্রবাসমন্দিরে, এসো গো বঙ্গভারতী। পর্যায়: বিবিধ
দীন প্রবাসী বঙ্গজনের লহো গো দীন আরতি। গীতিগুঞ্জ ১৫৩
যতনে তুলিয়া প্রবাসফুল পূজিত তোমার চরণমূল; রাগ: কাফি
আসিবে নূতন ভকতকুল, করিবে চরণে প্রণতি।
তোমার বীণার মোহন তান মোহিবে নিখিল-ভারত-প্রাণ,
গৌড়জনের গৌরব মান লভিবে নবীন শকতি।
সুজলা সুফলা ওগো শ্যামা, ওগো বাঙালি-হৃদি-রমা
ভোলেনি তোমায় ভোলেনি মা, তোমার প্রবাসী সন্ততি।

১৬. এসো হে এসো হে পর্যায়: বিবিধ
ভারতভূষণ, মোদের প্রবাসভবনে। গীতিগুঞ্জ ১৫৫
আমরা বাঙালি মিলিয়াছি আজ পুজিতে বঙ্গরতনে। রাগ: বেহাগ
লহো আমাদের হরষ-ভার;
পরো আমাদের প্রীতির হার;
হৃদয়ের থালা ভরিয়া এনেছি ভক্তিপুষ্পচন্দনে।
তোমার গৌরব, তোমার মান, তোমার সুকৃতি, তোমার জ্ঞান,
তোমার বিনয়, প্রেম মহান– ঘোষিছে ভারত-বন্দনে।
ঈশপদে করি মিনতি আজ, করো করো তুমি দেশের কাজ;
দেশের দৈন্য দেশের লাজ ঘুচাও দীর্ঘ জীবনে।

১৭. জয়তু জয়তু জয়তু কবি, জয়তু পুরব-উজল রবি। পর্যায়: বিবিধ
জয় জগতবিজয়ী কবি, জয় ভারতগৌরব রবি, গীতিগুঞ্জ ১৫৬
বঙ্গমাতার দুলাল 'রবি'–জয় হে কবি। রাগ: নটমল্লার
হে কবি, তোমার মোহন তান নিখিলজনের মোহিছে প্রাণ,
নানা ভাষা লভি' তোমার দান আজি গরবী–হে বিশ্বকবি।
কভু বাজাও ভেরী গভীর সুর, কভু বাজাও বীণা মৃদুমধুর,
কভু বাজাও বেণু প্রেমবিধুর–বিচিত্র করি।
স্বদেশের শঙ্খ যবে বাজাও সুপ্ত দেশবাসী-জনে জাগাও,
নবীন উৎসাহে সবে মাতাও হে বীর করি, দেশপ্রেমী কবি।
বিশ্বের উদার সমতলে ভারতীর দেউল তুলিলে
দেশকালের ভেদ ভুলিলে–কী নব ছবি!–হে কর্মী কবি।
বিশ্বেরশ্বরের চরণতলে তব গীতগঙ্গা সুধা ঢালে,
দুঃখী তাপিত জনে শীতলে, হে দেবকবি।

১৮. মিলন-সভা মাতাও আনন্দগানে পর্যায়: বিবিধ
বাঁধো আজি প্রেমডোর প্রাণে প্রাণে। গীতিগুঞ্জ ১৫৭
শোভন শুভ-উৎসবে রাগ: তিলক কামোদ
বৈরী আজি বন্ধু হবে!
চাহে চিত সর্বহিত-সুখ-পানে।
সকলে ধরি হাতে হাতে
চলো হে আগে, চলো হে সাথে।
গাহো শত কণ্ঠ মিলি একতানে।
কাতরে যাচে বন্ধজনে
যুবকজন-সম্মিলনে;
ওহে ঈশ, আশিস; করুণা-দানে।

১৯. মা, তোর শীতল কোলে তুলে নে আমায়, পর্যায়: বিবিধ
তোর মেঘে-ঢাকা পাখি-ডাকা শ্যামল শাখায়। গীতিগুঞ্জ ১৫৯
হেথা তোর বিজন বনে হাসে ফুল আপন মনে, রাগ: ভৈরবী
কেউ তারে দেয় না ব্যথা বিচ্ছেদব্যথায়
হেথা নাই খাঁচার বাধা, নাই পরের বচন সাধা,
হেথা গান গাছে পাখি সুখের হেলায়।
পাষাণের রক্ষা-ঝরা সরসী স্নেহ-ভরা,
কুলেতে ফুলের বিথান বিটপীর ছায়;
হেথা তোর বনের গাওয়া রঙিন ওই পাখির নাওয়া,
হেথা তোর মৃদুল হাওয়া মোর সকল ভুলায়।
সুন্দরের কুঞ্জবনে নীরব বেণুগুঞ্জনে
কে যেন ডাকে আমায়–আয় আয় আয়।
তারি সনে থাকব হেথা, ঘুছাব মোর সকল ব্যথা,
চুপিচুপি কতই কথা ক'ব দুজনায়।

২০. ওহে পুরজন, দাও কিছু ধন প্লাবনপীড়িত জনে,
তব দেশবাসী করে হাহাকার অন্ন-গেহ-বিহনে।
শিল্পী ও চাষি কত গেছে ভাসি দারুণ এ শ্রাবণে,
আশ্রয়হীন বস্ত্রবিহীন মৃত্যু মাগিছে মনে।
আর সইতে নারে, বলে হা বিধাতা।
কাঁদিছে জননী কোলের বাছনি যায় বুঝি অনশনে।
কে আছ মা, ঘরে, দাও স্নেহভরে, বাঁচাও শিশুরে প্রাণে।
ওগো স্নেময়ী, ওগো শিশুর মাতা।
তব ভাইবোনে হরিবে শমনে, সহিবে বলো কেমনে?
দাও কিছু দাও, বিপন্নে বাঁচাও– সুখী করো নারায়ণে।
ওহে পুরবাসী, করো দুঃখীর সেবা।

পর্যায়: বিবিধ
গীতিগুঞ্জ ১৬০
রাগ: কীর্তন

২১. প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্;
আর কোথায় পাবি এমন হাওয়া, এমন গাঙের জল!
যখন ছিলি এতটুকু,
সেথাই পেলি মায়ের সুধা ঘুম-পাড়ানো বুক;
সেথাই পেলি সাথির সনে বাল্যখেলার সুখ;
যৌবনেতে ফুটল সেথাই হৃদয়-শতদল।–
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।
হরির লুটের বাতাসা, আর পৌষ মাসের পিঠা,
পীরের সিন্নি, গাজির গান, আর করিমভাইয়ের ভিটা,
আহা মরি সেই স্মৃতি আজ লাগছে কত মিঠা;
শিউলি বেলি কদম চাঁপা এমন কোথায় বল্।–
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।
মনে পড়ে দেশের মাঠে খেত-ভরা সব ধান,
মনে পড়ে তরুণ চাষির করুণ বাঁশির তান,
মনে পড়ে পুকুর-পাড়ে বকুল গানের গান
মনে পড়ে আকাশ-ভরা মেঘ ও পাখির দল।–
প্রবাসী, চল্ রে দেশে চল্।

পর্যায়: বিবিধ
গীতিগুঞ্জ ১৯৪
রাগ: বাউল

২২. জননী বঙ্গ, তোমার সঙ্গ লভিয়া যদি গো
অঙ্গ আমার হয় না মা, ক্ষয়;
তথাপি রঙ্গে ভ্রুকুটি-ভঙ্গে তুচ্ছ করিয়া
গাহিব জননী, তোমারি জয়।
লাঞ্ছিত আমরা যদিও জননী,
শোণিতরঞ্জিত মোদের শির;
বক্ষ ভেদিয়া বয়ে যায় গুলি,
তথাপি ফেলি না অশ্রুনীর।
মৃত্যু সতত করিছে নৃত্য শিয়রে মোদের,
তবু তো করি না কাহারে ভয়।
অভয়ার বরপুত্র আমরা
হাসিয়া করি মা, গরল পান;
অনলদাহন যদিও মা বুকে
কণ্ঠ গাহিছে তোমারি গান।
সপ্তকোটি সন্তান আমরা
তোমার লাগিয়া এনেছি অর্ঘ্য;
তুমি গো জননী, দেবতা মোদের,
ধরায় তুমি মা, মোদের স্বর্গ।
যে পূজার মা গো, এত আয়োজন প্রাণ-বিনিময়ে
যেন সে যজ্ঞ পূর্ণ হয়।

পর্যায়: বিবিধ
গীতিগুঞ্জ ২০৭

কাজী নজরুল ইসলামের স্বদেশচেতনার গান

ক্রমিক	কাজী নজরুল ইসলামের দেশাত্মবোধক গানের তালিকা ১০৯টি	তথ্য
১.	অগ্নি-ঋষি! অগ্নি-বীণা তোমায় শুধু সাজে; তাই ত তোমার বহ্নি-রাগেও বেদন-বেহাগ বাজে ॥ দহন-বনের গহন-চারী— হায় ঋষি—কোন বংশীধারী দেশি নিঙড়ে আগুন আনলে বারি, অগ্নি-মরুর মাঝে। সর্বনাশা কোন্ বাঁশি সে বুঝতে পারি না যে ॥ দুর্বাসা হে! রুদ্র তড়িৎ হানছিলে বৈশাখে, হঠাৎ সে কার শুন্‌লে বেণু কদম্বের ঐ শাখে। বজ্রে তোমার বাজ্‌ল বাঁশি, বহ্নি হল কান্না-হাসি, সুরের ব্যথায় প্রাণ উদাসী—মন সরে না কাজে। তোমার নয়ন-ঝুরা অগ্নি-সুরেও রক্তশিখা রাজে ॥	গ্রন্থ : অগ্নি-বীণা (উৎসর্গ) পত্রিকা : মাসিক 'উপাসনা', ১৩২৮ রাগ : তিলক কামোদ তাল : ঝাঁপতাল
২.	'বাঙলায় মহাত্মা' আজ না-চাওয়া পথ দিয়ে কে এলে ঐ কংস কারার দ্বার ঠেলে। আজ শব-শ্মশানে শিব নাচে ঐ ফুল ফুটানো-পা ফেলে ॥ আজ প্রেম দ্বারকায় ডেকেছে বান, মরুভূমে জাগল তুফান, দিগ্বিদিকে উপচে পড়ে প্রাণ রে! তুমি জীবন-দুলাল সব লালে-লাল করলে প্রাণের রং ঢেলে ॥ ঐ শ্রাবন্তি ঢল আসল নেমে, আজ ভারতের জেরুজালেমে মুক্তি-পাগল এই প্রেমিকের প্রেমে রে ওরে আজ নদীয়ার শ্যাম নিকুঞ্জে রক্ষ হরি রাম খেলে ॥ ঐ চরকা-চাকায় ঘর্ঘর-ঘর শুনি কাহার আসার খবর, ঢেউ-দোলাতে দোলে সপ্ত সাগর রে! ঐ পথের ধূলা ডেকেছে আজ সপ্ত কোটি প্রাণ মেলে ॥ আজ জাত-বিজাতের বিভেদ ঘুচি, এক হল ভাই বামুন-মুচি প্রেম-গঙ্গায় সবাই হল শুচি রে! আয় এই যমুনায় ঝাঁপ দিবি কে বন্দেমাতরম্ বলে'— ওরে সব আগুন জ্বেলে ॥	গ্রন্থ : ফণি-মনসা শিরোনামে-বাংলায় মহাত্মা সময়-জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩১ উপলক্ষ্য : মহাত্মা গান্ধীর হুগলী আগমন
৩.	'তূর্য-নিনাদ' কোরাস্ : (আজ) ভারত ভাগ্য-বিধাতার বুকে গুরু-লাঞ্ছনা-পাষাণ-ভার, আর্ত-নিনাদে হাঁকিছে নকীব, —কে করে মুশকিল্ আসান তার? মন্দির আজি বন্দীর ঘানি, নির্জিত ভীত সত্য, বন্ধ রুদ্ধ স্বাধীন আত্মার বাণী,	গ্রন্থ : বিষের বাঁশি শিরোনাম-তূর্য নিনাদ পত্রিকা : মাসিক বসুমতী, বৈশাখ, ১৩২৯।

সন্ধি-মহলে ফন্দীর ফাঁদ, গভীর আন্ধি-অন্ধকার!
হাঁকিছে নকীব, —হে মহারুদ্র, চূর্ণ কর এ ভণ্ডাগার ॥
রক্ত-মদের বিষপান করি'
আর্তমানব; স্রষ্টা কাতর সৃষ্টির তাঁর নির্বাণ স্মরি'!
ক্রন্দন-ঘন বিশ্বে স্বনিছে প্রলয়-ঘটার হুহুঙ্কার,—
হাঁকিছে নকীব, —অভয়-দেবতা, এ মহাপাথার করহ পার ॥
কোলাহল-ঘাঁটা হলাহল-রাশি
কে নীলকণ্ঠ গ্রাসিবে রে আজ দেবতার মাঝে দেবতা সে আসি?
উরিবে কখন ইন্দিরা, ক্রোড়ে শান্তির ঝারি সুধার ভাঁড়?
হাঁকিছে নকীব, —আন ব্যথা-ক্লেশ-মন্থন-ধন অমৃত-ধার ॥
কণ্ঠ-ক্লিষ্ট ক্রন্দন-ঘাতে
অমৃত-অধিপ নর-নারায়ণ দারুময় ঘন মনো-বেদনাতে।
দশভুজে গলে শৃঙ্খল-ভার দশপ্রহরণ ধারিণী মা'র—
হাঁকিছে নকীব, —'আবিরাবির্ম এধি' হে নব যুগাবতার!
মৃত্যু-আহত মৃত্যুঞ্জয়,
কে শোনাবে তাঁরে চেতন-মন্ত্র? কে গাহিবে জয় জীবনের জয়?
নয়নের নীরে কে ডুবাবে বল বল-দর্পীর অহঙ্কার?—
হাঁকিছে নকীব, —সেদিন বিশ্বে খুলিবে আরেক তোরণ দ্বার ॥

৪. ওরে আজ ভারতের নব যাত্রা পথের
বাঁশি বাজলো, বাজলো বাঁশি
ফেলে তরুর ছায়া ভুলে ঘরের মায়া
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি ॥
তারা আকাশকে আজ চাহে লুটে নিতে
তারা মন্থর ধরায় চাহে দুলিয়ে দিতে
তারা তরুণ তরুণ প্রাণ জাগায় মৃতে
সাহস জাগায় চিতে তাদের অট্টহাসি ॥
মোরা প্রাচীরের পরে রে প্রাচীর তুলে
ভাই হয়ে ভাইকে হায় ছিলাম ভুলে।
আজ ভেঙে প্রাচীর হল ঘরের বাহির
একই অঙ্গনে দাঁড়ালো উন্নত শির
এলো মুক্ত গগন তলে প্রাণ পিয়াসি
এলো তরুণ পথিক ছুটে রাশি রাশি ॥

গ্রন্থ : সন্ধ্যামালতী
রেকর্ড :
১. এইচ. এম. ভি; ডিসেম্বর, ১৯৩৪।
শিল্পী-ধীরেন দাস
নং-এন ৭৩১৩
২. এইচ. এম. ভি; আগস্ট, ১৯৪৯।
শিল্পী-সুপ্রীতি ঘোষ ও তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
নং-এন ৩১০৬৮
সুর-নজরুল।
তাল : ফের্‌তা, দ্রুত-দাদ্‌রা ও কাহার্‌বা

৫. আজ ভারতের নব আগমনী জাগিয়া উঠেছে মহাশ্মশান
জাগরণী গায় প্রভাতের পাখি ফুলে ফুলে হাসে গোরস্থান ॥
ট'লেছে অটল হিমালয় আজি
সাগরে শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি'
হলাহল শেষে উঠেছে অমৃত বাঁচাইতে মৃত মানব-প্রাণ ॥
আঁধারে ক'রেছে হানাহানি যারা
আলোকে চিনেছে আত্মীয় তা'রা
এক হয়ে গেছে খ্রিস্টান, শিখ, হিন্দু, পারসি, মুসলমান।
এই তাপসীর চরণের তলে
লভিয়াছে জ্ঞান শিক্ষা সকলে
আবার আসিবে তারা দলে দলে করিতে পুণ্য-তীর্থ-স্নান ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
রাগ : ভৈরবী
তাল : দাদ্‌রা
রেকর্ড : মেগাফোন, ডিসেম্বর ১৯৩২
শিল্পী-ধীরেন দাস
নং-জে. এন. জি ২৬।

৬. ‘বন্দী-বন্দনা’

আজি রক্ত নিশি-ভোরে একি এ শুনি ওরে
মুক্তি-কোলাহল বন্দী-শৃঙ্খলে,
ঐ কাহারা কারাবাসে মুক্তি-হাসি হাসে,
টুটেছে ভয়-বাধা স্বাধীন হিয়া-তলে ॥
ললাটে লাঞ্ছনা-রক্ত-চন্দন,
বক্ষে গুরু শিলা, হস্তে বন্ধন
নয়নে ভাস্বর সত্য-জ্যোতি-শিখা,
স্বাধীন দেশ-বাণী কণ্ঠে ঘন বোলে,
সে ধ্বনি ওঠে রণি’ ত্রিংশ কোটি ঐ মানব-কল্লোলে ॥
ওরা দু’পায়ে দলে গেল মরণ-শঙ্কারে
সবারে ডেকে গেল শিকল ঝঙ্কারে,
বাজিল নভ-তলে স্বাধীন ডঙ্কা রে,
বিজয়-সঙ্গীত বন্দী গেয়ে’ চলে’
বন্দীশালা মাঝে ঝঞ্ঝা পশেছে রে উতল কলরোলে ॥
আজি কারার সারা দেহে মুক্তি-ক্রন্দন,
ধ্বনিছে হা হা স্বরে ছিঁড়িতে বন্ধন,
নিখিল গেহ যথা বন্দী-কারা, সেথা
কেন রে কারা-ত্রাসে মরিবে বীর-দলে।
‘জয় হে বন্ধন’ গাহিল তাই তারা মুক্ত নভ-তলে ॥
আজি ধ্বনিছে দিগ্বধূ-শঙ্খ দিকে দিকে,
গগনে কা’রা যেন চাহিয়া অনিমিখে,
ধু ধু ধু হোম-শিখা জ্বলিল ভারতে রে,
ললাটে জয়টীকা, প্রসূন-হার গলে
চলে রে বীর চলে;
সে নহে নহে কারা, যেখানে ভৈরব রুদ্র-শিখা জ্বলে ॥
কোরাস : জয় হে বন্ধন-মৃত্যু-ভয়-হর! মুক্তি-কামী জয়!
স্বাধীন-চিত জয়! জয় হে! জয় হে! জয় হে!

গ্রন্থ : বিষের বাঁশী
সুর : গান
শিরোনাম : বন্দী বন্দনা
পত্রিকা :
১. নারায়ণ, মাঘ ১৩২৮
রাগ-মল্লার
তাল-তেওড়া
২. বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য, মাঘ ১৩২৮।
শিরোনাম-বন্দী বন্দনা
রচনা স্থান-কান্দির পাড়, কুমিল্লা

৭. আজি শৃঙ্খলে বাজিছে মাভৈঃ—বরাভয়,
এ যে আনন্দ-বন্ধন ক্রন্দন নয় ॥
ওরে নাশিতে সবার এই বন্ধন-ত্রাস,
মোরা শৃঙ্খলে ধরি’ তারে করি উপহাস,
সহি নিপীড়ন-পীড়নের আয়ু করি হ্রাস,
এ যে রুদ্র-আশীর্বাদ—লৌহ-বলয় ॥
মোরা অগ্র-পথিক অনাগত দেবতার,
এই শৃঙ্খলে বন্দিছে চরণ তাঁহার।
শোন, শৃঙ্খলে তাঁর আগমনী-ঝঙ্কার!
হবে দৈত্য-কারায় নব অরুণ উদয় ॥

গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু
রাগ : ইমন
তাল : কাওয়ালী
নাট্যগ্রন্থ : কারাগার
নাটক : কারাগার
২৪.১২.১৯৩০ তারিখে মনোমোহন থিয়েটারে মঞ্চস্থ হয় (কঙ্কন ও কঙ্কার মিলিত কণ্ঠের গান)।

৮. ‘ধীবরদের গান’
আমরা নিচে পড়ে রইব না আর শোন রে ও ভাই জেলে,
এবার উঠব রে সব ঠেলে।
ঐ বিশ্ব-সভায় উঠল সবাই রে, ঐ মুটে-মজুর ছেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥
আজ সবার গায়ে লাগছে ব্যথা,
সবাই আজি কইছে কথা রে,
আমরা এমনি মরা কই নে কিছু মড়ার লাথি খেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥
হায় ভাইরে, মোদের ঠাঁই দিল না আপন মাটির মায়ে,
তাই জীবন মোদের ভেসে বেড়ায় ঝড়ের মুখে নায়ে।
ও ভাই নিত্য-নূতন হুকুম জারি
করছে তাই সব অত্যাচারী রে
তারা বাজের মতন ছোঁ মেরে খায় আমরা মৎস্য পেলে।
এবার উঠব রে সব ঠেলে ॥

গ্রন্থ : সর্বহারা
শিরোনাম : ধীবরদের গান
তাল : দাদ্‌রা
পত্রিকা : লাঙল, ৪ঠা চৈত্র ১৩৩২
শিরোনাম-জেলেদের গান
পাদটীকায় মুদ্রিত-“মাদারীপুরে নিখিল বঙ্গীয় ও আসাম প্রদেশীয় মৎসজীবী সম্মিলনীয় তৃতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত”

৯. ও ভাই খাঁটি সোনার চেয়ে খাঁটি আমার দেশের মাটি ॥
এই দেশেরই মাটি জলে এই দেশেরই ফুলে ফলে
তৃষ্ণা মিটাই মিটাই ক্ষুধা পিয়ে এরি দুধের বাটি ॥
এই মায়েরই প্রসাদ পেতে
মন্দিরে এর এঁটো খেতে
তীর্থ ক’রে ধন্য হতে আসে কত জাতি।
ও ভাই এই দেশেরই ধূলায় পড়ি’
মানিক যায় রে গড়াগড়ি
ও ভাই বিশ্বে সবার ঘুম ভাঙালো এই দেশেরই জিয়ন-কাঠি ॥
এই মাটি এই কাদা মেখে এই দেশেরই আচার দেখে
সভ্য হ’লো নিখিল ভুবন দিব্য পরিপাটি ।
ও ভাই সন্ন্যাসিনী সকল দেশে জ্বাল্‌লো আলো ভালোবেসে
মা আঁধার রাতে এক্‌লা জাগে আগ্‌লে রে এই শ্মশান-ঘাঁটি ॥

তাল : দাদ্‌রা

১০. আমার সোনার হিন্দুস্থান!
দেশ-দেশ-নন্দিতা তুমি বিশ্বের প্রাণ ॥
ধরণীর জ্যেষ্ঠা কন্যা তুমি আদি মাতা,
তব পুত্র গাহিল বেদ-বেদান্ত সাম-গাথা,
তব কোলে বারে বারে এলো ভগবান ॥
আদিম যুগের তুমি প্রথমা ধাত্রী,
তোমার আলোকে হল প্রভাত রাত্রি,
সবে বিলাইলে অমৃত সঙ্গীত জ্ঞান ॥
সোনার শস্যে তব ঝলমল বর্ণ,
অন্তরে মানিক্য-মণি-হীরা-স্বর্ণ,
বর্বরে করিয়াছ মানব মহান্‌ ॥
হিংসা-দ্বেষ-ভোগ-ক্লান্ত এ বিশ্ব
আবার শিখিবে ত্যাগ, হবে তব শিষ্য,
বাঁচাবে সবারে করি’ অমৃত দান ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
রাগ : পাহাড়ি মিশ্র
তাল : কার্ফা
রেকর্ড : মোগফোন; সেপ্টেম্বর ১৯৩৩
নং- জে. এন. জি ৬৫
শিল্পী : জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
বি.দ্র. : রেকর্ড বুলেটিনে গীতিকার হিসেবে তুলসী লাহিড়ীর নাম উল্লেখিত।

১১. আমি মহাভারতী শক্তিনারী।
আমি কৃশ-তনু-অসিলতা, স্বাহা-আমি তেজ-তরবারি ॥
আমি আশা-দীপ, জ্যোতি, আমি কল্যাণ, সাম্য, প্রেম,
সংহতি।
আমি ভবনে করুণা-কোমল আমি ভুবনের সর্ব দ্বন্দ্ব সংহারি' ॥
আমি শান্ত উদাসীন মেঘে আনি বর্ষণ-বেগ, আমি তড়িৎলতা,
পরাজিত পৌরুষে জাগায়ে তুলি, দূর করি নিরাশা দুর্বলতা।
আমি গার্গী, মৈত্রেয়ী, ভাগবতী শক্তি,
আমি নবারুণ আলোক আনিব বিশ্বে তিমির বিদারি' ॥

গ্রন্থ : সন্ধ্যামালতী
অন্য সূত্র : শৈল দেবীর খাতা
বেতার অনুষ্ঠান-চীনের জাগরণ।

১২. আয় রণজয়ী পাহাড়ি দল শক্তি-মাতাল বুনো পাগল
থৈ থৈ তা তা থৈ থৈ নেচে আয় রে দৃপ্ত পায়।
গিরি দরি বন ভাসায় যেমন পার্বতীয়া ঝর্নাজল!
আন তীর ধনু বর্শা হান্ বাজা রে শিঙ্গা বাজা মাদল ॥

সুরথ উদ্ধার : রের্কড নাটিকা]

১৩. আসে রে ঐ আসে ভারত-আকাশে আশা-অরুণ রবি।
মৃত জনগণে বাঁচাতে এলো যেন নূতন প্রাণ-জাহ্নবী ॥
তন্দ্রা-মগন জাগিছে জনগণ নব আশার মোহে,
গলি' পাষাণ-গিরি প্রাণ-নিঝর বহে
শোভিল ফুলে ফলে শুষ্ক অটবী ॥
নূতন দিনের পাখিরা ছুটে আসে
শত রঙের খেলা মুক্ত আকাশে,
ছুটলি দিকে দিকে 'জয় ভারত গাহি' শত চারণ কবি ॥

সূত্র : পাণ্ডুলিপি [নজরুলগীতি-অখণ্ড]
গ্রন্থ :
১. নজরুলগীতি-অখণ্ড, হরফ
২. নজরুল রচনাবলী,
তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা
শিরোনাম : জাগিছে জনগণ।

১৪. **উদার ভারত! সকল মানবে দিয়াছ তোমার কোলে স্থান।**
পার্সি-জৈন-বৌদ্ধ-হিন্দু খ্রিস্টান-শিখ-মুসলমান ॥
তুমি পারাবার, তোমাতে আসিয়া মিলেছে সকল ধর্ম জাতি;
আপনি সহিয়া ত্যাগের বেদনা সকল দেশের করেছ জ্ঞাতি;
নিজেরে নিঃস্ব করিয়া, হয়েছ বিশ্ব-মানব-পীঠস্থান ॥
নিজ সন্তানে রাখি নিরন্ন, অন্য সবারে অন্ন দাও,
তোমার স্বর্ণ রৌপ্য মানিকে বিশ্বের ভাণ্ডার ভরাও;
আপনি মগ্ন ঘন তমসায় ভুবনে করিয়া আলোক দান ॥
বক্ষে ধরিয়া কত সে যুগের কত বিজেতার গ্লানির স্মৃতি,
প্রভাত আশায় সর্বসহা মা যাপিছ দুখের কৃষ্ণাতিথি,
এমনি নিশীথে এসেছিলে বুকে আসিবে আবার সে ভগবান ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
রাগ : কানাড়া মিশ্র
তাল : একতালা
রেকর্ড : মেগাফোন, সেপ্টেম্বর ১৯৩৩
নং-জে. এন. জি ৬৫
শিল্পী-জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ
স্বরলিপি : নজরুল স্বরলিপি, দশম
খণ্ড, হরফ।

১৫. এ কি অপরূপ রূপে মা তোমায় হেরিনু পল্লী-জননী।
ফুলে ও ফসলে কাদা মাটি জলে ঝলমল করে লাবনি ॥
রৌদ্রতপ্ত বৈশাখে তুমি চাতকের সাথে চাহ জল,
আম কাঁঠালের মধুর গন্ধে জ্যৈষ্ঠে মাতাও তরুতল।
ঝঞ্ঝার সাথে প্রান্তরে মাঠে কভু খেল ল'য়ে অশনি ॥
কেতকী-কদম-যূথিকা কুসুমে বর্ষায় গাঁথ মালিকা,
পথে অবিরল ছিটাইয়া জল খেল চঞ্চলা বালিকা।
তড়াগে পুকুরে থই থই করে শ্যামল শোভার নবনী ॥
শাপলা শালুক সাজাইয়া সাজি শরতে শিশির নাহিয়া,

গ্রন্থ : গানের মালা
রাগ : বেহাগ মিশ্র
তাল : কাওয়ালী
রেকর্ড : টুইন, জুলাই ১৯৩৩
নং-এফ. টি ২৮২১
শিল্পী-মাস্টার কমল
শ্রেণি-আগমনী
স্বরলিপি : সুরলিপি, ডি. এম. লাইব্রেরি
মিশ্র-দাদরা।

শিউলি-ছোপানো শাড়ি পরে ফের আগামনী-গীত গাহিয়া।
অঘ্রাণে মা গো আমন ধানের সুঘ্রাণে ভরে অবনি ॥
শীতের শূন্য মাঠে তুমি ফের উদাসী বাউল সাথে মা,
ভাটিয়ালি গাও মাঝিদের সাথে গো, কীর্তন শোনো রাতে মা।
ফাল্গুনে রাঙা ফুলের আবিরে রাঙাও নিখিল ধরণী ॥

১৬. একি বেদনার উঠিয়াছে ঢেউ দূর সিন্ধুর পারে,
নিশীথ অন্ধকারে।
পূরবের রবি ডুবিল গভীর বাদল-অশ্রুধারে, নিশীথ-
অন্ধকারে ॥
ঘিরিয়াছে দিক ঘন ঘোর মেঘে
পূবালী বাতাস বহিতেছে বেগে,
বন্দিনী মাতা একাকিনী জেগে' কাঁদিতেছে কারাগারে—
শিয়রের দীপ যত সে-জ্বলায় নিভে যায় বারে বারে ॥
মুয়াজ্জিনের কণ্ঠ নীরব আজিকে মিনার-চূড়ে,
বহে না শিরাজ বাগের নহর, বুলবুল গেছে উড়ে'।
ছিল শুধু চাঁদ, গেছে তরবার সে-চাঁদও আঁধারে ডুবিল
এবার,
শিরতাজ-হারা কাঁদে মুসলিম অস্ত-তোরণ-দ্বারে—
উঠিতেছে সুর বিদায়-বিধুর পারাবার-পরপারে ॥
ছিল না সে-রাজা কেঁপেছে বিশ্ব তবু গো প্রতাপে তার,
শত্রু-দুর্গে বন্দী থাকিয়া খোলেনি সে-তরবার।
ছিল এ ভারত তারি পথ চাহি' বুকে বুকে ছিল তারি
বাদশাহী,
ছিল তার তরে ধূলার তখ্‌ত্‌ মানুষের দরবারে—
আজি বরষায় তারি তরবার ঝলসিছে বারে বারে ॥

গ্রন্থ : সন্ধ্যা
শিরোনাম : নিশীথ অন্ধকারে।

১৭. 'পাগল পথিক'
এ কোন্ পাগল পথিক ছুটে এলো বন্দিনী মা'র আঙিনায়।
ত্রিশ কোটি ভাই মরণ-হরণ গান গেয়ে তাঁর সঙ্গে যায় ॥
অধীন দেশের বাঁধন-বেদন
কে এলো রে করতে ছেদন ?
শিকল-দেবীর বেদীর বুকে মুক্তি-শঙ্খ কে বাজায় ॥
মরা মায়ের লাশ কাঁদে ঐ অভিমানী ভা'য়ে ভা'য়ে
বুক-ভরা আজ কাঁদন কেঁদে আনল মরণ-পারের মায়ে।
পণ করেছে এবার সবাই
পর-দ্বারে আর যাব না ভাই!
মুক্তি সে তো নিজের প্রাণে, নাই ভিখারির প্রার্থনায় ॥
শাশ্বত যে সত্য তাঁরি ভুবন ভ'রে বাজলো ভেরি,
অসহ্য আজ নিজের বিষেই মরলো ও-তার নাইকো দেরি।
হিংসুকে নয়, মানুষ হ'য়ে
আয় রে, সময় যায় যে ব'য়ে!
মরার মতন মরতে, ওরে মরণ ভীতু! ক'জন পায় ॥
ইস্রাফিলের শিঙ্গা বাজে আজকে ঈশান-বিষাণ সাথে,

গ্রন্থ : বিষের বাঁশী
শিরোনাম : পাগল পথিক
পত্রিকা : মোসলেম ভারত, ভাদ্র
১৩২৮
রাগ : মেঘ-ছায়ানট
তাল : দাদ্‌রা

প্রলয় রাগে নয় রে এবার ভৈরবীতে দেশ জাগাতে।
পথের বাধা স্নেহের মাথায়
পায় দ'লে আয় পায় দ'লে আয়!
রোদন কিসের? আজ যে বোধন—
বাজিয়ে বিষাণ উড়িয়ে নিশান আয় রে আয় ॥

১৮. এ দুর্দিন রবে না তোর আসবে শুভদিন।
নতুন আশায় বুক বাঁধ রে অন্ন-বস্ত্র-হীন ॥
রাত পোহাবে, এই আঁধারে রইবি না তুই ডুবে
আশার সূর্য উঠবে আবার পুবে,
তুই সাহস ক'রে উঠে দাঁড়া, হবে দুঃখের আয়ুক্ষীণ ॥
ধর্ম জাগেন মাথার উপর, অসীম আকাশ তলে,
আজো তাহার চাঁদ-সুরযের রুদ্র আঁখি জ্বলে।
এই সুখে রাখা দুঃখ দেওয়া যাঁহার হাতের খেলা
তুই ধর দেখি রে তাহার চরণ-ভেলা,
তুই দেখ্‌বি সেদিন রইবি না আর এমন পরাধীন ॥

নাট্যগ্রন্থ : দেবী দুর্গা
নাটক : দেবী দুর্গা
মঞ্চ : মিনার্ভা
উদ্বোধন : ১৮.১০.১৯৩৯
নাট্যকার : মহেন্দ্র গুপ্ত
চরিত্র : বৈতালিক
শিল্পী :
সুর : নজরুল
গ্রন্থ : বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, কলিকাতা।

১৯. এই আমাদের বাংলাদেশ এই আমাদের বাংলাদেশ
যে দিকে চাই স্নিগ্ধ শ্যামল চোখ জুড়ানো রূপ অশেষ ॥
চন্দনিত শীতল বাতাস বয় এ দেশে নিরন্তর
জোছনা সম কোমল হয়ে আসে হেথায় রবির কর
জীবন হেথায় স্নেহ সরস সরল হৃদয় সহজ বেশ ॥
নিত্য হেথা ঝরছে মেঘে স্বর্গ হতে শান্তি জল
মাঠে ঘাটে লক্ষ্মী হেথায় ছড়িয়ে রাখে ফুল কমল।
হাঙ্গোর কুমির শার্দুল সাপ খেলার সাথি এই জাতির
দিল্লীর যশ করল হরণ এই দেশেরি প্রতাপ বীর
একদা এই দেশের ছেলে জয় করেছে দেশ বিদেশ

সূত্র : রেকর্ড কোম্পানির সঙ্গে কবির সম্পাদিত ২৪.১.১৯৩৫ তারিখের চুক্তিপত্র
রেকর্ড-নাটিকা : 'প্রতাপাদিত্য'
গ্রন্থ : বাংলা নাটকে নজরুল ও তাঁর গান, ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, কলিকাতা।
তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

২০. এই দেশ কার? তোর নহে আর, রে মূঢ় সন্তান!
ভারতমাতার
দেবতার দেশে আজ দৈত্য করে বিরাজ,
মন্দির আজি বন্দীর কারাগার ॥
লাজ নাহি তার, যার জননী দাসী
দাসের শিকল প'রে (কেমনে নিলাজ) বেড়াস্‌ হাসি'?
অসম্মানের প্রাণ ক'রে দে রে অবসান,
মানুষের মত ম'রে বাঁচ রে আবার ॥

নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
(মুদ্রিত পাণ্ডুলিপি)
রাগ : দেশকার
তাল : তেতালা

২১. এই ভারতে নাই যাহা তা ভূ-ভারতে নাই।
মানুষ যাহা চায় স্বর্গে গিয়ে, আমরা হেথায় পাই ॥
মেঘমুক্ত এমন আকাশ চন্দনিত এমন বাতাস,
ফুল-ফসলের ছড়াছড়ি কোথায় এত পাই ॥
জল চাইলেই হাতের কাছে ছুটে আসে নদী,
মাটিতে পাই খাঁটি সোনার একটু কাটি যদি।
গিরি-দরি-সাগর-মরু পশু-পাখি-লতা-তরু,

পত্রিকা : মোয়াজ্জিন, আষাঢ় ১৩৪২
১. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
২. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা।

বিশ্বের সব দৃশ্য দেখি যখন যাহা চাই ॥
পাঁচভূতে খায় লুটে রে ভাই আমার দেশের দান,
(তবু) কম হ'ল না কভু ইহার বিভব অফুরান।
মানুষ যদি নাই এ দেশে নইলে কি ভাই এ দীন বেশে,
কেঁদে বেড়ায় দেশ-জননী অঙ্গে মেখে ছাই—
মোরা অবহেলে এই অফুরান বিভব যে হারাই ॥

২২. এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল-পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
তোদের বন্ধ কারায় আসা মোদের বন্দী হতে নয়,
ওরে ক্ষয় করতে আসা মোদের সবার বাঁধন–ভয়।
এই বাঁধন প'রেই বাঁধন-ভয়কে কর্‌ব মোরা জয়,
এই শিকল-বাঁধা পা নয় এ শিকল ভাঙা কল ॥
তোমার বন্ধ ঘরের বন্ধনীতে কর্‌ছ বিশ্ব গ্রাস,
আর ভয় দেখিয়েই ক'র্‌বে ভাবছ বিধির শক্তি হ্রাস
সেই ভয়-দেখানো ভূতের মোরা ক'র্‌বো সর্বনাশ,
এবার আন্‌বো মাভৈঃ বিজয়-মন্ত্র বল-হীনের বল ॥
তোমরা ভয় দেখিয়ে কর্‌ছ শাসন জয় দেখিয়ে নয় ;
সেই ভয়ের টুঁটি ধর্‌ব টিপে কর্‌ব তারে লয়।
মোরা আপনি ম'রে মরার দেশে আন্‌ব বরাভয়,
প'রে ফাঁসি আন্‌ব হাসি মৃত্যু-জয়ের ফল ॥
ওরে ক্রন্দন নয় বন্ধন এই শিকল-ঝঞ্ঝনা,
এ যে মুক্তি-পথের অগ্রদূতের চরণ-বন্দনা !
এই লাঞ্ছিতেরাই অত্যাচারকে হান্‌ছে লাঞ্ছনা,
মোদের অশ্রু দিয়েই জ্ব'লবে দেশে আবার বজ্রানল ॥

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
স্বরলিপিকার : নজরুল
রাগ : খাম্বাজ
তাল : দাদ্‌রা
স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত আদি
স্বরলিপি সংগ্রহ, নজরুল ইনস্টিটিউট,
ঢাকা, সম্পাদনা- ব্রহ্মমোহন ঠাকুর।

২৩. 'পূর্ণ-অভিনন্দন'*
এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র! এসো পূর্ণিমা-পূর্ণচাঁদ!
ভেদ করি' পুন বন্ধ-কারার অন্ধকারের পাষাণ-ফাঁদ!
এসো অনাগত নব-প্রলয়ের মহা সেনাপতি মহামহিম!
এসো অক্ষত মোহান্ধ-ধৃতরাষ্ট্র-মুক্ত লৌহ-ভীম!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
ছয়বার জয় করি' কারা-ব্যূহ, রাজ-রাহু-গ্রাস-মুক্ত চাঁদ!
আসিলে চরণে দুলায়ে সাগর নয়-বছরের মুক্ত-বাঁধ।
নবগ্রহ ছিঁড়ি' ফণি-মনসার মুকুটে তোমার গাঁথিলে হার,
উদিলে দশম মহাজ্যোতিষ্ক ভেদিয়া গভীর অন্ধকার!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
স্বাগত শুদ্ধ রুদ্ধ-প্রতাপ, প্রবুদ্ধ নব মহাবলী!
দনুজ-দমন দধীচি-অস্থি, বহ্নিগর্ভ দম্ভোলী!
স্বাগত সিংহ-বাহিনী-কুমার! স্বাগত হে দেব সেনাপতি!
অনাগত রণ-কুরুক্ষেত্রে সারথি-পার্থ-মহারথী
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥

গ্রন্থ : ভাঙার গান
শিরোনাম : পূর্ণ অভিনন্দন
পাদটীকা : মাদারীপুর শান্তি-সেনা
বাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ পূর্ণচন্দ্র
দাশ-এর কারামুক্তি উপলক্ষে
রচিত।

নৃশংস রাজ-কংস-বংশে হানিতে তোমার ধ্বংস-মার
এসো অষ্টমী-পূর্ণচন্দ্র, ভাঙিয়া পাষাণ-দৈত্যাগার!
এসো অশান্তি-অগ্নিকাণ্ডে শান্তিসেনার কাণ্ডারি!
নারায়ণী-সেনা-সেনাধিক, এসো প্রতাপের হারা-তরবারি!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
ওগো অতীতের আজো-ধূমায়িত আগ্নেয়গিরি ধূম্রশিখ!
না-আসা-দিনের অতিথি তরুণ তব পানে চেয়ে নির্নিমিখ।
জয় বাঙলার পূর্ণচন্দ্র, জয় জয় আদি-অন্তরীণ,
জয় যুগে-যুগে-আসা-সেনাপতি, জয় প্রাণ আদি-অন্তহীন!
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
স্বর্গ হইতে জননী তোমার পেতেছেন নামি' মাটিতে কোল্-
শ্যামল শস্যে হরিত ধান্যে বিছানো তাঁহারই শ্যাম-আঁচোল।
তাঁহারি স্নেহের করুণ গন্ধ নবান্নে ভরি' উঠিছে ঐ,
নদীস্রোত-স্বরে কাঁদিছেন মাতা, 'কই রে আমার দুলাল কই'?
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
মোছ আঁখি-জল এসো বীর! আজ খুঁজে নিতে হবে আপন মায়,
হারানো মায়ের স্মৃতি-ছাই আছে এই মাটিতেই মিশিয়া, হায়!
তেত্রিশ কোটি ছেলের রক্তে মিশেছে মায়ের ভস্ম-শেষ,
ইহাদেরই মাঝে কাঁদিছেন মাতা, তাই আমাদের মা স্বদেশ।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
এসো বীর ! এসো যুগ-সেনাপতি! সেনাদল তব চায় হুকুম,
হাঁকিছে প্রলয়, কাঁপিছে ধরণী, উদ্গারে গিরি অগ্নি-ধূম।
পরাধীন এই তেত্রিশ কোটি বন্দীর আখি-জলে হে বীর,
বন্দিনী মাতা যাচিছে শক্তি তোমার অভয় তরবারির।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥
গল-শৃঙ্খল টুটেনি আজিও, করিতে পারি না প্রণাম পা'য়,
রুদ্ধ কণ্ঠে ফরিয়াদ শুধু গুমরিয়া মরে গুরু ব্যথায়।
জননীর যবে মিলিবে আদেশ, মুক্ত সেনানী দিবে হুকুম,
শত্রু-খড়্গ-ছিন্ন-মুণ্ড দানিবে ও-পায়ে প্রণাম-চুম।
স্বাগত ফরিদপুরের ফরিদ, মাদারীপুরের মর্দবীর,
বাঙলা মায়ের বুকের মানিক, মিলন পদ্মা-ভাগীরথীর ॥

২৪. 'মরণ-বরণ'

এসো এসো এসো ওগো মরণ!
এইমরণ-ভীতু মানুষ-মেষের ভয় কর গো হরণ ॥
না বেরিয়েই পথে যা'রা পথের ভয়ে ঘরে
বন্ধ-করা অন্ধকারে মরার আগেই মরে,
তাতা থৈ থৈ তাতা থৈ থৈ তাদের বুকের 'পরে—
ভীমরুদ্রতালে নাচুক তোমার ভাঙন-ভরা চরণ ॥
দীপক রাগে বাজাও জীবন-বাঁশি
মড়ার মুখেও আগুন উঠুক হাসি'।

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : মরণ বরণ
রাগ : মিশ্র বেলাবল
তাল : তেওড়া
স্বরলিপিকার-
নলিনীকান্ত সরকার
রচনাস্থান ও সময় : কুমিল্ল,
জুন-জুলাই ১৯২১।

কাঁধে পিঠে কাঁদে যথা শিকল জুতোর ছাপ
নাই সেখানে মানুষ সেথা বাঁচাও মহাপাপ,
সে দেশের বুকে শ্মাশান মশান জ্বালুক তোমার শাপ,
সে থাজাগুক নবীন সৃষ্টি অবার হোক নব নাম-করণ ॥
হাতের তোমার দণ্ড উঠুক কেঁপে',
এবার দাসের ভুবন ভবন ব্যেপে'।
মেষগুলোকে শেষ ক'রে দেশ-চিতার বুকে নাচো!
শব ক'রে আজ শয়ন, হে শিব, জানাও তুমি আছ।
মরায় ভরা ধরায়, মরণ! তুমিই শুধু বাঁচো—
এইশেষের মাঝেই অশেষ তুমি, করছি তোমায় বরণ ॥
জ্ঞান-বুড়ো ঐ বলছে জীবন মায়া,
নাশ কর ঐ ভীরুর কায়া ছায়া !
মুক্তি-দাতা মরণ! এসো কাল-বোশেখির বেশে;
মরার আগেই মরলো যারা, নাও তাদেরে এসে।
জীবন তুমি সৃষ্টি তুমি জরা-মরার দেশে,
তাই শিকল বিকল মাগ্‌ছে তোমার মরণ-হরণ-শরণ ॥

২৫. 'আত্মশক্তি'

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : আত্মশক্তি

এসো বিদ্রোহী মিথ্যা-সূদন আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর!
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি ঝলক ন্যায়-অসির।
তুরীয়ানন্দে ঘোষ সে আজ, 'আমি আছি'—বাণী বিশ্ব-মাঝ,
পুরুষ-রাজ! সেই স্বরাজ!
জাগ্রত কর নারায়ণ-নর নিদ্রিত বুকে মর-বাসীর;
আত্ম-ভীত এ অচেতন-চিতে জাগো 'আমি'-স্বামী নাঙ্গা-শির ॥
এসো প্রবুদ্ধ, এসো মহান, শিশুভগবান জ্যোতিষ্মান!
আত্মজ্ঞান! দৃপ্ত-প্রাণ!
জানাও জানাও, ক্ষুদ্রেরও মাঝে বাজিছে রুদ্র তেজ রবির!
উদয়-তোরণে উড়ুক আত্ম-চেতন-কেতন 'আমি আছি-'র।
করহ শক্তি-সুপ্ত-মন, রুদ্র বেদনে উদ্বোধন,
হীন রোদন, ক্ষিণ্ন-জন
দেখুক আত্ম-সবিতার তেজ বক্ষে বিপুলা ক্রন্দসীর!
বল, নাস্তিক হউক আপন মহিমা নেহারি' শুদ্ধ ধীর।
কে করে কাহারে নির্যাতন, আত্ম-চেতন স্থির যখন?
ঈর্ষা-রণ ভীম-মাতন
পদাঘাত হানে পিঞ্জরে শুধু আত্ম-বল-অবিশ্বাসীর,
মহাপাপী সেই, সত্য যাহার পর-পদানত আনত শির ॥
জাগাও আদিম স্বাধীন প্রাণ,
আত্ম জাগিলে বিধাতা চান।
কে ভগবান আত্ম-জ্ঞান !
গাহ উদ্‌গাতা ঋত্বিক্ গান অগ্নি-মন্ত্র শক্তি-শ্রীর।
না জাগিলে প্রাণে সত্য চেতনা, মানি না আদেশ কারো বাণীর!
এসো বিদ্রোহী তরুণ তাপস, আত্মশক্তি-বুদ্ধ বীর,
আনো উলঙ্গ সত্য-কৃপাণ, বিজলি-ঝলক ন্যায়-অসির ॥

২৬. এসো মা ভারত-জননী আবার জগৎ-তারিণী সাজে। — গ্রন্থ : সুরসাকী
রাজরানী মা'র ভিখারিনী বেশ দেখে প্রাণে বড় বাজে ॥ — রাগ : জৌনপুরী মিশ্র
শিশু-জগতেরে মায়ের মতন, তুমি মা প্রথম করিলে পালন, — তাল : দাদরা
আজ মাগো তোরই সন্তানগণ কাঁদিছে দৈন্য-লাজে ॥ — তাল : একতাল
আঁধার বিশ্বে তুমি কল্যাণী জ্বালিলে প্রথম জ্ঞান-দীপ আনি;
হইলে বিশ্ব-নন্দিতা রানী নিখিল নর-সমাজে ॥
দেখা মা পুন সে অতীত মহিমা, মুছেদে ভীরুতা গ্লানির কালিমা
রাঙায়ে আবার দশদিক-সীমা দাঁড়া মা বিশ্ব-মাঝে ॥

২৭. প্রার্থনা — গ্রন্থ : সর্বহারা
এসো যুগ-সারথি নিঃশঙ্ক নির্ভয়। — শিরোনাম : প্রার্থনা।
এসো চির-সুন্দর অভেদ অসংশয়।
জয় জয়! জয় জয়!
এসো বীর অনাগত, বজ্র সমুদ্যত।
এসো অপরাজেয় উদ্ধত নির্দ্দয়।
জয় জয়! জয় জয় ॥
হে মহামৌনী জন-গণ, বেদনা-বিমোচন
যুগ-সেনানায়ক! জাগো জ্যোতির্ময়।
জয় জয়! জয় জয়।
ওঠে ক্রন্দন ওই, এসো বন্ধন-জয়ী।
জাগে শিশু, মাগে আলো, এসো অরুণোদয়
জয় জয়! জয় জয় ॥

২৮. 'বিজয় গান' — গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
ঐ অভ্র-ভেদী তোমার ধ্বজা উড়্‌লে আকাশ-পথে। — শিরোনাম : বিজয়গান
মাগো, তোমার রথ আনা ঐ রক্ত-সেনার রথে ॥ — পত্রিকা : বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, শ্রাবণ ১৩২৮
ললাট-ভরা জয়ের টীকা অঙ্গে নাচে অগ্নি-শিখা,
রক্তে জ্বলে বহ্নি-লিখা, মা! ঐ বাজে তোর বিজয়-ভেরি, — রচনাস্থান ও কাল : কুমিল্লা, জুন-জুলাই ১৯২১
নাই দেরি আর নাই মা দেরি, মুক্ত তোমার হ'তে ॥
আনো তোমার বরণ-ডালা, আনো তোমার শঙ্খ, নারী!
ঐ দ্বারে মা'র মুক্তি-সেনা, বিজয়-বাজা উঠ্‌ছে তারি।
ওরে ভীরু! ওরে মরা! মরার ভয়ে যাস্‌নি তোরা;
তোদেরও আজ ডাক্‌ছি মোরা—ভাই!
ঐ খোলে রে মুক্তি-তোরণ,
আজ একাকার জীবন-মরণ মুক্ত এ ভারতে ॥

২৯. 'ভূত-ভাগানোর গান' — গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
ঐ তেত্রিশ কোটি দেব্‌তাকে তোর তেত্রিশ কোটি ভূতে। — শিরোনাম : ভূত ভাগানোর গান
আজ নাচ্‌ বুঢ়টি নাচায় বাবা উঠ্‌তে বস্‌তে শুতে ॥ — শ্রেণি : বাউলের গান
ও ভূত যেই দেখেছে মন্দিরে তোর
নাই দেবতা নাচ্‌ছে ইতর,
আর মন্ত্র শুধু দন্ত-বিকাশ, অমনি ভূতের পুতে—
তোর ভগবানকে ভূত বানালে ঘানি-চক্রে জু'তে ॥

ও ভূত যেই জেনেছে তোদের ওঝা
আজ নকলের বইছে বোঝা,
ওরে অম্‌নি সোজা তোদের কাঁধে খুঁটো তাদের পুঁতে—
আজ ভূত-ভাগানোর মজা দেখায় বোম্‌ ভোলা বম্বুতে ॥
ও ভূত সর্ষে-পড়া অনেক ধুনো
দেখে শুনে হ'ল ঝুনো,
তাই তুলো-ধুনো করছে ততই যতই মরিস্‌ কুঁথে
ও ভূত নাচ্‌ছে রে তোর নাকের ডগায় পারিস্‌নে তুই ছুঁতে ॥
আগে বোঝেনি ক' তোদের ওঝা
তোরা গোঁজামিলের মন্ত্র-ভজা,
(শিখ্‌লি শুধু চক্ষু-বোঁজা)
শিখ্‌লি শুধু কানার বোঝা কুঁজোর ঘাড়ে থূতে—
তাই আপ্‌নাকে তুই হেলা ক'রে ডাকিস্‌ স্বর্গ-দূতে ॥
ওরে জীবন-হারা, ভূতে খাওয়া ! ভূতের হাতে মুক্তি পাওয়া
সে কি সোজা ? ভূত কি ভাগে ফুস-মন্তর ফুঁতে ?
তোর ফাঁকির কিন্তু এড়িয়ে—প'ড়বি কূল-হারা 'কিন্তু' তে !
ওরে ভূত তো ভূত—ঐ মারের চোটে
ভূতের বাবাও উধাও ছোটে,
ভূতের বাপ ঐ ভয়টাকে মার্‌, ভূত যাবে তোর চুটে—
তখন ভূতে-পাওয়া এই দেশই ফের ভ'রবে দেব্‌তা দূতে ॥

৩০. 'মুক্তি-সেবকের গান'

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : মুক্তি সেবকের গান

ও ভাই মুক্তি-সেবক দল!
তোদের কোন্‌ ভায়ের আজ বিদায়-ব্যথায় নয়ন ছল-ছল ॥
ঐকারা ঘর্‌ তো নয় হারা-ঘর,
হোথাই মেলে মা'র-দেওয়া বর রে।
ওরে হোথাই মেলে বন্দিনী মা'র বুক-জুড়ানো কোল!
তবে কিসের রোদন-রোল ?
তোরা মোছ্‌রে আঁখির জল! ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥
আজ কারায় যারা, তাদের তরে গৌরবে বুক উঠুক ভ'রে রে,
মোরা ওদের মতই বেদ্‌না ব্যথা মৃত্যু আঘাত হেসে,
বরণ যেন করতে পারি মা'কে ভালোবেসে।
ওরে স্বাধীনকে কে বাঁধতে পারে বল্‌? ওভাই মুক্তিসেবক দল ॥
ও ভাই প্রাণে যদি সত্য থাকে তোর
মর্‌বে নিজেই মিথ্যা, ভীরু চোর!
মোরা কাঁদব না আজ যতই ব্যথায় পিষুক কল্‌জে-তল!
মুক্তকে কি রুখতে পারে অসুক পশুর দল?
মোরা কাঁদব যেদিন আস্‌বে তারা আবার ফিরে রে,
কাঙালিনী মায়ের আমার এই আঙিনা-তল।
ও ভাই মুক্তি-সেবক দল ॥

৩১. 'কৃষাণের গান'

গ্রন্থ : সর্বহারা
শিরোনাম : কৃষাণের গান

ওঠ্ রে চাষি, জগদ্বাসী, ধর ক'ষে লাঙ্গল।
আমরা মরতে আছি—ভাল করেই মর্‌ব এবার চল্ ॥
মোদের উঠান-ভরা শস্য ছিল হাস্য-ভরা দেশ
ঐ বৈশ্য দেশের দস্যু এসে লাঞ্ছনার নাই শেষ,
ও ভাই লক্ষ হতে টানছে তারা লক্ষ্মী মায়ের কেশ,
আজ মা'র কাঁদনে লোনা হ'ল সাত সাগরের জল ॥
ও ভাই আমরা ছিলাম পরম সুখী, ছিলাম দেশের প্রাণ
তখন গলায় গলায় গান ছিল ভাই, গোলায় গোলায় ধান,
আজ কোথায় বা সে-গান গেল ভাই, কোথায় সে-কৃষাণ?
ও ভাই মোদের রক্ত জল হয়ে আজ ভ'র্‌তেছে বোতল ॥
আজ চারদিক হ'তে ধনিক বণিক শোষণকারীর জাত
ও ভাই জোঁকের মতন শুষ্‌ছে রক্ত, কাড়ছে থালার ভাত,
মোর বুকের কাছে মরছে খোকা, নাই ক' আমার হাত।
আজ সতী মেয়ের বসন কেড়ে খেলছে খেলা খল্ ॥
ও ভাই আমরা মাটির খাঁটি ছেলে দূর্বাদল-শ্যাম,
আর মোদের রূপেই ছড়িয়ে আছেন রাবণ-অরি রাম।
ঐ হালের ফলায় শস্য উঠে, সীতা তাঁরি নাম,
আজ হ'র্‌ছে রাবণ সেই সীতারে—সেই মাঠের ফসল ॥
ও ভাই আমরা শহীদ, মাঠের মক্কায় কোরবানি দিই জান্।
আর সেই খুনে যে ফলছে ফসল, হর্‌ছে তা' শয়তান।
আমরা যাই কোথা ভাই, ঘরে আগুন বাইরে যে তুফান!
আজ চারদিক হতে ঘিরে মারে এজিদ রাজার দল্ ॥
আজ জাগ্‌রে কিষাণ ! সব তো গেছে কিসের বা আর ভয়?
এই ক্ষুধার জোরেই করব এবার সুধার জগৎ জয়।
ঐ বিশ্বজয়ী দস্যুরাজার হয়কে করব নয়,
ওরে দেখবে এবার সভ্য জগৎ চাষার কত বল্ ॥

৩২. 'শ্রমিকের গান'

গ্রন্থ : সর্বহারা
শিরোনাম : শ্রমিকের গান
পত্রিকা : লাঙল, ফাল্গুন ১৩৩২
রচনাস্থান ও কাল : কৃষ্ণনগর, ২০ মাঘ ১৩৩২
বি. দ্র. : ১৯২৬ সালের ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারি কৃষ্ণনগরে অনুষ্ঠিত নিখিল বঙ্গ প্রজা সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের উদ্বোধনী সংগীত হিসেবে রচিত ও কবি কর্তৃক গীত।

ওরে ধ্বংস-পথের যাত্রী-দল! ধর্ হাতুড়ি, তোল্ কাঁধে শাবল।
আমরা হাতের সুখে গড়েছি ভাই, পায়ের সুখে ভাঙব চল্ ॥
ও ভাই আমাদেরি শক্তি-বলে, পাহাড় টলে তুষার গ'লে—
মরু ভূমে সোনার ফসল ফলে রে!
মোরা সিন্ধু ম'থে এনে সুধা পাই না ক্ষুধায় বিন্দু জল ॥
ও ভাই আমরা কলির কলের কুলি,
কলুর বলদ চক্ষে-ঠুলি হীরা পেয়ে রাজ-শিরে দিই তুলি রে!
আজ মানব-কুলের কালি মেখে আমরা কালো কুলির দল ॥
আমরা পাতাল ফেড়ে খুঁড়ে' খনি আনি ফণির মাথার মণি,
তাই পেয়ে সব শনি হ'ল ধনী রে!
এবার ফণী-মনসার নাগ-নাগিনী আয় রে গর্জে মার্ ছোবল ॥
যত শ্রমিক শুষে নিঙড়ে প্রজা, রাজা উজির মারছে মজা,
আমরা মরি ব'য়ে তাদের বোঝা রে!
এবার জুজুর দল ঐ হজুর দলে দল্‌বি রে আয় মজুর দল ॥

ও ভাই মোদের বলে হতেছে পার, হপ্তা রোজে সপ্ত পাথার
সাঁতার কেটে জাহাজ কাতার কাতার্ রে!
তবু মোরাই জনম চলছি ঠেলে ক্লেশ-পাথরের সাঁতার-জল ॥
আজ ছ' মাসের পথ ছ' দিনে যায়,কামান-গোলা রাজার সিপাই
মোদের শ্রমে মোদেরি সে-কৃপায় রে!
ও ভাই মোদের পুণ্যে শূন্যে ওড়ে ঐ ভুঁড়োদের উড়োকল !
ও ভাই দালান-বাড়ি আমরা গ'ড়ে—
রইনু জনম ধুলায় প'ড়ে,
বেড়ায় ধনী মোদের ঘাড়ে চ'ড়ে রে!
আমরা চিনির বলদ, চিনি নে স্বাদ চিনি বওয়াই সার কেবল ॥
ও ভাই আমরা মায়ের ময়লা ছেলে
কয়লা খনির বয়লা ঠেলে
যে অগ্নি দিই দিগ্বিদিকে জ্বেলে রে!
এবার জ্বালবে জগৎ কয়লা-কাঁটা ময়লা কুলির সেই অনল ॥
ও ভাই আমাদের কাজ হলে বাসি আমরা মুটে, কল্-খালাসী!
ডুবলে তরী—মোরাই তুলতে আসি রে!
আমরা বলির মতন দান ক'রে সব পেলাম শেষে পাতার-তল ॥
মোদের যা ছিল সব দিইছি ফুঁকে, এইবারে শেষ কপাল ঠুকে'
পড়ব রুখে অত্যাচারীর বুকে রে!
এবার নূতন ক'রে মল্লভূমে গর্জাবে ভাই দল-মাদল ॥
ঐশয়তানী চোখ কলের বাতি
নিবিয়ে আয় রে ধ্বংস-সাথি!
ধর্ হাতিয়ার, সামনে প্রলয়-রাতি রে!
আয় আলোক-স্নানের যাত্রীরা আয় আঁধার নায়ে চড়বি চল্ ॥

৩৩. 'রক্ত-পতাকার গান'
ওড়াও ওড়াও লাল নিশান।
দুলাও মোদের রক্ত-পতাকা ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান ॥
শীতল শ্বাসেরে বিদ্রূপ করি' ফোটে কুসুম
নব-বসন্ত-সূর্য উঠিছে টুটিয়া ঘুম,
অতীতের ঐ দশ-সহস্র বছরের হান মৃত্যু-বাণ ॥
চির-বসন্ত যৌবন করে ধরা শাসন
নহে পুরাতন দাসত্বের ঐ বন্ধ মন,
ওড়াও তবে রে লাল নিশান
ভরিয়া বাতাস, জুড়ি' বিমান।
বসন্তের এই জ্যোতির পতাকা ওড়াও উর্দ্ধে,
গাহ রে গান! লাল নিশান! লাল নিশান ॥

গ্রন্থ : ফণি-মনসা
শিরোনাম : রক্ত পতাকার গান (একটি ইংরেজি কবিতার ভাবানুবাদ)
পত্রিকা : গণবাণী, ২৮ এপ্রিল ১৯২৭
গান হিসেবে নির্দেশিত

৩৪. কল-কল্লোলে ত্রিংশ কোটি-কণ্ঠে উঠেছে গান
জয় আর্যাবর্ত, জয় ভারত, জয় হিন্দুস্থান ॥
শিরে হিমালয় প্রহরী, পদ বন্দে সাগর যাঁর,
শ্যাম বনানী কুন্তলা রানী জন্মভূমি আমার।
ধূসর কভু ঊষর মরুতে, কখনো কোমল লতায় তরুতে,
কখনো ঈশানে জলদ-মন্দ্রে বাজে-মেঘ বিষাণ ॥

সূত্র : পাণ্ডুলিপি এবং চুক্তিপত্র
১৮.৯.১৯৩৫
গ্রন্থ : ১. নজরুল সঙ্গীত সম্ভার, ঢাকা
২. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা
৩. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

সকল জাতি সকল ধর্ম পেয়েছে হেথায় ঠাই
এসেছিল যারা শত্রুর রূপে, আজ সে স্বজন ভাই।
বিজয়ীর বেশে আসিল যাহারা, আজি মা'র কোলে সন্তান তারা,
(তাই) মা'র কোল নিয়ে করে কাড়াকাড়ি হিন্দু মুসলমান ॥
জৈন পার্শী বৌদ্ধ শাক্ত খ্রিস্টান বৈষ্ণব
মা'র মমতায় ভুলিয়া বিরোধ এক হয়ে গেছে সব।
ভুলি' বিভিন্ন ভাষা আর বেশ
গাহিছে সকলে আমার স্বদেশ
শত দল মিলে' শতদল হ'য়ে করিছে অর্ঘ্য দান ॥

পত্রিকা : মুয়াজ্জিন, ভাদ্র ১৩৪০
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি, এপ্রিল ১৯৩৬
নং-এন ৯৭০৭
শিল্পি : গোপাল সেন
সুর : মার্চের সুর
তাল : দাদ্‌রা
স্বরলিপি : নজরুল স্বরলিপি, তৃতীয় খণ্ড, হরফ

৩৫. কারা-পাষাণ ভেদি' জাগো নারায়ণ!
কাঁদিছে বেদীতলে আর্ত জনগণ,
বন্ধ-ছেদন জাগো নারায়ণ ॥
হত্যা-যূপে আজি শিশুর বলিদান
অমৃত-পুত্রেরা মৃত্যু-ম্রিয়মাণ!
শোণিত-লেখা জাগে—নাহি কি ভগবান?
মৃত্যুক্ষুধা জাগে শিয়রে লেলিহান!
শঙ্কা-নাশন জাগো নারায়ণ ॥

গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু
রাগ : দরবারী কানাড়া–গীতাঙ্গী
পত্রিকা : জয়তী, পৌষ ১৩৩৭
নাটক : কারাগার
নাট্যকার : মন্মথ রায়
সঙ্গীত শিল্পি : নীহারবালা

৩৬. কারার ঐ লৌহ কপাট, ভেঙে ফেল কররে লোপাট
রক্ত জমাট শিকল পূজার পাষাণ বেদী।
ওরে ও তরুণ ঈশান! বাজা তোর প্রলয় বিষাণ!
ধ্বংস নিশান উড়ুক প্রাচী'র প্রাচীর ভেদী।
গাজনের বাজনা বাজা! কে মালিক? কে সে রাজা?
কে দেয় সাজা, মুক্ত স্বাধীন সত্য কে রে?
হা হা হা পায় যে হাসি, ভগবান পড়বে ফাঁসি?
সর্বনাশী শিখায় এ হীন তথ্য কে রে?
ওরে ও পাগলা ভোলা! দে রে দে প্রলয় দোলা
গারদগুলা জোরসে ধরে হেঁচকা টানে!
মার হাঁক হৈদরী হাঁক, কাঁধে নে দুন্দুভি ঢাক
ডাক ওরে ডাক মৃত্যুকে ডাক জীবন পানে!
নাচে ঐ কাল-বোশেখী, কাটাবি কাল বসে কি?
দে রে দেখি ভীম কারার ঐ ভিত্তি নাড়ি!
লাথি মার ভাঙরে তালা! যত সব বন্দিশালায়
আগুন জ্বালা, আগুন জ্বালা, ফেল উপাড়ি।

ভাঙার গান

৩৭. কালের শঙ্খে বাজিছে আজও তোমারই মহিমা ভারতবর্ষ।
প্রণতি জানায়ে বিশ্বভুবন শিখিছে আজিও তব আদর্শ॥
নিখিল মানবের প্রথমা ধাত্রী, শিক্ষা সভ্যতা দীক্ষাদাত্রী!
আসিল যুগে যুগে দেবতা মুনি ঋষি লভিতে তোমারি চরণস্পর্শ
শিল্প সঙ্গীত বেদ বিজ্ঞান সাংখ্য দর্শন পুণ্য প্রেমধ্যান।
যাহা কিছু সুন্দর যাহা কিছু মহীয়ান
বিশ্ব সাক্ষী মাগো সকলি তোমার দান।
জগৎসভা মাঝে তাহারি সন্তান আজি, মলিন মুখ লাজে বিমর্ষ॥

৩৮. খোলো মা দুয়ার খোলো, প্রভাতেই সন্ধ্যা হলো — জয় জয়ন্তী- কীর্ত্তন

দুপুরেই ডুবলো দিবাকর গো
সমরে শয়ান ওই, সূত তোর বিশ্বজয়ী
কাঁদনের উঠছে তুফান ঝড় গো॥
সবারে বিলিয়ে সুধা, সে নিল মৃত্যুক্ষুধা,
কুসুম ফেলে সে নিল খঞ্জর গো।
তাহারি অস্থি চিরে দেবতা বজ্র গড়ে
নাশে ঐ অসুর অসুন্দর গো।
ঐ মা যায় সে হেসে, দেবতার উপরে সে
ধরা নয় স্বর্গ তাহার ঘর গো॥
যাও বীর যাও গো চলে, চরণে মরণ দলে
করুক প্রণাম বিশ্ব চরাচর গো।
তোমার ঐ চিত্ত জ্বেলে ভাঙালে ঘুম ভাঙালে
নিজে হায় নিবলে চিতার পর গো।
বেদনার শ্মশান দহে, পোড়ালে আপন দেহে
হেথা কি নাচবে না শঙ্কর গো॥

৩৮. গঙ্গা সিন্ধু নর্ম্মদা কাবেরী যমুনা ওই,
বহিয়া চলেছে আগের মতন কইরে আগের মানুষ কই।।
মৌন স্তব্ধ সে হিমালয়, তেমনি অটল মহিমময়,
নাই তার সাথে সেই ধ্যানী ঋষি, আমরাও আর সে জাতি নই।
আছে সে আকাশ–ইন্দ্র নাই, কৈলাসে সে গোগীন্দ্র নাই,
অন্নদা-সূত ভিক্ষা চাই, কি কহিব এরে কপাল বই।
সেই আগ্রা, সে দিল্লী ভাই, পড়ে আছে সেই বাদশা নাই,
নাই কোহিনূর ময়ূর-তখ্‌ত নাই সে বাহিনী বিশ্বজয়ী।।
আমরা জানি না, জানে না কেউ, কূলে বসে কত গনিব ঢেউ,
দেখিয়াছি কত, দেখিব এ-ও, নিঠুর বিধির লীলা কতই।।

গ্রন্থ : গুলবাগিচা
রাগ : খাম্বাজ
তাল : দাদরা
শিল্পী- গোপাল সেন
রেকর্ড লেবেলে পাঠ- "কই সে আগের মানুষ কই"

৩৯. 'চরকার গান'
ঘোর—
ঘোর্ রে ঘোর্ রে আমার সাধের চর্‌কা ঘোর।
ঐ স্বরাজ-রথের আগমনী শুনি চাকার শব্দে তোর ॥
তোর ঘোরার শব্দে ভাই সদাই শুনতে যেন পাই,
ঐ খুল্‌ল স্বরাজ-সিংহদুয়ার, আর বিলম্ব নাই।
ঘু'রে আস্‌ল ভারত-ভাগ্য-রবি, কাট্‌ল দুখের রাত্রি ঘোর ॥
ঘর ঘর তুই ঘোর্ রে জোর ঘর্ঘর ঘর্ ঘূর্ণিতে তোর,
ঘুচুক ঘুমের ঘোর, তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
তোর ঘুর-চাকাতে বল-দর্পীর তোপ্ কামানের টুটুক জোর ॥
তুই ভারত-বিধির দান এই কাঙাল দেশের প্রাণ,
আবার ঘরের লক্ষ্মী আস্‌বে ঘরে শুনে' তোর ঐ গান।
আর লুট্‌তে না রবে সিন্ধু-ডাকাত বৎসরে পঁয়ষট্টি ক্রোড় ॥
হিন্দু-মুসলিম দুই সোদর, তাদের মিলন-সূত্র-ডোর রে
রচ্‌লি চক্রে তোর, তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : চরকার গান
পত্রিকা : ভারতী, বৈশাখ ১৩৩১
স্বরলিপি : নজরুল
বি. দ্র. : ১৯২৪ সালের মে মাসে মহাত্মা গান্ধী হুগলী এলে একটি সভায় কবি গানটি গেয়ে শোনান।

আবার তোর মহিমায় বুঝ্‌ল দুভাই মধুর কেমন মায়ের ক্রোড় !
ভারত বস্ত্রহীন যখন, কেঁদে ডাকল—নারায়ণ!
তুমি লজ্জা-হারী করলে এসে লজ্জা নিবারণ,
তাই দেশ-দ্রৌপদীর বস্ত্র হরতে পার্‌ল না দুঃশাসন-চোর ॥
এই সুদর্শন চক্রে তোর
অত্যাচারীর টুট্‌ল জোর রে, ছুটল সব গুমোর
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্ ॥
তুই জোর জুলুমের দশমগ্রহ, বিষ্ণু-চক্র ভীম কঠোর
হয়ে অন্ন বস্ত্রহীন আর ধর্মে কর্মে ক্ষীণ
দেশ ডুব্‌ছিল ঘোর পাপের ভারে যখন দিনকে দিন,
তখন আন্‌লে অন্ন পুণ্য-সুধা, খুল্‌লে স্বর্গ মুক্তি-দোর ॥
শাস্‌তে জুলুম নাশতে জোর,
খদ্দর-বাস বর্ম তোর রে অস্ত্র সত্য-ডোর,
তুই ঘোর্ ঘোর্ ঘোর্।
মোরা ঘুমিয়েছিলাম, জেগে দেখি চল্‌ছে চরকা, রাত্রি ভোর ॥
তুই সাত রাজারই ধন, দেশ-মা'র পরশ-রতন,
তোর স্পর্শে মেলে স্বর্গ অর্থ কাম্য মোক্ষ মন।
তুই মায়ের আশিস্ মাথার মানিক, চোখ ছেপে বয় অশ্রুলোর ॥

৪০. চল্ রে চপল তরুণ-দল বাঁধন হারা
চল্ অমর সমরে, চল ভাঙি' কারা
জাগায়ে কাননে নব পথের ইশারা ॥
প্রাণ-স্রোতের ত্রিধারা বহায়ে তোরা ওরে চল!
জোয়ার আনি, মরা নদীতে পাহাড় টলায়ে মাতোয়ারা ॥
ডাকে তোরে স্নেহভরে 'ওরে ফিরে আয় ফিরে ঘরে'
তারে ভোল্ ওরে ভোল্ তোরা যে ঘর-ছাড়া ॥
তাজা প্রাণের মঞ্জরি ফুটায়ে পথে তোরা চল্,
রহে কে ভুলে ছেঁড়া পুঁথিতে তাদের পরানে দে রে সাড়া।
রণ-মাদল আকাশে ঘন বাজে গুরু গুরু।
আঁধার ঘরে কে আছে প'ড়ে তাহার দুয়ারে দে রে নাড়া ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মার্চের সুর
পত্রিকা : মোয়াজ্জিন, আশ্বিন ১৩৪০
রেকর্ড : টুইন, জানুয়ারি ১৯৩৪
নং- এফ. টি ২৯৬৭
শিল্পি : কমল দাশগুপ্ত
তাল : কাহার্‌বা

৪১. চাঁদের কন্যা চাঁদ সুলতানা, চাঁদের চেয়েও জ্যোতি।
তুমি দেখাইলে মহিমান্বিতা নারী কী শক্তিমতী ॥
শিখালে কাঁকন চুড়ি পরিয়াও নারী,
ধরিতে পারে যে উদ্ধত তরবারি,
না রহিত অবরোধের দুর্গ, হতো না এ দুর্গতি ॥
তুমি দেখালে নারীর শক্তি স্বরূপ—চিন্ময়ী কল্যাণী,
ভারত জয়ীর দর্প নাশিয়া মুছালে নারীর গ্লানি।
তুমি গোলকুণ্ডার কোহিনূর হীরা সম
আজো ইতিহাসে জ্বলিতেছে নিরূপম, রণরঙ্গিণী ফিরে এসো,
তুমি ফিরিয়া আসিলে, ফিরিয়া আসিবে লক্ষ্মী ও সরস্বতী ॥

গ্রন্থ : বুলবুল দ্বিতীয় খণ্ড
বেতার : সঙ্গীতালেখ্য-পঞ্চাঙ্গনা
তারিখ : ২৩.৮.১৯৪১
শিল্পী : চিত্ত রায়
তাল : দাদ্‌রা

৪২. কোরাসঃ চীন ও ভারতে মিলেছি আবার মোরা শতকোটি লোক
চীন ভারতের জয় হোক! ঐক্যের জয় হোক সাম্যের জয় হোক
ধরার অর্ধ নরনারী মোরা রহি এই দুই দেশে,
কেন আমাদের এত দুর্ভোগ নিত্য দৈন্য ক্লেশে।
পুরুষ কণ্ঠঃ সহিব না আজ এই অবিচার—
কোরাস্ : খুলিয়াছে আজি চোখ ॥
প্রাচীন চীনের প্রাচীর মহাভারতের হিমালয়
আজি এই কথা যেন কয়—মোরা সভ্যতা শিখায়েছি
পৃথিবীরে—ইহা কি সত্য নয় ?
হইব সর্বজয়ী আমরাই সর্বহারার দল,
সুন্দর হবে শান্তি লভিবে নিপীড়িতা ধরাতল।
পুরুষ কণ্ঠ : আমরা আনিব অভেদ ধর্ম—
কোরাস্ : নব বেদ-গাথা-শ্লোক ॥

শিল্পি : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
সুর : নজরুল
বেতার : চীনের জাগরণে (সূত্র শৈল দেবীর খাতা)
স্বরলিপি : নজরুল স্বরলিপি, চতুর্থ খণ্ড, হরফ
তাল : দাদ্‌রা

৪৩. জগতে আজিকে যারা আগে চলে ভয়-হারা
ডেকে যায় আজি তারা, চল্ রে সুমুখে চল।
পিছু পানে চেয়ে' মিছে প'ড়ে আছি সব নীচে,
চাস্‌নে রে তোরা পিছে অগ্র-পথিক দল ॥
চলার বেগে উঠবে জেগে বনে নূতন পথ
বর্তমানের পানে মোদের চল্‌বে অরুণ-রথ,
অতীত আজি পতিত রে ভাই, রচ্‌ব ভবিষ্যৎ।
স্বর্গ মোরা আন্‌ব, না হয় যাব রসাতল ॥
রইব না পিছে প'ড়ে অতীতের কঙ্কাল ধ'রে,
বইবে নব জীবন-স্রোত যৌবন-চঞ্চল।
বিশ্ব-সভাঙ্গনে সকল জাতির সনে
বসিব সম-আসনে গৌরব-উজ্জ্বল ॥

গ্রন্থ : গুলবাগিচা
পেগ্যান সঙ্গীত
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি, জুন ১৯৩৫
নং- এন ৭৩৭১
শিল্পীঃ দেববালা দাসী

৪৪. জননী! জননী! আবার জাগো শুভ্র শারদ-প্রাতে।
আঁখি তোল অনসিত অনাহত মহিমাতে ॥
আকশে তরুণোদয় স্বপ্ন কুহেলিময়,
তরুণ উষার জয় জয় কনক কিরীট মাথে ॥
পত্রে পুষ্পে গন্ধে বনানী মুখরিত
শিশিরসিক্ত তৃণে অঞ্চল আলুলিত।
বন্দিনী মোর মা গো ক্রন্দন রাখি জাগো,
নব চেতনার ছন্দে, কবির বন্দনাতে ॥

গ্রন্থ : ১. সঞ্চয়ন (শিরোনাম-জননী জাগো)
২. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

৪৫. জননী মোর জন্মভূমি, তোমার পায়ে নোয়াই মাথা।
স্বর্গাদিপি গরীয়সী স্বদেশ আমার ভারত-মাতা ॥
তোমার স্নেহ যায় ব'য়ে মা শত ধারায় নদীর স্রোতে
ঘরে ঘরে সোনার ফসল ছড়িয়ে পড়ে আঁচল হ'তে,
স্নিগ্ধ-ছায়া মাটির বুকে তোমার শীতল পাটী পাতা ॥
স্বর্গের ঐশ্বর্য লুটায় তোমার ধূলি-মাখা পথে
তোমার ঘরে নাই যাহা মা, নাইক তাহা ভূ-ভারতে,
উর্ধ্বে আকাশ নিম্নে সাগর গাহে তোমার বিজয়-গাথা ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মিশ্র সুর
তাল : একতাল
শিল্পী : দেববালা দাসী

আদি জগদ্ধাত্রী তুমি জগতেরে প্রথম প্রাতে
শিক্ষা দিলে দীক্ষা দিলে, করলে মানুষ আপন হাতে,
তোমার কোলের লোভে মা গো রূপ ধ'রে আসেন বিধাতা ॥
ছেলের মুখের অন্ন কেড়ে খাওয়ালি মা যাদের ডেকে
তারাই দিল তোর ললাটে চির-দাসীর তিলক এঁকে,
দেখে শুনে হয় মা মনে, নেইক বিচার, নেই বিধাতা ॥

৪৬. 'ভারতী আরতি'
জয় ভারতী শ্বেত শতদলবাসিনী, বিষ্ণু-শরণ-চরণ আদি বাণী।
কণ্ঠ-লীনা বাজিছে বীণা,
বিশ্ব ঘু'রে গাহে সে সুরে জয় জয় বীণাপাণি ॥
শুনি সে-সুর অন্ধ নভে উদিল গ্রহ তারকা সবে,
মাতিল আলো-মহোৎসবে মা*, বিশ্বরানী ॥
আদি সৃজন-দিনে অন্ধ ভুবনে,
তোমার জ্যোতি আলো দিল মা নয়নে।
জ্ঞান-প্রদায়িনী হৃদয়ে আলো দিলে,
ধেয়ান-সুন্দর করিলে সব নিখিলে,
উর মা উর আঁধার-পুরে আলো দানি' ॥

গ্রন্থ : প্রলয় শিখা
রাগ : তিলক কামোদ ও শুভাবতী
তাল : সাদ্রা ও গীতাঙ্গী
শিরোনাম : ভারতী আরতি

৪৭. জয় হে জনগণ-অধিপতি জয়।
হে দেবপূজ্য-নিঃশঙ্ক নির্ভয় ॥
প্রতাপে ভাস্বর তুমি আদিত্য হে
মৃত্যু তোমার চরণে ভৃত্য হে,
সিংহাসন তব ব্যথিত চিত্ত হে—
হে রাজ সন্ন্যাসী চির-অসংশয় ॥
সিংহ-বিক্রম শত্রুজিৎ শূর
চক্রপথে তব ঊষর বন্ধুর,
দুর্দিনে এই দুর্গশিরে তুমি—
আশার কেতন-মন্ত্র অভয় জয় হে ॥

রেকর্ড-নাটিকা : প্রতাপাদিত্য
নাট্যকার : যোগেশ চৌধুরী
শিল্পী : গোপাল সেন

৪৮. জয় হোক জয় হোক শান্তির জয় হোক, সাম্যের জয় হোক্,
সত্যের জয় হোক, জয় হোক ॥
সর্ব অকল্যাণ পীড়ন অশান্তি সর্ব অপৌরুষ মিথ্যা ও ভ্রান্তি,
হোক ক্ষয়, ক্ষয় হোক জয় হোক জয় হোক ॥
দূর হোক অভাব ব্যাধি শোক দুখ দৈন্য গ্লানি বিদ্বেষ অহেতুক,
মৃত্যুবিজয়ী হোক্ অমৃত লভুক—ভয়-ভীত দুর্বল নির্ভয় হোক।
রবে না এ শৃঙ্খল উচ্ছৃঙ্খলতার বন্ধন কারাগার হবে হবে চুরমার,
পার হবে বাধার গিরি মরু পারাবার—
নির্যাতিত ধরা মধুর, সুন্দর প্রেমময় হোক,জয় হোক জয় হোক

স্বরলিপি : সঙ্গীতাঞ্জলি, দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা
সুর : নিতাই ঘটক
তাল : কাহার্‌বা

৪৯. ‘মোহান্তের মোহ-অন্তের গান’

জাগো আজ দণ্ড-হাতে চণ্ড বঙ্গবাসী।
ডুবালো পাপচণ্ডাল তোদের বাঙলাদেশের কাশী জাগো বঙ্গবাসী
তোরা হত্যা দিতিস্ যাঁর থানে, আজ সেই দেবতাই কেঁদে
ওরে তোদের দ্বারেই হত্যা দিয়ে মাগেন সহায় আপ্‌নি আসি’।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
মোহের যার নাই ক অন্ত পূজারি সেই মোহান্ত,
মা-বোনে সর্ব্বস্বান্ত করছে বেদী-মূলে।
তোদেরে পূজার প্রসাদ ব’লে খাওয়ায় পাপ-পুঁজ সে গুলে—
তোরা তীর্থে গিয়ে দেখে আসিস্ পাপ-ব্যভিচার রাশি রাশি।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
পুণ্যের ব্যবসাদারী চালায় সব এই ব্যাপারী,
জমাচ্ছে হাঁড়ি হাঁড়ি টাকার কাঁড়ি ঘরে।
হায় ছাই মেখে যে ভিখারি শিব বেড়াল ভিক্ষা ক’রে—
ওরে তাঁর পূজারী দিনে-দিনে ফুলে’ হচ্ছে খোদার খাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
এইসব ধর্ম-ঘাগী দেবতায় করছে দাগী,
মুখে কয় সর্বত্যাগী ভোগ-নরকে ব’সে।
সে যে পাপের ঘণ্টা বাজায় পাপী দেব-দেউলে প’শে।
আর ভক্ত তোরা পূজিস্ তারেই যোগাস্ খোরাক সেবা-দাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
দিয়ে নিজ রক্তবিন্দু ভরালি পাপের সিন্ধু,
ডুব্‌লি তায় ডুব্‌লি হিন্দু ডুবালি দেব্‌তারে।
দ্যাখ্ ভোগের বিষ্ঠা পুড়ছে তোদের বেদীর রূপাধারে।
পূজারির কমণ্ডলুর গঙ্গা-জলে মদের ফেনা উঠ্‌ছে ভাসি’।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
দিতে যায় পূজা-আরতি সতীত্ব হারায় সতী,
পুণ্য-খাতায় ক্ষতি লেখায় ভক্তি দিয়ে।
তার ভোগ-মহলের জ্বল্‌ছে প্রদীপ তোদের পুণ্য-ঘিয়ে।
তোদের ফাঁকা ভক্তির ভণ্ডামিতে মহাদেব আজ ঘোড়ার ঘাসী।
জাগো বঙ্গবাসী ॥
তোরা সব শক্তিশালী বুকে নয়, মুখে খালি।
বেড়ালকে বাছতে দিলি মাছের কাঁটা যে রে।
তোরা পূজারিকে করিস্ পূজা পূজার ঠাকুর ছেড়ে।
মার্ অসুর শোধ্‌রা সে-ভুল, আদেশ দেন মা সর্বনাশী—
‘জয় তারকেশ্বর’ ব’লে পর্‌বি রে, নয় গলায় ফাঁসি!
জাগো বঙ্গবাসী ॥

গ্রন্থ : ভাঙার গান
শিরোনাম : মোহান্তের মোহ অন্তের গান
পত্রিকা : ধূমকেতু, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা ১১ই আগস্ট ১৯২২
উপলক্ষ্য : তারকেশ্বর মন্দিরের মোহান্তের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে ১৩৩১ সালে পরিচালিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন উপলক্ষ্যে রচিত।

৫০. জাগো জাগো! জাগো নব আলোকে
জ্ঞান-দীপ্ত চোখে ডাকে ঊষসী আলো।
জাগে আঁধার-সীমায় রবি রাঙা মহিমা,
গাহে প্রভাত-পাখি হের নিশি পোহালো ॥
জগো ঊর্দ্ধে ধরার শিশু স্বপ্ন-আতুর,
নব বিস্ময় লোকে জাগো সৃজন-বিধুর।
রাঙা গোধূলি-বেলা র'চ ধূলির ধোঁওয়ায়,
আনো কল্প-মায়া, নাশো গহন কালো ॥

গ্রন্থ : গীতিশতদল
রাগ : টোড়ি
তাল : কাওয়ালী
উপলক্ষ্য : ১৯৩২ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর তারিখে কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে বঙ্গীয় পরিশীলন সমিতির সাহায্যের নিমিত্তে আয়োজিত বিচিত্রানুষ্ঠানের উদ্বোধনী সংগীতরূপে রচিত।

৫১. জাগো জাগো জাগো হে দেশপ্রিয়!
ভারত চাহে তোমায় হে বীর-বরণীয় ॥
চিতার ঊর্দ্ধে হে অগ্নিশিখা,
ঊর্দ্ধে কারার বন্ধহারা, হে বীর জাগো!
শরণ দাও, হে চির-স্মরণীয় ॥
ধূলির স্বর্গে যতীন্দ্র জাগো,
বজ্র-বাণী অম্বরে হানি' জাগো!
তব ত্যাগের মন্ত্র শুনাইয়ো ॥
ভারত কাঁদে অনন্ত শোকে
নিদ্রাহীনা ধূলি-শয়ন-লীনা জাগো!
মথিয়া মৃত্যু আনো প্রাণ-অমিয় ॥

গ্রন্থ : সন্ধ্যামালতী
উপলক্ষ্য : দেশপ্রিয় যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্তের মৃত্যু উপলক্ষে রচিত।
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি. কোম্পানীর চুক্তিপত্র ১৩.০১.১৯৩৫
পাণ্ডুলিপিতে শিল্পী: ধীরেন দাস

৫২. জাগো তন্দ্রামগ্ন জাগো ভাগ্যহত।
তব গৌরব-কেতন সমুন্নত ঐ হল আনত ॥
লক্ষ্মীর চরণের আল্‌পনা হায়,
ওরে গৃহ অঙ্গনে তোর যায় মুছে যায়।
মন্দির বিগ্রহ ধূলায় লুটায়—
মাহেন্দ্র-ক্ষণ ঐ হ'ল রে গত ॥

সূত্র : রেকর্ড কোম্পানির চুক্তিপত্র ২৪.০১.১৯৩৫
রেকর্ড-নাটিকা : প্রতাপাদিত্য
নাট্যকার : যোগেশ চৌধুরী

৫৩. জাগো দুস্তর পথের নব যাত্রী
জাগো জাগো!
ঐ পোহাল তিমির রাত্রি ॥
দ্রীম্ দ্রীম্ দ্রীম্ রণ-ডঙ্কা
শোন বোলে নাহি শঙ্কা!
আমাদের সঙ্গে নাচে রণ-রঙ্গে
দনুজ-দলনী বরাভয়-দাত্রী ॥
অসম্ভবের পথে আমাদের অভিযান
যুগে যুগে করি মোরা মানুষেরে মহীয়ান।
আমরা সৃজিয়া যাই নতুন যুগ ভাই
মোরা নবতম ভারত-বিধাত্রী ॥
সাগরের শঙ্খ ঘন ঘন বাজে,
রণ-অঙ্গনে চল্ কুচ্‌কাওয়াজে।
বজ্রের আলোকে মৃত্যুর মুখে
দাঁড়াব নির্ভীক উগ্র সুখে
ভারত-রক্ষী মোরা নব শাস্ত্রী ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মার্চের সুর
তাল : কাহার্‌বা
রেকর্ড : টুইন, জানুয়ারি ১৯৩৪
নং- এফ. টি ৩০০৩
শিল্পি : সন্তোষ কুমার দাস
স্বরলিপি : ১. নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, অষ্টম খণ্ড, ঢাকা
২. নজরুল স্বরলিপি, একাদশ খণ্ড, হরফ

৫৪. 'ছাত্রদলের গান'
জাগো রে তরুণ দল।
(স্বতঃ) উৎসারিত ঝর্ণধারার প্রায় জাগো প্রাণ-চঞ্চল ॥
ভেদ বিভেদের গ্লানির কারা-প্রাচীর
ধূলিসাৎ করি' জাগো উন্নত-শির !
জবা-কুসুম-সঙ্কশ জাগো বীর
বিধি নিষেধের ভাঙো অর্গল ॥
ধর্ম, বর্ণ জাতির ঊর্ধ্বে জাগো রে নবীন প্রাণ,
তোমার অভ্যুদয়ে হবে সব বিরোধের অবসান।
সঙ্কীর্ণতা ক্ষুদ্রতা ভোলো ভোলো
সকল মানুষে ঊর্ধ্বে ধরিয়া তোলো,
তোমাদের চাহে আজ নিখিল জন-সমাজ
বিধাতার সম জাগো প্রেম-প্রোজ্জ্বল ॥
*. জাগো রে তরুণ জাগো রে ছাত্রদল!
*. তোমাদের চাহে নিখিল জন-সমাজ
আনো জ্ঞান-দীপ এই তিমির মাঝ।

সূত্র : পাণ্ডুলিপি (নজরুলগীতি অখণ্ড গ্রন্থে নির্দেশিত)
নাটক : বুলবুল, পৌষ ১৩৪৪

৫৫. 'জাতের বজ্জাতি'
জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত-জালিয়াৎ খেলছ জুয়া!
ছুঁলেই তোর জাত যাবে ? জাত ছেলের হাতের নয়তো মোয়া ॥
হুঁকোর জল আর ভাতের হাঁড়ি–ভাব্‌লি এতেই জাতির জান,
তাইত বেকুব, করলি তোরা এক জাতিকে একশ'-খান।
এখন দেখিস ভারত জোড়া পঁচে আছিস বাসি মড়া,
মানুষ নাই আজ, আছে শুধু জাত-শেয়ালের হুক্কাহুয়া ॥
জানিস নাকি ধর্ম সে যে বর্ম সম সহন-শীল,
তাকে কি ভাই ভাঙ্‌তে পারে ছোঁয়া ছুঁয়ির ছোট্ট ঢিল!
যে জাত-ধর্ম ঠুন্‌কো এত, আজ নয় কা'ল ভাঙবে সে ত,
যাক্ না সে জাত জাহান্নামে, রইবে মানুষ, নাই পরোয়া ॥
বলতে পারিস, বিশ্ব-পিতা ভগবানের কোন সে জাত?
কোন্ ছেলের তার লাগলে ছোঁয়া অশুচি হন জগন্নাথ?
ভগবানের জাত যদি নাই তোদের কেন জাতের বালাই?
ছেলের মুখে থুথু দিয়ে মার মুখে দিস ধূপের ধোঁয়া ॥

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : জাতের বজ্জাতি
শিরোনাম : জাত জালিয়াত
রচনাস্থান ও কাল : বহরমপুর জেলে ১৯২৩ সালের ১৮ই জুন থেকে ২০শে জুলাই এর মধ্যে লেখা।
উপলক্ষ্য : বিজলী পত্রিকায় পাদটীকায় লিখিত-"মাদারীপুর শান্তি সেনা চারণদলের জন্য লিখিত

৫৬. 'বনস্পতির গান'
ঝড় এসেছে ঝড় এসেছে কাহারা যেন ডাকে।
বেরিয়ে এলো নতুন পাতা পল্লবহীন শাখে ॥
ক্ষুদ্র আমার শুক্‌নো ডালে দুঃসাহসের রুদ্র ভালে
কচি পাতার লাগলো নাচন ভীষণ ঘূর্ণিপাকে ॥
স্থবির আমার ভয় টুটেছে গভীর শঙ্খ-রবে,
মন মেতেছে আজ নতুনের ঝড়ের মহোৎসবে।
কিশলয়ের জয়-পতাকা অন্তরে আজ মেল্‌লো পাখা
প্রণাম জানাই ভয়-ভাঙানো অভয়-মহাত্মাকে ॥

শিল্পী : গোপাল সেন
শিরোনাম : বনস্পতির গান
শ্রেণী : ভজন (চতুর্মাত্রিক ছন্দ)
স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, দশম খণ্ড, ঢাকা।
তাল : কাহার্‌বা

৫৭. ঝড়-ঝঞ্ঝার ওড়ে নিশান, ঘন-বজ্রে বিষাণ বাজে।
জাগো জাগো তন্দ্রা-অলস রে, সাজো সাজো রণ-সাজে ॥
দিকে দিকে ওঠে গান, অভিযান অভিযান!
আগুয়ান আগুয়ান হও ওরে আগুয়ান
ফুটায়ে মরুতে ফুল-ফসল।
জড়ের মতন বেঁচে কি ফল? কে র'বি প'ড়ে লাজে ॥
বহে স্রোত জীবন-নদীর, চল চঞ্চল অধীর,
তাহে ভাসিবি কে আয়, দূর সাগর ডেকে যায় ।
হ'বি মৃত্যু-পাথার পার, সেথা অনন্ত প্রাণ বিরাজে ॥
পাঁওদল্ রণে চল্, চল্ রণে চল্পাঁওদল আগে চল্, চল্ রণে চল্
মরুতে ফোটাতে পারে ওই পদতল প্রাণ-শতদল।
বিঘ্ন-বিপদে করি' সহায় না-জানা পথের যাত্রী আয়,
স্থান দিতে হবে আজি সবায়, বিশ্ব-সভা-মাঝে ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মার্চের সুর
তাল : ফের্‌তা, দ্রুত-দাদ্‌রা ও কাহার্‌বা
শিল্পী : সন্তোষ কুমার দাস
স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, চতুর্থ খণ্ড, ঢাকা

৫৮. ত্রিংশ কোটি তব সন্তান ডাকে তোরে
ভুলে আছিস দেশ জননী কেমন ক'রে ॥
ব্যথিত বুকে মাগো তোমার মন্দির গড়ি
করি পূজা আরতি মাগো যুগ যুগ ধরি'
ধূপ পুড়িয়া মাগো চন্দন শুকায়ে যায়
এসো মা এসো পুন রানীর মুকুট প'রে ॥
দুখের পসরা মা আর যে বহিতে নারি
কাঁদিয়া কাঁদিয়া শুকায়েছে আঁখি-বারি
এ গ্লানি লাজ মাগো সহিতে নাহি পারি
বিশ্ব বন্দিতা এসো দুখ-নিশি-ভোরে ॥
অতীত মহিমা ল'য়ে এসো মহিমাময়ী
হীনবল সন্তানে কর মা ভুবনজয়ী
দুখ তপস্যা মা কবে তব হবে শেষ
আয় মা নব আশা রবির প্রদীপ ধ'রে ॥

রাগ : মালগুচ্ছ-জলদ্
তাল : তেতালা
গ্রন্থ : সুরসাকী
শিল্পী : ধীরেন দাস

৫৯. দুরন্ত দুর্মদ প্রাণ অফুরান গাহে আজি উদ্ধত গান।
লঙ্ঘি' গিরি-দরি ঝঞ্ঝা নূপুর পরি'
ফেরে মন্থন করি' অসীম বিমান ॥
আমাদের পদভরে ধরা টলমল অগ্নিগিরি ভয়ে মন্থর নিশ্চল,
কম্পমানা ধরা শান্ত অটল— চরণে লুটায় ঘোর সিন্ধু-তুফান ॥
মোরা উচ্ছৃঙ্খল ঘোর স্পর্ধা ভরে ভাঙি দ্বার নিষেধের বজ্র-করে
করি অসম্ভবের পানে নব অভিযান ॥
মোদের প্রণমি' যায় কালভৈরব আমাদের হাতে মৃত্যুর পরাভব
মৃত্য নিঙাড়ি' আনি জীবন-আসব—
মানুষে করেছি মোরা মহামহীয়ান ॥

মার্চের সুর
গ্রন্থ : গুলবাগিচা

৬০. দুর্গম দূর পথে চল্ যাত্রী
ভয় নাহি, নাহি ভয় বলো যাত্রী ॥
মহাতীর্থের মরুপথ সঙ্গী
দুস্তর গিরি-পর্বত লঙ্ঘি,
ধরি বন ঘন কুন্তল রাত্রির—
চল্ দুর্জয় চঞ্চল যাত্রী ॥

সূত্র : শৈল দেবীর গানের খাতা
বেতার : সঙ্গীতালেখ্য কাফেলা
(মরুদেশের সঙ্গীত)
তারিখ : ২৪.০৫.১৯৪১
গ্রন্থ : বেতার নজরুল ও তাঁর গান,
ব্রহ্মমোহন ঠাকুর, কলিকাতা
তাল : কাহার্‌বা

৬১. 'বোধন'

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : বোধন
শিরোনাম বোধন
সুরনির্দেশ : সুর "সেদিন সুনীল জলধি হইতে" (দ্বিজেন্দ্রগীতি)

১
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে।
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
কেঁদো না, দমো না, বেদনা-দীর্ণ এ প্রাণে আবার আসিবে শক্তি
দুলিবে শুষ্ক শীর্ষে তোমারও সবুজ প্রাণের অভিব্যক্তি।
জীবন-ফাগুন যদি মালঞ্চ-ময়ূর-তখ্‌তে আবার বিরাজে,
শোভিবেই ভাই, ঐত সেদিন শোভিবে ও-শিরও পুষ্প-তাজে ॥
২
হ'য়ে না নিরাশ, অজানা যখন ভবিষ্যতের সব রহস্য,
যবনিকা-আড়ে প্রহেলিকা-মধু, —বীজেই সুপ্ত স্বর্ণ শস্য!
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই ! ঐ যে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
৩
দু'দিনের তরে গ্রহ-ফেরে ভাই সব আশা যদি না হয় পূর্ণ
নিকট সেদিন, র'বে না এ দিন, হবে জালিমের গর্ব চূর্ণ!
পূণ্য-পিয়াসি যাবে যারা ভাই মক্কার পূত তীর্থ লভ্যে
কণ্টক-ভয়ে ফিরবে না তারা বরং পথেই জীবন সঁপ্‌বে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
৪
অস্তিত্বের ভিত্তি মোদের বিনাশেও যদি ধ্বংস-বন্যা,
সত্য মোদের কাণ্ডারি ভাই, তুফানে আমরা পর্‌ওয়া করি না।
যদিও এ পথ ভীতি-সঙ্কুল, লক্ষ্যস্থলও কোথায় দূরে,
বুকে বাঁধ্ বল, ধ্রুব-অলক্ষ্য আসিবে নামিয়া অভয় তূরে।
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুন হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥
৫
অত্যাচার আর উৎপীড়নে সে আজিকে আমরা পর্যুদস্ত,
ভয় নাই ভাই! রয়েছে খোদার মঙ্গলময় বিপুল হস্ত!
কি ভয় বন্দী, নিঃস্ব যদিও, আমার আঁধারে পরিত্যক্ত,
যদি রয় তব সত্য-সাধনা স্বাধীন জীবন হবেই ব্যক্ত!
দুঃখ কি ভাই, হারানো সুদিন ভারতে আবার আসিবে ফিরে,
দলিত শুষ্ক এ মরুভূ পুনঃ হ'য়ে গুলিস্তাঁ হাসিবে ধীরে ॥

৬২. দুঃখ সাগর মন্থন শেষ ভারতলক্ষ্মী আয় মা আয়
কবে সে ডুবিলি অতল পাথারে উঠিলি না আর হায় মা হায় ॥
মন্থনে শুধু উঠে হলাহল
শিব নাই পান কে করে গরল
অমৃত ভাণ্ড লয়ে আয় মাগো জ্বলিয়া মরি বিষের জ্বালায় ॥
হরিৎ ক্ষেত্রে সোনার শস্যে দুলে না আর তোর আঁচল
শুকায়েছে মাগো মায়ের স্তন্য গাভীর দুগ্ধ নদীর জল।
চাই না মোক্ষ চাই মা বাঁচিতে
অক্ষয় আয়ু লয়ে ধরণীতে
চাই প্রাণ চাই ক্ষুধায় অন্ন মুক্ত আলোকে মুক্ত বায় ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
রাগ : গৌড় সারং
তাল : একতালা
শিল্পী : কে মল্লিক
বিষয় : দেশাত্ববোধক

৬৩. দে দোল্ দে দোল্ ওরে দে দোল্ দে দোল্
জাগিয়াছে ভারত সিন্ধু তরঙ্গে কল-কল্লোল ॥
পাষাণ গলেছে রে অটল টলেছে রে
জেগেছে পাগল রে ভেঙেছে আগল ॥
বন্ধন ছিল যত হল খানখান রে
পাষাণ পুরীতে ডাকে জীবনেরি বান রে
মৃত্যু ক্লান্ত আজি কুড়াইয়া প্রাণ রে
দুর্মদ যৌবন আজি উতরোল ॥
অভিশাপ রাত্রির আয়ু হল ক্ষয় রে
আর নাহি অচেতন আর নাহি ভয় রে
আজও যাহা আসেনি আসিবে সে জয় রে
আনন্দ ডাকে দ্বারে খোল দ্বার খোল ॥

সুর : নজরুল
তাল : ফের্‌তা
শিল্পী : ধীরেন দাস

৬৪. 'দেশপ্রিয় নাই' শুনি ক্রন্দন সহসা প্রভাতে জাগি'।
আকাশে ললাঁ হানিয়া কাঁদিছে ভারত চির-অভাগী ॥
বহুদিন পরে আপনার ঘরে মা'র কোলে মাথা রাখি',
ঘুমাতে এসেছে শ্রান্ত সেনানী, জাগায়ো না তারে ডাকি'।
দেশের লাগিয়া দিয়াছে সকলি, দেয়নি নিজেরে ফাঁকি—
তাহারি শুভ্র শান্ত হাসিটি অধরে রয়েছে লাগি' ॥
স্বার্থ অর্থ বিলাস বিভব গৌরব সম্মান
মায়ের চরণে দিয়াছে সে-বীর অকাতরে বলিদান,
রাজ-ভিখারির ছিল সম্বল শুধু দেহ আর প্রাণ
তাই দিয়ে দিল শেষ অঞ্জলি দানবীর বৈরাগী ॥
দেশবন্ধুর পার্শ্বে জ্বলিছে দেশপ্রিয়ের চিতা
এতদিন পরে বক্ষে এসেছে দুঃখের সাথি মিতা,
বহিছে অশ্রুগঙ্গা, জ্বলিছে শোকের দীপান্বিতা—
নিভে যাবে চিতা, রয়ে যাবে ধুম, চিরদিন বুকে জাগি' ॥
তুমি এসেছিলে হিন্দু-মুসলমানের মিলন-হেতু
পদ্মা ও ভাগীরথীর মাঝারে তুমি বেঁধেছিলে সেতু,
অন্ধকারের বুকে ছিলে তুমি দীপ্ত চন্দ্র-কেতু—
বন্ধন হল নন্দন-ফুল-হার তোমার ছোঁয়া লাগি' ॥

শিল্পি : মাস্টার কমল
রাগ : জয়জয়ন্তী
তাল : দাদ্‌রা

৬৫. 'বিদ্রোহী বাণী'–'এবার তোরা সত্য বল্'
দোহাই তোদের! এবার তোরা সত্যি করে সত্য বল্।
ঢের দেখালি ঢাক ঢাক গুড় গুড় ঢের মিথ্যা ছল ॥
পেটে এক আর মুখে আরেক—এই যে তোদের ভণ্ডামি,
এতেই তোরা লোক হাসালি, বিশ্বে হলি কম্-দামি।
নিজের কাছেও ক্ষুদ্র হলি আপন ফাঁকির আফসোসে,
বাইরে ফাঁকা পাঁয়তারা তাই, নাই তলোয়ার খাপ-কোষে।
তাই হলি সব সেরেফ আজ কাপুরুষ আর ফেরেব-বাজ
সত্য কথা বলতে ডরাস তোরাই আবার করবি কাজ—
ফোঁপরা ঢেঁকির নেইক লাজ।
ইলশেগুড়ি বৃষ্টি দেখেই ঘর ছুটিস্ সব রাম-ছাগল!
যুক্তি তোদের খুব বুঝেছি, দুধকে দুধ আর জলকে জল ॥
বুকের ভিতর ছ-পাই ন-পাই, মুখে বলিস্ স্বরাজ চাই,
স্বরাজ কথার মানে তোদের ক্রমেই হচ্ছে দরাজ তাই!
'ভারত হবে ভারতবাসীর' —এই কথাটাও বলতে ভয়।
এদের তোরা বলিস নেতা, এদের কথায় চলতে হয়।
বল রে তোরা বল নবীন চাই নে এসব জ্ঞান প্রবীণ।
চোখের সামনে দেশকে এরা করছে ক্লীব দিনকে দিন,
চায় না এরা—হই স্বাধীন।
কর্তা হবার সখ সবারই, স্বরাজ-ফরাজ ছল্ কেবল।
ফাঁকা প্রেমের ফুস্-মন্তর, মুখ সরল আর মন গরল।
ধর্ম-কথা প্রেমের বাণী জানি মহান উচ্চ খুব,
কিন্তু সাপের দাঁত না ভেঙে মন্ত্র ঝাড়ে সে বেকুব
'ব্যাঘ্র সাহেব, হিংসে ছাড়, পড়বে এসো বেদান্ত।'
কয় যদি ছাগ, লাফ দিয়ে বাঘ, অমনি হবে কৃতান্ত।
থাকতে বাঘের দন্ত-নখ বিফল ভাই ঐ প্রেম-সেবক।
চোখের জলে ডুবলে গর্ব শার্দুলও হয় বেদ-পাঠক,
প্রেম মানে না খুন-খাদক।
ধর্ম-গুরু ধর্ম শোনান, পুরুষ ছেলে যুদ্ধে চল্।
সেও ভি আচ্ছা, মরব্ পিয়ে মৃত্যু-শোণিত এল্‌কোহল ॥

৬৬. ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা!
(এরা) লতা নয় পরদেশী অসুর ছানা ॥ (ধূয়া)
ইহাদের সবংশে কর কর নাশ,
এদেরে দগ্ধ ক'রে কর ছাই পাঁশ,
(এরা) জীবনের দুশমান, গলার ফাঁস,
(এরা) দৈত্যের দাঁত, রাক্ষসের ডানা—
(এরা) ম্যালেরিয়া আনে, জানে অভাব নরক
(এরা) অমঙ্গলের দূত, ভীষণ মড়ক ॥
(এরা) একে একে গ্রাস করে নদী ও নালা
(যত) বিল ঝিল মাঠ ঘাট ডোবা ও খানা
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)
(এরা) বাংলার অভিশাপ, বিষ, এরা পাপ
(এসো) সমূলে কচুরী-পানা ক'রে ফেলি সাফ্,

গ্রন্থ : শেষ সওগাত
বেতার : পল্লীমঙ্গলের আসর
তারিখ : ৩০.১২.১৯৩৯

(এরা) শ্যামল বাঙলাদেশ করিল শ্মশান,
(এরা) শয়তানী ধূর্ত দুর্ভিক্ষ-আনা।
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)
(কাল) সাপের ফণা এর পাতায় পাতায়
(এরা) রক্তবীজের ঝাড়, মরিতে না চায়,
(ভাই) এরা না মরিলে মোরা মরিব সবাই
(এরে) নির্মূল ক'রে ফেল শুন না মানা
ধ্বংস কর এই কচুরী-পানা ॥ (ধূয়া)

৬৭. নবীন আশা জাগ্‌ল যে রে আজ!
নূতন রঙে রাঙা তোদের সাজ ॥
কোন সে বাণী বাজ্‌ল প্রাণের মাঝ্,
বাজরে বীনা বাজ্, দীপক-তানে বাজ
আপন কাজে পাস্ রে কেন লাজ?
এগিয়ে গিয়ে ধর্ রে নিজের কাজ।
শির্ উচিয়ে দাঁড়া জগৎ-মাঝ!
তোদের কণ্ঠে হানে যেন প্রবল বাজ ॥
ফেলে দে রে যা কিছু সব জীর্ণ
রিক্ত যা, হবে তা দীর্ণ।
থাকিস্ নে ব'সে কেউ শীর্ণ
দুন্দুভি-ঢাক বাজুক না রে আজ ॥

সূত্র : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
গ্রন্থ : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
তাল : কাহার্‌বা

৬৮. নমঃ নমঃ নমো বাঙলাদেশ মম, চির মনোরম চির মধুর।
বুকে নিরবধি বহে শতনদী চরণে জলধির বাজে নূপুর॥
শিয়রে গিরিরাজ হিমালয় প্রহরী,
আশিষ মেঘবারি সদা তার পড়ে ঝরি
যেন উমার চেয়ে এ আদরিনি মেয়ে
ওড়ে আকাশ ছেয়ে মেঘ চিকুর॥
গ্রীষ্মে নাচে বামা কাল-বোশেখী ঝড়ে
সহসা বরষাতে কাঁদিয়া ভেঙে পড়ে
শরতে হেসে চলে শেফালিকা তলে
গাহিয়া আগমনী গীতিবিধুর॥
হরিত অঞ্চল হেমন্তে দুলায়ে
ফেরে সে মাঠে মাঠে শিশির ভেজা পায়ে
শীতের অলস বেলা পাতা ঝরার খেলা
ফাগুনে পড়ে সাজ ফুল বধুর॥
এই দেশের মাটি জল ও ফুলে ফলে
যে রস যে সুধা নাহি ভুমণ্ডলে
এই মায়ের বুকে হেসে খেলে সুখে
ঘুমাবো এই বুকে স্বপ্নাতুর॥

দেশাত্মবোধক
উদ্দীপক

৬৯. নমো নমো নমঃ হিম-গিরি-সূতা দেবতা-মানস-কন্যা।
স্বর্গ হইতে নামিয়া ধূলায় মর্ত্যে করিলে ধন্যা ॥
আছাড়ি' পড়িছ ভীষণ রঙ্গে চূর্ণি' পাষাণ ভীম-তরঙ্গে,
কাঁপিছে ধরণী ভ্রুকুটি ভঙ্গে— ভুজগ-কুটিল বন্যা ॥
কুলে কুলে তব কন্যা-কমলা শস্যে কুসুমে হাসিছে অচলা,
বন্দিছে পদ শ্যাম-অঞ্চলা— ধরণী ঘোরা অরণ্যা।

গ্রন্থ : ১. ঝিলিমিলি
নাটক : সেতুবন্ধ
জলদেবীর স্তুতি গান
২. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

৭০. 'কারাগারের গান'
নাহি ভয় নাহি ভয়।
মৃত্যু সাগর মন্থন শেষ আসে মৃত্যুঞ্জয় ॥
কৃষ্ণাতিথির তিমির হরণ আসিল কৃষ্ণ তিমির বরণ,
দিকে দিকে ঐ গাহে জনগণ— জয় হে জ্যোতির্ময় ॥
দলিত হৃদয়-শতদলে তাঁর আঁখি-জল-ঘেরা আসন বিথার,
ব্যথা-বিহারীরে দেখিবি কে আয়। ধ্বংসের মাঝে বংশী বাজায়,
নিখিলের হৃদি বেদনা-আভায়— নবীন অভ্যুদয় ॥

গ্রন্থ : চন্দ্রবিন্দু
রাগ : টৌড়ী-একতালা
পত্রিকা : জয়তী, পৌষ-মাঘ ১৩৩৭
শিরোনাম : কারাগার এর গান

৭১. পর হবে তোর আপন জনে (তুই) ভাবনা তবু করিস্‌নে।
হয়ত তরী ডুববে জলে (তবু) তুফান দেখে ডরিস্‌নে ॥
ছেড়ে যাবে বন্ধু জ্ঞাতি আসবে ঘিরে আঁধার রাতি,
জ্বালিয়ে পাঁজর জ্বালবে বাতি— মরবি তবু টলিস্‌নে ॥
তোর বেদনায় গলবে সবে তোর আপন জনেই আঁল রবে,
তুই আপন পথে চল নীরবে—কারুর চরণ ধরিস্‌নে ॥

রেকর্ড : নাটিকা-সরলা
নাট্যকার-তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

৭২. 'সত্য মন্ত্র'
পুঁথির বিধান যাক পুড়ে তোর, বিধির বিধান সত্য হোক!
এই খোদার উপর খোদকারী তোর মানবে না আর সর্বলোক ॥
নানান মুনির নানান মত্ যে, মানবি বল্ সে কার শাসন?
কয়জনার বা রাখবি মন?
একজনকে মানলে করবে আর এক সমাজ নির্বাসন,
চারদিকে শৃঙ্খল বাঁধন!
সকল পথের লক্ষ্য যিনি চোখ পুরে নে তাঁর আলোক ॥
জাতের চেয়ে মানুষ সত্য,
অধিক সত্য প্রাণের টান প্রাণ-ঘরে সব এক সমান।

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : সত্য মন্ত্র
শিল্পি-হরেন্দ্রনাথ দত্ত

৭৩. বজ্র আলোকে মৃত্যুর সাথে হবে নব পরিচয়, জয় জীবনের জয়।
শক্তিহীনের বক্ষে জাগাবো শক্তির বিস্ময়, জয় জীবনের জয়।
ডঙ্কা বাজায়ে শঙ্কা-হরণে আনিব সমরে অমর মরণে,
কণ্টক-ক্ষত নগ্ন চরণে দলিব মৃত্যু-ভয়, জয় জীবনের জয় ॥
অরণ্য গিরি-পর্বতে রচিব রক্ত-পথ,
সেই পথ ধ'রে ভবিষ্যতের আসিবে বিজয়-রথ।
আমাদের শত শব-চিন্ ধরি' আসিবে শক্তি প্রলয়ঙ্কারী
আসিবে মোদের রক্ত সাঁতরী নবীন অভ্যুদয় জয় জীবনের জয়॥

নাটক-ভূতের ভয় (রচনা নজরুল)
নাট্যগ্রন্থ : ঝিলিমিলি, দ্বিতীয় সংস্করণ
গ্রন্থ : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

৭৪. ‘মুক্তবন্দী’

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : মুক্তবন্দী
উপলক্ষ্য : জনৈক বিপ্লবীর ছয় বছর
নাটক : কারাগার

বন্দী তোমায় ফন্দী কারার গণ্ডী-মুক্ত বন্দী-বীর,
লঙ্ঘিলে আজি ভয়-দানবের ছয় বছরের জয়-প্রাচীন।
বন্দি তোমায় বন্দী-বীর! জয় জয়ন্ত বন্দী-বীর!!
অগ্রে তোমার নিনাদে শঙ্খ, পশ্চাতে কাঁদে ছয়-বছর,
অম্বরে শোনো ডমরু বাজে— ‘অগ্রসর হও, অগ্রসর।’
কারাগার ভেদি’ নিঃশ্বাস ওঠে বন্দিনী কোন্ ক্রন্দসীর,
ডান-আঁখে আজ ঝলকে অগ্নি, বাম-আঁখে ঝরে অশ্রু-নীর ॥
পথ-তরু-ছায় ডাকে ‘আয় আয়’ তব জননীর আর্তস্বর,
এ আগুন-ঘরে কাঁপিল সহসা ‘সপ্তদশ সে বৈশ্বানর’।
আগমনী তব রণ-দুন্দুভি বাজিছে বিজয়-ভৈরবীর,
জয় অবিনাশী উল্কা-পথিক চির-সৈনিক উচ্চ-শির ॥
রুদ্ধ-প্রতাপ হে যুদ্ধ-বীর, আজি প্রবুদ্ধ নব বলে।
ভুলো না বন্ধু,দলেছে দানব যুগে যুগে তব পদ-তলে!
এ নহে বিদায়, পুন হবে দেখা অমর সমর-সিন্ধু-তীর,
এসো বীর এসো, ললাটে এঁকে দি’ অশ্রু-তপ্ত লাল রুধির ॥

৭৫. ‘অভয় মন্ত্র’

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : অভয় মন্ত্র
রচনাকাল : জুন-জুলাই ১৯২২
কলিকাতা
তাল : দাদ্‌রা

বল্ নাহি ভয় নাহি ভয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!
তুই নির্ভর কর্ আপনার’ পর্ আপন পতাকা কাঁধে তুলে ধর্
ওরে যে যায় যাক্ সে, তুই শুধু বল্ ‘আমার হয়নি লয়’!
বল্‌‘আমি আছি,’ আমি পুরুষোত্তম, আমি চির-দুর্জয়!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
যে গেল সে নিজেরে নিঃশেষ করি’
তোদের পাত্র দিয়ে গেল ভরি’!
ঐ বন্ধ মৃত্যু পারেনি ক’ তাঁরে পারেনি করিতে লয়!
তাই আমাদের মাঝে নিজেরে বিলায়ে সে আজি শান্তিময়
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
ওরে রুদ্র তখনি ক্ষুদ্রেরে গ্রাসে আগেই যবে
সে ম’রে থাকে ত্রাসে
ওরে আপনার মাঝে বিধাতা জাগিলে বিশ্বে সে নির্ভয়
এই ক্ষুদ্র কারায় কভু কি ভয়াল ভৈরব বাঁধা রয়?
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!
ওরে আত্ম-অবিশ্বাসী, ভয়ে-ভীত! কেন হেন ঘন অবসাদ চিত
বল্ পর-বিশ্বাসে পর-মুখপানে চেয়ে কি স্বাধীন হয়?
তুই আত্মাকে চিন্, বল ‘আমি আছি,’ ‘সত্য আমার জয়’!
বল্ মাভৈঃ মাভৈঃ, জয় সত্যের জয়!!

৭৬. 'যুগান্তরের গান'

বল ভাই মাভৈঃ মাভৈঃ, নব যুগ ঐ এলো ঐ
এলো ঐ রক্ত যুগান্তর রে।
বল জয় সত্যের জয় আসে ভৈরব বরাভয়,
শোন অভয় ঐ রথ-ঘর্ঘর রে ॥
রে বধির! শোন পেতে কান ওঠে ঐ কোন মহাগান,
হাঁকছে বিষাণ ডাকছে ভগবান রে।
জগতে পাগল সাড়া জেগে ওঠ উঠে দাঁড়া,
ভাঙ্ পাহারা মায়ার কারা-ঘর রে।
যা আছে যাক্ না চুলায় নেমে পড় পথের ধূলায়,
নিশান দুলায় ঐ প্রলয়ের ঝড় রে।
সে ঝড়ের ঝাপটা লেগে ভীম আবেগে উঠনু জেগে
পাষাণ ভেঙে প্রাণ-ঝরা নির্ঝর রে।
ভুলেছি পর ও আপন ছিঁড়েছি ঘরের বাঁধন,
স্বদেশ স্বজন স্বদেশ মোদের ঘর রে।
যারা ভাই বদ্ধ কুঁয়ায় খেয়ে মা'র জীবন গোঁয়ায়
তাদের শোনাই প্রাণ-জাগা মন্তর রে ॥
ঝড়ের ঝাঁটার ঝাণ্ডা নেড়ে মাভৈঃ বাণীর ডঙ্কা মেরে
শঙ্কা ছেড়ে হাঁক্ প্রলয়ঙ্কর রে।
তোদের ঐ চরণ-চাপে যেন ভাই মরণ কাঁপে
মিথ্যা পাপের কণ্ঠ চেপে ধর্ রে।
শোনা তোর বুক ভরা গান জাগা ফের দেশ-জোড়া প্রাণ,
দে বলিদান প্রাণ ও আত্মপর রে ॥
মোরা ভাই বাউল চারণ মানি না শাসন বারণ,
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হাসি জোর জয়ের হাসি,
অ-বিনাশী নাইকো মোদের ডর রে,
গেয়ে যাই গান গেয়ে যাই মরা প্রাণ উট্‌কে দেখাই,
ছাই-চাপা ভাই অগ্নি ভয়ঙ্কর রে ॥
খুঁড়ব কবর তুড় ব শ্মশান মড়ার হাড়ে নাচাব প্রাণ,
আনব বিধান নিদান কালের বর রে
শুধু এই ভরসা রাখিস মরিস্‌নি ভির্মি গেছিস
ঐ শুনেছিস ভারত বিধির স্বর রে।
ধর্ হাত ওঠ্ রে আবার দুর্যোগের রাত্রি কাবার,
ঐ হাসে মা'র মূর্তি মনোহর রে ॥

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : যুগান্তরের গান
শিল্পি : গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ও অন্যান্য
সুর : নজরুল
তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

৭৭. 'আশু-প্রয়াণগীতি'

কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥
বাঙলার ঋষি, বাঙলার জ্ঞান বঙ্গবাণীর শ্বেতকমল,
শ্যাম বাঙলার বিদ্যা-গঙ্গা অবিদ্যা-নাশী তীর্থজল !
মহামহিমার বিরাঁ পুরুষ শক্তি-ইন্দ্র তেজ-তপন—
রক্ত-উদয় হেরিতে সাহসা হেরিনু সে-রবি মেঘ-মগন।

গ্রন্থ : ভাঙার গান
শিরোনাম : আশু প্রয়াণ গীতি
রচনাস্থান ও কাল : হুগলী, মে ১৯২৪
উপলক্ষ্য : আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মৃত্যু।
পত্রিকা : বঙ্গবাণী, আষাঢ় ১৩৩১

কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥
মদ-গর্বীর গর্ব-খর্ব বল-দর্পীর দর্প-নাশ
শ্বেত-ভীতুদের শ্যাম বরাভয় রক্তাসুরের কৃষ্ণত্রাস।
নব ভারতের নব আশা-রবি প্রাচীর উদার অভ্যুদয়
হেরিতে হেরিতে সহসা বিদায়-গোধূলি গগনময়।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥
পড়িল ধসিয়া গৌরীশঙ্কর হিমালয়-শির স্বর্গচূড়,
গিরি কাঞ্চন-জঙ্ঘা গিরিল — বাঙলার যবে দিন-দুপুর।
শিশুক-হাঙর শোষিছে রক্ত, মৃত্যু শোষিছে সাগর-প্রাণ,
পরাধীনা মা'র স্বাধীন সূতের মেদ-ধূমে কালো দেশ-শ্মশান ॥
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥
অরাজক মারী মড়া-কান্নায় দেশ-জননীর বদ্ধ শ্বাস,
হে দেব-আত্মা! স্বর্গ হইতে দাও কল্যাণ, দাও আভাস,
কেমন করিয়া মৃত্যু মথিয়া মৃত্যুঞ্জয় হয় মানব;
শব হয়ে গেছ, শিব হয়ে এসো দেবকী-কারার নীল কেশব।
কোরাস্ : বাঙলার 'শের' বাঙলার শির,
বাঙলার বাণী, বাঙলার বীর সহসা ও-পারে অস্তমান।
এপারে দাঁড়িয়ে দেখিল ভারত মহা-ভারতের মহাপ্রয়াণ ॥

৭৮. 'উদ্বোধন'
বাজাও প্রভু বাজাও ঘন বাজাও ভীম বজ্র-বিষাণে
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব।
বাজাও! অগ্নি তূর্য কাঁপাক সূর্য বাজুক রুদ্রতালে ভৈরব ॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! নট-মল্লার দীপক-রাগে
জ্বলুক তড়িৎ-বহ্নি আগে,
ভেরির রন্ধ্রে মেঘ-মন্দ্রে জাগাও বাণী জাগ্রত নব ॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! দাসত্বের এ ঘৃণ্য তৃপ্তি
ভিক্ষুকের এ লজ্জা-বৃত্তি,
বিনাশ জাতির দারুণ এ লাজ, দাও তেজ দাও মুক্তি-গরব ॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! খুন দাও নিশ্চল এ হস্তে
শক্তি-বজ্র দাও নিরস্ত্রে,
শীর্ষ তুলিয়া বিশ্বে মোদেরও দাঁড়াবার পুনঃ দাও গৌরব ॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও ! ঘুচাতে ভীরুর নীচতা দৈন্য
প্রের হে তোমার ন্যায়ের সৈন্য,
শৃঙ্খলিতের টুটাতে বাঁধন আন আঘাত প্রচণ্ড আহব ॥
দুর্জয় মহা-আহ্বান তব, বাজাও! নিবীর্য্য এ তেজঃসূর্য্যে,
দীপ্ত কর হে বহ্নি-বীর্য্যে,
শৌর্য, ধৈর্য্য মহাপ্রাণ দাও, দাও স্বাধীনতা সত্য বিভব ॥

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : উদ্বোধন
পত্রিকা : সওগাত, বৈশাখ ১৩২৭
শিরোনাম : উদ্বোধন
রাগ : বসন্ত সোহিনী
তাল : দাদরা
বি. দ্র. : প্রথম প্রকাশিত নজরুলের গান
রাগ : বসন্ত সোহিনী
তাল : দাদ্‌রা

৭৯. বাঁশি বাজাবে কবে আবার বাঁশরিওয়ালা
তব পথ চাহি ভারত-যশোদা কাঁদিছে নিরালা ॥
কৃষ্ণা-তিথির তিমির-হারী; শ্রীকৃষ্ণ এসো, এসো, মুরারি
ঘরে ঘরে আজ পুতনা-ভীতি হানিছে কালা ॥
কংস-কারার ভাঙো ভাঙো দ্বার
দেবকীর বুকের পাষাণ ভার নামাও নামাও
যুগ-যুগ-সম্ভব পূর্ণাবতার!
নিরানন্দ এ দেশ হাসুক আবার, আনন্দে হে নন্দলালা ॥

শিল্পী : ধীরেন দাস
সুর : নজরুল
শ্রেণী : স্বদেশী
স্বরলিপিকার : জগৎ ঘটক
রাগ : আশা
তাল : কার্ফা
সুর : নজরুল

৮০. বিশাল ভারত চিত্তরঞ্জন হে দেশবন্ধু এসো ফিরে।
কাণ্ডারী হে, দেখাও দিশা অসীম অশ্রু সাগর নীরে॥
নাই দিশারী নাই সেনানী, আজ জনগণ ত্রস্ত ভয়ে,
ভারত কাঁদে ব্যাকুল চিত্তে তোমার চিতার ভস্ম লয়ে,
সগর দেশের হে ভগীরথ, জাগো ভাগীরথীর তীরে।
রাজৈশ্বর্য্য বিলিয়ে, নিলে হে বৈরাগী ভিক্ষাঝুলি,
সোনার অঙ্গে মাখলে তুমি পায়ে চলা পথের ধুলি।
দেশ জননী ত্রিশ কোটি সন্তানেরে বক্ষে নিয়া
ভুলতে নারে তোমার স্মৃতি, শূন্যে তাহার মাতৃ হিয়া।
কে পরাবে রাণীর মুকুট বন্দিনী মার রিক্ত শিরে॥

দেশাত্মবোধক
উদ্দীপক
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মহাপ্রয়াণে

৮১. বীরদল আগে চল্
কাঁপাইয়া পদভরে ধরণী টলমল।
যৌবন-সুন্দর চির-চঞ্চল ॥
আয় ওরে আয় তালে তালে পায়ে পায়ে
আশা জাগায়ে নিরাশায়।
আয় ওরে আয় প্রাণহীন মরুভূমে, আয় নেমে বন্যার ঢল ॥
ঝঞ্ঝার বাজে রণ-মাদল চল্ চল্
ভোল্ ভোল্ জননীর স্নেহ-অঞ্চল ॥
ডাকে বিধুর প্রিয়া সুদুর ভোল্ তারে ডাকে তোরে তূর্য-সুর।
দল্ দল্ পায়, ভয় ভাবনায়,
শ্মশানে জাগা প্রাণ আপন-ভোলা পাগল ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মার্চের সুর

৮২. ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী
জাগো উর্দ্ধে মোদের দেবী শক্তিময়ী
অবনত এ জাতির প্রার্থনা ওই
তব ললাটে জ্বলে জয়টীকা ভাস্বর
তব বিজয় যাত্রাপথে শঙ্খ বাজে হে বীরবর॥

দেশাত্মবোধক
উদ্দীপক

৮৩. 'মিলন গান'
ভাই হয়ে ভাই চিনবি আবার গাইব কি আর এমন গান!
সেদিন দুয়ার ভেঙে আস্‌বে জোয়ার মরা গাঙে ডাকবে বান ॥
তোরা স্বার্থ-পিশাচ যেমন কুকুর তেম্‌নি মুগুর পাস্ রে মান।
সেই কল্‌জে চুঁয়ে গল্‌ছে রক্ত দল্‌ছে পায়ে ডল্‌ছে কান ॥
ওরে তোরা করিস লাঠালাঠি সিন্ধু-ডাকাত লুটছে ধান!

গ্রন্থ : ভাঙার গান
শিরোনাম : মিলন গান
শিল্পী : সত্য চৌধুরী
সুর : নজরুল
তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

তাই গোবর-গাদা মাথায় তোদের কাঁঠাল ভেঙে খায় শেয়ান ॥
ছিলি সিংহ ব্যাঘ্র, হিংসা-যুদ্ধে আজকে এমন ক্ষিন্ন প্রাণ।
মুখের গ্রাস ঐ গিল্‌ছে শেয়াল, তোমরা শুয়ে নিচ্ছ ঘ্রাণ ॥
তোরা বাঁদর ডেকে মান্‌লি সালিশ ভাইকে দিতে ফাট্‌লো প্রাণ!
সালিশ নিজেই, 'খা ডালা সব', বোকা তোদের এই দেখান ॥
তোরা নাক কেটে নিজ পরের যাত্রা ভঙ্গ করিস বুদ্ধিমান
তোদের কে যে ভালো কে যে মন্দ সব শিয়ালই এক সমান ॥
শুনি আপন ভিটেয় কুকুর রাজা, তার চেয়েও হীন তোদের প্রাণ
তাই তোদের দেশ এই হিন্দুস্থানে নাই তোদেরই বিন্দু স্থান ॥
আজ সাধে ভারত-বিধাতা কি চোখ বেঁধে ঐ মুখ লুকান!
তোরা বিশ্বে যে তার রাখিস্‌নে টাই কানা গরুর ভীন্‌ বাথান ॥
তোরা করলি কেবল অহরহ নীচ কলহের গরল পান।
আজ বুঝ্‌লি নে হায় নাড়ি-ছেঁড়া মায়ের পেটের ভায়ের টান ॥

৮৪. ভয় নাই ভয় নাই হে বিজয়ী
জাগো ঊর্দ্ধে মোদের দেবী শক্তিময়ী।
অবনত এ জাতির প্রার্থনা ওই—
তব ললাটে জ্বলে জয়টীকা ভাস্বর,
তব বিজয় যাত্রা-পথে শঙ্খ বাজে হে বীরবর ॥

শিল্পি : গোপাল সেন
চরিত্র : বৈতালিক

৮৫. ভারত আজিও ভোলেনি বিরাট মহাভারতের ধ্যান।
দেশ হারায়েছে—হারায়নি তা'র আত্মা ও ভগবান ॥
তাহার ক্ষাত্রশক্তি গিয়াছে
প্রেম ও ভক্তি আজও বেঁচে আছে,
আজিও পরম ধৈর্য ও বিশ্বাসে—
তার আশা-দীপ জ্বালিয়া রেখেছে সেই ভাগবত জ্ঞান ॥
দেহের জীর্ণ পিঞ্জরে তার প্রাণ কাঁদে নিরাশায়,
'সম্ভবামি যুগে যুগে' বাণী ভুলিতে পারে না হায়!
সেই আশ্বাসে আজ নব অনুরাগে
পাষাণ ভারতে বিরাট চেতনা জাগে,
জেগেছে সুপ্ত-সিংহ, এসেছে দিব্য অসি-কৃপাণ ॥

শিল্পী : সত্য চৌধুরী
সুর : নজরুল
স্বরলিপি : সঙ্গীতাঞ্জলি দ্বিতীয় খণ্ড, কলিকাতা

৮৬. ভারতলক্ষ্মী মা আয় ফিরে এ ভারতে
ব্যথায় মোদের চরণ ফেলে অরুণ আশার সোনার রথে ॥
অশ্রু গঙ্গার জলে ধুই মা তোর চরণ নিতি
ত্রিশ কোটি কণ্ঠে বাজে রোদনে তোর বোধনগীতি
আয় মা দলিত রাঙা হৃদয় বিছানো পথে ॥
বিজয়া তোর হ'ল কবে শতাব্দী চলিয়া যায়
ভারত-বিজয়-লক্ষ্মী ভারতে ফিরিয়া আয়
বিসর্জনের কান্না মা এবার তুই এসে থামা
সফল কর এ তপস্যা মা স্থান দে স্বাধীন জগতে ॥

শিল্পী : কে. মল্লিক
বিষয় : আগমনী
সুর : নজরুল
স্বরলিপি : সুরমুকুর, ডি. এম. লাইব্রেরী
রাগ : সুঘরাই কানাড়া
তাল : কাওয়ালী

৮৭. ভারত-লক্ষ্মী আয় মা ফিরে দুঃখ-রাতের তিমির হরি'।
হাতে ল'য়ে সোনার ঝাঁপি সুধার পাত্রে সুধা ভরি' ॥
আঁচলে তোর উঠুক দুলে, নবীন ধানের মঞ্জরি সে
অঙ্গনতল মাতিয়ে দে মা, দোয়েল শ্যামার মধুর শিসে,
ফিরিয়ে দে সেই হারিয়ে যাওয়া রত্ন বোঝোই সোনার তরী ॥
লক্ষ্মী মায়ের সন্তান আজ, হায় রে কেন লক্ষ্মী-ছাড়া?
দু মুঠো ভাত নেইকো পেটে, তৃষ্ণায় নেই তৃষ্ণা-ধারা।
কোন্ পাপে আজ সোনার এ দেশ, শ্মশান হল দে মা ব'লে
দুঃখ-সাগর মন্থন শেষ, ভরল ভুবন হলাহলে,
অমৃত এনে সন্তানে, বাঁচা মা তোর পায়ে ধরি ॥

শিল্পী : সত্য চৌধুরী
সুর : নজরুল
গ্রন্থ : নজরুল স্বরলিপি, ষষ্ঠ খণ্ড, হরফ
স্বরলিপি : নজরুল স্বরলিপি, ষষ্ঠ খণ্ড, হরফ।

৮৮. ভারত শ্মশান হ'ল মা, তুই শ্মশানবাসিনী ব'লে।
জীবন্ত-শব নিত্য মোরা, চিতাগ্নিতে মরি জ্ব'লে ॥
আজ হিমালয় হিমে ভরা, দারিদ্র্য-শোক-ব্যাধি-জরা,
নাই যৌবন, যেদিন হতে শক্তিময়ী গেছিস্ চ'লে ॥
(মা) ছিন্নমস্তা হয়েছিস্ তাই হানাহানি হয় ভারতে,
নিত্য-আনন্দিনী, কেন টানিস্ নিরানন্দ পথে ?
শিব-সীমন্তিনী বেশে খেল্ মা আবার হেসে হেসে,
ভারত মহাভারত হবে, আয় মা ফিরে মায়ের কোলে ॥

শিল্পী : জ্ঞান গোস্বামী
সুর : নজরুল
স্বরলিপিকার : বিজলী ধর
সুর : নিতাই ঘটক
রাগ : মূলতান
তাল : একতাল

৮৯. ভারতের দুই নয়ন তারা হিন্দু-মুসলমান
দেশ জননীর সমান প্রিয় যুগল সন্তান ॥
তাইতো মায়ের কোল নিয়ে ভাই ভা'য়ে ভা'য়ে বাধে লড়াই
এই কলহের হবেই হবে মধুর অবসান
এক দেশেরই অন্নজলে এক দেহ এক প্রাণ ॥
আল্লা বলে কোরান তোমায়, এলা বলে বেদ,
যেমন পানি, জলে রে ভাই শুধু নামের ভেদ।
মোদের মাঝে দেয়াল তুলতে যে চায়
জানবে মোদের শত্রু তাহায় (জানবে রে)
বিবাদ ক'রে এনেছি হায় অনেক অকল্যাণ
মিলনে আজ উঠুক জেগে নব-হিন্দুস্থান।
জেগে উঠুক হিন্দুস্থান ॥

শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন ও মৃণালকান্তি ঘোষ
সুর : কমল দাশগুপ্ত
তাল : তেওড়া

৯০. কোরাস্ : ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও!
ফিরে চাও ওগো পুরবাসী, সন্তান দ্বারে উপবাসী।
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও! জাগো গো, জাগো গো,
তন্দ্রা-অলস জাগো গো, জাগো রে! জাগো রে ॥
১
মুক্ত করিতে বন্দিনী মা'য় কোটি বীরসুত ঐ হের দায়,
মৃত্যু-তোরণ-দ্বার-পানে। কার যানে?
দ্বার খোলো দ্বার খোলো! একবার ভুলে ফিরিয়া চাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
২
জননী আমার ফিরিয়া চাও ভাইরা আমার ফিরিয়া চাও!

গ্রন্থ : ভাঙার গান
পত্রিকা : ধুমকেতু, শ্রাবণী ১৩২৯
রচনাকাল : কুমিল্লা ২১.১১.১৯২১
উপলক্ষ্য : প্রিন্স অফ ওয়েলস এর ভারত আগমন
সূত্র : এইচ. এম. ভি কোম্পানির চুক্তিপত্র ১৫.০৭.১৯৩৭
বি. দ্র. : গানটি উদ্ধার করা যায়নি। গানের টাইটেল হিসাবে চুক্তিপত্রে 'ভিলনি ভিলিয়া' উল্লেখিত। সম্ভবতঃ ভিল

চাই মানবতা, তাই দ্বারে কর হানি মা গো বারে বারে—
দাও মানবতা ভিক্ষা দাও!
পুরুষ-সিংহ জাগো রে সত্যমানব জাগো রে!
বাধা-বন্ধন-ভয়-হারা হও সত্য-মুক্তি-মন্ত্র গাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...

যুবক ও ভিল যুবতীর দ্বৈতগান।

৩
লক্ষ্য যাদের উৎপীড়ন আর অত্যাচার,
নর-নারায়ণে হানে পদাঘাত জেনেছে সত্য-হত্যা সার ॥
অত্যাচার! অত্যাচার!!
ত্রিশ কোটি নর-আত্মার যারা অপমান হেলা করেছে রে
শৃঙ্খল গলে দিয়েছে মা'র।
সেই আজ ভগবান তোমার! অত্যাচার! অত্যাচার!!
ছি ছি ছি ছি ছি ছি নাই কি লাজ—
নাই কি আত্মসম্মান ওরে নাই জাগ্রত ভগবান কি রে
আমাদেরো এই বক্ষোমাঝ?
অপমান বড় অপমান ভাই মিথ্যার যদি মহিমা গাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৪
আল্লায় ওরে হকতা'লায়, পায়ে ঠেলে যারা অবহেলায়;
আজাদ-মুক্ত আত্মারে যারা শিখায়ে ভীরুতা করেছে দাস—
সেই আজ ভগবান তোমার! সেই আজ ভগবান তোমার!
সর্বনাশ! সর্বনাশ!
ছি-ছি নির্জীব পুরবাসী আর খুলো না দ্বার! জননী গো!
জননী গো !
কার তবে জ্বাল উৎসব-দীপ? দীপ নেবাও! দীপ নেবাও!!
মঙ্গল-ঘট ভেঙে ফেল, সব গেল মা গো সব গেল!
অন্ধকার! অন্ধকার।
ঢাকুক এমুখ অন্ধকার! দীপ নেবাও! দীপ নেবাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৫
ছি ছি ছি ছি একি দেখি গাহিস্ তাদেরি বন্দনা-গান
দাস সম নিস্ হাত পেতে দান
ছি-ছি-ছি-ছি-ছি-ছি ওরে তরুণ ওরে অরুণ!
নরসুত তুমি, দাসত্বের এ ঘৃণ্য চিহ্ন মুছিয়া দাও!
ভাঙিয়া দাও, এ-কারা এ-বেড়ি ভাঙিয়া দাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...
৬
পরাধীন ব'লে নাই তোমাদের সত্য-তেজের নিষ্ঠা কি?
অপমান স'য়ে মুখ পেতে নেবে বিষ্ঠা ! মরি লাজে, লাজে মরি'!
এক হাতে তোরে পয়জার মারে, আর হাতে ক্ষীর সর ধরি'!
অপমান সে যে অপমান! জাগো জাগো ওরে হতমান!
কেটে ফেল লোভী লুব্ধ রসনা, আঁধারে এ হীন মুখ লুকাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও...

৭
ঘরের বাহির হ'য়ো না আর,
ঝেড়ে ফেল হীন বোঝার ভার,
কাপুরুষ হীন মানবের মুখ ঢাকুক লজ্জা অন্ধকার।
পরিহাস ভাই পরিহাস সে যে,
পরাজিতে দিতে মনোব্যথা—যদি জয়ী আসে রাজ-রাজ সেজে।
পরিহাস এ যে নির্দয় পরিহাস! ওরে কোথায় যাস্
বল্ কোথা যাস ছি ছি পরিয়া ভীরুর দীন বাস?
অপমান এত সহিবার আগে হে ক্লীব, হে জড়, মরিয়া যাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও ...
৮
পুরুষসিংহ জাগো রে! নির্ভীক বীর জাগো রে!
দীপ জ্বালি' কেন আপনারি হীন কালো অন্তর
কালামুখ হেন হেসে দেখাও! নির্লজ্জ রে ফিরিয়া চাও!
অন্ধকার! অন্ধকার! নিশ্বাস আজি বন্ধ মা'র
অপমানে-নির্মম লাজে, তাই দিকে দিকে ক্রন্দন বাজে—
দীপ নেবাও দীপ নেবাও! আপনার পানে ফিরিয়া চাও ॥
কোরাস্ : ভিক্ষা দাও ...

৯১. ভূমিকম্পের প্রলয়-লীলায় সব হ'ল ছারখার;
ভিক্ষার ঝুলি ছাড়া আজ ভাই সম্বল নাহি আর।
ভিক্ষা দাও গো ভিক্ষা দাও, কাঁদন কি ঐ শুনিতে পাও —
বিত্তবিহীন চিত্ত ভরিয়া সকরুণ হাহাকার ॥
সারা জীবনের শ্রম-সঞ্চিত
সম্পদ হ'তে হ'য়ে বঞ্চিত
রিক্ত হস্ত জনগণ হের ফিরিতেছে দ্বার দ্বার।
তোমার ক্ষুধার অন্নে আছে এ ক্ষুধিতের অধিকার ॥
আর্ত বিহারী তরে এ ভিক্ষা নহে হে বন্ধু, করে প্রতীক্ষা,
দ্বারে তব দীন পীড়িত মানুষ প্রার্থনা সবাকার।
এই পীড়িতেরে ফিরাতে কে পারে, রুধিবে কে আজি দ্বার ॥
আজ যাহা দিবে সম্বলহীনে
ফিরায়ে তা পাবে তব দুর্দিনে,
ঐশ্বর্যের পরিণতি হের সমুখে তব বিহার।
ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া হে দাতা বর লহ বিধাতার ॥

সূত্র : পত্রিকা মোয়াজ্জিন
পত্রিকা : মোয়াজ্জিন, চৈত্র ১৩৪০
উপলক্ষ্য : ১৯৩৩ সালে বিহারের প্রবল ভূমিকম্প
বিষয় : পথভিক্ষা

৯২. ভোল লাজ ভোল গ্লানি জননী মুক্ত আলোকে জাগো।
কবে সে ঘুমালি মরণ-ঘুমে মা আর তো জাগিলি না গো ॥
চরণে কাঁদে মা তেমনি জলধি বক্ষ আঁকড়ি কাঁদে নদ-নদী,
ত্রিশ কোটি সন্তান নিরবধি— কাঁদে আর ডাকে মা গো ॥
যে তিতিক্ষা যে শিক্ষা ল'য়ে অতীতে ছিলি মা রাজরানী হয়ে,
ল'য়ে সে-মহিমা পুন নির্ভয়ে — বিশ্ব-বুকে-দাঁড়া গো ॥
বিশ্বের এই খল কোলাহলে তুই আয় কল্যাণ-দীপ জ্বেলে',
বিরোধের শেষে তুই শান্তি মা—মৃত্যু শেষে সুধা গো ॥

গ্রন্থ : বনগীতি
শ্রেণী : স্বদেশি গান
শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন
তাল : দাদ্‌রা

৯৩. মানবতাহীন ভারত শ্মশানে দাও মানবতা হে পরমেশ।
কি হবে লইয়া মানবতাহীন ত্রিশ কোটি এই মানুষ মেষ ॥
কলের পুতুল এরা প্রাণহীন পাষাণ আত্মা বিশ্বাসহীন,
নিজেরে ইহারা চিনে না জানে না, কেমনে চিনিবে নিজের দেশ
ভারত শ্মশানে ফেরে প্রেতপাল, নর নাই, শুধু নর-কঙ্কাল ;
এই চির অভিশপ্তের মাঝে জাগাও হে প্রভু প্রাণের রেশ ॥
ভায়ে ভায়ে হেথা নাহি প্রেমবোধ ;
কেবলি কলহ, কেবলি বিরোধ ;
হে দেশ-বিধাতা, দূর কর এই লজ্জা ও গ্লানি, এ দীন বেশ ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
ইমন মিশ্র-একতালা
শিল্পী : মৃণালকান্তি ঘোষ
সুর : নজরুল
মালকোষ- তেওড়া

৯৪. মোরা এক বৃন্তে দু'টি কুসুম হিন্দু-মুসলমান।
মুসলিম তার নয়ন-মণি, হিন্দু তাহার প্রাণ ॥
এক সে আকাশ মায়ের কোলে যেন রবি শশী দোলে,
এক রক্ত বুকের তলে, এক সে নাড়ির টান ॥
এক সে দেশের খাই গো হাওয়া, এক সে দেশের জল,
এক সে মায়ের বক্ষে ফলাই একই ফুল ও ফল।
এক সে দেশের মাটিতে পাই কেউ গোরে কেউ শ্মশানে ঠাঁই
এক ভাষাতে মা'কে ডাকি, এক সুরে গাই গান ॥

গ্রন্থ : ১. পুতুলের বিয়ে
২. সুরসাকী
ভৈরবী-একতালা
রেকর্ড : নাটিকা : পুতুলের বিয়ে
নাট্যকার : নজরুল
শিল্পি : বীণাপাণি ও হরিমতি
বাউল-কার্ফা

৯৫. মোরা মারের চোটে ভূত ভাগাবো, মন্ত্র দিয়ে নয়।
মোরা জীবন ভ'রে মার খেয়েছি আর প্রাণে না সয় ॥
তোদের পিঠ হয়েছে বারোয়ারী ঢাক, যে চায় হানে মার,
সেই ঢাক গড়িয়ে মায়ের পিঠে পড়ুক না এবার !
তোরা নবীন মন্ত্র শোন্ আমাদের—'প্রহার ধনঞ্জয়' ॥
আছে তোদের গায় ভূতের লেখা হাজার মারের ঋণ,
এবার ফিরিয়ে দিতে হবে সে-মার, এসেছে আজ দিন।
ওরে মন্ত্র দিয়ে হয় কি কভু বনের পশু জয় ॥
ওরে দৈন্যেরে তোর সৈন্য ক'রে রণের করিস্ ভান,
খর-স্রোতের মুখে খড় ভেসে কয়—'সাগর অভিযান'!
তোরা যজ্ঞ করিস্ অযোগ্য সব—প্রাণে মৃত্যু-ভয় ॥
তোদের হাড্ডি গেছে, মাংস গেছে, চামড়া মাত্র সার,
তোরা তাই নিয়ে কি ভাবিস্ তোরা যজ্ঞ-অবতার।
তোদের শুষ্ক দেহে জ্বালা এবার আগুন জ্বালাময় ॥

নাট্যগ্রন্থ (সংকলন) : ঝিলিমিলি
(দ্বিতীয় সংস্করণ)
নাটক : ভূতের ভয়
বিপ্লব কুমারের গান
গীতিগ্রন্থ : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

৯৬. শঙ্কাশূন্য লক্ষ কণ্ঠে বাজিছে শঙ্খ ঐ
পুণ্য-চিত্ত মৃত্যু-তীর্থ-পথের যাত্রী কই ॥
আগে জাগে বাধা ও ভয়
ও ভয়ে ভীত নয় হৃদয়
জানি মোরা হবই হব জয়ী ॥
জাগায়ে প্রাণে প্রাণে নব আশা, ভাষাহীন মুখে ভাষা
হে নবীন আন নব পথের দিশা নিশি শেষের ঊষা
কেহ নাই দেশে মানুষ তোমরা বৈ ॥
স্বর্গ রচিয়া মৃত্যুহীন চল্ ওরে কাঁচা চল নবীন
দৃপ্ত চরণে নৃত্য দোল জাগায়ে মরুতে রে বেদুইন!
'নাই নিশি নাই' জাগে শুভ্র দীপ্ত দিন ।
নাই ওরে ভয় নাই জাগে ঊর্ধ্বে দেবী জননী শক্তিময়ী ॥

গ্রন্থ : গানের মালা
মার্চ সং
শিল্পি : কমল দাশগুপ্ত
স্বরলিপি : ১. নজরুল স্বরলিপি,
একাদশ খণ্ড, হরফ
২. নজরুল সঙ্গীত
স্বরলিপি, দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা
তাল : দ্রুত-দাদ্‌রা

Dhaka University Institutional Repository

৯৭. 'বন্দনা-গান'
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি।
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
তাদেরি উষ্ণ শোণিত বহিছে আমাদেরও এই শিরা-মাঝে,
তাদেরি সত্য-জয়-ঢাক আজি মোদেরি কণ্ঠে ঘন বাজে।
সম্মান নহে তাহাদের তরে ক্রন্দন-রোল দীর্ঘশ্বাস,
তাহাদেরি পথ চলিয়া মোরাও বরিব ভাই ঐ বন্দী-বাস।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
মুক্ত বিশ্বে কে কার অধীন ? স্বাধীন সবাই আমরা ভাই,
ভাঙিতে নিখিল অধীনতা-পাশ মেলে যদি কারা, বরিব তাই।
জাগেন সত্য ভগবান যে রে আমাদেরি এই বক্ষ-মাঝ,
আল্লার গলে কে দেবে শিকল, দেখে নেবো মোরা তাহা আজ।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদেরি ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥
কাঁদিব না মোরা, যাও কারা-মাঝে যাও তবে বীর-সংঘ হে !
ঐ শৃঙ্খলই করিবে মোদের ত্রিশ কোটি ভ্রাতৃ-অঙ্গ হে!
মুক্তির লাগি' মিলনের লাগি' আহুতি যাহারা দিয়াছে প্রাণ,
হিন্দু-মুসলিম চলেছি আমরা গাহিয়া তাদেরি বিজয়-গান।
কোরাস্ : শিকলে যাদের উঠেছে বাজিয়া বীরের মুক্তি-তরবারি,
আমরা তাদের ত্রিশ কোটি ভাই, গাহি বন্দনা-গীতি তা'রি ॥

গ্রন্থ : বিষের বাঁশি
শিরোনাম : বন্দনাা গান
শিরোভাগে 'গান' নির্দেশিত
পত্রিকা : সাধনা, অগ্রহায়ণ ১৩২৮
শিরোনাম : বিজয় গান
রচনাস্থান : কান্দিরপাড়, কুমিল্লা

৯৮. শুধু নদীয়ার নহ তুমি, আজ বাঙলার গৌরব।
দিগ্‌দিগন্তে লুটাইয়া পড়ে তব যশঃ-সৌরভ ॥
জলাঙ্গী অঞ্জনা চূর্ণীতে বাজে তরঙ্গ কল-সঙ্গীতে
কুলুকুলু রবে কূলে তাহাদের ধ্বনিছে তোমার স্তব ॥
হৃদয়-আসন পাতা ছিল, আজ পেলে রাজাসন ধীর;
ধন্য হইল শিরোপা আজিকে বরিয়া তোমার শির।
ওগো বীর, তুমি রাজসম্মান নিলে জয় করি', লহ নাই দান;
সুন্দরতর আজ তাই তব শুভ বিজয়োৎসব ॥

গ্রন্থ : ১. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
২. নজরুল রচনাবলী, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা
উপলক্ষ্য : শান্তিপুর খান বাহাদুর
মোহাম্মদ আজিজুল হকের সংবর্ধনা
সভার জন্য রচিত ও কবি কর্তৃক গীত।
রচনাকাল : জুলাই ১৯৩৪

৯৯. শুভ যাত্রার লগ্ন এসেছে কালের শঙ্খ বাজিছে ওই!
কে দেখাবে পথ, প্রদীপ তুলিয়া নিশীথ রাতের বন্ধু কই?
ঘন তমসায় এ মহাসাগরে কে বাহিবে তরী ভাঙ্গা হাল ধ'রে,
কঙ্কাল-বুকে নাচে মহাকাল, জীবন-দেবতা নাচে তাথৈ!
মোরা স্বার্থ-হিংসা-প্রাচীর গড়িয়া বন্দী হয়েছি আপন ঘরে,
বন্ধুতা ভুলে অন্ধ-কায়ায় বৈরী হয়েছি পরস্পরে।
ভীরু জনগণ আজো গৃহ-কোণে
লাজে অপমানে কাঁদিছে গোপনে,
কোথা হে ভারত-ভাগ্য-বিধাতা অভয়-কণ্ঠে বলো মাভৈঃ ॥

সূত্র : পাণ্ডুলিপি (হরফ প্রকাশনীর
হেফাজতে রক্ষিত)
গ্রন্থ : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
রাগ : ইমন-ভূপালি
তাল : দাদ্‌রা

১০০. শ্যামলা বরণ বাংলা মায়ের রূপ দেখে যা, আয় রে আয়
গিরি-দরি, বনে-মাঠে, প্রান্তরে রূপ ছাপিয়ে যায় ॥
ধানের ক্ষেতে, বনের ফাঁকে, দেখে যা মোর কালো মা-কে
ধূলি-রাঙা পথের বাঁকে বৈরাগিণী বীণ বাজায় ॥
ভীরু মেয়ে পালিয়ে বেড়ায় পল্লীগ্রামে এক্‌লাটি
বিজনমাঠে গ্রাম সে বসায় নিয়ে কাদা, খড়, মাটি
কালো মেঘের ঝারি নিয়ে করুণা-বারি ছিটায় ॥
কাজলা-দীঘির পদ্মফুলে যায় দেখা তার পদ্ম-মুখ
খেলে বেড়ায় ডাকাত-মেয়ে বনে লয়ে বাঘ-ভালুক
ঝড়ের সাথে নৃত্যে মাতে বেদের সাথে সাপ নাচায় ॥
নদীর স্রোতে পাথর নুড়ির কাঁকন চুড়ি বাজে তার
সাঁঝের বারান্দাতে দাঁড়ায় টিপ প'রে সন্ধ্যা-তারার।
ঊষার গাঙে ঘট ভরিতে যায় সে মেয়ে ভোর বেলায়।
হরিত শস্যে লুটায় আঁচল ঝিল্লিতে নূপুর বাজে
ভাটিয়ালি গায় ভাটির স্রোতে গায় বাউল মাঠের মাঝে (মা)।
গঙ্গা-তীরে শ্মশান-ঘাটে কেঁদে কভু বুক ভাসায় ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
রাগ : খাম্বাজ মিশ্র
তাল : দ্রুত দাদ্‌রা
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি, সেপ্টেম্বর ১৯৩২
নং- এন ৭০২৩
শিল্পি : ধীরেন দাস
স্বরলিপি : নজরুল সঙ্গীত স্বরলিপি, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা

১০১. সঙ্ঘ শরণ তীর্থযাত্রা-পথে এসো মোরা যাই।
সঙ্ঘ বাঁধিয়া চলিলে অভয় সে পথে মৃত্যু নাই ॥
সঙ্ঘবদ্ধ হইলে তাদের সাথে,
ঐশী শক্তি সহায় হইয়া চলে হাত রেখে হাতে
সঙ্ঘবদ্ধ হইলে সারথি ভগবানে মোরা পাই ॥
সঙ্ঘ শক্তি আসিলে সর্ব ক্লৈব্য হইবে লীন,
চল্লিশ কোটি মানুষ এই ভারতে
ভিন্ন হইয়া ডাকি ঠাঁই ঠাঁই, তাই মোরা পরাধীন।
মোরা সঙ্ঘবদ্ধ হই যদি একবার
জাতি ও ধর্ম ভেদ রবে নাকো আর
পাব সাম্য, শান্তি, অন্ন, বস্ত্র পুন সবাই ॥

শিল্পি : প্রতিভা ঘোষ, জগন্ময় মিত্র ও সত্য চৌধুরী
সুর : নজরুল
গ্রন্থ : নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ
তাল : দাদ্‌রা

১০২. স্বদেশ আমার! জানি না তোমার শুধিব মা কবে ঋণ।
দিনের পরে মা দিন চ'লে যায় এলো না সে শুভদিন ॥
খাই দাই আর আরামে ঘুমাই পাগলের যেন ব্যথা-বোধ নাই
ললাট–লিখন বলিয়া এড়াই ভীরুতা, শক্তি ক্ষীণ।
অভাগিনী তুমি, সন্তান তব সমান ভাগ্যহীন ॥
কত শতাব্দী করেছি মা পাপ মানুষেরে করি ঘৃণা
জানি মা মুক্তি পাব না তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিনা।
ক্ষুদ্র ম্লেচ্ছ কাঙাল ভাবিয়া রেখেছি যাদেরে চরণে দাবিয়া
তাদের চরণ-ধূলি মাখি যদি আসিবে সে শুভদিন
নূতন আলোকে জাগিবে পুলকে জননী ব্যথা-মলিন ॥

গ্রন্থ : গুলবাগিচা
রাগ : কেদারা
তাল : একতাল

Dhaka University Institutional Repository

১০৩. স্বপনে দেখেছি ভারত-জননী তুই যেন রাজরাজেশ্বরী।
নবীন ভারত! নবীন ভারত! স্তব-গান ওঠে ভুবন ভরি' ॥
শস্যে ফসলে ডেকেছে মা বান মাঠে ও খামারে ধরে নাকো ধান
মুখভরা হাসি, হাসিভরা প্রাণ নদী ভরা যেন পণ্যতরী ॥
পড়ুয়ারা পড়ে বকুল-ছায়ে সুস্থ সবল আদুল গায়ে
মেয়েরা ফিরিছে মুক্ত বায়ে কল-গীতে দিক মুখর করি'।
ভুলিয়া ঈর্ষা ভোগ আসক্তি ধরার ক্লান্ত অসুর-শক্তি
এসেছে শিখিতে প্রেম ও ভক্তি নব-ভারতের চরণ ধরি' ॥

গ্রন্থ : গুলবাগিচা
পাহাড়ি- একতালা
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি, জুলাই ১৯৩৩
নং- এন ৭১২৩
শিল্পী : কে. মল্লিক
রাগ : পাহাড়ি
তাল : একতালা

১০৪. 'সালাম'
সালাম, সালাম, জামালউদ্দীন আফগানী তস্‌লিম।
এশিয়ার নব-প্রভাত-সূর্য—পুরুষ মহামহিম ॥
সাম্য ওমর ফারুকের তুমি, আলীর জুলফীকার
অসম সাহস খালেদের, মুসা তারেকের তলোয়ার,
নিরাকার কারবালা-প্রান্তরে দুল্‌দুল্‌ আসওয়ার—
জড় ও ক্লীবের মাঝে এসেছিলে আদর্শ মুসলিম ॥
কারাগারে তুমি দেখিলে স্বপন কোন্‌ মহামুক্তির
ভাঙিয়া বুলন্দ-দরওয়াজা হলে মুক্ত-লোকে বাহির,
খান্‌ খান্‌ হয়ে টুটিল অমনি চরণের জিঞ্জির—
রাঙিল আকাশ, বন্দীর বুকে জাগিল আশা অসীম ॥
শত লাঞ্ছনা জুলুম সহিয়া ভাঙিলে সবার নিদ
বুকের রক্তে সুবহ-সাদেক আনিয়া হ'লে শহীদ,
জাগিল কাবুল, মেসের, ইরান, তুর্ক, আবর, হিন্দ্‌—
তুষার-সাগরে হে চাঁদ আসিয়া জাগালে জোয়ারে ভীম ॥
সউদ, কামাল, জগগুল-পাশা, ইবনে-করিম বীর
তোমার মানস-পুত্রের রূপে এলো উন্নত শির,
দীনের জামাল, তরুণ শাহানশাহীর আলমগীর—
'প্রাচী'র গর্ব সাম্য মৈত্রী মানবতার খাদিম ॥

পত্রিকা : মোহাম্মদী, ভাদ্র ১৩৪৬
শিরোনাম : সালাম
গ্রন্থ : ১. নজরুলগীতি অখণ্ড, হরফ

১০৫. সেই আমাদের বাংলাদেশ!
রাজরানী আজ ভিখারিনী কাঁদছে বনে লুটিয়ে কেশ ॥
মুক্ত-ধারা সে-নদী আজ মন্দ-গতি বন্ধনে,
সুনীল আকাশ অশ্রু-মলিন নিপীড়িতের ক্রন্দনে।
ধূলায় ছিল সোনার রেণু ঘরে ঘরে সুখ-বিলাস
নিঃশ্বসিয়া ফিরছে হেথা চাঁদ-কেদারের দীর্ঘশ্বাস,
বাতাসে হায় ফিরছে উড়ে বীর প্রতাপের ভস্ম-শেষ

রেকর্ড : নাটিকা-প্রতাপাদিত্য
নাট্যকার : যোগেশ চৌধুরী
শিল্পী : ধীরেন দাস

১০৬. হায় পলাশী!
এঁকে দিলি তুই জননীর বুকে কলঙ্ক-কালিমা রাশি,
পলাশী, হায় পলাশী ॥
আত্মঘাতী স্বজাতি মাখিয়া রুধির কুম্‌কুম্‌,
তোরই প্রান্তরে ফুটে ঝরে গেল পলাশ কুসুম।
তোরই গঙ্গার তীরে পলাশ-সঙ্কাশ
সূর্য ওঠে যেন দিগন্ত উদ্ভাসি' ॥

শিল্পী : নীহারবালা
সুর : নজরুল
নাটক : সিরাজদ্দৌলা
নাট্যকার : শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

১০৭. হিন্দু আর মুসলিম মোরা দুই সহোদর ভাই।
এক বৃন্তে দু'টি কুসুম এক ভারতে ঠাঁই ॥
সৃষ্টি যাঁর মুসলিম রে ভাই হিন্দু সৃষ্টি তাঁরি
মোরা বিবাদ ক'রে খোদার উপর করি যে খোদকারি।
শাস্তি এত আজ আমাদের হীন-দশা এই তাই ॥
দুই জাতি ভাই সমান মরে মড়ক এলে দেশে
বন্যাতে দুই ভাইয়ের কুটির সমানে যায় ভেসে।
দুই জনারই মাঠেরে ভাই সমান বৃষ্টি ঝরে—
সব জাতিরই সকলকে তাঁর দান যে সমান করে
চাঁদ সুরুযের আলো কেহ কম-বেশি কি পাই
বাইরে শুধু রঙের তফাৎ ভিতরে ভেদ নাই ॥

শিল্পী : আব্বাসউদ্দিন ও
মৃণালকান্তি ঘোষ
সুর : কমল দাশগুপ্ত
তাল : তেওড়া

১০৮. হিন্দু-মুসলমান দুটি ভাই ভারতের দুই আঁখি-তারা।
এক বাগানে দুটি তরু—দেবদারু আর কদমচারা ॥
যেন গঙ্গা সিন্ধু নদী যায় গো ব'য়ে নিরবধি,
এক হিমালয় হতে আসে, এক সাগরে হয় গো হারা ॥
বুলবুল আর কোকিল পাখি এক কাননে যায় গো ডাকি',
ভাগীরথী যমুনা বয় মায়ের চোখের যুগল-ধারা ॥
পেটে-ধরা ছেলের চেয়েও চোখে ধরার মায়া বেশি,
অতীতে ছিল অতিথি, আজ সে সখা প্রতিবেশী।
ফুল পাতিয়ে গোলাপ বেলি এক সে-মায়ের বুকে খেলি,
পাগল তারা—ভিন্ন ভাবে আল্লা ভগবানে যারা ॥

গ্রন্থ : সুরসাকী
ছায়ানট-দাদ্‌রা
রেকর্ড : এইচ. এম. ভি, সেপ্টেম্বর
১৯৩২
নং- এন ৭০২৩
শিল্পী : ধীরেন দাস

১০৯. হোক প্রবুদ্ধ সঙ্ঘবদ্ধ মোদের মহাভারত হোক সার্থক নাম।
হোক এই জাতি ধর্মে এক, কর্মে এক, মর্মে এক—
এক লক্ষ্যে মধুর সখ্যে,
পূর্ণ হউক পূর্ণ হউক আর্যাবর্তধাম॥

সূত্র : রেকর্ড কোম্পানির
প্রচার পুস্তিকা
রেকর্ড : নাটিকা-সুরথ
উদ্ধার
নাট্যকার : মন্মথ রায়
সুর : নজরুল